বিষয়

সূচীপত্র।

লেখক ও লেখিকাগণের বর্ণানুক্রমিক নাম।

নারায়ণ

মাসিক পত্র।

সম্পাদক

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ।

তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১ম সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩ সাল।

সূচী।

কলিকাতা, ২০ নং পটুয়াটোলা লেন,

বিজয় প্রেসে,—শ্রীরমেশচন্দ্র চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"নারায়ণ" সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

---:০:---

নারায়ণের বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র অগ্রিম ৩৸৹ টাকা। প্রতি সংখ্যা ।৴৹ আনা। বিশেষ সংখ্যায় বিশেষ মূল্য। ভিঃ পিঃ মাশুল ৴৹ আনা।

প্রতি অগ্রহায়ণ হইতে নারায়ণের বর্ষ আরম্ভ হয়। কেহ বর্ষের মধ্যে গ্রাহক হইলে তাঁহাকে তৎপূর্ব্ব অগ্রহায়ণ হইতে নারায়ণ লইতে হইবে। গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ আমাদিগকে পত্র লিখিবার সময় তাঁহাদের গ্রাহক-নম্বর লিখিয়া দিবেন।

"নারায়ণ"-সম্পাদকের নামে চিঠীপত্র ও প্রবন্ধাদি সমস্তই "নারায়ণ"-কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধাদি মনোনীত না হইলে, "নারায়ণ"-সম্পাদক তাহা ফেরত পাঠাইবার ভার গ্রহণ করিতে অক্ষম। এইজন্য লেখকগণ তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন।

"নারায়ণ"-কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীবামাচরণ সেনের স্বাক্ষরযুক্ত রসিদ ব্যতীত কাহাকেও চাঁদা কিম্বা বিজ্ঞাপনের হিসাবে কেহ কোন টাকা দিলে নারায়ণ-কার্য্যালয় তাহার জন্য দায়ী হইবে না।

"নারায়ণ"-কার্য্যাধ্যক্ষকে পত্র লিখিলে বিজ্ঞাপনের দর ও নিয়মাবলী পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

শ্রীবামাচরণ সেন,
"নারায়ণ"-কার্য্যাধ্যক্ষ।

"নারায়ণ"-কার্য্যালয়, ২০৮।২ ডিঃ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

নারায়ণ

২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা] [জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩ সাল

আর্টের আধ্যাত্মিকতা

কলাবিদ্যার সহিত ধর্ম্মজীবনের কোন স্বাভাবিক বিরোধ আছে কি? পিউরিটানগণ (Puritan) কাব্যসঙ্গীত বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহুদির ধর্ম্মশাস্ত্রে (Talmud) মানুষ হউক দেবতা হউক কাহারও প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করা একেবারে নিষেধ। প্লেতো তাঁহার আদর্শ মনুষ্যসমাজে (Republic) কবিকে আসন দিতে চাহেন নাই। আধুনিক জগতেও কাব্যে সঙ্গীতে চিত্রে ভাস্কর্য্যে আমরা চাহিতেছি Idealism, অর্থাৎ যাহা উচ্চভাবের উদ্বোধক—যাহা অধ্যাত্মবোধের সহায়, ধর্ম্মজীবনের উদ্দীপক। ইহসর্ব্বস্ব যে চারুকলা তাহা ছাড়িয়া আমরা চাহিতেছি সেই কলা যাহা ভগবানের সহিত আমাদিগকে পরিচিত করাইয়া দেয়। মানুষের অধোমুখী প্রবৃত্তিসকলের মূর্ত্তি যে কলা ফুটাইয়া তুলে তাহা হইতে চক্ষু ফিরাইয়া দেখিতে চাহিতেছি উচ্চতর মহত্তর শুদ্ধতর প্রেরণার চিত্র।

অধ্যাত্ম বিদ্যাই পরাবিদ্যা, আর সব অপরাবিদ্যা। ধর্ম্মজীবনই মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও একমাত্র স্পৃহনীয় বস্তু। ইহাই যদি সত্য, তবে যে বস্তু ধর্ম্মের সহায় মানুষ শুধু তাহাই চাহিবে—ধর্ম্মের যাহা পরিপন্থী তাহা হইতে মানুষ দূরে থাকিবে। সকল অপরাবিদ্যা

সই এক পরাবিদ্যারই সোপানস্বরূপ সৃজন করিতে হইবে। জগতের যদি কিছু মহিমা বা সৌন্দর্য্য থাকে তাহা ভগবানে, তাই অপরাবিদ্যার সার্থকতা একমাত্র পরাবিদ্যার অনুচর হইয়া। এই সূত্রটি আমরা আজ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছি। কিন্তু এই সূত্রটি কতদূর সত্য, ইহার প্রকৃত অর্থই বা কি?

প্রথমেই আমরা বলিতে চাই চারুকলা বা আর্টের উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি। ভগবৎ-উপলব্ধিতে এক রস, রমণী-সম্ভোগে আর এক রস। শিল্পী এই দুই বিষয়ের যে কোনটি লইয়া এক রসপূর্ণ সৃষ্টি করিতে পারেন। রমণী-সম্ভোগের চিত্র ধর্ম্মজীবনের পক্ষে হানিকর হইতে পারে, কিন্তু শুধু রসসৃষ্টির দিক দিয়া দেখিলে তাহার মূল্য যে কম হইবে এমন বাধ্যবাধকতা আছে কি? প্রতিপক্ষ উত্তরে বলিবেন ভগবানই একমাত্র পূর্ণরসের আধার। সাধারণ জাগতিক জীবনে রসের বা সৌন্দর্য্যের অভাব নাই, কিন্তু সে রস সে সৌন্দর্য্য ভগবানেরই অংশ বা ছায়া, বেশীর ভাগই তাহা বিকৃত অংশ বিকৃত-ছায়া মাত্র। রমণী-সম্ভোগের কাহিনী অতি মনোমুগ্ধকর হইতে পারে, কিন্তু উহার মধ্যে যদি এমন কিছু না পাই যাহা ভগবানের দিকেই আমাদের দৃষ্টি পরিচালিত করে, তাঁহারই রসমূর্ত্তিটি ফুটাইয়া তুলে, তবে রসসৃষ্টির দিক দিয়াও উহার পূর্ণ সার্থকতা নাই। যেমন তেমন ভাবে রসসৃষ্টি করিলেই যদি আর্ট হয়, তবে শিল্পী যে-কোন বিষয় লইয়া যে-কোন প্রকারে তাঁহার উদ্দেশ্য সাধন করিলেও করিতে পারেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠরস, রসের পূর্ণতা যদি কিছু দেখাইতে চাহেন, তাহা হইলে শিল্পী যেন ভগবান[illegible] বাক্যে, শব্দে, চিত্রপটে, প্রস্তরখণ্ডে ফুটাইয়া তুলেন।

কিন্তু সমস্যা হইতেছে ভগবান কি, ভগবানের রসমূর্ত্তিই বা কি? ভগবান বলিলেই একটা নির্দ্দিষ্ট অবিকল্প বস্তুবিশেষ বুঝায় না। ভগবানের বহুমূর্ত্তি—কে যে কতভাবে দেখিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রথমেই তাই আমাদের সন্দেহ আসিতে পারে, সাধুর ভগবান ও

শিল্পীর ভগবান কি একই, না উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে? সাধু যে চক্ষে ভগবানকে দেখেন, শিল্পী ভগবানকে সেই চক্ষে নাও দেখিতে পারেন। সাধু ভগবানের যে রসমূর্ত্তির সন্ধান পাইয়াছেন, শিল্পী ঠিক তদ্রূপ পূর্ণভাবেই অন্য এক রসমূর্ত্তির পরিচয় পাইতে পারেন।

বস্তুতঃ সাধু বা ধার্ম্মিক দেখেন সেই ভগবান যিনি শুদ্ধ অপাপ-বিদ্ধ—ইহলোকের প্রেরণাদি যাঁহাকে কলঙ্কলিপ্ত করে না। মানুষে যে মলিনতা, যে ইন্দ্রিয়বিক্ষোভ, যে স্থূলত্ব দেখিতে পাই, সে সকলের নিতান্ত অভাব যেখানে, শুধু সেইখানেই সাধুর ভগবান প্রকট। জগতের সাধারণ নিত্যনৈমিত্তিক লীলার পশ্চাতে, জগতের সকল পাপ হইতে মুক্ত মঙ্গলময় এই ভগবানকেই যে শিল্পী লক্ষ্য করিয়াছেন, সেই শিল্পীই তাঁহার কাছে প্রকৃত শিল্পী। সাধুর কাছে সেই শিল্পীরই আদর মানুষকে যিনি দুঃখদৈন্য ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যের অতীত করিয়া এক মহত্বের আভায় রচিত করিয়াছেন। সাধুর কাছে ভগবান সদাচারী মুক্তপুরুষ হইলেও হইতে পারেন; শিল্পী কিন্তু তাঁহাকে শরীর মন প্রাণের দাস বলিয়াও জানে। ত্যাগের মধ্যে, শুচির মধ্যে সাধুর আনন্দ—শরীরের ভোগের মধ্যে, এমন কি যাহাকে আমরা অশুদ্ধভোগ বলি তাহার মধ্যেও যে আনন্দ রহিয়াছে, সে আনন্দ যে ভগবানেরই আনন্দ, তাহা যে হীনতর নয়, ইহা শিল্পীই দেখাইতে পারেন; এইখানেই শিল্পীর শিল্প। শান্ত শুদ্ধ আনন্দে সাধু যদি ডুবিয়া থাকেন, মরজীবনের উদ্বেলিত স্রোতের মধ্যেই শিল্পী [illegible] অমৃতরস পাইয়াছেন তাহা যদি তিনি উপভোগ না করিতে পারেন, তবে ভগবানকে তিনি খণ্ডীকৃত করিয়াই দেখেন নাই? মানুষের মহত্ব, উদারতা, অতীন্দ্রিয়তার মধ্যে ভগবান আছেন, আবার মানুষের ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতা, ইন্দ্রিয়পরতার মধ্যেও সেই একই ভগবান। সাধু চাহেন প্রথমটি। শিল্পী কিন্তু দুইটিকেই সমানভাবে সত্যরসপূর্ণ করিয়া দেখাইতে পারেন।

সাধু ও শিল্পীর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এক নহে। সাধু এবং সংস্কারক জগৎকে মানুষকে একটা বিশেষ আদর্শে গড়িয়া তুলিতে চাহেন। সতীধর্ম্ম, সত্যপরায়ণতা প্রভৃতি এইরূপ এক একটি আদর্শ। সাধু চাহেন জগতে সকল স্ত্রীই চিরকাল সতী হইবে, সকল মানুষই সত্যবাদী হইবে। অসতী স্ত্রীর চিত্র, মিথ্যাচারী মানুষের চিত্র তাই তিনি দেখিতে ও দেখাইতে চাহেন না। কারণ উহা মিথ্যাচারকে, অসতীত্বকে জাগাইয়া তুলিতে পারে; চাহি না যাহা তাহা বাস্তব জীবনেও যেমন চাহি না, সেইরূপ শিল্পকলাতেও তাহাকে চাহি না, কোনক্ষেত্রে কোথাও তাহাকে চাহি না। শিল্পী কিন্তু বলেন, না চাহিতে পারি বটে, কিন্তু যাহা পাইতে চাহি না, হইতে চাহি না তাহার মধ্যেও ভগবানের, অনন্তের অনন্তমূর্ত্তির এক মূর্ত্তি, তাহার মধ্যেও সত্যবস্তু রহিয়াছে, তাহারও "কেন" "কি" আছে, আমি তাহা বুঝিব, লোকচক্ষে ধরিয়া দেখাইব। পাপ না চাহিতে পারি, কিন্তু তাই বলিয়া উহার প্রতি অন্ধদৃষ্টি হইব কেন? বাস্তব জীবনে না হয় পুণ্যবানই হইলাম, জগতে পুণ্য প্রতিষ্ঠা করাই যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়। কিন্তু পুণ্যবান হইয়াও পাপের মধ্যে কি খেলা কি উদ্দেশ্য কি তত্ত্ব তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে বিরত থাকিব কেন? বৃদ্ধ হইতে কেহ চাহে না। চিরযৌবন পাওয়াই সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিত। দেবগণ চিরযুবা। কিন্তু সেই জন্য বলিতে হইবে কি বৃদ্ধত্বে কোন সত্য নাই, কোন সৌন্দর্য্য নাই? না, বৃদ্ধকে শুধু এই ভাবেই আঁকিতে হইবে যাহাতে লোকের মনে বৃদ্ধত্বের উপর একটা ঘৃণা বা অশ্রদ্ধা জন্মায়, যাহাতে বৃদ্ধত্বকে ছাড়িয়া লোকে যৌবনের উপরই অধিকতর আকৃষ্ট হয়?

জগতে আদর্শ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিল্পী তাঁহার শিল্পকে নিয়োজিত করেন না, সে আদর্শ যতই মহান হউক না কেন। আদর্শ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। কোন আদর্শ কোন যুগে ফুটিয়া উঠিয়া জগতের হৃদয় আকর্ষণ করিতেছে সেই অনুসারে শিল্পী তাঁহার প্রতিভা প্রচালিত

করেন না। আর্ট দেশকালের অতীত। শিল্পী দেখেন শুধু চিরন্তন সত্য, উদাসীনভাবে ধ্যান করেন পাপপুণ্যে, ক্ষুদ্রে বৃহতে, অন্তের মধ্যে কল্যের মধ্যে ভগবানের বিচিত্র সত্তা। তাহাই তিনি ফলাইয়া লোকের নয়নগোচর করান। জগতের কোন মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনকল্পে শিল্পীর শিল্প পরম সাহায্যকারী হইতে পারে, কারণ তিনি সেই উদ্দেশ্যটির সত্য সৌন্দর্য্য প্রকটিত করিতে সক্ষম। কিন্তু তাই বলিয়া শুধু এই কর্ম্মেই যদি শিল্পী আপনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখেন তবে মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধই থাকিবে, জগতের রহস্য অনেকখানি আবরিত রহিয়া যাইবে, ভগবানের বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য্যে যে কত রস উৎসারিত হই-তেছে তাহার কোনই আস্বাদ পাইব না।

আর্টের বিচারকালে এই অনন্তরসবোধের কথা অনেক সময়ে আমরা ভুলিয়া যাই। তৎপরিবর্ত্তে সাধুর ন্যায় ভগবানের এক বিশেষরূপ কল্পনা করিয়া, কখন বা ধার্ম্মিকের ন্যায় নৈতিক কল্যাণের মানদণ্ডদ্বারা আমরা আর্টের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে যাই। সামাজিক বা রাজনৈতিক মঙ্গলসাধনেও আর্টকে সময়ে সময়ে নিযুক্ত করি। মনুষ্যজাতির উন্নতির দিক দিয়া, ব্যবহারিক হিসাবে, দেশকালপাত্র হিসাবে ভগবানের এক বিশেষ মূর্ত্তির আরাধনা প্রয়োজন হইতে পারে। সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক কল্যাণসাধনেরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু এসকল কিছু আর্টের অন্তরঙ্গ কথা নয়।

আমরা বলিয়াছি আর্টের মূল কথা হইতেছে চিরন্তন অনন্ত সত্য। এই সত্য হইতেছে বৃহৎ—সর্ব্বত্র বিস্তৃত। চক্ষুর কাছে যাহা সুন্দর বা অসুন্দর, সংস্কারের কাছে যাহা প্রিয় বা অপ্রিয়, বুদ্ধির কাছে যাহা ভাল বা মন্দ, সেই সকলের মধ্যেই একটা নিগূঢ় সত্য রহিয়াছে। বস্তুর যে গুণ, যে নিজস্বতা, যে বৈশিষ্ট্য, জগতের রঙ্গমঞ্চে তাহাকে যে ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তাহাই হইতেছে সেই বস্তুর সত্য। এই সত্যটিই নিত্য, ইহাই রসপূর্ণ—এই জিনিষটিকেই শিল্পী দেখাইতে চাহেন। জগতে যাহা কিছু বর্ত্তমান, ধার্ম্মিক সংস্কারক বা সাধুর

কাছে সে সমস্তই মঙ্গলকর প্রিয় বা সুবিধাজনক না হইতে পারে। কিন্তু কিছুই নিতান্ত অসত্য নয়। একটা কিছু সত্যপ্রাণকে আশ্রয় করিয়া প্রত্যেক বস্তু প্রকাশিত হইতেছে। এই সত্যটিই তাহার আনন্দ ঘন-স্বরূপ, ইহাই তাহার সৌন্দর্য্য, ইহাই তাহার মধ্যে ভগবান। শিল্পীর লক্ষ্য এই ভগবান। সাধুর বিরাট বৈরাগ্য ফুটাইয়া তুলিতে শিল্পীর যেমন কৃতিত্ব, কর্ম্মীর কর্ম্মপিপাসা ফুটাইয়া তুলিয়া তাঁহার ঠিক সেই একই কৃতিত্ব। কামীর কামোন্মত্ততা দেখাইয়াও তাঁহার মর্য্যাদার কোন হানি নাই। প্রকৃত অধ্যাত্মের সহিত আর্টের কোনই বিরোধ নাই। বরং অধ্যাত্মই আর্টের জীবন, তাহার প্রথম ও শেষ কথা। অধ্যাত্ম অর্থ আত্মা-সম্বন্ধীয়। যোগীর আত্মা কোথায়? তাঁহার যোগে। ভোগীর আত্মা কোথায়? তাঁহার ভোগে। যোগীর যোগীত্ব, ভোগীর ভোগীত্ব, দেবের দেবত্ব, পশুর পশুত্ব প্রকটিত করিতে পারিলেই শিল্পীর শিল্পের পরাকাষ্ঠা। এই হিসাবে শিল্পীই প্রকৃত অধ্যাত্মবাদী। করুণাবতার ভগবান তথাগতকে শিল্পী আঁকিয়া দেখাইতে পারেন। তাই বলিয়া রুদ্র-আত্মা নাদির সাহের প্রতিমূর্ত্তিকে শিল্পজগৎ হইতে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে কেন? কালিদাস আদিরসের অধ্যাত্মচিত্র দিয়াছেন। এই চিত্র যদি পাঠকের মনে আদিরসের ভাব জাগাইয়া তুলে তাহাতে কালিদাসের দোষ কি? কালিদাসের উদ্দেশ্যই ত এই ভাবটিকে গোচর করিয়া ধরা। মানুষের পক্ষে কোন অবস্থায় এই ভাবটি ধর্ম্মসাধনের বাধাস্বরূপ হইতে পারে, কিন্তু সেই জন্য উহা যে মূলতঃ অসত্য বা অসুন্দর তাহা কে বলিবে?

নগ্ননারীর চিত্র আমাদের চক্ষুকে যে পীড়িত করে তাহা শুধু আমাদের নীতিবোধের জন্য নহে, আমাদের সৌন্দর্য্যবোধের জন্যও বটে। কারণ সচরাচর যে চিত্র দেখি, তাহা চিত্র নয়, ফটোগ্রাফ মাত্র, প্রকৃতির হুবহু নকল। অসুন্দর কাহাকে বলি? অসুন্দর তাহাই যাহা বস্তুর বাহিরের চেহারাটি শুধু দেখায়, বস্তুর অন্তরের

রহস্যটি যাহা বুঝাইয়া দিতে পারে না। ফটোগ্রাফ কুৎসীত, তাহা নগ্ননারীরই হউক আর সাধুপুরুষেরই হউক। কারণ ফটোগ্রাফে নগ্ননারীই দেখি, নগ্ননারীত্ব দেখি না, সাধুপুরুষের জটাবল্কল দেখি কিন্তু সাধুত্বের ব্যাখ্যা পাই না। আর্টের দিক দিয়া বিচার করিলে বটতলার উপন্যাস যেমন কুৎসীত, রবিবর্ম্মার দেবদেবীর মূর্ত্তিও ঠিক তেমনি কুৎসীত। শুধু শরীর যেখানে, শরীরের পশ্চাতে গভীরতর কোন সত্যের মধ্যে শরীরের অর্থটি যেখানে পাই না, সাধুর অতীন্দ্রিয়পরতা, নীতিবাদীর শ্লীলতাবোধের দিক হইতেও যেমন তাহা হেয়, শিল্পীর সৌন্দর্য্যবোধের দিক হইতেও তেমনি।

উলঙ্গ রমণীর আত্মার কথাটিকে ব্যক্ত করিয়া যে শিল্পী উলঙ্গ রমণীর চিত্র আঁকিয়াছেন, তিনি উলঙ্গ রমণীকে লম্পটের দৃষ্টি দিয়া দেখেন নাই, সাধুর দৃষ্টি দিয়াও দেখেন নাই; তিনি দেখিয়াছেন ঋষির দৃষ্টি দিয়া, তিনি উলঙ্গ করিয়াছেন ভাগবত এক সত্য। অপরে মনের খেলার দাস হইয়া বলিতেছে, ইহা শুদ্ধ, উহা অশুদ্ধ, ইহা পুণ্য, উহা পাপ। কিন্তু ঋষিকল্প শিল্পী দেখিতেছেন, সত্য কি? বস্তুর নিগূঢ় তথ্য কি? কোথায় রসের সহস্রধারার উৎস?

কবি যিনি দ্রষ্টা যিনি তিনি সৃষ্টি করেন সিদ্ধ অবস্থার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া। এ ভাব ভাল-মন্দ শুদ্ধ-অশুদ্ধ মঙ্গল-অমঙ্গলের অতীত। সিদ্ধের পূর্ণ সত্যানুভূতি অপরিণত সাধকের পক্ষে তাহার সাধনের দিক দিয়া দেখিলে সকল সময়ে স্পৃহনীয় না হইলেও হইতে পারে। তবুও সিদ্ধেরই অনুভূতি প্রকৃত সত্য। সাধকের জন্য যে সত্য তাহা ক্ষণিক, সাময়িক, তাহার মূল্য সার্ব্বজনীন অথবা চিরন্তন নহে। কবির কথা সিদ্ধপুরুষের কথা। সাধন অবস্থার কোন মানদণ্ড লইয়া সে কথা বিচার করিতে যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু তাই বলিয়া আবার এসব কথা যে সাধকের কাছ হইতে লুকাইয়া রাখিতে হইবে, সাধককে এ সকল বিষয় হইতে যে দূরে দূরে রাখিতে হইবে তাহারও আবশ্যকতা কিছু নাই। উলঙ্গ নারীর চিত্র

আমাদিগকে বিচলিত করিতে পারে। কিন্তু সেই জন্য উহাতে যে সত্য যে সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত হইয়াছে তাহার উপভোগ হইতে বিরত থাকিব কেন? ইন্দ্রিয়কে দমনে রাখিতে যাইয়া ইন্দ্রিয়ের সত্য-ভোগকে নির্ব্বাসিত করিব কেন? ইন্দ্রিয়ের যে বাহ্যবিক্ষোভ তাহার ভয়ে ইন্দ্রিয়ের দেবতাকে অস্বীকার করা সত্যানুভূতিরই অন্তরায়।

কিন্তু সাধনার দিক হইতেও আর্টের যে মূল্য নাই এমন নহে। তবে শিল্পীর পথ ও সাধু বা ধার্ম্মিকের পথ এক নহে। সাধুর পথ 'ইহা নয়' 'ইহা নয়'; শিল্পীর পথ 'ইহাই, 'ইহাই'। সাধু চাহেন ইন্দ্রিয়কে দমনে রাখিয়া, ইহাকে দূর করিয়া শুধু অতীন্দ্রিয়ে পৌঁছিতে অথবা ইন্দ্রিয়ের কোন এক নির্দ্দিষ্ট ভঙ্গী বা প্রকরণের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে। শিল্পী চাহেন ইন্দ্রিয়ের বিশ্ববিভূতির মধ্যেই অতীন্দ্রিয়কে বোধ করিতে। আচার নিয়মের মধ্য দিয়া সাধু ধর্ম্মজীবন গঠিত করিতে চাহেন। শিল্পীর আচার নিয়ম নাই। প্রথম হইতেই তিনি আপনাকে মুক্ত বলিয়া মানিয়া লন। এই শ্রদ্ধাটুকু সর্ব্বদার জন্য ধরিয়া রাখিলে জীবনেও তিনি মুক্তসিদ্ধ হইতে পারেন। সাধু তাঁহার সাধুত্বের, ধার্ম্মিক তাহার ধর্ম্মশীলতার পরিমাপ করেন কোন্ বিষয়ে কোন্ বস্তুতে তাঁহার মতি বা অমতি, সেই বিষয় সেই বস্তুর রূপ বিচার করিয়া দেখিয়া। শিল্পী কিন্তু বিষয় নির্ব্বাচনে মনোযোগ দেন না। তিনি জানেন বিষয়ে কিছু দোষ নাই। তিনি দেখেন শুধু তাঁহার অন্তর, তাঁহার সহজ সত্য প্রেরণা ও সেই অনুসারে যে বিষয়েই তিনি হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন তাহা হইতেই সত্যসুন্দর মঙ্গলকে দৃষ্টিগোচর করিতে পারেন। আচরণ, [illegible], শিক্ষা, ব্যাখ্যার সাহায্যে সাধু ধর্ম্মের সহিত, অধ্যাত্মের সহিত পরিচয় স্থাপন করিতে চাহেন, শিল্পী কিন্তু চাহেন শুধু ভাবের মধ্য দিয়া। ম্যাডোনার (Madonna) ছবিই তুমি অঙ্কিত কর, আর বারনারীর ছবিই অঙ্কিত কর, তোমার বিষয়টির কোন প্রকৃতিগত দোষ নাই। প্রশ্ন শুধু, সত্যভাবটিকে পাইয়াছ কি?

আর্টের প্রভাব প্রসার সূক্ষ্ম। স্থূলপ্রকৃতি আমরা তাহা সহজে অনুভব করি না। আমরা চাই স্থূলপ্রভাব—স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া না দিলে আমরা বুঝি না, লাঠৌষধি না হইলে আমাদের চৈতন্য হয় না। ধর্ম্মশাস্ত্র নীতিশাস্ত্রের তাই সৃষ্টি হইয়াছে। আর্টের মধ্যেও তাই নীতিবাদ প্রভৃতি মতবাদ প্রবেশ করাইতে চাহিতেছি। নীতির প্রয়োজন থাকিলেও থাকিতে পারে, মানুষের স্থূলভাগটির পরিবর্ত্তনের সাহায্যের জন্য। কিন্তু মানুষের সূক্ষ্ম যে অন্তরের প্রকৃতি, তাহার অধ্যাত্মসত্তা কোন দিনই নীতির দ্বারা প্রবুদ্ধ হইবে না। আর্ট হইতেছে দৃষ্টি Revelation। এই দৃষ্টি বস্তুর অন্তরতম রহস্যের সহিত সাক্ষাৎভাবেই আমাদের এক সহজ পরিচয় স্থাপন করিয়া দেয়। অনেক সময়ে অজানিত ভাবেই আর্টের সাহায্যে বস্তুর প্রাণের সহিত আমরা মিলিত হইয়া যাই। এই সম্বন্ধই রসের সম্বন্ধ। ইহাকেই ধর্ম্মসাধনের ভাষায় ভগবৎপ্রসাদ নামে অভিহিত করিতে পারি। এই ভগবৎপ্রসাদ যিনি পাইয়াছেন, ব্যবহার-শাস্ত্রের এমন কি সাধনারই বা তাঁহার প্রয়োজন কি? এই ভগবৎপ্রসাদের ফলে শিল্পী সহজেই কৃচ্ছ্র সাধনা ব্যতিরেকে, ভোগের মধ্য দিয়া, ইন্দ্রিয়-লীলার সত্য-সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে করিতেই নির্ম্মল শুদ্ধচিত্ত, আধ্যাত্মিকভাবে পরিপ্লুত হইতে পারেন।

প্রকৃতপক্ষে আর্ট ও ধর্ম্মের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ নাই—ধর্ম্ম অর্থে নৈতিক আচার-বিচার বা সাধুজীবন না বুঝিয়া, বুঝি যদি সত্যধর্ম্ম, যাহা অধ্যাত্মদৃষ্টিগোচর। আত্মার সহিত পরিচিত হওয়াই যদি ধর্ম্মের লক্ষ্য, আর্টেরও তবে উহাই লক্ষ্য। অধ্যাত্মদ্রষ্টা আত্মাকে দেখিতে যাইয়া যদি আবার শরীরকে অথবা শরীরের কোন ভাগকে বাদ দিয়া না রাখেন, তবে শিল্পীও স্বচ্ছন্দে শরীরমধ্যে সকলরূপে আত্মার মহিমাকে বর্ণে শব্দে বাক্যে প্রস্তরফলকে মূর্ত্তিমান করিয়া পরম আধ্যাত্মিকতারই কার্য্য করিবেন।

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ।

মধুর পন্থী

আমি যাব, যাব তাহারি সদনে।
যে পথে গিয়াছে শত মহাজন,
উপল বন্ধুর গিরি দরী বন
আমি যাব না সে ভীম শরণে
আমি যাব, যাব তাহারি সদনে।

যাব, কুসুমের মত ফুটিতে ফুটিতে
যাব সে যাবক চরণে লুটিতে
সুরভির মত যাব অলখিতে
মিশিয়া বাসন্তী পবনে,
যাব, যাব তাহারি সদনে।

আপনার পথ আপনি করিয়া
নির্ঝরের মত যাইব ছুটিয়া
তুলে কলতান সারাপথ গান
মুখরিত করি ভুবনে।
যাব, যাব তাহারি সদনে।

শুনিয়া সে গীতি গাহিবে পাপিয়া
প্রতিধ্বনি গাবে পিয়া পিয়া পিয়া,
চমকি ভুবন ছুটিবে মাতিয়া
সে সরল সুন্দর শরণে

যাব করে করে ধরি গাহি গুনু গুনু
পদে বাজিবে মঞ্জীর রুণু ঝুনু রুণু
যাব সকলে মিলিয়া নাচিয়া গাহিয়া
যাব, যাব তাহারি সদনে ;

চির সুন্দর প্রাণেশ আমার
সুন্দর পথে যাব অভিসার
সুন্দর গীতি সুন্দর বীথী
লুকি সুন্দর লাজ নয়নে !
যাব, যাব তাহারি সদনে।

রুধি নিশ্বাস করি উপবাস
যায় কি পিয়ারী বন্ধুর পাশ
তার প্রেম যোগ তনুয়া সম্ভোগ,
ইঙ্গিতে বঁধু দেছে যে আভাস,
পাসরিব তাহা কেমনে।
যাব, যাব তাহারি সদনে।

এ তনুর প্রতি অণু পরমাণু
ভালবাসে পিয়া বাঁধা তাহে জনু
[illegible] কঙ্কালসার করিয়া তাহার
নিকটে ধরিব কেমনে।
যাব, যাব তাহারি সদনে,

তাই, সজ্জা করিব লজ্জা ত্যজিয়া
ভাল করে বেণী বাঁধলো সখিয়া

হৃদয় উচ্ছ্বাস ফুটে বাহিরিয়া
ফুটে মদির মৃগ নয়নে।
যাব, যাব তাহারি সদনে।

দুলিবে গীতি, শ্রুতি কুণ্ডলে!
উঠিবে গীতি চেল অঞ্চলে
নাচিবে গীতি মঞ্জীর তালে,
মৃদু মন্থর গমনে।—
ভেটিতে সুন্দর চল সুন্দরী
সুন্দর গীতি শরণে।

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

রাজা রামমোহন রায় ও ব্রহ্মসভা

রাজা রামমোহন রায় ব্রহ্মসভারই প্রতিষ্ঠা করেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে একটা নূতন ধর্ম্মের কিম্বা ব্রাহ্মসমাজ নামে একটা নূতন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে চান নাই। একটা বিশেষ ধর্ম্ম বা স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিলে, তাহার সঙ্গে জগতের অপরাপর ধর্ম্মের ও সম্প্রদায়ের একটা বিরোধ বাধিয়া উঠিত। কারণ প্রাচীন ও প্রচলিত ধর্ম্মসকল যতক্ষণ না অসত্য বা অক্ষম বলিয়া বোধ হয়, ততক্ষণ কেহ কোনও নূতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে যায় না। প্রাচীনের অসত্যতা ও অপূর্ণতাকে দূর করিয়াই খৃষ্টীয়ান্ প্রভৃতি ধর্ম্মের

প্রতিষ্ঠা হয়। হিন্দু, খৃষ্টীয়ান্, মুসলমান্ প্রভৃতি প্রাচীন ও প্রচলিত ধর্ম্মসকল ভ্রান্তিপূর্ণ ও মুক্তির পথ প্রদর্শনে অক্ষম বলিয়া ভাবিলেই রাজাও ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে একটা অভিনব সত্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ব্রতী হইতে পারিতেন। আর সে অবস্থায় সত্যাসত্য প্রামাণ্য-অপ্রামাণ্য লইয়া তাঁর প্রতিষ্ঠিত নূতন ধর্ম্মের সঙ্গে ঐসকল পুরাতন ও প্রচলিত ধর্ম্মের একটা নিত্য-বিরোধ জাগিয়া থাকিত। কিন্তু রাজা একেবারে কোন ধর্ম্মকেই অসত্য কহেন নাই। এমন কি, যে প্রচলিত প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধে তিনি অমন খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন, তাহাকে পর্য্যন্ত একান্ত অসত্য বা ধর্ম্মবিগর্হিত কহেন নাই। জগৎকার্য্য দেখিয়া জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা যে ইন্দ্রিয়াতীত ও মনবুদ্ধির অগম্য পরমেশ্বর, তাঁহার চিন্তনে যাঁহারা অসমর্থ তাঁহাদের নিমিত্ত এসকল কল্পিত রূপের পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে, অপরের জন্য নহে; এই শাস্ত্রপ্রমাণে রাজা বুদ্ধিমান শিক্ষাভিমানীদিগের পক্ষে এসকল বাহ্য-পূজা নিন্দনীয় ও সর্ব্বথা বর্জ্জনীয় বলিয়াছিলেন। নতুবা তাঁহার পরবর্ত্তী ব্রাহ্মগণের মধ্যে অনেকে যেমন এগুলিকে একান্ত ধর্ম্মবিগর্হিত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, রাজা কদাপি তাহা করেন নাই। প্রত্যুত এসকল প্রতিমার বা দেবদেবীর পূজা যাহারা করে, তাহারাও যে আপনাপন আরাধ্য দেবতাকে জগতের স্রষ্টা পাতা ও সংহর্ত্তা বলিয়া মনে করে, রাজা বারম্বার একথাও স্বীকার করিয়াছেন। রাজা যেভাবে প্রত্যক্ষ জগতের বিচিত্র রচনার আলোচনা করিয়া এই জগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্তার চিন্তন ও ধ্যানধারণার প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রহ্মসভার ব্রহ্মোপাসনার ব্যবস্থা করেন, তাহাতে এসকল বাহ্য ও কল্পিত পূজা-অর্চ্চনা—শুষ্ক পত্র যেমন আপনা হইতে বৃক্ষ-শাখা হইতে ঝরিয়া পড়ে, সেইরূপ উপাসকের মন ও ব্যবহার হইতে চলিয়া যাইবে, ইহা তিনি জানিতেন। যতদিন না এইরূপ সহজ ও স্বাভাবিক উপায়ে এসকল বাহ্য ও কল্পিত পূজা-অর্চ্চনা আপনা হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে, ততদিন এসকল হইতে লোককে প্রতি-

নিবৃত্ত করিতে তিনি চান নাই, বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার যত কিছু বিচার ও তর্কবিতর্ক কেবল বুদ্ধিমান, শাস্ত্রজ্ঞ, পাণ্ডিত্যাভিমানী লোকের সঙ্গেই হইয়াছিল। এসকল লোকের পক্ষে যে এই বাহ্য পূজা বিহিত হয় নাই, ইঁহারা শ্রেষ্ঠতর অধিকারী হইয়াও কেবল সাংসারিক স্বার্থ ও সুবিধার জন্যই নিজেরাও এসকল পূজা করিতেন ও সাধারণ লোককে এসকলে প্রবৃত্ত করাইতেন, রাজা এই কথা বলিয়াই ইহাদিগের কর্ম্মের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন; নতুবা সাধারণ খৃষ্টীয়ান্ বা মুসলমানদিগের মতন রাজা কখনও এসকল বাহ্য পূজা-অর্চ্চনাকে অধর্ম্ম বা দুর্নীতি বা পাপ, এমন কি একান্ত অসত্য বলিয়াও প্রচার করেন নাই। যাহারা যে কোনও কারণেই প্রতিমাদির পূজা করেন, তাঁহারা যে ব্রহ্মসভার উপাসনা করিবার অনধিকারী বা ব্রহ্মসভার সভ্য হইতে পারেন না, কিম্বা ব্রহ্মসভার আচার্য্যের বা অন্য কোনও কর্ম্মচারীর পদ পাইতে পারেন না, রাজা রামমোহন কখনও একথা বলেন নাই। এদেশের প্রতিমা-পূজকেরাও যখন আপনার ইষ্টদেবতাকে জগতের স্রষ্টা পাতা ও সংহর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করেন, যখন প্রতিমাদির প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকেও তাঁহারা সন্ধ্যা-বন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম সাধন করিবার সময় কেবল জগতের স্রষ্টা পাতা ও নিয়ন্তারূপে আপনাপন ইষ্টদেবতার চিন্তন ও ধ্যান করেন,—এবং প্রতিমাদিকে দেবতার আবির্ভাব-স্থান ভাবিয়াই এসকলের ভোগ-আরতি করেন, তখন ইঁহারাও ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন, প্রকৃতপক্ষে কাষ্ঠলোষ্ট্রের পূজা করেন না। আর এই জন্য ইঁহারাও ব্রহ্মসভায় যোগদান করিতে পারেন, রাজা ব্রহ্মসভায় যে উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করেন, ইঁহারাও তাহার সম্পূর্ণ অধিকারী। হিন্দু, খৃষ্টীয়ান্, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোককেই রাজা তাঁর ব্রহ্মসভাতে আহ্বান করিয়াছিলেন। আর তাঁহারা নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক মত ও সাধনাদি বর্জ্জন না করিয়াও ব্রহ্মসভাতে আসিতে পারেন, রাজা ইহাও বলিয়াছিলেন। এই জন্যই ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠাতে

রাজা রামমোহন রায় যে কোনও বিশিষ্ট ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন বা বিশিষ্ট সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চান নাই, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়। ব্রহ্মসভার ক্রমবিকাশে, পরে এরূপ সম্প্রদায়-গঠন অত্যাবশ্যক বা অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল কি না, সে প্রশ্ন উঠিতে পারে। ব্রহ্মসমাজের পরবর্ত্তী ইতিহাসের আলোচনায় এ প্রশ্নের বিচার করাও আবশ্যক হইবে। কিন্তু সেই বিচারের দ্বারা রাজা রামমোহন যে কোনও নূতন ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন নাই, একথা অপ্রমাণ হইবে না—হইতেই পারে না।

রাজা যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে কোনও নূতন ধর্ম্মের প্রচার ও প্রবর্ত্তন না করিয়া থাকেন, তবে তিনি করিয়াছেন কি? এই প্রশ্ন উঠে। তাহা হইলে তাঁর কার্য্যের বিশেষত্বটাই বা কি, প্রয়োজনই বা কি ছিল, এই বিচার করিতে হয়। এই প্রশ্নের উত্তরে এক কথায় এই-মাত্র বলা যাইতে পারে যে জগতের সকল ধর্ম্ম বিবিধ নামরূপাদির সঙ্গে যুক্ত করিয়া যে পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, রাজা এসকল নাম-রূপাদি হইতে বিযুক্ত করিয়া, সেই পরব্রহ্মের পূজাই প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাই রাজার ব্রহ্মসভার বিশেষত্ব। এই ভাবে সকল প্রকারের সাম্প্রদায়িকতা ও বিশিষ্ট নামরূপাদি হইতে বিযুক্ত করিয়া, কেবল জগতের স্রষ্টা পাতা ও সংহর্ত্তা রূপে পরমেশ্বরের ভজনাতে সকল ধর্ম্মের ও সকল সম্প্রদায়ের লোকেই সমভাবে যোগদান করিতে পারেন। আর এইরূপে সকল ধর্ম্মের ও সকল সম্প্রদায়ের একটা সাধারণ মিলনক্ষেত্র রচনাই ব্রহ্মসভার লক্ষ্য ছিল। এই প্রয়োজন সাধনের জন্যই রাজা ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজা ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠায় যাঁহাকে উপাস্যরূপে বরণ করিয়াছিলেন, তিনি সম্প্রদায়বিশেষের বা ধর্ম্মবিশেষের বিশিষ্ট উপাস্য নহেন, কিন্তু সকল ধর্ম্মের ও সকল সম্প্রদায়েরই উপাস্য। জগতের যে যেখানে যেনামে, যেভাবে, যেউপায়ে বা উপকরণে, যাঁহারই উপাসনা করুক না কেন, রাজা বলিতেছেন, সে তাহার নিজের

এই উপাস্তকে এই জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা মনে করে। ইঁহাকেই ত বেদান্তে ব্রহ্ম কহিয়াছেন। যাঁহা হইতে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহার মধ্যে ও যাঁহার শক্তিতে এই ব্রহ্মাণ্ড প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, বিশ্বের প্রবাহ অবিরাম গতিতে যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়াছে ও অন্তিমে, প্রলয়কালে যাঁহাতে প্রবেশ করিতেছে ও যাঁহার মধ্যে বিলীন হইয়া যাইতেছে, তিনিই ব্রহ্ম। এইভাবেই বেদান্ত ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। জগতের কারণ ও নির্ব্বাহককেই শাস্ত্রে ব্রহ্ম কহিয়াছেন। এই ব্রহ্ম কোনও প্রকারের নামরূপের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হন নাই। তাঁর কেবল একনাম—তজ্জ ও তল্ল; অর্থাৎ যাঁহা হইতে বিশ্বের জন্ম ও যাঁহাতে বিশ্বের লয় হয়, তিনিই ব্রহ্ম। আর যে যাঁহারই উপাসনা করুন না কেন, তাঁহাকেই বিশ্বের জন্ম-স্থিতিলয়-হেতু বলিয়া মনে করে। অতএব জগতের একমাত্র উপাস্য ব্রহ্ম। "অনুষ্ঠান" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে "কে উপাস্য ?" এই প্রশ্নের উত্তরে রাজা কহিয়াছেন :—

অনন্ত প্রকার বস্তু ও ব্যক্তিসম্বলিত অচিন্তনীয় রচনাবিশিষ্ট যে এই জগৎ, ও ঘটিকাযন্ত্র অপেক্ষাকৃত অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত রাশিচক্রে বেগে ধাবমান চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি যুক্ত যে এই জগৎ, ও নানাবিধ স্থাবর জঙ্গম শরীর যাহার কোন এক অঙ্গ নিষ্প্রয়োজন নহে সেই সকল শরীর ও শরীরীতে পরিপূর্ণ যে এই জগৎ, ইহার কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা যিনি তিনি উপাস্য হন।

রাজা এই উপাস্যেরই উপাসনা প্রচার করেন। আর জগতের সকল ধর্ম্ম ও সকল উপাসকই যখন আপন আপন উপাস্যকে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণ বলিয়া মনে করেন, তখন বিচারত কেহই এই উপাসনার বিরোধী হইতে পারেন না। রাজা বলিতেছেন :—

এ উপাসনার বিরোধী বিচারত কেহ নাই, যেহেতু আমরা জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা এই উপলক্ষ করিয়া উপাসনা করি, অতএব এরূপ উপাসনায় বিরোধ সম্ভব হয় না; কেননা প্রত্যেক দেবতার উপাসকেরা সেই সেই দেবতাকে জগৎ-কারণ ও জগতের নির্ব্বাহকর্ত্তা এই বিশ্বাস পূর্ব্বক

উপাসনা করেন, সুতরাং তাঁহাদের বিশ্বাসানুসারে আমাদের এই উপাসনাকে তাঁহারা সেই সেই দেবতার উপাসনারূপে অবশ্যই স্বীকার করিবেন। এই প্রকারে যাঁহারা কাল কিম্বা স্বভাব অথবা বুদ্ধ কিম্বা অন্য কোন পদার্থকে জগতের নির্ব্বাহকর্ত্তা কহিয়া থাকেন তাঁহারাও বিচারত এ উপাসনার, অর্থাৎ জগতের নির্ব্বাহকর্ত্তারূপে চিন্তনের, বিরোধী হইতে পারিবেন না। এবং চীন ও ত্রিব্বৎ ও ইউরোপ ও অন্য অন্য দেশে যে সকল নানাবিধ উপাসকেরা আছেন, তাঁহারাও আপন আপন উপাস্যকে জগতের কারণ ও নির্ব্বাহক কহেন, সুতরাং তাঁহারাও আপন আপন বিশ্বাসানুসারে আমাদের এই উপাসনাকে সেই সেই আপন উপাস্যের আরাধনা রূপে অবশ্যই স্বীকার করিবেন।

বিচারত যদি অপর উপাসকেরা, রাজা যে উপাসনা প্রচার করেন, তাহার বিরোধী হইতে না পারেন, তাহা হইলে, রাজা বা রাজার অনুবর্ত্তীগণও অন্য অন্য উপাসকের বিরোধী হইতে পারেন না। প্রশ্নকর্ত্তা এবিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া, "আপনারা অন্য অন্য উপাসকের বিরোধী ও দ্বেষ্টা হন কি না?" এই প্রশ্ন করিলে, রাজা কহিতেছেন :—

কদাপি না, যে কোন ব্যক্তি যাঁহার যাঁহার উপসনা করেন সেই সেই উপাস্যকে পরমেশ্বর বোধে কিম্বা তাঁহার আবির্ভাব-স্থান বোধে উপাসনা করিয়া থাকেন, সুতরাং আমাদের দ্বেষ ও বিরোধভাব তাঁহাদের প্রতি কেন হইবেক।

কিন্তু তাই যদি হয়, অর্থাৎ আপনারা যে পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, এবং অন্য অন্য উপাসকেরাও প্রকারান্তরে সেই পরমেশ্বরেরই উপাসনা করেন, তবে তাঁহাদের সহিত আপনাদের প্রভেদ কি? রাজা ইহার উত্তরে কহিতেছেন :—

তাঁহাদের সহিত দুই প্রকারে আমাদের পার্থক্য হয়, প্রথমতঃ তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ অবয়ব ও স্থানাদি বিশেষণের দ্বারা পরমেশ্বরের নির্ণয়বোধে উপাসনা করেন, কিন্তু আমরা, যিনি জগৎকারণ তিনি উপাস্য ইহার অতিরিক্ত অবয়ব কি স্থানাদি বিশেষণ দ্বারা নিরূপণ করি না। দ্বিতীয়তঃ, এক প্রকার

অবয়ববিশিষ্টের যে উপাসক তাঁহার সহিত অন্য প্রকার অবয়ববিশিষ্টের উপাসকের বিবাদ দেখিতেছি, কিন্তু আমাদের সহিত কোন উপাসকের বিরোধের সম্ভব নাই।

যে যারই উপাসনা করে, সে তাহাকেই জগতের কারণ ও নির্ব্বাহক বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে ; সুতরাং নানা নামে, নানাবিধ উপায়ে ও উপকরণসহায়ে জগতের সকল লোকেই যিনি জগতের কারণ ও কর্ত্তা, বিশ্বসংসার যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন ও পালন করিতেছেন, তাঁহারই উপাসনা করে, এই সর্ব্ববাদীসম্মত প্রত্যক্ষ সত্যকে অবলম্বন করিয়াই রাজা জগতের সকল ধর্ম্মের একটা সাধারণ মিলন-ভূমির প্রতিষ্ঠা করেন। রাজার এই ধর্ম্ম-সূত্র সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক। এই মূল বিষয়ে সকল ধর্ম্মের মধ্যে ঐক্য রহিয়াছে। এই ঐক্যের উপরেই রাজা তাঁর ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা করেন।

ফলতঃ রাজার সমস্ত কর্ম্মেরই এই একটি বিশেষত্ব দেখিতে পাই যে তিনি সর্ব্বদা, সকল বিষয়েই একটা সঙ্গতি ও সমন্বয়ের পথ খুঁজিয়া চলিতেন, অথচ সকল বিষয়েই আবার তিনি সময়োপযোগী সংস্কার এবং পুনর্গঠনেরও চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সংস্কার করিতে যাইয়া প্রাচীন ও প্রচলিতের সঙ্গে তাঁর চারিদিকেই গুরুতর বিরোধ বাধিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এই বিরোধের কোলাহল এবং বিক্ষেপের মধ্যেও রাজা কখনও মিলন ও সামঞ্জস্যের সূত্রটি হারাইয়া ফেলেন নাই। আর তাঁর প্রত্যক্ষবাদই তাঁহাকে এই মিলনসূত্রটি দিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। রাজা দেখিলেন প্রত্যক্ষের ভূমিতে সত্যে সত্যে কোনও বিরোধ হয় না। এখানে অশেষ প্রকারের বিচিত্রতা আছে, কিন্তু কোথাও একটা কাল্পনিক ঐক্যের নামে অনর্থক ও সাংঘাতিক অনৈক্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। জগতে ধর্ম্মে ধর্ম্মে যত বিবাদ বিসম্বাদ তাহা সকলই অপ্রত্যক্ষ, অতীন্দ্রিয়ীকৃত বিষয় লইয়া। কার্য্যকারণ সম্বন্ধ জগতের আস্তিক-নাস্তিক সকলেই স্বীকার করেন। জগৎটা যে কার্য্য, ইহা যে জন্যবস্তু, একথাও সকলেই মানেন। সুতরাং এই জগৎরূপ কার্য্যের একটা কারণও যে আছেই

আছে, ইহাও সকলেই বিশ্বাস করেন। এই পর্য্যন্ত আস্তিকে-নাস্তিকে, ঈশ্বরবাদী ও নিরীশ্বরবাদীতে কোনও বিরোধ নাই। নিরীশ্বরবাদী-দিগকে রাজা কহিতেছেন—"তোমরাও ত কালকে বা স্বভাবকে অথবা পরমাণুকে কিম্বা অন্য কোনও পদার্থকে জগতের কারণ ও নির্ব্বাহক বলিয়া স্বীকার কর। তোমরা যাঁহাকে কাল বা স্বভাব বা পরমাণু বা অন্য কিছু নামে অভিহিত করিতেছ, আমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বলি। সুতরাং মূলে তোমাতে আমাতে ত অমিল নাই। আর এই জগতের উৎপত্তি যাঁহা হইতেই হউক না কেন, এই জগৎকার্য্য দেখিয়া আমরা সকলেই বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া উঠি। কি আশ্চর্য্য ইহার পরিপাটি। কি অদ্ভুত ইহার বিচিত্রতা। কি নিগূঢ় ইহার ঐক্যবন্ধন। কি শৃঙ্খলা, কি কৌশল, কি নিপুণতা, কি অনির্ব্বচনীয় মহিমায় এই জগৎ পরিপূর্ণ হইয়া আছে। এসকল চিন্তা করিয়া যে কারণ হইতে এই বিচিত্র, অদ্ভুত, সুনিপুণ, সুশৃঙ্খল, অনীর্ব্বচনীয় শক্তিশালী ও মহিমাময় জগতের প্রকাশ বা সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহার জ্ঞান, শক্তি ও মহিমার কথা ভাবিয়া সকলকেই স্তম্ভিত হইতে হয়। এই সকল ভাবের অনুশীলনই ত উপাসনা। এই "অনুষ্ঠান"-পত্রেই রাজা "উপাসনা কাহাকে কহেন?" এই প্রশ্নের উত্তরে কহিতে-ছেন যে—

"পরব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞানের আবৃত্তিকে উপাসনা কহি।"

এইরূপে রাজা কি উপাস্য-নির্ণয়ে, কি উপাসনার সংজ্ঞা নির্দ্ধারণে, ধর্ম্মের তত্ত্বাঙ্গে বা সাধনাঙ্গে, কোনও দিকেই কোনও প্রকারের অপ্রত্যক্ষ ও অতিপ্রাকৃত বিষয়ের প্রতিষ্ঠা করিতে যান নাই। এমন কি, পাছে তাঁর প্রচারিত উপাসনাতে কি জানি কোনও অপ্রত্যক্ষ, অতিপ্রাকৃত বা কল্পিত বিষয় প্রবেশ করে, এই ভয়ে তিনি বারম্বার কেবল ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণেরই উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছেন, স্বরূপলক্ষণের কথা বেশী কহেন নাই। তটস্থ লক্ষণের দ্বারা যে

ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহার স্বরূপ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। এই ব্রহ্ম অজ্ঞেয় কিম্বা কেবল সত্তামাত্র-জ্ঞেয়। এই ব্রহ্মতত্ত্ব অনেকটা আধুনিক ইউরোপীয় অজ্ঞেয়তাবাদেরই মতন—Unknown এবং Unknowable—হার্বার্ট স্পেন্সার যে অজ্ঞেয়তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, কেবলমাত্র তটস্থ লক্ষণের দ্বারা যে ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা অনেকটা ইহারই অনুরূপ। রাজা যে পরব্রহ্মকে উপাস্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, "তিনি কি প্রকার?"—এই প্রশ্ন হইলে, উত্তরে কহিতেছেন :—

তোমাকে পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে যিনি এই জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা তিনিই উপাস্য হন, ইহার অতিরিক্ত তাঁহার নির্দ্ধারণ করিতে কি শ্রুতি কি যুক্তি সমর্থ হন না। ...তাঁহার স্বরূপকে কি মনেতে কি বাক্যেতে নিরূপণ করা যায় না, ইহা শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে বারংবার কহিয়াছেন। এবং যুক্তিসিদ্ধও ইহা হয়, যেহেতু এই জগৎ প্রত্যক্ষ অনন্ত, ইহার স্বরূপ ও পরিমাণকে কেহ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না, সুতরাং এই জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা যিনি লক্ষিত হইতেছেন তাঁহার স্বরূপ ও পরিমাণের নির্দ্ধারণ কি প্রকারে সম্ভব হয়?

বেদান্তগ্রন্থের ভূমিকাতেও এই কথাই কহিয়াছেন।—"ইহার (অর্থাৎ বেদান্তগ্রন্থের) দৃষ্টিতে জানিবেন যে, আমাদের মূল শাস্ত্রানুসারে ও অতিপূর্ব্ব পরম্পরায় এবং বুদ্ধির বিবেচনাতে জগতের স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা ইত্যাদি বিশেষণ গুণে কেবল ঈশ্বর উপাস্য হইয়াছেন।" পুনরায় কহিতেছেন যে, "যে ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞেয় নহে কিন্তু তাঁহার উপাসনাকালে তাঁহাকে জগতের পাতা সংহর্ত্তা ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা লক্ষ্য করিতে হয়, তাহার কল্পনা কোন নশ্বর নামরূপে কিরূপ করা যাইতে পারে। সর্ব্বদা যে সকল বস্তু যেমন চন্দ্র সূর্য্যাদি আমরা দেখি ও তাহার দ্বারা ব্যবহার নিষ্পন্ন করি তাহারো যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারি না; ইহাতেই বুঝিবে যে ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ের অগোচর তাঁহার স্বরূপ কিরূপে জানা যায়।"

কিন্তু তাই বলিয়া রাজা যে স্পেন্সারের মতন অজ্ঞেয়তাবাদী বা

agnostic ছিলেন, এমন মনে করা কর্ত্তব্য নহে। ব্রহ্মের স্বরূপ-জ্ঞান ও স্বরূপ-উপাসনা সম্ভব, রাজা ইহা বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু অন্য বিষয়ে যেমন, এখানেও সেইরূপ অধিকারী-অনধিকারী বিচার আছে। সকলের পক্ষে এই স্বরূপজ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। আপামর সাধারণের পক্ষে ইহা একরূপ অসাধ্য। কারণ শ্রুতিই কহিতেছেন (কঠ—৪র্থ—১)—

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ
তস্মাৎ পরাঙ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ
দাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥

রাজা এই শ্রুতির অনুবাদ করিয়াছেন :—

স্বপ্রকাশ যে পরমাত্মা তেঁহ ইন্দ্রিয়সকলকে রূপ রস ইত্যাদি বাহ্য বিষয়ের গ্রহণের নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন এই হেতু লোকসকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্য বিষয়কে দেখেন, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পারেন না। কোন বিবেকী পুরুষ মুক্তির নিমিত্তে বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে নিরোধ করিয়া অন্তরাত্মাকে দেখেন।

অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়সকলের একান্ত নিরোধ না হইলে, জীবের ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলাভ হয় না। যে অবস্থায় বহিরিন্দ্রিয়ের এরূপ একান্ত নিরোধ হয়, আমাদের শাস্ত্রে তাহাকেই সমাধি কহিয়াছেন। রাজা সমাধিতে বিশ্বাস করিতেন। সমাধিতে ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি হয়, ইহাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচারে রাজা স্পষ্ট করিয়া কহিয়াছেন যে স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা ইত্যাদি গুণের দ্বারা ব্রহ্মের যে নির্দ্দেশ করা হয় "সে কেবল প্রথমাধিকারীর বোধের নিমিত্ত।" এইরূপে তটস্থ লক্ষণের দ্বারা ব্রহ্ম-নির্ণয় করিয়া তাঁহার চিন্তা ও অনুশীলন করিতে করিতে ক্রমে তাঁর স্বরূপজ্ঞান উপলব্ধ হইয়া থাকে। সে স্বরূপ-জ্ঞানে ব্রহ্মকে সত্যং জ্ঞানং অনন্ত-রূপে প্রতীত হয়। বেদান্তসূত্রের অনুবাদে রাজা কহিয়াছেন :—

ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বেদে কহেন যে সত্য সর্ব্বজ্ঞ এবং মিথ্যা জগৎ যাহার সত্যতা দ্বারা সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। যেমন মিথ্যা সর্প সত্য-রজ্জুকে আশ্রয় করিয়া সর্পের ন্যায় দেখায়।

ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচারে স্বরূপ-সাক্ষাৎকার বা আত্মসাক্ষাৎকার কাহাকে বলে, তাহা আরও একটু বিশদ করিয়া কহিয়াছেন :—

বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের দ্বারা যে আমরা পরমেশ্বরের আলোচনা করি সেই পরম্পরা উপাসনা হয় আর যখন অভ্যাসবশতঃ প্রপঞ্চময় বিশ্বের প্রতীতির নাশ হইয়া কেবল ব্রহ্মসত্তা মাত্রের স্ফূর্ত্তি থাকে তাহাকেই আত্মসাক্ষাৎকার কহি।

এই স্বরূপ-জ্ঞান কেবল সমাধিতে লাভ করা যায়। ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হইলে, সাধক প্রথমে জগতের কারণ ও নির্ব্বাহক রূপে ব্রহ্মের চিন্তা করিবেন। বহুতর লোকের পক্ষে ইহাই কেবল সম্ভব। তবে "সমাধি বিষয় ক্ষমতাপন্ন হইলে সকল ব্রহ্মময় এমতরূপে সেই ব্রহ্ম সাধনীয় হয়েন।" কিন্তু এই সমাধির শক্তিলাভ অতিশয় কঠিন-সাধন-সাপেক্ষ বলিয়া অতি অল্প লোকেই এই স্বরূপ-উপাসনার অধিকার লাভ করেন। অধিকাংশ লোকে কেবল তটস্থ লক্ষণ দ্বারা, জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তারূপেই ব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারেন। তাঁহাদের পক্ষে এই উপাসনাই প্রত্যক্ষের সঙ্গে যুক্ত ও সাক্ষাৎ অনুভূতি প্রতিষ্ঠ হইয়া সত্য হয়। যাঁহারা সমাধির শক্তি লাভ করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে স্বরূপ-উপাসনার প্রয়াস নিশ্চয়ই বস্তুজ্ঞানহীন অলীক মানসকল্পনাতে পরিণত হইবে। তাহারা মৃণ্ময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ না করিলেও বাঙ্ময়ী কল্পনার সৃষ্টি করিয়া অসত্যের উপাসনা করিবেই করিবে। এই জন্য রাজা সাধারণ লোকের নিমিত্ত তটস্থ লক্ষণের দ্বারা ব্রহ্মনিরূপণ করিয়া, জগতের স্রষ্টা পাতা ও সংহর্ত্তারূপে তাঁহার চিন্তা করিবারই বিধান দিয়াছেন।

আর এই উপাসনা সকলের পক্ষেই উপযোগী। যে যে ধর্ম্মমত পোষণ করুক না কেন, আপনার উপাস্যকে স্রষ্টা পাতা ও সংসারের

প্রভু ও নিয়ন্তা বলিয়া বিশ্বাস করে। সুতরাং জগতের যিনি আদি কারণ তাঁহাকে কেবল স্রষ্টা পাতা ও নিয়ন্তারূপে ধ্যান করিলে সকলেরই নিজ নিজ উপাস্যের ভজনা হয়, অথচ এখানে কাহারও সঙ্গে কাহারও কোনও বিরোধ উপস্থিত হয় না। এইটিই সার্ব্বজনীন ঈশ্বরতত্ত্ব ও এই ঈশ্বরতত্ত্বের এরূপ ভজনাই সার্ব্বজনীন ভজনা। এই সার্ব্বজনীন ঈশ্বরতত্ত্বের আশ্রয়ে, এই সার্ব্বজনীন ভজনার প্রতিষ্ঠা করিয়া, যাহাতে সকল ধর্ম্মের, সকল সম্প্রদায়ের সকল লোকে এক উদার ও বিশাল মিলনভূমিতে একত্রিত হইয়া, নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক মত ও বিশ্বাস, আচার ও অনুষ্ঠানাদিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, এক পরমেশ্বরের ভজনা করিতে পারেন, তাহারই জন্য রাজা ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা করেন।

এই ব্রহ্মসভা কোনও নূতন ও বিশিষ্ট ধর্ম্মমত বা ধর্ম্মসাধনের প্রতিষ্ঠা করে নাই। ইহা হিন্দুর দেউল, খৃষ্টীয়ানের গির্জ্জা, মুসলমানের মসজিদ, বা বৌদ্ধ ও পারসী, শিণ্টো, ও কনফুচীয় প্রভৃতি ধর্ম্মের বা সম্প্রদায়ের ভজনালয়কে ভাঙ্গিয়া, তাহাদের স্থান অধিকার করিতে চাহে নাই। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভাবে যে যেখানে, যেভাবে, যেনামে, যেউপকরণেই আপন আপন উপাস্যের পূজা করুক না কেন, সকলে যাহাতে ধর্ম্মের সাধারণ ও সার্ব্বভৌমিক লক্ষণের প্রতি মনোনিবেশ করিয়া, একটা সাধারণ ও সার্ব্বজনীন ক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়া, সাধারণ ও সার্ব্বজনীনভাবে জগতের যিনি একমাত্র কারণ ও নিয়ন্তা, তাঁহার ভজনা করিতে পারে, ব্রহ্মসভা তাহারই ব্যবস্থা করিয়া দেন। ব্রহ্মসভার আকারে রাজা একটি সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মক্ষেত্র ও ভজনের স্থান প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন।

ইহাই যে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের পরিপূর্ণ আদর্শ বা চরম লক্ষ্য এমন নহে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে যেসকল বৈশিষ্ট্য ফুটিয়াছে, তাহাকে বাদ দিলে ধর্ম্মের যে সাধারণ তত্ত্ব বা লক্ষণটুকু বাকি থাকে, তাহা অতি সামান্য। তাহার দ্বারা সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের

লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক বা least common multiple মাত্র প্রাপ্ত হই, গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনিয়ক বা greatest common measure প্রাপ্ত হইতে পারি না। ইহার মধ্যে ধর্ম্মের যে সার্ব্বভৌমিকতা প্রাপ্ত হই তাহাতে ধর্ম্মবস্তুর লঘুতম লক্ষণ ও ক্ষুদ্রতম আকার মাত্র প্রত্যক্ষ করি, তাহার শ্রেষ্ঠতম লক্ষণ বা বিকাশ যে কি, তার সন্ধান পাই না। সদ্যোজাত শিশুর মধ্যে সার্ব্বভৌমিক যে মনুষ্যত্ব বস্তু তার কতটুকুই বা প্রত্যক্ষ হয়। মানবশিশুতে যতটুকু মনুষ্যধর্ম্ম প্রকাশিত হয়, তাহাকে ধরিয়া মনুষ্যত্ব বস্তুর স্বরূপ আমরা কিছুই ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। প্রকৃত মনুষ্যত্ববস্তু কি ইহা দেখিতে হইলে শ্রেষ্ঠতম মানুষকে দেখিতে হয়। শিশুতে মনুষ্যত্ব অতি অস্ফুট বীজাকারে বা অঙ্কুরাকারে মাত্র প্রত্যক্ষ হয়। এই বীজ যেমানুষে পরিপূর্ণরূপে ফুটিয়াছে, তাহাতেই কেবল মনুষ্যত্বের পূর্ণ লক্ষণ ধরিতে পারি। সার্ব্বভৌমিক যে মনুষ্যত্ব বস্তু তার সত্য স্বরূপ পরিপূর্ণ মানুষেই প্রকট হয়, শিশুতে হয় না। সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মসম্বন্ধেও ইহাই সত্য। রাজা যে সূত্র ধরিয়া জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে একটা ঐক্য স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতে ধর্ম্মের বীজাঙ্কুর মাত্র প্রত্যক্ষ হয়, পরিপূর্ণ প্রস্ফুট ধর্ম্মবস্তুকে পাওয়া যায় না। রাজার এই সূত্র অবলম্বনে আদিম অবস্থার প্রেত-পূজা, নিসর্গ-পূজা, পশুপক্ষী গিরিনদী প্রভৃতির পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মজ্ঞান বা ভগবদ্ভক্তি পর্য্যন্ত ধর্ম্মের সকল অবস্থার, সকল প্রকাশের মধ্যে যে অতি সামান্য ঐক্যটুকু আছে তাহাই কেবল ধরিতে পারি। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়া ধর্ম্মবস্তু যে অপূর্ব্ব উন্নতি ও বিকাশ-লাভ করিয়াছে, তার সন্ধান খুঁজিয়া পাই না। অথচ ধর্ম্মের এই সকল বিশেষ বিশেষ প্রকাশ বাদ দিলে তার পরিপূর্ণ সত্য ও মাহাত্ম্য কিছুই রক্ষা পায় না।

রাজা যে এসকল কথা ভাবেন নাই বা বুঝেন নাই, এমন

কল্পনাও করা সম্ভব নয়। বেদান্তে যেসকল তটস্থ লক্ষণের দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ও পরোক্ষভাবে "কার্য্য দেখিয়া কর্ত্তার চিন্তন"-রূপ যে উপাসনা উপদেশ দিয়াছেন, ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠায় রাজা তাহাই কেবল অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইহা সত্য। কিন্তু স্বরূপোপাসনা যে সম্ভব ইহাও তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। তবে কেবল শ্রেষ্ঠতম অধিকারী, যাঁহারা সমাধির শক্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই এই স্বরূপ-উপাসনা করিতে পারেন, অপরের পক্ষে ইহা অসাধ্য বলিয়া অবিহিত। সুতরাং রাজা যে তত্ত্ব ও উপাসনা প্রচার করিয়াছিলেন তাহা যে ধর্ম্মের শেষ কথা বা শ্রেষ্ঠতম অবস্থা নহে, ইহা তিনি বেশ জানিতেন। আজিকালিকার ধর্ম্মবিজ্ঞান যেরূপে যতটা পরিষ্কার ভাবে ধর্ম্মের বিকাশ-ক্রমটির সন্ধান পাইয়াছে, ডারুইন-প্রচারিত অভিব্যক্তিবাদের মূল তত্ত্বের আশ্রয়ে ধর্ম্মের যে ঐতিহাসিক ধারার কথা আধুনিক পণ্ডিতেরা কহিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং এই সকল অভিনব আবিষ্কার ও চিন্তার ফলে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের যে তত্ত্ব আজিকালি প্রকাশিত হইতেছে, রাজার সময়ে তাহা হয় নাই। কিন্তু তথাপি রাজা আপনার অনন্যসাধারণ মনীষাপ্রভাবে, আমাদের দেশের প্রাচীন বৈদান্তিক সাধনের অনুশীলনের দ্বারাই ধর্ম্মেরও যে ক্রমোন্নতি হয়, ইহা পরিষ্কাররূপে ধরিয়াছিলেন। বেদান্তে একদিকে "ক্রম-মুক্তির" ও অন্যদিকে "পরম্পরা-উপাসনার" কথা কহিয়াছেন। রাজা এই "পরম্পরা-উপাসনার" সূত্রটি অবলম্বন করিয়াই তাঁর সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মতত্ত্ব ও উপাসনাতত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তটস্থ লক্ষণের দ্বারা ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া, এই "অচিন্ত্য-রচনা-বিশ্বের" আশ্রয়ে অচিন্ত্যশক্তিশালী ও অনির্ব্বচনীয় গুণসম্পন্ন, অবাঙ্‌মনসোগোচর পরমেশ্বরের চিন্তার দ্বারা উপাসনা প্রচার করিয়া, রাজা জগতের যাবতীয় ধর্ম্মের একটি সাধারণ মিলনসূত্র মাত্র দেখাইয়া দেন। কিন্তু এইখানেই ধর্ম্মসাধনের শেষ হইল, এমন কথা তিনি বলেন নাই, ভাবেন নাই,

কল্পনাও করেন নাই। বরঞ্চ তিনি সাধারণভাবে এই উপাসনাতে অপর সকল ধর্ম্মাবলম্বীর সঙ্গে মিলিত হইয়াও, প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীকে তাঁহার নিজের শাস্ত্র ও সাধন অনুযায়ী আপন আপন সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ ও ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। একদিকে যেমন তিনি স্বদেশবাসী হিন্দুসাধারণকে বেদান্তসম্মত ব্রহ্মোপাসনাতে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন, অন্যদিকে সেইরূপ বিদেশীয় খৃষ্টীয়ান্ সাধারণকে বাইবেলসম্মত ঈশ্বরোপাসনাতেই প্রেরিত করেন। তিনি খৃষ্টীয়ান্‌কে বৈদান্তিক হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিতে, কিম্বা হিন্দুকে খৃষ্টীয়ান্ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে কহেন নাই। কেবল কি হিন্দু, কি খৃষ্টীয়ান্ সকলকেই নিজ নিজ প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপরে আপন আপন ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্ম-সাধনকে গড়িয়া তুলিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

জগতের ভিন্ন ভিন্ন প্রাচীন ঐতিহাসিক ধর্ম্মেতে যে সকল বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহারও মধ্যে সত্য আছে; সাধকগণের প্রত্যক্ষ অনুভূতির আশ্রয়েই এসকল বৈশিষ্ট্যেরও প্রকাশ হইয়াছে। কিন্তু এসকল গভীরতর ও গভীরতম সত্যের সাক্ষাৎকারলাভ জন-সাধারণের ভাগ্যে ঘটে না। এ সকল অনুভূতিলাভ বহু-সাধন-সাপেক্ষ। জনসাধারণের সে সাধন নাই। সুতরাং তাহাদের পক্ষে এসকল গভীরতম তত্ত্ব অজ্ঞেয় ও অবোধ্য। যাহার অনুভূতি হয় নাই, তাহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে বিচারের যথাযোগ্য অবসরও মিলেনা। অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের অনুমান অসম্ভব। এরূপ ক্ষেত্রে অনুমানের আশ্রয় লইলে মিথ্যা কল্পনার সৃষ্টি অনিবার্য্য হইয়া উঠে। শ্রেষ্ঠতম অধি-কারীর সাধকেরা যে সকল নিগূঢ়তম তত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া-ছিলেন, এবং শাস্ত্রাদিতে যে সাক্ষাৎকারের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, সাধারণ নিম্নতম অধিকারীর সাধকেরা সেই সকল অপ্রত্যক্ষ তত্ত্বের অনুমান করিতে যাইয়া সকল ধর্ম্মেই অশেষ প্রকারের অলীক কল্পনার সৃষ্টি করিয়াছেন। একের প্রত্যক্ষ অপরের প্রত্যক্ষের সঙ্গে সর্ব্বদাই মিলে, মিলিবে। ইহা যেমন সত্য ও অনিবার্য্য; সেইরূপ

কল্পনায় কল্পনায় অমিল হওয়াও অবশ্যম্ভাবী। তবে পুরাগত সংস্কার-বদ্ধ হইয়া যেসকল কল্পনা পুরুষানুক্রমে কোনও জাতির অস্থি-মজ্জাগত হইয়া যায়, তাহার সম্বন্ধে এরূপ অমিল হয় না ও হইবার আশঙ্কা অল্প। কিন্তু এখানে ব্যষ্টিভাবে একজাতির অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির একে অন্যের কল্পনার মধ্যে মিল দেখিতে পাওয়া গেলেও, সমষ্টিভাবে, অপর জাতির কল্পনার সঙ্গে সেরূপ মিল হয় না, হওয়াও অসম্ভব। আমাদের দেশের লোকেরা বিশেষ মানসিক অবস্থাধীনে কালীদুর্গা রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতির প্রত্যক্ষলাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইউরোপের কোনও খৃষ্টীয়ান্ কখনও অনুরূপ মানসিক অবস্থাধীনে, অর্থাৎ ধ্যানের বা সমাধির অবস্থায়, কালীদুর্গা কিম্বা রাধাকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করেন না; তাঁহারা যীশুকে কিম্বা এঞ্জেল-দিগকে দেখিয়া থাকেন। সেইরূপ মুসলমানেরা ঐ অবস্থায় হজ্‌রত্ মহম্মদকে কিম্বা আলীকে কিম্বা কোনও পীরকে দেখিয়া থাকেন। কোনও ইউরোপীয় খৃষ্টীয়ান্ যদি রাধাকৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেন, কিম্বা কোনও হিন্দু যদি যীশুখৃষ্টকে দেখিতে পাইতেন, অথবা আরবদেশের কোনও কোনও মুসলমান যদি শিবদুর্গার প্রত্যক্ষলাভ করিতেন, তাহা হইলে এসকল অনুভূতিকে সত্য অর্থাৎ বস্তুতন্ত্র মনে করা সম্ভব হইত। কারণ একজনের যেবস্তু সাক্ষাৎকারে যে অনুভূতি হয়, সেবস্তু সাক্ষাৎকারে অপরের সেই অনুভূতি হইবেই হইবে! আমাদের দেশের সাধকেরা ভগবানের এসকল দেবতারূপ ধারণকে মায়িক বলিয়াছেন, সাধকের তৃপ্ত্যর্থে ভগবান এসকল রূপ ধারণ করেন। মায়াপ্রভাবে তিনি এসকল রূপ ধরিয়া সাধকের সমক্ষে উপস্থিত হন। এই মায়া, ইন্দ্রজাল, মিথ্যাকে সত্য রূপে দেখান। বাজিকরেরা এইরূপ অবস্তুকে বস্তুরূপে, একবস্তুকে অন্যবস্তুরূপে দেখাইয়া থাকে। ইহারা দর্শকের দৃষ্টিভ্রম উৎপাদন করে, তাহার বুদ্ধিকে মোহিত করিয়া অসত্যে সত্য বোধ জন্মায়। ভগবানও তবে এইরূপই সাধকের তৃপ্তির নিমিত্ত তাহার চিত্তকে মুগ্ধ করিয়া এসকল দৃষ্টিভ্রম উৎপাদন করেন। একথা

মানিলেও ভগবানের অসীম করুণারই প্রমাণ হয়, সাধক যাহা দেখেন তাহা যে সত্য, ইহার প্রমাণ হয় না। বরঞ্চ তদ্বিপরীতই প্রমাণ হয়। আর এসকল কল্পনার যেরূপ ব্যাখ্যাই করিনা কেন, এই কল্পনার ভূমিতেই যে জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মেতে যাবতীয় ভেদবিরোধের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। যোগ-সমাধি প্রভৃতি সাধনের উচ্চভূমিতেই আবার এসকল কল্পনার জন্ম হয়। এই জন্যই রাজা এসকলকে উপেক্ষা করিয়া, ধর্ম্মতত্ত্বকে ও ধর্ম্মসাধনকে জনগণের সাধারণ অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপরে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায়, "প্রথমাধিকারীর বোধের নিমিত্ত" ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

সোজা পথ

আকুল পরাণ ক্ষণে ক্ষণে চম্‌কে ওঠে ;—কোন স্বপনে
ফুটেছে মোর পূজার মুকুল মৃণাল-কাঁটার মাঝে ?
শিশির-ঝরা পাতার মত নয়ন-তারা আপ্‌নি নত—
আরতি-দীপ জ্বল্‌ল কৈ আর এমন ধ্যানের সাঁঝে !

কি জপ জপি ! কি তপ তপি ! কোন্ বেদীতে অর্ঘ্য সঁপি ?
মর্ম্ম-দেউলে কোন্ অচেনা লুকায় আমার কাছে—
কোন্‌খানে কৈ দেখ্‌তে না পাই, নিখিল খুঁজে নিখিল হারাই,
কোন্ শুকান' অশ্রুধারায় পথ আঁকিয়া গেছে !

চল্‌ছি পথে দৃষ্টিহারা, যায় না কিছুই চিন্‌তে পারা,
কেউ ত ডাকে দেয় না সাড়া—বন্ধ বাঁশীর তান;—
দেয় না দেখা বন্ধু আমার, পথ-হারাণ শেষ অভিসার—
যুগযুগান্ত বিচ্ছেদে হায় শান্তিহারা প্রাণ!

শিউলি যেমন্ আধেক রাতে সব ঝরে' যায় আঙ্গিনাতে,
শিউরে ওঠে মর্ম্ম-ছেঁড়া ফুল-হারাণ বোঁটা,
তেম্‌নি আকুল আঁখির ঝারি, পথ চেয়ে আর রৈতে নারি,
গল্‌ছে খেদে কেঁদে কেঁদে অন্ধ আঁখির ফোঁটা!

শ্রীকরুণানিদান বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইরাবতী

কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের ইরাবতী এক সময়ে পাটরাণী ধারিণীর দাসী ছিল। কিন্তু তাহার চেহারাখানি ভাল; সে নাচিতে জানে, গাহিতে জানে, বেশ একটু রসিকতা করিতেও জানে। ক্রমে সে রাজার নজরে পড়িয়া গেল। সেকালে বহু-বিবাহ দোষের ছিল না, রাজা তাহাকে বিবাহ করিয়া রাণী করিয়া দিলেন। একেবারে দাসী হইতে রাণী! ইরাবতীর মাথাটা একটু বিগড়াইয়া গেল, তাহার উপর সে আবার একটু মদ ধরিল এবং সকলের উপর একটু প্রভুত্বও করিতে লাগিল। রাজার আদরের রাণী, সকলেই সহিয়া থাকিল।

ইরাবতী তো দাসী। সে রাজা রাজড়ার চাল কি বুঝিবে? পাটরাণী ধারিণী ইরাবতীর সর্ব্বনাশের জন্য একটু চাল চালিলেন।

যাহাতে ইরাবতীর উন্নতি, তিনি তাহাতেই ইরাবতীর অধোগতির উপায় করিলেন। তাঁহার এক ভাই ছিলেন রাজার সেনাপতি। তিনি বনের ভিতর ডাকাতের হাত থেকে একটি মেয়ে উদ্ধার করেন। সে মেয়েটি তিনি আপনার ভগিনীকে উপহার দেন। ভগিনী অর্থাৎ রাণী দেখিলেন মেয়েটি বড় সুন্দরী, বেশ বুদ্ধিমতী. একটু আধটু নাচ গানও জানে। তিনি একজন ভাল নাট্যাচার্য্য আনিয়া মেয়েটিকে ভাল করিয়া নাচগান শিখাইতে লাগিলেন। কেন শিখাইতে লাগিলেন, কালিদাস কোথাও সেটি খুলিয়া বলিলেন না। কিন্তু প্রথমাঙ্কের প্রথম বিষ্কম্ভকে একজন চেটীর মুখে শুনাইয়া দিলেন, "বেশ্ বেশ্ এ যেন ইরাবতীকে ছাড়িয়ে উঠ্‌ল।" সুতরাং রাণী যে ইরাবতীকেই অপদস্থ করিবার জন্য মালবিকাকে নাচগান শিখাইতেছিলেন একথা চেটীরাও জানিত। কিন্তু ইরাবতী ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিত না। পাটরাণী ধারিণী ভাবিয়াছিলেন, একটা চাকরাণী রাণী হইয়া গিয়াছে, আর একটাকে রাণী করিয়া ওটাকে সরাইব। পাটরাণী মালবিকাকে খুব লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, রাজা যাহাতে কিছুতেই টের না পান। সে নাচগানে খুব পরিপক্ক হইলে তাহাকে রাজার সামনে যাইতে দিবেন।

কিন্তু দৈব মালবিকার অনুকূল। রাজা একদিন পাটরাণীর ঘরে তাহার একখানি ছবি দেখিয়া ফেলিলেন। দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, এ মেয়েটি কে? রাণী কথাটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রাজা বার বার জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলে, রাজার একটি ছোট মেয়ে বলিয়া দিল, 'ও মালবিকা।' রাজা বিদূষকের সাহায্যে মালবিকাকে দেখিলেন এবং তাহার প্রণয়পাশে বদ্ধ হইলেন। এখন ইরাবতীকে তাঁর আর মনে ধরে না।

বসন্ত আসিয়া উপস্থিত, ইরাবতী প্রমোদ-কাননে বসন্ত-শোভা দেখিবার জন্য রাজাকে নিমন্ত্রণ করিল। বসন্তের প্রথম ফুল লাল কুরুবক বা ঝাঁটি ভেট্ পাঠাইলেন, আর বলিয়া পাঠাইলেন, 'রাজা যদি

আসেন দু'জনে একবার দোলায় চড়িব।' রাজা শুনিয়াই বিদূষককে বলিলেন, "না—যাওয়া হবে না। আমার মন যখন অন্যের প্রতি আসক্ত হইয়াছে তখন ইরাবতী সেটা নিশ্চয়ই টের পাইবে, আর টের পাইলে রক্ষা থাকিবে না।" বিদূষক বলিল, "সেওকি হয়? আপনাকে সব রাণীরই মন যোগাইয়া চলিতে হইবে।" রাজা খানিক ভাবিয়া বলিলেন, "তবে চল।" যাইতে যাইতে প্রমোদ-কাননের মধ্যেই মালবিকার সহিত রাজার দেখা হইয়া গেল। কবিরা বলেন, সুন্দরী যুবতী যদি আলতা পরিয়া সেই পায়ে অশোক-গাছে লাথি মারে তবে তাতে ফুল ফুটে। প্রমোদ-কাননের এক অশোক গাছে কিছুতেই ফুল ফুটে না। কথাটা ছিল রাণী ধারিণী একদিন আসিয়া ঐ গাছে পদাঘাত করিবেন। কিন্তু দোলা হইতে পড়িয়া গিয়া তাঁহার পায়ে ব্যথা হইয়াছে, তিনি আসিতে পারিলেন না। তাই তিনি মালবিকাকে সাজাইয়া গুজাইয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার সখী বকুলাবলী তাঁহার পায়ে আলতা পরাইতেছেন। তিনি একটা গাছের ছায়ায় একখানা পাথরের উপর বসিয়া আছেন। রাজা ও বিদূষক তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়া লতার আড়ালে গেলেন। গিয়াই বিদূষক বলিলেন, নিকটে বোধ হয় ইরাবতীও আছেন। রাজা বলিলেন, হাতী জলে পড়িয়া যদি কমলিনী পায়, তবে কি আর সে হাঙ্গরের ভয় করে?

ইরাবতী এখনও রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে নাই। প্রবেশ করিলে রাজা তাঁহার কিরূপ আদর করিবেন, কবি এখন হইতেই তাহার একটু নমুনা দিয়া রাখিলেন। ক্রমে মালবিকার দু'পায়েই আলতা পরান হইল। রাজা বলিলেন, এ আলতাপরা পায়ে কা'কে কা'কে লাথি মারিতে পারে? হয় বাঁঝা অশোক গাছকে অথবা অপরাধী স্বামীকে। বিদূষক বলিলেন, তুমি অপরাধ করিতেছ, তোমাকেই মারিবে। রাজা বলিলেন, "ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ কখনও মিথ্যা হয় না।" রাজা যে ইরাবতীকে একেবারে সম্পূর্ণরূপ মন হইতে ছাঁটিয়া ফেলিয়া-

ছেন, সেইটি আগে দেখাইয়া কবি ইরাবতীকে রঙ্গমঞ্চে আনিতেছেন।

ইরাবতীর তখন বেশ একটু নেশা হইয়াছে, সঙ্গে তাঁহার চেটী নিপুণিকা আছে, সেও বোধ হয় মদ খাইয়াছে। কেন না মদটা একা খে'লে তত সুবিধা হয় না। ইরাবতী বলিতেছেন, নিপুণিকা লোকে যে বলে, মদটা স্ত্রীলোকের ভূষণ, একথাটা কি সত্য ? নিপুণিকা বলিল, প্রথম একটা কথার কথা ছিল, কিন্তু এখন সত্য হইয়াছে। "তুমি একথাটা আমার প্রতি স্নেহ আছে বলেই বলিতেছ ; সে যাহোক এখন বল দেখি, আমার আগে রাজা দোলাঘরে গিয়াছেন কিনা, সেটা কেমন করিয়া জানিব।"

"আপনার প্রতি তাঁহার যেরূপ অনুরাগ তাহাতে কি আর বুঝিতে বাকি থাকে ?"

"মনযোগান কথা কো'য়ো না, অপক্ষপাতে কথা কও।"

"বিদূষক লাড়ু খাইবার লোভে একথা আগেই বলিয়া গিয়াছে, আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলুন।" তাড়াতাড়ি চলিতে গিয়া ইরাবতী টলিতে লাগিল ও বলিল, "আমার হৃদয় তো তাড়াতাড়ি করিতে চায়, কিন্তু আমার চরণ যে চলে না।"

"এইতো দোলাঘরে এসেছি—"

"নিপুণিকা কই আর্য্যপুত্রকে তো দেখিতেছি না।" "আপনি ভাল করে দেখুন, হয় ত আপনাকে পরিহাস করিবার জন্য কোথাও লুকিয়ে আছেন ; আমরা প্রিয়ঙ্গু-লতার বেড়দেওয়া এই অশোক গাছের তলায় পাথরের উপর বসি।"

ইরাবতীর মনে রাজার প্রতি অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সে এখনও জানে রাজা তাহারই আছে। সে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছে, রাজা কি না আসিয়া থাকিতে পারিবেন, আগেই আসিবেন। যখন দেখিতে পাইলেন না, তখন বলিলেন, কোথাও লুকাইয়া আছেন। খুঁজিতে লাগিলেন। নিপুণিকা বলিল, "দেবী দেখুন আমের বোল খুঁজতে গিয়ে পিঁপ্‌ড়ের কামড়াল।"

"সেকি ?"

"অশোক গাছের ছায়ায় বকুলাবলী মালবিকার পায়ে আলতা "পরাইতেছে।"

ইরাবতীর একটু সন্দেহ হইল, "সে কি ? এত মালবিকার জায়গা নয়! সে কেমন ক'রে এল!" "রাণীর পায়ে ব্যথা হইয়াছে তাই তিনি বোধ হয় উহাকে পাঠাইয়াছেন।"

"হাঁ এইটাই খুব সম্ভব"।

"আর কি স্বামীর অনুসন্ধান করিবেন ? আমার পা তো আর অন্যত্র যেতে চায় না। আমার মদের নেশা এসে পড়েছে। কিন্তু যখন সন্দেহ হয়েছে, এটার শেষ দেখে যেতে হবে।"

বেশ করিয়া মালবিকার মুখখানি দেখিয়া মনে মনে ভাবিল, "আমার হৃদয় যে কাতর হয়েছে তা ঠিক! কারণ রাজা যদি এ চেহারা দেখেন, আমার উপর আর তাঁহার কিছুমাত্র অনুরাগ থাকিবে না।"

ক্রমে ইরাবতী সেইখানে দাঁড়াইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার সন্দেহ বড়ই বাড়িয়া গেল। একবার বকুলাবলী বলিল, "মালবিকা, তোমার পা দুখানি যেন লাল শতদলপদ্ম। তুমি যেন স্বামীর সোহাগের পাত্র হও।" শুনিয়া ইরাবতী নিপুণিকার দিকে চাহিতে লাগিল। সে চাহনির অর্থ এই, এ হল কি ? ক্রমে তিনি শুনিতে লাগিলেন রাজা মালবিকায় আসক্ত, মালবিকাও রাজার প্রতি আসক্ত, আর বকুলাবলী বৃন্দে দূতী সাজিয়াছে। তিনি বলিলেন, "আমার আশঙ্কাটা তাহলে ঠিক্। যাহোক এখন তো সব টের পেলাম, এরপর যা করবার তা করব।" তখনও ইরাবতীর সন্দেহটা যায় নাই, এক একবার মনে হইতে লাগিল যেন পাটরাণীর হুকুমে অশোক গাছের জন্যই সে এসেছে। ক্রমে মালবিকা আসিয়া অশোক গাছে পদাঘাত করিল। রাজা বলিলেন, "অশোক গাছ ইঁহাকে কানের গহনা দেয়, ইনি তাহাকে চরণ দিলেন। লালে

লালে বেশ বিনিময় হইয়া গেল। যা বঞ্চিত আমিই হলাম। আমার তো কিছু দেবার নাই।” ক্রমে রাজা লতার আড়াল হইতে আসিয়া মালবিকার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। নিপুণিকা বলিল, “দেবি! রাজা যে আসিলেন।” ইরাবতী বলিল, “আমারও মনে মনে এই সন্দেহটাই হচ্ছিল যে রাজা এর ভিতর আছেন।” ক্রমে মালবিকা নমস্কার করিলে রাজা নিজহাতে তাহাকে উঠাইলেন এবং বলিলেন, “কঠিন গাছে তোমার এমন কোমল বাঁপাখানি দিয়াছিলে, না জানি তোমার কত কষ্ট হইয়াছে।”

ইরাবতী একথা শুনিয়া অত্যন্ত চটিয়া গেল, বলিল, আহাহা আর্য্যপুত্রের হৃদয় তো নয় যেন ননী। মালবিকা এখন চলিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত। বকুলাবলী বলিল, “রাজার অনুমতি লও।” রাজা বলিলেন, “যাবেই তো, আমার একবার ভিক্ষাটা শোন।” বকুলাবলী বলিল, “মন দিয়ে শোন, মন দিয়ে শোন, বলুন তো আপনি।” রাজা বলিলেন, “আমার আর কাহাতেও রুচি নাই। অশোকের যেমন ফুল হইতেছে না, আমারও তেমনি আর ধৈর্য্য হয় না। অশোককে যেমন স্পর্শ করিয়াছ, আমাকেও তেমনি স্পর্শ কর।” রাজার এই কথা যেমন বলা, আর অমনি ইরাবতীর সেইখানে আসা। আসিয়াই বলিল, “স্পর্শ কর, স্পর্শ কর, অশোকের ফুল তো ফুট্‌ল না, ইঁহার ফুল ফুটে উঠ্‌বে।” ইরাবতী বকুলাবলীকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, এখন তুমি আর্য্যপুত্রের অভিলাষ পূরণ কর? বকুলাবলী ও মালবিকা তো একেবারেই চম্পট। রাজা বিদূষককে বলিলেন, এখন উপায়। বিদূষক বলিলেন, “জংঘাবল।”

ইরাবতী বলিল, “পুরুষের উপর কিছুতেই বিশ্বাস করা উচিত নয়। হরিণী যেমন ব্যাধের গীতে মুগ্ধ হইয়া আপনার সর্ব্বনাশ করে, সেইরূপ ইহার বঞ্চনা-বাক্যে আমি প্রতারিত হইয়াছি।” বিদূষক বলিলেন, “বয়স্য হাতেনাতে ধরা পোড়েছ। এখন আর উপায় নাই, যাহা হয় একটা কল্পনা ক’রে বল।” রাজা বলিলেন, “সুন্দরী মাল-

বিকার সঙ্গে আমার কি ? তোমার দেরী হচ্ছে দেখে কোন রকমে সময় কাটাচ্ছি।"

"আপনি অতি বিশ্বাসের কাজ করেছেন। আপনি যে সময় কাটাবার এখন উপায় পেয়েছেন, তা আমি জানতাম না। জানিলে, আমি চিরদুঃখিনী, কখনও এমন কর্ম্ম করিতাম না।"

বিদূষক বলিয়া উঠিলেন—দেখুন রাণী, রাজা সকল রাণীকে সমান দেখেন, তা যদি তিনি সম্মুখে পড়িলে দেবীর পরিজনের সঙ্গে দু'টো কথাবার্ত্তা কন্, সেটা কি অপরাধের মধ্যে গণ্য হবে ? তাহলে আপনার সঙ্গেও তো কথাবার্ত্তা কহা হয় না।

"কথাবর্ত্তাই হোক, আমি আর কেন আপনাকে কষ্ট দিই" এই বলিয়া তিনি যাইতে উদ্যত হইলেন, রাজা সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। ইরাবতীর চন্দ্রহার খসিয়া পড়িতেছে, তথাপি সে চলিতে লাগিল। রাজা কহিলেন, "সুন্দরী, আমি তোমার একান্ত প্রণয়ী, আমার প্রতি তোমার নির্দ্দয় হওয়া ভাল দেখায় না।"

"তুমি শঠ, তোমার উপর আর বিশ্বাস করিতে পারি না"।

"আমায় শঠ বলিয়া তুমি অবহেলা করিতে পার, কিন্তু তোমার চন্দ্রহার তোমার পায়ে জড়াইয়া প্রার্থনা করিতেছে, তুমি রাগ করিও না।"

"এ হতভাগাও দেখিতেছি তোমারি পথে যাইতেছে" এই বলিয়া চন্দ্রহার তুলিয়া লইলেন এবং রাজাকে তাহার বাড়ী মারিতে উদ্যত হইলেন।

একে ইরাবতী সুন্দরী, তাহাতে বেশ একটু মদে মুখ লাল হইয়াছে, তাহার উপর সে রাগে গর্‌গর্‌ করিতেছে, হাতে চন্দ্রহার উচাইয়া মারিতে যাইতেছে—এ অবস্থাতেও রাজা সেইরূপ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন—"এই ইরাবতী, ইঁহার চোখ দিয়া শ্রাবণের ধারার ন্যায় জল ঝরিতেছে। ইঁহার চন্দ্রহার খসিয়া পড়িয়াছে, এ রাগে গর্ গর্ করিয়া সেই চন্দ্রহার তুলিয়া আমায়

প্রচণ্ড ভাবে মারিতে আসিতেছে—যেন মেঘমালা বিদ্যুতের দড়ী দিয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতকে প্রহার করিতে আসিতেছে।"

"কেন তুমি বারবার আমায় অপরাধিনী করিতেছ?" রাজা তাঁহার হাত ধরিলেন ও বলিলেন, "আমি অপরাধ করিয়াছি, আমার দণ্ডবিধান করিতে আসিয়া কেন থামিয়া যাইতেছ? তোমার হাবভাব ইহাতে আরও খুলিতেছে, দাসের প্রতি কেন তুমি রাগ করিতেছ। আমি এখন যাহা করিতেছি তাহাতে বোধ হয় তোমার মত আছে" এই বলিয়া তিনি ইরাবতীর চরণে পতিত হইলেন। ইরাবতী বলিয়া উঠিলেন—"এত মালবিকার চরণ নয়, যে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবে ও আনন্দের লহর তুলিয়া দিবে?" এই বলিয়াই তিনি সখীর সহিত চলিয়া গেলেন।"

বিদূষক ঠাট্টা করিয়া বলিল, "বয়স্য উঠ, তিনি তোমার উপর প্রসন্ন হয়েছেন।" রাজা তাড়াতাড়ি উঠিয়া ইরাবতীকে না দেখিয়া বলিলেন,—কি? চলিয়া গিয়াছে?

"তোমার অবিনয় দেখিয়া অপ্রসন্ন হইয়াই চলিয়া গিয়াছেন, এস আস্তে আস্তে সরিয়া যাই; কে জানে মঙ্গল গ্রহের মত আবার ঘুরিয়া সেই রাশিতে উপস্থিত না হয়।"

রাজা বলিতেছেন, "প্রণয় কি বিষম। আমার মন মালবিকায় আকৃষ্ট। আমি পায়ে পড়িলাম তাতেও ইরাবতী প্রসন্ন হইল না, আমার পক্ষে ইহা ভালই হইয়াছে। সে আমায় বড় ভালবাসিত, সে যখন রাগ করিয়া গিয়াছে, তখন আমি তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারি।"

এইখানে তৃতীয় অঙ্ক শেষ হইল। ইরাবতীরও এইখানে শেষ হইলে ভাল হইত। ইরাবতীর অপরাধ সে রাজাকে বড়ই ভালবাসিয়াছিল, ভাল বাসিয়া একটু উঁচাইয়া গিয়াছিল। এখন তাহার পতন হইল। কবি কিন্তু এই পতন দেখাইয়া খুসী হইলেন না। কবিরা বড় নিষ্ঠুর, ইরাবতীকে আরও যন্ত্রণা দিবেন, তাহারই ব্যবস্থা

করিলেন। ইরাবতী মনে যে আঘাত পাইয়াছিল, তাহাতে সে আর যে কখন রাজার ত্রিসীমানায় যাইবে, তাহার সম্ভাবনা ছিল না। সে যায়ও নাই। অত ভালবাসার এইরূপ পরিণাম হইলে, যাওয়া যায়ও না। তবু তাহার কিছু কিছু সান্ত্বনা তো আছে? কবি সে সান্ত্বনার পথগুলিও বন্ধ করিয়া দিলেন। চতুর্থ অঙ্কে ইরাবতী ও নিপুণিকা আবার রঙ্গমঞ্চে আসিলেন। আবার সেই দু'টী। নিপুণিকা খবর দিল বিদূষক সমুদ্রগৃহের বারাণ্ডায় শুইয়া ঘুমাইতেছে, চন্দ্রিকা একথা তাহাকে বলিয়া গিয়াছে। ইরাবতী বলিল, "একথাটা কি সত্য? নিপুণিকা বলিল, "সত্য না হইলে কি আপনাকে বলিতে পারি? তবে এস আমরা যাই।" বেচারা বড় বিপদে পড়িয়াছিল, বিদূষককে সাপে কামড়াইয়াছিল। তাহার খবর করি আর "আপনার আরও কিছু বলিবার আছে বোধ হয়?"

"আছে বৈকি?" সেখানে রাজার ছবি আছে, তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিব এবং প্রসন্ন হইতে বলিব। "এখনই কেন রাজার কাছে যাননা?" "যাহার মন অন্যের উপর পড়িয়াছে সে আসলের চেয়ে নকল অনেক ভাল। আমার সৌজন্যের একটু অভাব হইয়াছিল, তাই ক্ষমা প্রার্থনা করিব। তা ছবির কাছেই ভাল।"

ইরাবতী এই কথা বলিয়া নিপুণিকাকে বুঝাইল বটে, কিন্তু আসল কথাটা তা নয়। সমুদ্র-ঘরে রাজার একখানি ছবি ছিল। সেখানি ইরাবতীর বিবাহের দিনের ছবি। ইরাবতীর বর্ত্তমান অন্ধকার, ভবিষ্যৎও অন্ধকার। রাজা যে তাহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন, সে আশা নাই। আবার যে ভালবাসিবেন, সে আশা নাই। আবার যে তাহার সহিত দোলায় চড়িবেন, সে আশা নাই। আবার যে তাঁহার সহিত প্রমোদ-কাননে বসন্তের ফুল দেখিয়া বেড়াইবেন, সে আশা নাই। কিন্তু সে তো রাজাকে না ভাল বাসিয়া থাকিতে পারে না? সে যে এখন রাণী। রাজা যে একদিন

তাহাকে পায়ে রাখিয়াছিলেন, এখন তো সে দাসীপনা করিয়া কাল কাটাইতে পারে না। সুতরাং তাহাকে ভালবাসিতেই হইবে, কিন্তু এখনকার রাজাকে সে ভালবাসিতে পারে না। এ রাজার মন অন্যের উপর পড়িয়াছে, সুতরাং এ রাজা ইরাবতীর কাছে কাঠ। সে বরং রাজার ছবির কাছে হাতজোড় করিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিবে কিন্তু এ রাজার কাছে যাইবে না। তাই সে সমুদ্র-গৃহে তাহার বিবাহের দিনের রাজার ছবি দেখিতে যাইতেছিল। সে এখন অতীতের স্মৃতি লইয়া থাকিবে। সেই সেকালের রাজাকে ভাল বাসিবে। তাহারই কাছে আপনার মনের কথা বলিবে, তাহারই কাছে মাফ চাহিবে। এই তাহার আশা, এই তাহার ভরসা, এই সুখেই সে যে-কয়দিন বাঁচিবে সুখী হইবে, এই স্মৃতিই তাহার জীবন হইবে। নিষ্ঠুর কবি, কালিদাস, তাহাকে এ সুখটুকু হইতেও বঞ্চিত করিবেন। যে সরিষা দিয়া ইরাবতী ভূত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল, কালিদাস সেই সরিষার মধ্যেই ভূত আনিয়া দিলেন।

নিপুণিকা ও ইরাবতী যাইতেছেন, এমন সময় পাটরাণীর এক চেটী আসিয়া ইরাবতীকে বলিল, রাণী আপনাকে খবর দিয়াছেন যে এটা আমাদের সতীনিপনার সময় নহে। আমি তোমার প্রতি আদর দেখাইবার জন্য মালবিকা ও তাহার সখীকে আটক করিয়াছি। রাজার যদি কোন প্রিয় করিতে হয়, তুমি যখন বলিবে তখন করিব। এখন তোমার কি ইচ্ছা বল। চেটীর মুখে রাণীর এই আদরের খবর শুনিয়া ইরাবতী সত্য সত্যই গলিয়া গেল। সে ভাবিত রাণী তাহার সতীন, তাহাকে কষ্ট দিতে পারিলেই তিনি খুসী হন।

সে তখন বলিল, "মহারাণীকে পরামর্শ দিবার আমরা কে? তিনি আপনার দাসীকে শিকল দিয়া বাঁধিয়া আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছেন। আর্য্যও কথা, কার অনুগ্রহে আমি আছি, আমি বেড়েছি, আমি রাণী হয়েছি, সবই তো তাঁরই অনুগ্রহে।"

চেটী চলিয়া গেলে উহারা দু'জনে বিদূষকের কাছে গেল। দেখিল যে সে সমুদ্র-গৃহের দুয়ারে বাজারে বলদের মত ব'সে ব'সেই ঘুমুচ্ছে। তাহাকে ওভাবে ঘুমাইতে দেখিয়া ইরাবতীর ভয় হইল বুঝি বা এখনও বিষের শেষ আছে। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিল তাহা নহে, তাহার মুখ বেশ প্রসন্ন। এমন সময় বিদূষক স্বপ্নে চীৎকার করিয়া উঠিল, 'ও মালবিকা' শুনিয়াই নিপুণিকা বলিল, এ হতভাগাকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। চিরকাল আপনার স্বস্তিবাচনের মোয়া খেয়ে এখন কিনা মালবিকাকে স্বপ্ন দেখিতেছে। এমন সময়ে বিদূষক আবার বলিয়া উঠিল, "তুমি ইরাবতীকে ছাড়াইয়া উঠ।" এটা আর নিপুণিকা সহ্য করিতে পারিল না। বিদূষকের এক হেঁতালের লাঠী ছিল, সেটা আঁকা বাঁকা ঠিক সাপের মত। নিপুণিকা থামের আড়ালে থাকিয়া সেই লাঠীগাছটা বিদূষকের গায়ে ফেলিয়া দিল। ইরাবতী ইহাতে বড় খুসী হইল, ভাবিল বেইমানের উপর উপদ্রব করাই উচিত।

লাঠী গায়ে পড়িবামাত্র বিদূষক সাপ সাপ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং "বয়স্য বয়স্য" বলিয়া রাজাকে ডাকিতে লাগিল। রাজা হঠাৎ সমুদ্র-ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, বলিলেন, "ভয় নাই ভয় নাই।" সঙ্গে সঙ্গে মালবিকাও আসিল, বলিল, "সাপ্ সাপ্ বলিতেছে, আপনি বাহির হইবেন না।" ইরাবতী রাজাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। বকুলাবলী হঠাৎ বাহির হইয়া বলিল, "আপনি বাহির হইবেন না, সাপের মতই দেখা যাইতেছে।" ইরাবতী আর সহ্য করিতে পারিল না। থামের আড়াল হইতে রাজার নিকটে আসিয়া বলিল, আপনারা দিনের বেলায় যে সঙ্কেত করিয়াছিলেন, সেটা নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইয়াছে তো। বকুলাবলীকে বলিল, "বেশ বেশ তুই খুব দূতীগিরি কল্লি যা হোক।"

রাজা বলিলেন, "তোমার দেখছি অদ্ভুত সৌজন্য।" শুনিয়াই বিদূষক বলিল, "রাজা আপনাকে দেখিয়াই আপনার পূর্ব্ব ব্যবহার সব

ভুলিয়া গেলেন, কিন্তু আপনি এখনও প্রসন্ন হন না কেন ?" ইরাবতী বলিলেন, "আমি রাগ ক'রেই বা কি করব।" রাজা বলিলেন, "এযে অস্থানে রাগ, এটা কি তোমার পক্ষে সাজে ? বিনা কারণে তোমার মুখে কখনই তো রাগের চিহ্ন দেখা যায় না। পূর্ণিমা ভিন্ন চন্দ্রমণ্ডলে কি কখন গ্রহণ উপস্থিত হয় ?"

এ কথাগুলি ইরাবতীর মর্ম্মস্থান স্পর্শ করিল। সে বলিল, "আর্য্যপুত্র, আপনি অস্থানে রাগের কথা যা বলিয়াছেন তা ঠিক। আমার যে সৌভাগ্য ছিল, সে যখন অন্য জায়গায় চলিয়া গিয়াছে, তখন যদি আমি রাগ করি লোকে যে হাস্‌বে।" রাজা বলিলেন, "তুমি উল্টা মানে করলে, আমি এতে রাগের কোন কারণই দেখ্‌তে পাইনে। আজ আমাদের উৎসব, তাই সব কয়েদী খালাস দিয়াছি, এ দু'টি মেয়ে খালাস পেয়ে আমাদের নমস্কার করতে এসেছে।" রাজা একটা বাজে কথা কহিয়া ইরাবতীকে ঠাণ্ডা করিতে গেলেন, কিন্তু ইরাবতী ঠাণ্ডা হইল না। তাহার মনে হইল রাণী ধারিণী যে খবর দিয়াছিলেন যে তিনি মালবিকাকে আটক্ করিয়াছেন, সেটা ঠিক নহে। সে নিপুণিকাকে বলিল, তুমি দেবীর কাছে গিয়া বল, আমি তাঁর পক্ষপাত আজ বেশ বুঝতে পার্‌লাম। নিপু-ণিকা কিছুদূর গিয়াই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "রাস্তায় মাধবিকার সহিত আমার দেখা হইল, সেই এই কথা বলিয়া গেল।" বলিয়া ইরাবতীর কানে কানে সব কথা বলিল। তখন ইরাবতী বুঝিলেন রাণী যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ঠিক। বিদূষক কৌশল করিয়া আটকান মেয়ে দু'টিকে বাহির করিয়া রাজার কাছে উপস্থিত করিয়াছে। সে বিদূষকের দিকে চাহিয়া বলিল, "ইনি এখন রাজার কামতন্ত্রের মন্ত্রী। এসকল ইহারই নীতি।" বিদূষক বলিল, "আমি যদি নীতির এক অক্ষরও পড়তাম তাহলে রাজাকে আমি কখন এমন কার্য্যে পাঠাতাম না।

তৃতীয় অঙ্কের শেষে রাজাতে ও ইরাবতীতে একরকম কাটান

ছিড়ান হইয়া গিয়াছে। চতুর্থ অঙ্কে ইরাবতীর কপাল কেমন ভাঙ্গিয়াছে, সেটি দেখাইবার জন্য আর একবার রাজার সহিত তাহার দেখা হওয়া দরকার। তাই কালিদাস তাহাকে সমুদ্রগৃহে আনিয়াছেন। সে আসিয়া দেখিল সেই সমুদ্র-গৃহেই রাজা ও মালবিকা। যে স্মৃতিটুকু জাগাইবার জন্য সে এত ব্যস্ত হইয়াছিল, সে স্মৃতিটুকুও অন্ধকারময় হইয়া গেল। ইরাবতীর আর কিছুই রহিল না। তাহার ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সবই গেল। কিন্তু একটা কথা হইতেছে, রাজা তো তৃতীয় অঙ্কের শেষে ইরাবতীর সঙ্গে কাটান ছিড়ান করিয়া আসিয়াছেন, আবার কেন ইরাবতীর খোসামোদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভয় হইয়াছিল যে ইরাবতী ও ধারিণী দু'জনে মিলিয়া মালবিকাকে আবার কষ্ট দিবে। তাই তিনি ইরাবতীকে ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহার যে ভয় হইয়াছিল, সেটি বিদূষকের একটি কথায় প্রকাশ হইয়াছে। যখন ইরাবতী নিপুণিকাকে ধারিণীর নিকট পাঠাইল, তখন বিদূষক মনে মনে করিল—হায় হায় বাঁধন খুলে পায়রা বিড়ালের মুখে গিয়ে পড়্‌ল।

কিন্তু ইরাবতী তেমন মেয়ে নয়। সে যে মালবিকার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিবে, তাহার সে প্রকৃতিই নয়। সে আপনার সুখে আপনি মত্ত ছিল, এখন আপনার দুঃখে মরমে মরিয়া থাকিল। সমস্ত বইখানায় ইরাবতী মালবিকার সহিত একটিবারও কথা কহে নাই। বরং অশোক-তলায় মালবিকার মুখখানি দেখিয়া তাহার মনে হইয়াছিল, এমুখ দেখিলে রাজা তাহাকে হয় ত ভুলিয়া যাইবেন। ইরাবতী একেবারে ক্রূর, খল বা কপট নহে। চতুর্থ অঙ্কের শেষে যখন জয়সেন আসিয়া খবর দিল, রাজার মেয়ে বসুলক্ষ্মী বানর দেখিয়া বড় ভয় পাইয়াছে এবং ক্রমাগত কাঁপিতেছে। তখন ইরাবতীই সর্ব্বাগ্রে তাহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য দৌড়িল এবং রাজাকেও শীঘ্র যাইবার জন্য অনুরোধ করিল।

চতুর্থ অঙ্কের শেষে ইরাবতীর সর্ব্বনাশ করিয়া পঞ্চমাঙ্কে কবি

আর ইরাবতীকে আনিলেন না। রাণী কয়েকবার ইরাবতীর নাম রাজার কানে তুলিয়া দিলেন, কিন্তু ইরাবতী রঙ্গমঞ্চে আর আসিল না। মালবিকার সহিত রাজার বিবাহাদি হইয়া গেলে নিপুণিকা আসিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, ইরাবতী আপনাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তিনি আপনার সম্মান রাখেন নাই, তজ্জন্য তিনি অপরাধিনী হইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে স্বামীর অনুকূল কার্য্যই করা হইয়াছে এবং আপনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া, তাহার মান রক্ষা করিবেন। রাজা একথার কোনই উত্তর দিলেন না। ইরাবতীকে আর তাঁহার মনে নাই। তিনি এখন মালবিকাময় হইয়া উঠিয়াছেন। এখন অপরাধিনী ইরাবতীরও যে দশা, নিরপরাধিনী সর্ব্বস্বত্যাগিনী মহারাণী ধারিণীরও সেই দশা। তাই তিনি নিপুণিকাকে জবাব দিলেন, "আর্য্যপুত্র তাহার সেবা জানিবেন।" নিপুণিকা, অনুগৃহীত হইলাম বলিয়া প্রস্থান করিল। যে ইরাবতীর সৌভাগ্য দেখিয়া একসময় রাজপরিবারের সকলেই হিংসায় মরিত, সেই ইরাবতী একেবারে লোপ হইয়া গেল।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

পিরীতি

১।

পিরীতি পিরীতি, কি তার প্রকৃতি, কেমন মুরতি ধরে ?
পিরীতির কথা, কহে যথা তথা, কেহ কি দেখেছে তারে ?
এ অঙ্গে অনঙ্গে, সদা এক সঙ্গে, রঙ্গে বসতি করে।
এরূপে অরূপে মিলায়ে স্বরূপে, রসের মুরতি ধরে॥
নিজ রসে মজি, এ মুরতি ভজি, সহজে পিরীতি পায়।
রসতনুখানি, রসের পরাণি, রসেতে ভাসিয়া যায়॥

২।

কি বলিব সখি, বলিবার এ কি, বলিলে বুঝিবে কে ?
গুণ বিপরীত, মিলায়ে বিধাত, গড়েছে পিরীতি দে'॥
এই ত বয়ান জুড়ায় পরাণ, তবু যেন এই নয়।
এ রুচির দেহ বাড়াইছে লেহ, এ নহে মরমে কয়॥
এ রূপ দরশে আঁখি অনিমেষ, নারি তবু দেখিবারে।
এ তনু পরশে হইনু অবশ, ছুঁতে নারি তবু তারে॥
এই অঙ্গ গন্ধ নাসা করে অন্ধ, মিটে না পিয়াসা কভু।
এই কণ্ঠধ্বনি শ্রুতি রসায়নী, শ্রবণ পূরে না তবু॥
এ মানুষই হয়, এ মানুষ নয়, হেঁয়ালি ভাঙ্গিবে কে ?
অঙ্গেরে ধরিয়া, অনঙ্গে পাইয়া, পিরীতি জানয়ে সে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

কঠোর সমালোচনা

সম্প্রতি এক ধূয়া উঠিয়াছে, বাঙ্গালা সাহিত্যে কঠোর সমালোচনার দিন এখনও আসে নাই। এই ধূয়া যাঁহারা ধরিয়াছেন, তাঁহাদের অগ্রণী হইতেছেন—স্যার রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ গত বৈশাখের 'ভারতী'তে স্পষ্ট করিয়াই লিখিয়াছেন,—"বাংলা সাহিত্যকে কি আমরা পাকা বয়সের সাহিত্য বলিতে পারি? না পারি না। এখন ইহাকে ঘের দিয়া বাঁচাইয়া তুলিতে হইবে—ইহার কচি ডালপালাগুলোকে গোরু ছাগল দিয়া মুড়াইয়া খাইতে দিলে যে ইহার উপকার হইবে এমন কথা আমি মনে করি না। এই জন্য আমার মতে বাংলা সাহিত্যে কঠোর সমালোচনার দিন আসে নাই। যে লেখা ভাল বলিতে পারিব না তার সম্বন্ধে চুপ করিয়া যাইতে হইবে। অথচ দেখিতে পাই বালক-বাংলা সাহিত্য যেন অভিমন্যুর মত সপ্তরথীর হাতে চারিদিক হইতে কেবলি বাণ খাইতেছে। না, সপ্তরথী বলাও ভুল—কেননা, বীরের হাতের মারও নয়। ছোট ছোট সমালোচকের ছোট ছোট খোঁচা তাহাকে হয়রাণ করিয়া মারিতেছে।"

প্রথমেই বলিয়া রাখি, অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় সমালোচনার সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে তিনি এরূপ মতের পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রায় ২২।২৩ বৎসর পূর্ব্বে, বঙ্কিমের কঠোর সমালোচনার সমর্থন করিতে যাইয়া 'সাধনা'র পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছিলেন,—"নিজের বাগানের প্রতি যে মালীর যথার্থ অনুরাগ আছে, ছোট খাট কাঁটাগুল্ম-জঙ্গলকে সে তীব্র কোদালি দিয়া সবলে সমূলে উচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। যে সকল ক্ষুদ্র তৃণ-গুল্ম জঙ্গল অনাদরে জন্মে, তাহাদিগকে সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে।

কারণ, তাহারা দেখিতে দেখিতে সমস্ত স্থান আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, গুণে না হৌক্ সংখ্যায় প্রধান হইয়া দাঁড়ায়, ভালয়-মন্দয় এমন একাকার হইয়া যায় যে নির্ব্বাচন করা বড়ই কঠিন হইয়া উঠে। তখন ভাল জিনিস আপন জন্মভূমি হইতে প্রাণধারণযোগ্য যথেষ্ট রস পায় না, ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া আসে।"

বলা বাহুল্য, এখন তিনি ঠিক ইহার উল্টা সুর ধরিয়াছেন। কঠোর সমালোচক এখন তাঁহার চক্ষে আর কর্ত্তব্যপরায়ণ মালী নহে;—এখন তিনি তাহাকে গোরু ছাগল বলিয়া গালি দিতেছেন। আরও হাসির কথা এই যে, যিনি কঠোর সমালোচনার বিরুদ্ধে এত বলিয়াছেন, সংযম ও শীলতার এত উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহারই মুখে গালাগালির উচ্ছ্বাস!—ইহাতে শুধু হাসি আসে না,—দুঃখও হয়। দুঃখ—কঠোর সমালোচনার অভাব অনুভব করিয়া। যে বিচার-বিশ্লেষণের অগ্নিপরীক্ষায় স্বাস্থ্যকর শিক্ষা এবং সংশোধিত শক্তি ও সংযম লাভ হয়, এদেশে তাহার ঠিকমত প্রচলন থাকিলে মনে হয় রবীন্দ্রনাথকে আজ একটু সংযত হইয়াই কথা কহিতে হইত।

কঠোর সমালোচনার দিন যে এখনও কেন আসে নাই, ইহার অবশ্য যুক্তি দিতে রবীন্দ্রনাথ ভুলেন নাই। যুক্তি এই যে, 'বাংলা সাহিত্যকে আমরা পাকা বয়সের সাহিত্য বলিতে পারি না।'

কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে কথাটা খুব ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। এদেশে কঠোর সমালোচনা যা' একটু দেখিতে পাই, তাহা প্রধানতঃ কবিতার উপরেই হইয়া থাকে। কিন্তু এই কাব্য-সাহিত্যের বয়স নিতান্ত কাঁচা নয়। প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে, যে দেশে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির মতন কবি জন্মিয়া গিয়াছেন, সে দেশের সাহিত্যের বয়স পাকা না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। আর এই বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের দেশে আধুনিক ন্যাকামীপূর্ণ কবিতার প্রচলন দেখিয়া যদি কেহ তাহার নিন্দা করে, তাহা হইলে এই নিন্দার বিরুদ্ধে কোনও যুক্তিসঙ্গত কথা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রবীন্দ্র-

নায় এই নিন্দাকারীকে গোরু-ছাগলের সামিল মনে করিলেও তাহার নিন্দা যে সত্য, ইহা কিছুতেই তিনি অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

সমালোচনা জিনিসটা এদেশে পূর্ব্বে ছিল না। স্বভাবের নিয়মে —অনুরাগের আকর্ষণেই ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। ছাপাখানা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে বাঙ্গালা পুস্তকের সংখ্যা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। গ্রন্থকার হইবার সখ্ ও গ্রন্থ ছাপিবার পয়সা, এই দুইটির সংযোগ যাঁহাতে ঘটিত, তিনিই পুস্তক প্রকাশ করিতেন। ফলে, মন্দ পুস্তকের ভাগটা খুব বেশী হইয়া পড়ে। এই মন্দ পুস্তকের কবল হইতে পাঠকসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য এবং ভাল পুস্তকের প্রচারকল্পে তখন স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় তাঁহাদের "বিবিধার্থ সংগ্রহ" পত্রে পুস্তক-সমালোচনার রীতি আরম্ভ করিয়া দেন। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় "বিবিধার্থ সংগ্রহে" লিখিয়াছিলেন,—"কি বিদ্যালয়স্থ শিশু কি অপ্রাপ্ত-ব্যবহারাশ্রমস্থ অপোগণ্ড বালক সকলেই গ্রন্থকার-গৌরব লাভার্থ ব্যাকুল ; এমন কি, বর্ণপরিচয়বিহীন অপক্কমতিরাও গ্রন্থকার নামে পরিচিত হইতেছে। মুদ্রাযন্ত্রের ব্যয়সাধন করিয়া যাহা ইচ্ছা মুদ্রিত করিতে পারিলেই গ্রন্থ নামে বিখ্যাত হইবে এবং যে মূল্য নির্দ্দিষ্ট হউক না কেন, গ্রন্থ সংগ্রহকারী সহৃদয়কে অবশ্যই ক্রয় করিতে হইবে। এই ভয়ানক ব্যভিচারের মূল কি ? ইহা স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিতে গেলে কেবল সমালোচন-প্রথার অসঙ্গতি—এই দোষের নিদান, ইহা স্পষ্ট প্রতীতি হইবে।"—এই দোষ দূর করিবার আশায় তিনি ও রাজেন্দ্রলাল, দুই জনে মিলিয়া কড়া সমালোচনার প্রবর্ত্তন করেন। এজন্য তাঁহাদিগকে অবশ্য অনেক লেখকের বিষদৃষ্টিতে পড়িতে হইয়াছিল—অনেকের নিকট গালাগালিও খাইতে হইয়াছিল। কিন্তু গালি খাইয়া তাঁহারা সত্য বলিতে কখনও ভয় পান নাই। মাঝে মাঝে শুধু একটু দুঃখ করিয়া লিখিতেন,—"সত্য বলিলে বন্ধু বিগড়ে।"

তারপর বঙ্কিমের আমলে লেখকের উপদ্রব আরও বাড়িয়া উঠিল। তিনি দুঃখ করিয়া লিখিলেন,—"আজিকালি বাঙ্গালা ছাপাখানা ছারপোকার সঙ্গে তুলনীয় হইয়াছে; উভয়ের অপত্যবৃদ্ধির সীমা নাই, এবং উভয়েরই সন্তান-সন্ততি কদর্য্য এবং ঘৃণাজনক। যেখানে ছারপোকার দৌরাত্ম্য, সেখানে কেহ ছারপোকা মারিয়া নিঃশেষ করিতে পারে না; আর যেখানে বাঙ্গালা গ্রন্থ সমালোচনার জন্য প্রেরিত হয়, সেখানে তাহা পড়িয়া কেহ শেষ করিতে পারে না।"—এই উক্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার 'বঙ্গদর্শনে' সজোরে চাবুক চালাইতে ত্রুটি করেন নাই। পরে তাঁহার অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রও 'বঙ্গদর্শনে' কিছুদিনের জন্য সেই চাবুকের জের চালাইয়াছিলেন।

তারপর 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ হইল। যাঁহারা বঙ্গদর্শনের চাবুক খাইয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা এখন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। অনেকে আবার কেঁচে কলম ধরিলেন। কিন্তু এ ভাব বেশী দিন চলিল না। কয়েক বৎসর যাইতে না যাইতে সুরেশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং চাবুক হস্তে সাহিত্যের অঙ্গনে দেখা দিলেন। 'সাহিত্য' ও 'সাধনা'র পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখিলেই একথার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

আজ কিন্তু সহসা রবীন্দ্রনাথের প্রাণ বাঙ্গালী লেখকদের জন্য কাঁদিয়া উঠিল কেন, বুঝিতে পারিতেছি না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনিই অথচ দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন,—"অন্য দেশ অপেক্ষা আমাদের এদেশে লেখকের কাজ চালানো অনেক সহজ। লেখার সহিত কোন যথার্থ দায়িত্ব না থাকাতে কেহ কিছুতেই তেমন আপত্তি করে না। ভুল লিখিলে কেহ সংশোধন করে না, মিথ্যা লিখিলে কেহ প্রতিবাদ করে না, নিতান্ত ছেলেখেলা করিয়া গেলেও তাহা "প্রথম শ্রেণীর" ছাপার কাগজে প্রকাশিত হয়। বন্ধুরা বন্ধুকে অম্লানমুখে উৎসাহিত করিয়া যায়, শত্রুরা রীতিমত নিন্দা করিতে বসা অনর্থক পণ্ডশ্রম মনে করে।"

বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ যেজন্য দুঃখ করিয়াছিলেন, দুঃখের সেই কারণ এখন ক্রমশঃ বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। অথচ সেই রবীন্দ্রনাথ এখন উপদেশ দিতেছেন,—"যে লেখা ভাল বলিতে পারিব না, তার সম্বন্ধে চুপ করিয়া যাইতে হইবে।" কেন? পাঠক-বেচারী—যাহারা ঘরের পয়সা খরচ করিয়া পুস্তক কিনিয়া পড়ে, তাহাদের সহিত প্রতারণা করাই কি তবে সমালোচকের ধর্ম্ম? সমালোচনা ও বিজ্ঞাপন কি তবে একাকার হইয়া যাইবে? কঠোর সমালোচনার আঘাত রবীন্দ্রনাথ খুব অল্পই সহ্য করিয়াছেন সত্য। কিন্তু সেই স্বল্প আঘাতের ফলে যে তাঁহার একটু উপকার হইয়াছিল, সেকথা তিনি আজ কেন বিস্মৃত হইতেছেন? কেন ভুলিয়া যাইতেছেন যে, রাহুর কবলে না পড়িলে তাঁহার 'কড়ি ও কোমলে'র দ্বিতীয় সংস্করণ অতটা আবর্জ্জনা-বর্জ্জিত হইত না?

তাই বলিতেছি যে, তাঁহার আগেকার মতই সত্য। তেইশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি ঠিকই বলিয়াছিলেন যে, "এখন আমাদের লেখকদিগকে অন্তরের যথার্থ বিশ্বাসগুলিকে পরীক্ষা করিয়া চালাইতে হইবে, নিরলস এবং নির্ভীকভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে, আঘাত করিতে এবং আঘাত সহিতে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না।"

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

মহাযাত্রা

[৺পুরীধামে লিখিত]

১

দারা পুত্র পরিবৃত বাসনার বাড়ী
ফেলে' এস পিছে ;
চলে এস সংসারের ক্ষণ সুখ ছাড়ি,'
সে যে স্বপ্ন মিছে !
শ্রান্ত যদি পান্থ, তব সাধন-পন্থায়
পাবে ধর্ম্ম-শালা ;
বিশ্রাম করিও তথা আসিয়া সন্ধ্যায়,
জুড়াইবে জ্বালা।

২

ধেয়ে চল পান্থ, এবে নাচিতে নাচিতে
আনন্দের পুরী ;
'জয় জগন্নাথ' বলি' বাঁধ গো ত্বরিতে
গলে প্রেম-ডুরী।
অন্ধ করে আঁখি যদি নয়নের জল,
ফেল তা মুছিয়া ;
কণ্ঠ যদি গদ গদ, অঙ্গ টলমল,
রুদ্ধ কর হিয়া।

৩

দারুসম কর দেহ বহির্ভাব-হীন,
অন্তর্মুখী মন,
উন্মীলিত কর ধীরে পলক-বিহীন
ধ্যানের নয়ন।
এইবার দারু-ব্রহ্ম কর দরশন
চিন্ময় শরীর,
ভাবাভাব-বিবর্জ্জিত বিরাট বদন
আনন্দ-গভীর।

৪

তার পর চল পান্থ, মহাযাত্রা করি'
সিন্ধুর সন্ধানে,
কূলে তার স্বর্গ-দ্বার উদ্ঘাটিত করি'
মৃত্যুর শ্মশানে।
চল দ্রুত সূক্ষ্মদেহে ভোগ-অবসানে
কালার্ণব-পার—
নাহি যথা জন্ম, মৃত্যু, কাল, রূপ, নামে
দ্বন্দ্ব অনিবার!

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

নিধু গুপ্ত

উপক্রমণিকা।

ভাষা-জননীর স্তব-স্তুতি করিয়া এদেশে এখন যে সব গীত রচিত হইতেছে, তাহার মূল নিধুবাবুর সঙ্গীতে। প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে—সেই সুদূর অতীতে, এই বাঙ্গালী কবির গানেই 'মাতৃসম মাতৃভাষা' ভাবটা সর্ব্বপ্রথম ফুটিয়া উঠিয়াছিল। অথচ সে সময়ে এদেশে মাতৃভাষার কোনই আদর ছিল না।—পণ্ডিতমণ্ডলীর অশ্রদ্ধায় ও ধনী-সমাজের অবহেলায় উহা তখন একান্তই ম্রিয়মাণা। কিন্তু ভাষার সেই দুর্দ্দশার দিনেই নিধুর মধুর কণ্ঠে বাঙ্গালী শুনিল :—

'নানান্ দেশে নানান্ ভাষা,
বিনে স্বদেশীয় ভাষা পূরে কি আশা ?
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর—
ধারাজল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা ?'

কেবলমাত্র এই টুকুই তাঁহার পরিচয় নহে। নিধুবাবু ওরফে রামনিধি গুপ্ত বাঙ্গালা দেশের সরিমিঞা। বাঙ্গলা টপ্পার তিনিই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শুধু সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিলে সব বলা হয় না,—এক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। নিজে কবিওয়ালা না হইলেও কবিওয়ালাদের তিনি গুরু। রামবসু হরুঠাকুর প্রভৃতি বড় বড় কবিওয়ালারা তাঁহারই অনুসরণ করিয়া অনেক অমর সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন।

আসল কথা,—যে প্রতিভা দেশ ও কালের প্রভাব বিজয় করিয়া, দিব্য অনুভূতির সাহায্যে নূতনের সৃষ্টি করিয়া চরিতার্থ হয়, নিধুবাবু সেই প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ভারতচন্দ্রের যখন মৃত্যু হয়, তখন নিধুর বয়স বেশী না হইলেও নিতান্ত কম ছিল না।—তখন

তিনি উনিশ-কুড়ি বৎসর বয়সের এক যুবক। সে সময়ে ভারতের খুব নাম—খুব মান। সে নাম ও মানের বহর নিধুবাবু নিজ চক্ষেই দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা দেখিয়াও, ভারতের পথে পদবিক্ষেপ করিতে তিনি প্রলোভিত হন নাই। ভারতের প্রভাব তাঁহাকে বিন্দু-মাত্র স্পর্শ করিতে পারে নাই। নিজ প্রতিভাবলে তিনি নূতন পথ তৈয়ারী করিয়াছিলেন—নূতন ধরণের এক সুর বাঙ্গালার সঙ্গীত-সাহিত্যে আনিয়া দিয়াছিলেন।—ইহাই তাঁহার কৃতিত্ব! এ কৃতিত্ব উপেক্ষার যোগ্য নহে।

কিন্তু প্রতিভা জিনিসটাকে চিনিবার শক্তি আমাদের এতই কম যে, এ হেন যুগপ্রবর্ত্তনকারী শক্তিশালী কবিকেও ভুলিবার জন্য আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছিলাম। 'নিধু অশ্লীল' 'নিধু vulgar' এই কথাই একদিন আমাদের মুখের বুলি হইয়াছিল। জীবিতকালে তিনি তেমন উপেক্ষিত হন নাই, একথা সত্য। কিন্তু মৃত্যুর কিছু-কাল পর হইতেই, ইংরাজী-শিক্ষিত-বাঙ্গালী-সমাজে তাঁহার প্রসার প্রতিপত্তি কমিতে আরম্ভ হয়। ঈশ্বরগুপ্ত, রাজনারায়ণ ও রামগতি প্রভৃতির ন্যায় দুই চারিজন রসজ্ঞ লেখক ছাড়া তখনকার কালে আর কেহ বড় একটা মুখ ফুটিয়া তাঁহার সুখ্যাতি করেন নাই। বঙ্কিমের আমলে এই উপেক্ষার ভাবটা যেন আরও বাড়িয়া উঠে। তাঁহার সমগ্র রচনার মধ্যে নিধুর নাম মনে হইতেছে একবার মাত্র দেখিয়াছি—তাহাও আবার উপন্যাসে। তাঁহার 'বিষবৃক্ষে'র এক-স্থলে আছে,—"বৈষ্ণবী জিজ্ঞাসা করিল, 'কি গাইব?' তখন শ্রোত্রী-গণ নানাবিধ ফরমায়েস আরম্ভ করিলেন। কেহ চাহিলেন 'গোবিন্দ অধিকারী'—কেহ 'গোপাল উড়ে।' যিনি দাশরথির পাঁচালি পড়িতে-ছিলেন, তিনি তাহাই কামনা করিলেন।...কোন লজ্জাহীনা যুবতী বলিল, 'নিধুর টপ্পা গাইতে হয় ত গাও—নহিলে শুনিব না'।"—এই লেখাটুকুর মধ্যে নিধুর প্রতি বঙ্কিমের অশ্রদ্ধার ভাবটাই ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। গোপাল উড়ের গান-ফরমায়েসকারিণীকে বঙ্কিম-

চন্দ্র কোনও বিশেষণে বিশেষিত করেন নাই, অথচ যে স্ত্রীলোকটি হরিদাসী বৈষ্ণবীকে নিধুর টপ্পা গায়িতে অনুরোধ করেন, তাঁহাকে তিনি 'লজ্জাহীনা' বলিয়াছেন! কিন্তু কি কবিত্ব বা কি শ্লীলতা, কোন গুণেই নিধুর টপ্পার নিকট গোপাল উড়ের গান দাঁড়াইতে পারে না। যদি লজ্জাকর কিছু থাকে, তবে তাহা গোপাল উড়েতে আছে, দাশরথিতেও আছে, কিন্তু নিধুগুপ্তে নাই। নিধুকে 'বয়কট' করিতে হইলে, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতিকেও কাব্য-সংসার হইতে নির্ব্বাসিত করিতে হয়। যাঁহারা বৈষ্ণব কবিতাকে ভাল বলেন, অথচ নিধুকে ঘৃণা করেন, তাঁহারা যদি রাধা-কৃষ্ণের নামে বেনামী করিয়া নিধু পড়েন, তাহা হইলে তাহাতে আপত্তির কিছু পাইবেন না।

শুধু বঙ্কিম নহেন, সে সময়ে রমেশচন্দ্র ও হরপ্রসাদ প্রভৃতির লেখাতেও নিধুর প্রতি ঐ অশ্রদ্ধা বা উপেক্ষার ভাব বেশ প্রকাশ পাইয়াছিল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে "The Literature of Bengal" নাম দিয়া রমেশচন্দ্রের যে একখানি দুই শতাধিক পৃষ্ঠার পুস্তক প্রকাশিত হয়, তাহার কোথাও নিধু বা কোন কবিওয়ালার নাম-গন্ধ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ, যে গ্রন্থের সাহায্যে এই গ্রন্থ তিনি লিখিয়াছিলেন, সে গ্রন্থে—অর্থাৎ, রামগতির "বাঙ্গলা-ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" নামক পুস্তকে, নিধুর এবং দুই-চারিজন কবিওয়ালার কথা খুব প্রশংসার সহিতই উল্লিখিত হইয়াছিল। তাহার পর ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে, সঞ্জীব-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে' শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "বাঙ্গলা সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধে নিধুর নামোল্লেখ করেন বটে, কিন্তু তাহা করার চেয়ে না করাই বোধ করি ভাল ছিল। কেন না, নিধুকে অমন স্পষ্ট ভাষায় অযথাভাবে অপদার্থ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা আর কখনও কোন লেখককে করিতে দেখি নাই। তিনি লিখিয়াছিলেন,—"সাহিত্য একেবারে রহিল না; ভারতচন্দ্র ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। রামপ্রসাদ সেন এই সময়ে পরলোক গমন করেন, গঙ্গাভক্তি-

তরঙ্গিণী প্রণেতা দুর্গাপ্রসাদও তাঁহাদের পশ্চাদ্‌গামী হন। তাঁহাদের স্থান অধিকার করে এমন লোক একেবারে হইল না, যে দুই-একজন রহিলেন, তাঁহাদেরও প্রতিভা সম্পূর্ণ বিকাশ হইল না। তাঁহারা অতি নীচ শ্রেণীর কবিতা লইয়া করতোপ করিতে লাগিলেন মাত্র। আপনারা কি নিধুবাবু, রামবসু প্রভৃতিকে ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের স্থান পাইবার যোগ্য মনে করেন?"

শাস্ত্রী মহাশয়ের এই সমালোচনাটুকু পড়িয়া মনে হয় যে, নিধুর সঙ্গীতের সঙ্গে তাঁহার একটুও পরিচয় নাই। নিধুকে ভারতচন্দ্র বা রামপ্রসাদ অথবা দুর্গাপ্রসাদের আসনে বসাইতে পারা যায় কিনা, জানি না; কিন্তু তিনি যে 'অতি নীচশ্রেণীর কবিতা লইয়া করতোপ' করিতেন, একথা বলিলে সত্যের অবমাননা করা হয়। তিনি বিদ্যা বা সুন্দর কিম্বা মালিনীর মত কিছু গড়িয়া যান নাই বটে, কিন্তু তিনি যাহা দিয়া গিয়াছেন, ভারতচন্দ্রাদিতে তত্তুল্য কিছুই দেখিতে পাই না। নিধুবাবু খাঁটি আদিরসের কবি। ভারতচন্দ্রের আদিরস প্রকৃত আদিরস নহে। নিধুর টপ্পা প্রকৃত আদিরসাত্মক বলিয়াই উহা কামের সঙ্গে সঙ্গে অপরিহার্য্যরূপে প্রেমের উদ্রেক করে। কিন্তু ভারতচন্দ্র পড়িবার সময় প্রেমের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ না বাড়িয়া দারুণ অশ্রদ্ধা ও বিরক্তিই জন্মে। নিধু প্রেম উদ্দীপ্ত করেন। ভারত কামকে প্রদীপ্ত করেন। আরও একটি দোষ হইতে নিধুবাবু মুক্ত। আধুনিক কবির প্রেম-কবিতায় সচরাচর যে দোষ দেখা যায়, নিধুতে তাহা নাই। আধুনিক কবির—

"দূরে রও ঊর্দ্ধে রও দেবী হ'য়ে পূজা লও
পূজিবার দেহ অধিকার।
এর বেশী নাহি চাই এও কেন নাহি পাই
এও কেন অদেয় তোমার।"

—এ জিনিস নিধুবাবুতে পাওয়া যায় না। ইহাও প্রকৃত আদিরস নহে—আদিরসের কতকটা বিকৃতি। কারণ, প্রেমের স্বাভাবিক ধর্ম্ম যে লালসা, তাহা ইহাতে নাই। যতদিন দেহ আছে, ততদিন দেহের সঙ্গে একেবারে সম্পর্কশূন্য হইয়া মনের কোন বৃত্তিরই চালনা হইতে পারে না। নিধুর টপ্পা দেহকে আশ্রয় করিয়া জাগে, আবার দেহকেই ছাড়াইয়া যায়। ইন্দ্রিয়েতে জন্মিয়া, ইন্দ্রিয়কে ছাড়াইয়া, তাহা বিশুদ্ধ রস-রাজ্যে উপনীত হয়।—তাঁহার প্রেম-সঙ্গীতে আছে,—

'ভাল বাসিবে ব'লে ভাল বাসিনে,
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।
বিধুমুখে মধুর হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
তাই দেখিবারে আসি, দেখা দিতে আসিনে'

আদিরস এখানে চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। উহাতে বিদ্যা-সুন্দরের হীন প্রবৃত্তি সকলের অসংযত উদ্দাম-লীলা-তরঙ্গ নাই, অথচ উহাতে উপরোক্ত আধুনিক কবির স্বপ্নময় কল্পনার অলীক প্রেমের আভাসও নাই। উহা প্রকৃত, পবিত্র ও অমূল্য। বঙ্কিম বলেন—"প্রকৃত আদিরস জগতের একটি দুর্লভ পদার্থ।"—এই দুর্লভ সামগ্রী নিধুবাবু এদেশে অজস্র পরিমাণে ছড়াইয়া গিয়াছেন। দেশের বড় বড় লেখকেরা কেন যে এমন 'দুর্লভ পদার্থ'কে উপেক্ষার ও অশ্রদ্ধার ফুৎকারে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, বুঝিতে পারি না।

তবে একটা এই আশ্বাসের কথা, এবং কতকটা মজার কথাও বটে যে, মুখে নিধুকে উড়াইতে চেষ্টা করিলেও, মন হইতে আমরা কেহই তাঁহাকে তাড়াইতে পারি নাই। এমন কি, এ যুগের শ্রেষ্ঠ গীত-রচয়িতা গিরিশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথও তাঁহার ও অন্যান্য কবিওয়ালার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। একথার প্রমাণস্বরূপ এইখানে দুই একটা নমুনা দিলাম।
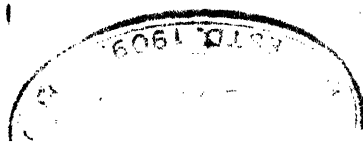
নিধুবাবু গাইয়াছেন,—

"আমারি মনের দুঃখ চিরদিন মনে রহিল,
ফুকারি কাঁদিতে নারি বিচ্ছেদে প্রাণ দহিল।"

তারপর রামবাবু গাইয়াছেন—

"মনে রহিল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে
তারে বলি বলি বলি আর বলা হ'ল না।"

তারপর রবীন্দ্রনাথে দেখিতে পাই—

"হলোনা হলোনা সই
মরমে মরম লুকান রহিল বলা হ'ল না;
বলি বলি বলি তারে কত মনে করিনু
হলোনা হলোনা সই।"

বাঙ্গালার সাহিত্য-সমাজে আর একটা ভাব লইয়া কিরূপ কাড়াকাড়ি হইয়াছে দেখা যাউক:—

নিধু গুপ্ত গাইয়াছেন—

'আমি মাত্র এই চাই, মরি তাহে ক্ষতি নাই
তুমি আমার সুখে থেকো, এ দেহে সকলি সবে।'

তারপর রামবাবু গাইয়াছেন,—

'তুমি যা'তে ভাল থাক সেই ভাল
গেল গেল বিচ্ছেদে প্রাণ আমারই গেল।'

রবীন্দ্রনাথ এই কথাটাই একটু ঘুরাইয়া বলিয়াছেন,—

'তুমি যাহে সুখী হও তাই কর সখা,
আমি সুখী হব বলে যেন হেস না!
আপন বিরহ লয়ে আছি আমি ভাল।'

ইহা ছাড়া, রবীন্দ্রনাথের "হৃদয় আমার হারিয়েছে" ও গিরিশচন্দ্রের "না জানি সাধের প্রাণে কোন্ প্রাণে প্রাণ পরায় ফাঁসী" প্রভৃতি গান নিধুর "মনপুর হতে আমার হারায়েছে মন" ও "আদরে

সাধ করে, দিলাম প্রেমের বেড়ী পায়” প্রভৃতি গানকে স্মরণ করাইয়া দেয়। নিধুর সঙ্গীতের সহিত আধুনিক বাঙ্গলা প্রেম-কবিতার এই ধরণের লাইনের মিল যে কত আছে, তাহার সংখ্যা নাই। বাহুল্যভয়ে, সে সব আর উদ্ধৃত করিলাম না।

আসল কথা, সৌন্দর্য্য যাহার প্রাণ—নিত্য রসে যাহা টল-টলায়মান, তাহার বিনাশ নাই। মেঘ চাঁদকে যতই ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করুক; চাঁদই স্থায়ী—মেঘ স্থায়ী নহে। নিধুর গান যে এত ঝড়-ঝাপটা খাইয়াও আজও টিঁকিয়া আছে, সে শুধু তাহার রসের গুণে। সে রসের কথা—সে কবিত্বের কথা, পরে আলোচনা করিতেছি।—এখন তাঁহার জীবন-কথা যতটুকু জানি, তাহাই বিবৃত করা যাউক। কারণ, কবিকে চিনিতে পারিলে,—কবির সমসাময়িক দেশের ও সমাজের অবস্থা জানিতে পারিলে, কবির যাহা কীর্ত্তি, অর্থাৎ গান বা কবিতা, তাহা বুঝিতে একটু সুবিধা হইবে।

সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা।

নিধুবাবু কোন্ সময়ের লোক, সে খবর এদেশের অনেকেরই জানা নাই। শুধু তাহাই নহে। বলিতে লজ্জাও হয়, হাসিও আসে—নিধু যে এক মানুষের নাম, একথাও ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে অনেক বাঙ্গালীই জানিতেন না। তাই দুঃখ করিয়া গুপ্ত-কবি তাঁহার ‘প্রভাকরে’র পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলেন,—“অনেকেই ‘নিধু’ ‘নিধু’ কহেন, কিন্তু ‘নিধু’ শব্দটি কি, অর্থাৎ এই নিধু কি গীতের নাম, কি সুরের নাম, কি রাগের নাম, কি মানুষের নাম, কি, কি?—তাহা জ্ঞাত নহেন।”

সুখের বিষয়, এই দুঃখ যিনি করিয়াছিলেন, তিনিই ‘প্রভাকরে’র পৃষ্ঠায় নিধুবাবুর এক অতি সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা ধরিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সে রচনার নিকট আমরা কিয়ৎপরিমাণে ঋণী।—একজন্য

প্রথমেই স্বর্গীয় কবিবরের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

নিধুগুপ্ত খাঁটি সেকেলে বাঙ্গালী। পলাশির যুদ্ধের প্রায় ষোল বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে, পৌষমাসে, রামনিধিগুপ্ত ত্রিবেণীর সন্নিহিত চাঁপতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ত্রিবেণী বাঙ্গালার এক প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ দেশ; বঙ্কিম তাঁহার গুরু গুপ্ত-কবির জন্মস্থানের পরিচয় দিতে যাইয়া লিখিয়াছেন,—"প্রয়াগে মুক্তবেণী—বাঙ্গালার ধান্যক্ষেত্রমধ্যে মুক্তবেণী—কলিকাতার ১৫ ক্রোশ উত্তরে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ত্রিপথগামিনী হইয়াছেন। যেখানে এই পবিত্র তীর্থস্থান, তাহার পশ্চিম পারস্থ গ্রামের নাম "ত্রিবেণী"—পূর্ব্বপারস্থিত গ্রামের নাম "কাঞ্চন পল্লী" বা কাঁচরাপাড়া। কাঁচরাপাড়ার দক্ষিণে কুমারহট্ট, কুমারহট্টের দক্ষিণে গৌরীভা বা গরিফা। এই তিন গ্রামে অনেক বৈদ্যের বাস। এই বৈদ্যদিগের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। গরিফার গৌরব রামকমল সেন, কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্ণবিহারী সেন, প্রতাপচন্দ্র মহমদার। কুমারহট্টের গৌরব, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ। কাঁচরাপাড়ার একটি অলঙ্কার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।"—বঙ্কিমচন্দ্র 'ত্রিবেণী'র পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু সে অঞ্চলেও যে অনেক বৈদ্যের বাস, তাহা বলেন নাই। এ অঞ্চল রামনিধির জন্মস্থান বলিয়া গৌরব অনুভব করিতে পারে।

তবে একটা কথা এই যে, তিনি ত্রিবেণী-অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করিলেও, সেখানে বেশীদিন বাস করেন নাই। তাঁহার পৈতৃক ভিটা ছিল কলিকাতার কুমারটুলিতে। এইখানে তাঁহার পিতা ৺হরিনারায়ণ গুপ্ত ও পিতৃব্য ৺লক্ষ্মীনারায়ণ গুপ্ত, এই দুই সহোদরে কবিরাজী করিতেন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে, কলিকাতা-অঞ্চলে বর্গীর উপদ্রব যখন অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে, তখন তাঁহারা ভয়ে কলিকাতার বাসভূমি ত্যাগ করিয়া সপরিবারে চাঁপতা গ্রামে মাতুলালয়ে পলায়ন করেন।—পিতার এই মাতুল গৃহেই নিধুর জন্ম হয়। প্রায় সাত

বৎসর কাল এখানে তাঁহারা বাস করেন। এইখানেই নিধুর হাতে খড়ি হয়। এই গ্রামের এক পাঠশালায় তিনি পাঠাভ্যাস করিতেন। বৎসর দুই মধ্যে তাঁহার পাঠশালার পড়াও এক প্রকার শেষ হয়।

১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে, নবাব আলিবর্দ্দীর চেষ্টায় বঙ্গদেশ হইতে বর্গীর দল যখন বিতাড়িত হইল, ৺হরিনারায়ণ কবিরাজ সপরিবারে তখন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। ফিরিয়া আসিয়া পুত্রকে আর পাঠ-শালায় ভর্ত্তি করিলেন না। তাঁহার সাধ ছিল—নিধু একটু ইংরেজী লেখা-পড়া শিখে—এবং শিখিয়া ইংরাজের কুঠিতে কাজ-কর্ম্ম করে। তাই তিনি কলিকাতার এক পাদ্রী সাহেবের হাতে নিধুর বিদ্যা-শিক্ষার ভার অর্পণ করেন। সাহেব নিধুকে সুশীল ও মেধাবী দেখিয়া অত্যন্ত ভালবাসিতেন, এবং যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দিতেন।

নিধুবাবুর সর্ব্বশুদ্ধ তিন বিবাহ। বাইশ বৎসর বয়সে সুখচর গ্রামে তিনি প্রথম বিবাহ করেন। এই বিবাহের অনতিকাল পরেই তাঁহার চাকরী করিবার সাধ হয়। সেই সময়ে তাঁহার প্রতিবেশী দেওয়ান রামতনু পালিত মহাশয় তাঁহাকে ছাপরায় লইয়া যান, এবং সেখানে কালেক্টারী আফিসে একটি কেরাণীর কাজে নিযুক্ত করিয়া দেন।

ছাপরায় আসিয়া নিধুর সঙ্গীত-শিক্ষা-ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে। বাল্যকাল হইতেই তিনি সঙ্গীতের পরম পক্ষপাতী ছিলেন। কোন স্থানে গান হইতেছে দেখিলে বা শুনিলে তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত হইতেন। গান ভাল লাগিলে, তাঁহার আহার-নিদ্রার কথা কিছুই মনে থাকিত না। তিনি বাল্যকাল হইতে সঙ্গীত-শিক্ষার অবসর খুঁজিতেছিলেন। ছাপরায় তাঁহার সে অবসর জুটিল—সঙ্গীত-চর্চ্চার সুযোগ ঘটিল। এই সঙ্গীত-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সঙ্গীত-রচনা-শক্তিরও উন্মেষ দেখা দেয়।—সে সব কথা আগামী বারে আমরা বিবৃত করিব।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

বিচারক !

(কথা-চিত্র)

১

আমি বিচারক ! আশ্চর্য্য ! কে কার বিচার করে ! ঝড় কেন হয়, বাজ কেন পড়ে, ভূমিকম্পে নগর কেন ধ্বংস হয় ? এর উত্তর কে দিবে ?...কার দণ্ড, কার বিচারে এ হয় ? আমিও বিচারক ! কিসের ?—সমাজ-বৃক্ষ হইতে একটা পাতা কেন এমন করিয়া ঝরিয়া গেল, তারি বিচারক ! আশ্চর্য্য ! ঝড়ের পাতার বিচারক ! আশ্চর্য্য...আমি ! বড় ঝড়ে গাছ উপড়ায়, সাগর তোলপাড় করে, সব উড়াইয়া দেয় । সে কার ঝড় ! সে ঝড় তুলে কে ? আর আমার রচা যে ঝড় ; সে ঝড়ে উড়িল একটা পাতা । বড় ঝড়ে পৃথিবী ওলট-পালট হইয়া গেল...আমার ঝড়ে একটা পাতা উড়য়া গেল । হো ! হো ! আমিই ঝড়, আমিই বিচারক ! সে কে ?...যে এই ঝড় তুলে...সেও কোথায় বড় ঝড়ের স্রষ্টা, সেও তবে কিসের বিচারক । যে অক্ষমতা, আমার মধ্যে, সে অক্ষমতাও তবে সেই তার মধ্যে...অক্ষমতা...অক্ষমতা···উভয়েরই তবে জাত এক ! তবে বিচার করে কে ? তার বিচার সে করে, আমার বিচার আমি করি । রাজধর্ম্মের কাছে, আমার ঝড়ের বিচারও আমার প্রাপ্য—অবশ্য প্রাপ্য । আমি আমার মনুষ্যত্বের দ্বারে, মানুষের...তার অন্তঃপুরে এই ঝড় তোলার বিচারের যথাযথ শাস্তি পাইবার, আমার নিঃসঙ্কোচ দাবী আছে । রাজধর্ম্মের কাছে সেই বিচারের দাবী করি ! নইলে আমাকে মানুষের ধাপ হইতে খারিজ করিতে হয় । আমি মানুষ, সে অধিকার—শাস্তি লইবার অধিকার রাজার কাছে আমার বিশিষ্ট প্রাপ্য । হরি ! হরি ! কিন্তু

বিচারক যে আমিই! ভাবিয়োনা যে ইহা সমস্যা বা প্রহেলিকা—ইহাই সত্য!

পদতলে রতি কাম করে আত্মদান
ছিন্নমস্তা নিজ রক্ত নিজে করে পান...

নিজ মুণ্ড কাটিয়া নিজ হাতে ধরিয়া তার সেই তপ্ত রক্তের ফিন্‌কি পান করিতেছি। ঝড় যখন তুলিয়াছি, রুদ্র দণ্ড নিজের বিচারে নিজেই লইব।

২

পাপ করিলাম আমি, চাপ পড়িল অন্যের উপর! অভিযোগ উঠিল, যে পাতা তাহার উপর; যে পাপের স্রষ্টা তাহার উপর নয়; যে পাতা, সমাজ তাহার উপর খড়্গ লইয়া শাস্তা-রূপে আসিল—সমাজের কর্ণধার রাজা···রাজধর্ম্ম তাহাকে অন্ধ কারাগারে বন্ধ করিল। সমাজের ক্রিয়া চলিল! সৃষ্টি করিলাম আমি অলক্ষ্যে, প্রত্যক্ষে ভোগ করিল অন্যে, জ্বালা বাড়িল সমাজের। কেননা তার যে অপরোক্ষ অনুভূতি। সমাজের কর্ত্তাও ত আমি! আমি যে বিচারক! হারে দুনিয়া! হারে মানুষ! বড় স্রষ্টার বিচারে ক্ষমতা. অক্ষমতার দাবী আছে, ক্ষমা আছে, নাই তোমার। তাই হয়...সূর্য্যের তাপ সহা যায়, পদতলের বালুর তাপ সহা যায় না।...

৩

অভিযোগ, কাজলা বলিয়া একটি মেয়ে তার শিশু পুত্রকে হত্যা করিয়া পতিতোদ্ধারিণীর স্রোতজলে তাহাকে ভাসাইয়া দিতে গিয়াছিল। ঝঞ্ঝনায় ঝাঙ্কৃত প্রকৃতি যখন উন্মাদ নর্ত্তনে ঝড় তুলিয়া তিমিরের খেলা খেলিতেছিল, তখন কাজলা নিঃশব্দে জলে নামিতেছিল। অদূরে শ্মশান...ধারার বর্ষণে ঝঞ্ঝার দাপটে চিতা নিভিয়া গেছে, অর্দ্ধদগ্ধ শবদেহ বিকৃত রূপের নেশায় ভোর হইয়া সহরের গ্যাসের আলোয় হাহা করিয়া হাসিতেছিল। সমাজের

বাহুবল পুরুষ, বলের দ্বারা স্ত্রীলোকের গতিরোধ করিল, পতিতো-দ্ধারিণী পতিতাকে আর বুকে ধরিতে পারিলেন না। শূন্যে আস্ফালনে ঝড়ের নৃত্যের সঙ্গে তরঙ্গ তুলিয়া তটে আছড়াইয়া, গর্জ্জিয়া, কাঁদিয়া ফিরিতে লাগিলেন। মাতার ক্রন্দন বড় বিচারকের কাণে বুঝি পৌঁছায় না। কাজলা আঁধার আকাশের তলে...তার অন্ধকার প্রাণটা, অন্ধকারে মিশাইতে পারিল না। সমাজ বলিল রাক্ষসী, পুরুষে বলিল, 'শাস্তি দাও,' ঘরের মেয়েরা বলিল, 'আহা', রাজা বলিলেন, 'বেড়ী দাও', বাহিরের মেয়েরা বলিল···'প্রাণ ত গেছেই, দেহের কারবার কর'...পদতলে সর্ব্বসহা কাঁপিয়া উঠিল, আকাশ বাতাস গর্জ্জিয়া বলিল 'মুক্তি দাও!'...দুনিয়াটার বিচারের নেশা লাগিয়া গেল।

৪

সর্ব্বনাশ! সৃষ্টিকে নষ্ট করিতে চায় এত বড় অভিযোগ! এত বড় অন্যায়...সমাজধর্ম্মের রক্ষক রাজা বলিলেন, 'বিচার কর, বিচার কর, সে যেন সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলে না, যেন নির্দ্দোষী না দণ্ড পায়, দণ্ড নেতৃত্ব ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত চাই! বিচার কর!' ...আসিল ন্যায়। সোজা কথা যা সহজ হইয়া জ্বল্ জ্বল্ করিতে-ছিল, তাহাকে বাক্‌জালের মধ্যে ফেলিয়া, কার্য্য-কারণের সম্পর্ক আনিয়া, ইতিহাসের পাতার মসীলেখায় চক্ষু উজ্জ্বল করিয়া, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হইল। নরনারী তাহার স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি, তার স্বাভাবিক ক্ষুধার আগ্রহে মিলিত হইয়া নূতন জগতে যে সৃষ্টির ভিতর নিজেরা ফুটিতেছিল...পরস্পরের আত্মদানের মাঝে যে পূর্ণতা ভরিয়া উঠিতে-ছিল; তাহাকে সংযমের দণ্ড আনিয়া ন্যায় গড়িল, স্বাধীনকে বাঁধে রাখিয়া, গলা টিপিয়া। পুরুষের গড়া শাস্ত্র চীৎকার করিয়া উঠিল, 'শাসন কর! শাসন কর! ইহা ব্যভিচার!'...ইতিহাসে এমনি হয়!

৫

এখন এর ইতিহাস কি? কাজলা কায়েতের মেয়ে। বাপ ছিল না। পাঁচ বছরের সময় বাপ গিয়াছিল, নয় বছরের সময় মা গিয়াছিল, প্রতিবেশী ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আশ্রয় পাইল। ছেলে কোলে করিত। বাসন মাজিত, ভাত খাইত, মা বাপের জন্য লুকাইয়া কাঁদিত। রাত্রে বুড়া ব্রাহ্মণের পদসেবা করিয়া, বামুনমার কাছে ঘুমাইত। সাত বৎসর এমনি কাটে। সাত বৎসর বসন্ত ফিরিয়া ফিরিয়া আসিয়া ধরাকে জাগাইতেছিল। কাজলাকেও রূপের ঝলকে আলা করিয়া দিল। রূপ ছাপা যায় না আঁচল ছাপিতে চায়...তার চোখের চাহনিতে চাহনিতে আগুন ঠিক্‌রিতে লাগিল... নিঃশ্বাসে মলয়, কণ্ঠস্বরে মাদকতা...দিন গেল...ফুল ফলে পরিণত হয়! স্বভাব ফলের আকাঙ্ক্ষায় যেন ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তার রূপ, তার গন্ধ, তার স্পর্শ জাগিয়া উঠিল, ও স্পর্শ পরশের জন্য ব্যাকুল। শিকারী পুরুষ তাহাকে শিকারের খেলায় খেলিতে চাহিল। শিকার যে পুরুষের ব্যবসা। ব্রাহ্মণের এক পুত্র ছিল। পুত্র তীর ধনু লইয়া ব্যাধের মত ধায়, কাজলা তার কাল কাজলের রেখাটানা হরিণচোখ তুলিয়া শিহরিয়া ছুটিয়া বন্য মৃগের মত পলাইয়া বেড়ায়। ব্রাহ্মণের বাড়ী মৃগারণ্য, ব্যাধের পালায় ব্রাহ্মণের পুত্র...মৃগের পালায় কাজলা...কায়েতের মেয়ে, মেয়ে মানুষের স্বভাব ধর্ম্মে ছেঁড়া আঁচল জড়াইয়া জড়াইয়া, নুইয়া দেহ-লতাকে দুমড়াইয়া লতার মত লতাইয়া সরিয়া সরিয়া যাইতে লাগিল। একদিন লতা পায়ে বাধিয়া অনবধান মৃগ পড়িয়া গেল। অবসর বুঝিয়া শিকারী তীর হানিল। মৃগ বিদ্ধ হইল। বানাহত মৃগী সজল নয়ানে শিকারীর পায়ে লুটাইয়া পড়িল। সমাজ বলিল মৃগমাংস অতি সুস্বাদু ভক্ষণ কর।... ব্রাহ্মণের বাড়ী হইতে কাজলা বিতাড়িত হইল। তখন মৃগী তাহার দোহদা ব্যথায় কাঁপিতেছে। সর্ব্বসহা সকলি সয়। নইলে পালন করে কে।...এই হইল তার কার্য্য-কারণের বন্ধনীর ধারা।...

রক্ষণশীল সমাজ এক অরক্ষণীয়া কন্যার সহিত ব্রাহ্মণ পুত্রের খুব ঘটা করিয়া বিবাহ দিল। 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' এর একটুও অভাব হইল না।

৬

বাকী ইতিহাস; তাহার ফল, সমাজশাস্ত্রে কাজলার কর্ম্মফল... ভদ্র গৃহে আর স্থান নাই, সমাজ বড় দার্শনিক পণ্ডিত। নির্ব্বিকার নির্ব্বিকল্প। চিত্তে তাহার বিকার নাই। যম নিয়মের দ্বারা ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাই যে তাহার ধর্ম্ম। সমাজ তাহাকে আশ্রয় দিল না। মাতা আশ্রয় পাইল না। মায়ের সন্তান মাকে জায়গা দিল না... একটা কুঁড়ে মিলিল, গতর খাটাইয়া ভাতও জুটিল, বক্ষের দুগ্ধ-সুধা সন্তান পাইল। দিন গেল, বৎসর গেল...ছাত্রাবাসে চাকরাণী—শিশু পুত্র, কাঁদে, কাঁদে...ঘুমাইয়া পড়ে—মাটির মেজেয় পড়িয়া থাকে। আবার এখানেও সেই মৃগ ব্যাধের পালা, নূতন শিকারীর অভাব নাই। কাজলার চোখের চারিদিকে কালি বেশী করিয়া পড়িল। কিন্তু না হইলে যে সন্তান বাঁচে না...স্রষ্টা ত সৃষ্টি করিয়াই খালাস, এখন মাতা নাড়ী ছিঁড়িয়াছে, সে যে পাতা, পালন করিতেই হইবে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নৈয়ায়িকের স্বধর্ম্ম পুণ্ডরীক...ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিল...কিন্তু মাতা সন্তানকে ফেলিতে পারিল না। দিন গেল, সন্তানকে কবিরাজের রাজত্বে আসিতে হইল। কাজলার ছাত্রাবাসের কায বন্ধ হইল। তাহার বুকের ধন বুকে করিয়া...বুকে করিয়া ঘুমপাড়ানীর গান গাহিতে লাগিল—

ঘুমের মাসী ঘুমের পিসী
ঘুম দিলে ভালবাসি
ঘুমনা লো তরুলতা
ঘুমনা লো গাছের পাতা,
তুই ঘুমুলে জুড়োয় ব্যথা,
বল্‌না সে ঘুম পাই লো কোথা...

ঘুমের বুড়ী নয়ন-ঢুলানি নয়নে চামর ঢুলাইয়া দিল। এমন ঘুম আসিল সে ঘুম আর ভাঙিল না। কাজলা বুকে বুকে কুঁড়ের দাওয়ায় বুকের ধনকে চাপিয়া উদাস আঁখি বেড়াইতেছিল...বাহিরে "ঝঞ্ঝা গরজন্তি"...দিক কাল আঁধারে ডুবিয়া গেল...অন্ধকারে সেই নূতন শিকারীর চক্ষু তাকে বিদ্ধ করিবার জন্য ছাত্রাবাস হইতে এখানেও' তাড়া করিল। কাজলা পালাইতে চায়, পালাইবার পথ নাই। বুকে মৃত শিশু—মন নিশ্চিন্ত আজ কয়দিনের পর যে তার বাছা ঘুমাইয়াছে। সন্ধ্যা···লক্ষ্মীপূজার সন্ধ্যা—ঘরে সন্ধ্যা দেওয়া হয় নাই। বাড়ীওয়ালী বলিল, 'ওমা আজ নখ্যিবার, সন্ধ্যে পর্য্যন্ত দেওয়া নেই'...কাজলার ছেলে বুকে, সে যে নামাইতে পারে না...তারপর ...বাড়ীওয়ালী টাকার লোভ দেখাইল...কত ভাল কথা বুঝাইল। শিকারী এবার এ রূপের বদলে অখণ্ড মণ্ডলাকারের যাদুমন্ত্রে চরাচরের নূতন শিকার খেলিতে চাহিল...পারিল না—তাড়া করিল...ভয়ে, দুঃখে, লজ্জায়, কাজলা কাঁপিয়া উঠিল। বাড়ীওয়ালী বলিল, 'বের আমার বাড়ী থেকে'...কাজলা চমকিয়া উঠিল। বাহিরে বৃষ্টি ঝড়। কাজলা নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের মত। বাড়ীওয়ালী ছেলেকে নাড়িয়া দেখিল, সেটা খাঁচা ফেলিয়া উড়িয়া গেছে। ঘুমের বুড়ী জুজুবুড়ীর মত আসিয়া কখন তাহাকে লইয়া গেছে। বলিল...'রাম! রাম! এই ভর সন্ধ্যে বেলা অজেতের মড়া ছুঁয়ে মলুম, মা—মা—মা...কি আপদ গা...তুমি বাপু পথ দেখ'...কাজলা বিতাড়িত হইল। শিকারী কিন্তু পিছনে। এ সমাজে নারী ধরা যে পুরুষের দায়াধিকার। ঝড়ের পাতা উড়িয়া গেল। শিকারী কি এত যুগের শিকার ব্যবসা রদ করিতে পারে?

অদূরে গঙ্গা। এইখানে সবাই আসে, গঙ্গায় ত মড়া এলে না... চারিদিকে মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি। বিদ্যুতের কষাঘাতে থাকিয়া থাকিয়া আকাশ দীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। কাজলা গঙ্গায় নামিল। শিকারী

ধরিল। সমাজ পুরুষের গড়া। শিকারীর সমাজ। সর্ব্বভুক কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত সমাজ চীৎকার করিয়া উঠিল...মনু যাজ্ঞবল্ক্য পরাশরের যত শর ছিল একে একে যোজনা করিল...কাজলা হরিণ জালে পড়িল। সমাজদ্রোহের অপরাধে কারারুদ্ধ হইল, বক্ষে সেই মৃত শিশু। বিশীর্ণাদেহা কোটরগত চক্ষু। আঁখির পলক পড়ে না, নাসার নিশ্বাসও বুঝি থামিয়া যায়! এই ইতিহাসের আর এক পৃষ্ঠা!!! সমাজ বুলি ধরিল, ঝড়ের পাতা কুড়াইয়া শাসন কর! শাসন কর! ধর্ম্ম যে যায়!

৮

তারপর বিচার!!! বিচার! ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা চাই! দণ্ড নেতৃত্ব আমারই হাতে। কেন্দ্রীভূত রাজধর্ম্মে—আমিই বিচারক! "কাজলা! কাজলা! আমার কাজল!" বহুদিনের হারাণ সুর ঝঙ্কৃত হইয়া ধ্বনিত বিধূনিত হইয়া আমার কর্ণে প্রবেশ করিল!...হো! হো! বিশ্বরাজ! রাজধর্ম্ম পালন কর, আমিই সেই ব্রাহ্মণ পুত্র! আজ তবে আমার বিচারক কে?...

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

সরিষার ফুল

(১)

চিরদিন, চিরদিন, আমি তোরে করিয়াছি ঘৃণা,
লো লাঞ্ছিতা, চরণ-দলিতা!
বুঝি নাই—রূপ-রাজ্যে কেহ নাই অতি দীনা হীনা,—
সকলেই ধনীর দুহিতা!
হৃদয়-নিকষে মোর, কভু তোর করিনি পরখ,—
কাঞ্চনেও ভেবেছি পিত্তল!
প্রেমিক জহরি নহি—কি বুঝিব হীরক্-ঝলক্,
ইন্দ্রনীল, পদ্মরাগ, মুকুতার লাবণ্য তরল?

(২)

চিরদিন গোলাপেরে তুষিয়াছি গোলাপী সম্ভাষে!
কমলিনী সর-সোহাগিনী—
বীণার ঝঙ্কারে মোর, মেলি আঁখি, বিজয়-উল্লাসে,
হইয়াছে আরো গরবিণী!
প্রকৃতির একি ঘোর প্রতিশোধ! লো ফুল শোভন,
তুই ছিলি চির আঁখি-শূল—
তাই এবে গোলাপের, কমলের নাহি দরশন!
চারিধারে একি হেরি? চারিধারে সরিষার ফুল!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

মগধের মৌখরি-রাজবংশ

[যশোহর সাহিত্যসম্মিলনে পঠিত]

দ্বিতীয় গুপ্তরাজবংশের সমকালে উত্তরাপথের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা বহুসংখ্যক স্বাধীন রাজবংশের অভ্যুত্থানের সহায় হইয়াছিল। এই সকল রাজবংশের মধ্যে মগধের মুখরবংশীয় বর্ম্মরাজবংশ সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বলিয়া কথিত হইতে পারে।(১) দ্বিতীয় গুপ্তরাজবংশের রাজত্বকালে ইঁহাদিগের প্রকৃত অভ্যুত্থান হইলেও প্রথম গুপ্তরাজবংশের অবসানযুগেও মগধরাষ্ট্রের কিয়দংশে বর্ম্মরাজগণের অভ্যুত্থান সূচিত হইয়াছিল। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম হরিবর্ম্মা। হরিবর্ম্মার পুত্র আদিত্যবর্ম্মা ও তাঁহার পুত্র ঈশ্বরবর্ম্মা। ইঁহারা বর্ম্মবংশের লেখমালায় 'মহারাজ'-উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। ঈশ্বরবর্ম্মার পুত্র ঈশানবর্ম্মাই সর্ব্বপ্রথম 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। হরি-বর্ম্মা প্রভৃতি প্রথম তিনজনের পত্নী 'ভট্টারিকাদেবী' উপনামে বিভূষিতা, কিন্তু ঈশানবর্ম্মার পত্নীর নামের সহিত 'ভট্টারিকামহাদেবী' এই অধিকতর সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।(২) ঈশানবর্ম্মার পূর্ব্ব-পুরুষগণের কোনও মুদ্রা এযাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। এই সকল বিষয় হইতে অনুমান হয়, তাঁহারা তাদৃশ ক্ষমতাশালী ছিলেন না। ঈশানবর্ম্মাই মৌখরিবংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি বলিয়া বিবেচনা হয়।(৩)

(১) V. A. Smith's Early History of India, Third Edition, P. 312.

(২) Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, III, P. 220.

(৩) A Historical sketch of the Central Provinces and Berar, by V. Natesa Aiyar B. A., P. 12.

জৌনপুরে হরিবর্ম্মদেবের পৌত্র ঈশ্বরবর্ম্মার এক শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।(৪) ইহাতে অন্ধ্রগণের প্রসঙ্গে একজন নৃপতির নাম ছিল,(৫) কিন্তু শিলালিপির উক্ত অংশ লুপ্তপ্রায় হওয়ায় এতৎপ্রসঙ্গে কি বলা হইয়াছে স্থির করা যায় না। অন্ধ্রগণের সহিত মৌখরিগণের নিশ্চয়ই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। ঈশ্বরবর্ম্মার পুত্র ঈশানবর্ম্মা অন্ধ্রাধিপতিকে পরাজিত করেন বলিয়া একখানি শিলালেখে উক্ত হইয়াছে। (৬)

গুপ্তরাজবংশের সহিত ঈশানবর্ম্মার পিতামহ আদিত্যবর্ম্মার সদ্ভাব ছিল, তিনি দ্বিতীয় গুপ্তরাজবংশের হর্ষগুপ্তের ভগিনী হর্ষগুপ্তাকে বিবাহ করেন বলিয়া পণ্ডিতগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন।(৭) ঈশানবর্ম্মার সময় মৌখরিগণের সহিত গুপ্তরাজবংশের সখ্যসূত্র ছিন্ন হইয়াছিল। তিনি গুপ্তরাজবংশের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের একচ্ছত্র আধিপত্যে বাধা দিয়াছিলেন। দুর্দ্ধর্ষ হূণগণ আসিয়া যখন উত্তরাপথের সিংহদ্বারে আঘাত করিল, তখন এই দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজবংশ আপনাদের পুরাতন বৈরিভাব বিস্মৃত হইয়া হূণশক্তির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইলেন। আদিত্যসেনের অফসড়লিপিতে মৌখরিগণকে হূণবিজয়ী বলা হইয়াছে।(৮) এ প্রশংসা মৌখরিগণের শত্রুপক্ষ করিতেছেন, সুতরাং ইহা তাঁহাদের ন্যায্য প্রাপ্য। বোধ হয় হূণগণ পরাজিত হইলে মৌখরি ও গুপ্তবংশের পুরাতন বৈরিভাব পুনরায় প্রভাববান্ হইয়াছিল। অফসড়লিপি হইতে জানা যায়, কুমারগুপ্তকর্ত্তৃক ঈশান-

(৪) Fleet's Gupta Inscriptions, Pp. 228—30.

(৫) Ibid. Pp. 229—30.

(৬) Annual Report of the Lucknow Provincial Museum for the year ending 31st. March, 1915, P. 3.

(৭) Fleet's Gupta Inscriptions, P. 220; Bana's Harsacarita, Translated by Cowell & Thomas, P. [illegible], note 3.

(৮) Fleet's Gupta Inscriptions, P. 203.

বর্ম্মা পরাজিত হন।(৯) বার্ণ্ বলেন, ইনি দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত।(১০) কিন্তু ইহা সত্য নহে। প্রথম জীবিতগুপ্তের তনয় তৃতীয় কুমারগুপ্তই ঈশানবর্ম্মাকে পরাজিত করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই কুমারগুপ্তের মৃত্যু হয় এবং তৎপুত্র দামোদরগুপ্ত মগধের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন।(১১) কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর সম্ভবতঃ মৌখরিগণ (ঈশানবর্ম্মা অথবা তাঁহার উত্তরাধিকারীর অধিনায়কতায়) দ্বিতীয়বার মস্তক উত্তোলন করিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহারা দামোদরগুপ্তের হস্তে পুনরায় নির্জ্জিত হন।(১২) অফসড়লিপিতে ঈশানবর্ম্মার রাজত্বপদসূচক কোনও উপাধি নাই; সম্ভবতঃ গুপ্তগণ মুখরনৃপতিগণকে যথার্থ অধিকারী বলিয়া গণনা করিতেন না। ঈশানবর্ম্মার নামাঙ্কিত কতিপয় মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কানিংহাম সর্ব্বপ্রথম 'ঈশানবর্ম্মা'র স্থলে 'শান্তিবর্ম্মা' পাঠ করিয়া ভ্রমে পতিত হন।(১৩) পরে ফ্লিট এবং ভিন্সেণ্ট্ স্মিথ 'ঈশানবর্ম্মা' এই প্রকৃত পাঠ উদ্ধার করেন।(১৪) ঈশানবর্ম্মার মুদ্রায় তারিখ দেওয়া আছে। ফ্লিট দুইটি মুদ্রা পরীক্ষা করিয়া লিখিয়াছেন, তারিখের অঙ্কগুলি অত্যন্ত অস্পষ্ট, উহা পাঠ করা যায় না।(১৫) ফৈজাবাদ জেলায় ঈশানবর্ম্মার নয়টি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। বার্ণ্ উক্ত মুদ্রাসকল পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন, ৫৫৩ খৃষ্টাব্দে উহা মুদ্রিত হয়।(১৬) সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশে,

(৯) Ibid.

(১০) J. R. A. S. 1906, Pp. 849, 850.

(১১) Gupta Inscriptions, P. 203. (১২) Ibid.

(১৩) Annual Report of the Archaeological Survey of India, Vol. IX, Pp. 27—28.

(১৪) Indian Antiquary, Vol. XIV, P. 68; J. R. A. S. 1819, Pp. 136—7.

(১৫) I. A. Vol. XIV, P. 68. (১৬) J. R. A. S. 1906, P. 849.

বারাবাঁকী জেলার অন্তর্গত হার্হানামক স্থানে ঈশানবর্ম্মার রাজ্যকালের একখানি শিলালেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে।(১৭) লক্ষ্ণৌচিত্রশালা হইতে উহার প্রতিলিপি কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীতে প্রেরিত হয়। বিগত পৌষমাসে কলিকাতা চিত্রশালায় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট উক্ত প্রতিলিপি দেখিতে পাই। সম্প্রতি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিরামচন্দ্র দিবেকর এম, এ, মহাশয় এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত 'সরস্বতী'নামক হিন্দী পত্রিকায় হার্হালিপির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন।(১৮) ঈশানবর্ম্মার পুত্র সূর্য্যবর্ম্মা মৃগয়া করিতে যাইয়া বনমধ্যে এক ভগ্ন শিবালয় দেখিতে পান। হার্হায় আবিষ্কৃত শিলালিপিতে উহার জীর্ণোদ্ধারের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। হার্হালিপি হইতে আমরা জানিতে পারি, ঈশান বর্ম্মার এক পুত্রের নাম সূর্য্যবর্ম্মা ছিল। যথা :—

যস্মিন্ শাসতি চ ক্ষিতিং ক্ষিতিপতৌ জাতেব ভূয়স্ত্রয়ী।
তেন ধ্বস্তকলিপ্রবৃত্তিতিমিরঃ শ্রীসূর্য্যবর্ম্মাজনি ॥

—১৬শ শ্লোক

আশিরগড়ে প্রাপ্ত এক মোহর হইতে ঈশানবর্ম্মার আর এক পুত্র শর্ব্ববর্ম্মার নাম পাওয়া যায়।(১৯) সুতরাং ঈশানবর্ম্মার দুই পুত্র ছিল—শর্ব্ববর্ম্মা ও সূর্য্যবর্ম্মা। হার্হালিপির তক্ষণকাল ৬১১ অথবা ৫৮৯ বিক্রমাব্দ, অর্থাৎ ৫৫৪-৫৫ অথবা ৫৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দ।(২০) সে সময় ঈশানবর্ম্মা বর্ত্তমান ছিলেন।

(১৭) Annual Report of the Lucknow Provincial Museum, 1915, P. 3.

(১৮) সরস্বতী—মাঘ, ১৩২২—'সূর্য্যবর্ম্মা কা শিলালেখ,' পৃঃ ৮০—৮৬।

(১৯) Gupta Inscriptions, P. 221.

(২০) Annual Report of the Lucknow Provincial Museum, 1915, P. 3, Note.

একাদশাতিরিক্তেষু ষট্সু শাতিতবিদ্বিষি।
শতেষু শরদাং পত্যৌ ভুবঃ শ্রীশানবর্ম্মণি॥

[২০শ পঙ্‌ক্তি]

ফৈজাবাদ জেলায় শর্ব্ববর্ম্মার ছয়টি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, উহার দুইএকটি ৫৫৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়।(২১) তাহার পূর্ব্বে নিশ্চয়ই ঈশানবর্ম্মার মৃত্যু হইয়াছিল। সুতরাং হার্হালিপি সম্ভবতঃ ৫৫৪-৫৫ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হয় নাই, বস্তুতঃ ৫৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দেই হইয়াছিল। হার্হালিপি হইতে ঈশানবর্ম্মার রাজত্বকালসম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান্ তথ্য অবগত হওয়া যায়। ঈশানবর্ম্মা ৫৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতে-ছিলেন, তাহার পূর্ব্বেই তিনি অন্ধ্রাধিপতিকে এবং গৌড়াধিপতিকে পরাজিত করিয়াছেন।

জিত্বান্ধ্রাধিপতিং সহস্রগণিতত্রিধাক্ষরদ্বারণম্
ব্যাবল্গন্নিযুতানি সংখ্যে তুরগানভঙ্‌ক্ত্বা রণে [মূ] লিকাম্।
কৃত্বা চায়তিমোচিতস্থলভুবো গৌড়ান্ সমুদ্রাশ্রয়ে
নধ্যাসিষ্ট নতক্ষিতীশচরণঃ সিংহাসনং যো জিতো॥

—১৩শ শ্লোক

মৌখরিগণ কর্ত্তৃক গৌড়বিজয় বাঙ্গালার ইতিহাসে এক সম্পূর্ণ অভি-নব ব্যাপার বলিয়া কথিত হইতে পারে। কিন্তু তখন গৌড়াধিপতি কে ছিলেন তাহা জানা যায় না। খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীর প্রারম্ভে কোন্ রাজবংশ গৌড়ের ভাগ্যনিয়ন্তা ছিলেন নূতন আবিষ্কার না হইলে তাহা বলিবার উপায় নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সম্ভবতঃ ৫৫৩ খৃষ্টাব্দে ঈশানবর্ম্মার মৃত্যু

(২১) J. R. A. S., 1906, P. 849.

হয়। ঈশানবর্ম্মার মৃত্যুর পর তৎপুত্র শর্ব্ববর্ম্মা রাজা হন। তিনি বরুণবাসী মন্দিরদেবতার পূজার নিমিত্ত বরুণিকাগ্রাম অর্পণ করেন, একথা উক্তগ্রামে আবিষ্কৃত দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের খোদিত লিপি হইতে জানা যায়।(২২) পঞ্চনদের অন্তর্গত নির্ম্মন্দগ্রামে আবিষ্কৃত মহারাজ সমুদ্রসেনের তাম্রশাসনে শর্ব্ববর্ম্মার উল্লেখ আছে।(২৩) শর্ব্ববর্ম্মা কপালেশ্বর নামক দেবতার জন্য উক্ত গ্রামে ভূমিদান করিয়াছিলেন। বুরহানপুরের নিকটবর্ত্তী আশিরগড়ে শর্ব্ববর্ম্মার এক তাম্রমোহর আবিষ্কৃত হয়।(২৪) উহাতে তাঁহার বংশতালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। ফ্লিট বলেন, আশিরগড়ে মৌখরিবংশের মোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়াই যে ঐ অঞ্চল মৌখরিগণের অধিকারভুক্ত ছিল এরূপ মনে করা সঙ্গত নহে।(২৫) ফৈজাবাদে আবিষ্কৃত শর্ব্ববর্ম্মার মুদ্রার শেষ তারিখ ৫৫৭ খৃষ্টাব্দ।(২৬) কোন্ সময় শর্ব্ববর্ম্মার মৃত্যু হয় তাহা জানা যায় না। শর্ব্ববর্ম্মার ভ্রাতা সূর্য্যবর্ম্মা কতদিন জীবিত ছিলেন তাহাও অবগত হইবার উপায় নাই। সিরপুরে প্রাপ্ত কটকের সোমবংশীয় রাজগণের পূর্ব্বপুরুষ প্রথম মহাশিবগুপ্তের একখানি শিলালিপিতে (২৭) মগধের বর্ম্মবংশীয় এক সূর্য্যবর্ম্মার উল্লেখ আছে।(২৮) মহাশিবগুপ্তের পিতা হর্ষগুপ্ত সূর্য্যবর্ম্মার কন্যা বাসটাদেবীকে বিবাহ করেন। সিরপুরলিপির আলোচ্যস্থল এইরূপ :—

> নিষ্পঙ্কে মগধাধিপত্যমহতাং জাতঃ কুলে
> বর্ম্মণাং পুণ্যাভিঃ কৃতিভিঃ কৃতী কৃতমনঃকম্পঃ সুধাভোজিনাম।

(২২) Fleet's Gupta Inscriptions. P. 216. (২৩) Ibid. Pp. 289—90.

(২৪) Ibid. Pp. 219—21. (২৫) Ibid. P. 220.

(২৬) J. [illegible]. A. S. 1906, P. 849.

(২৭) Epigraphia Indica. Vol XI, Pp. 18[illegible]—201.

(২৮) Ibid. P. 191.

যাবাসাস্ত সুতাং হিমাচল ইব শ্রীসূর্য্যবর্ম্মা নৃপঃ
প্রাপ প্রাক্‌পরমেশ্বরশ্বশুরতাগর্ব্বানিখর্ব্বং পদম্ ॥

—১৬শ শ্লোক

উদ্ধৃতাংশের বঙ্গানুবাদ এইরূপ—যে বর্ম্মগণ মগধদেশে আধিপত্যহেতু বরেণ্য বলিয়া পরিগণিত হন সেই নিষ্কলঙ্ক ['নিষ্পঙ্কে'] বর্ম্মবংশে সূর্য্যবর্ম্মা নামক নৃপতি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আচরিত সদনুষ্ঠান দেবগণের ['সুধাভোজিনাম্'] হৃদয়েও কম্পন উপস্থিত করিয়াছিল। সূর্য্যবর্ম্মা পূর্ব্বদেশাধিপতিকে ['প্রাক্‌পরমেশ্বর'] কন্যাদান করিয়া হিমাচলের ন্যায় গর্ব্ব অনুভব করিয়াছিলেন।

সিরপুরলিপি তারিখযুক্ত নহে। উক্ত লিপির প্রকাশক রায়-বাহাদুর হীরালাল মত প্রকাশ করিয়াছেন, উহা খৃষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।(২৯) মহাশিবগুপ্তের রাজ্যকালের আর একখানি শিলালিপির তারিখ সম্বন্ধে পণ্ডিতপ্রবর কীল্‌হর্ণও ঐ কথাই বলেন।(৩০) ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত রায়পুর জেলার 'গেজেটিয়রে'ও মহাশিবগুপ্তের খোদিত লিপিনিচয় খৃষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দীর বলিয়া লিখিত হইয়াছে।(৩১) ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে, ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত নটেশ আয়ার মহাশয় রায়-পুরচিত্রশালার পুরাবস্তুসমূহের যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাতে (৩২) তিনি মহাশিবগুপ্তের দুইখানি শিলালিপিকে খৃষ্টীয় সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আলোচ্য সিরপুরলিপি উহাদিগের অন্যতম।

(২৯) Epigraphia Indica, Vol. XI, P. 184.
(৩০) Indian Antiquary, Vol. XVIII, P. 179.
(৩১) Raipur District Gazetteer, Edited by A. E. Nelson, Vol. [illegible] P. 67.
(৩২) A Descriptive List of the Antiquities in the Raipur Museum, P. 6.

রায়বাহাদুর হীরালালের মত গ্রহণ করিয়া সম্প্রতি ['প্রতিভা' নামক মাসিক পত্রিকায়] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী ইতিহাসাধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন, "শিলালিপিখানি মহাশিবগুপ্তের রাজ্যকালে খোদিত হইয়াছিল ; ইহাতে কোন তারিখ নাই, কিন্তু অক্ষরতত্ত্বহিসাবে ইহাকে অষ্টম বা নবম শতাব্দীর বলিয়া মনে হয়। সূর্য্যবর্ম্মা মহাশিবগুপ্তের মাতামহ। এই শিলালিপি মহাশিবগুপ্তের রাজ্যলাভের কিছুকাল পরে লিখিত হইয়াছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে ; কারণ ইহাতে মহাশিবগুপ্তের বহু যুদ্ধজয়ের উল্লেখ আছে। সুতরাং সূর্য্যবর্ম্মা ৭ম শতাব্দীর শেষ অথবা অষ্টম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।" [প্রতিভা, ভাদ্র, ১৩২২ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৭১]। রমেশবাবুর এবং তিনি যাঁহার অনুসরণ করিয়া এই মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই রায় বাহাদুর হীরালালের উল্লিখিত অক্ষরতত্ত্বের 'হিসাব' কতদূর ঠিক দেখাইতে চেষ্টা করিব।

সিরপুরলিপির অক্ষরগুলি যিনিই লক্ষ্য করিবেন তিনিই অচিরে বুঝিতে পারিবেন, উক্ত লিপির ১ম পঙ্‌ক্তি হইতে ১৪শ পঙ্‌ক্তির 'সনাতনম্' পর্য্যন্ত এক হাতের লেখা এবং অবশিষ্টাংশ আর এক হাতের লেখা। খোদিত লিপির এই দুই অংশের 'শ'গুলির পরস্পর তুলনা করিলে ইহাও প্রতিপন্ন হইবে যে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উক্ত খোদিত লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, অর্থাৎ প্রথমাংশ প্রথমে এবং শেষাংশ শেষে উৎকীর্ণ হয়। মহানামনের বুদ্ধগয়ালিপি (৩৩) ৫৮৮-৮৯ খৃষ্টাব্দে এবং মহারাজ আদিত্যসেনের অফসড়লিপি (৩৪) অনুমান ৬৭২ খৃষ্টাব্দে খোদিত হয়। নবাবিষ্কৃত হার্হালিপির তারিখ ৫৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দ। এই তিনখানি শিলালেখের অক্ষরের সহিত সিরপুরলিপির অক্ষর

---

(৩৩) Gupta Inscriptions, P. 274—78.
(৩৪) Ibid. Pp. 200-8.

মিলাইলে শেষোক্ত লিপির কাল নির্ণীত হইতে পারে। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ, সপ্তম প্রভৃতি কয়েক শতাব্দী ধরিয়া উত্তরাপথে প্রচলিত অক্ষরমালার মধ্যে 'শ' 'হ' ও 'ভ' এই তিনটি অক্ষর সর্ব্বাপেক্ষা রূপান্তরিত হইয়াছিল। উক্ত অক্ষরত্রয়ের সাহায্যে এই যুগের তারিখহীন লেখমালার কাল নিরূপিত হইয়া থাকে। হাড়াহালিপির এবং বোধগয়ালিপির 'শ', 'হ' ও 'ভ' সিরপুরলিপির 'শ', 'হ' ও 'ভ' হইতে প্রাচীনতর। অফসড়লিপিতে যে প্রকারের 'শ' আছে সে প্রকারের 'শ' সিরপুরলিপির প্রথমাংশে [১ম হইতে ১৪শ পঙ্‌ক্তির 'সনাতনম্' পর্য্যন্ত] দৃষ্ট হয় না, দ্বিতীয়াংশেই কেবল লক্ষিত হয়। অফসড়লিপির 'শ' সিরপুরলিপির প্রথমাংশের 'শ' অপেক্ষা আধুনিক। কিন্তু এই দুইলিপির অন্যান্য অক্ষরগুলি এবং বিশেষতঃ 'হ' ও 'ভ' বিশেষ সদৃশ বলিয়া বিবেচনা হয়। সিরপুরলিপির প্রথমাংশ অফসড়লিপির পূর্ব্বে এবং মহানামনের বোধগয়ালিপির পরে উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া ধারণা হয়। সিরপুরলিপির প্রথমাংশ খৃষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিলে অসমসাহসিকের কার্য্য হইবে। বস্তুতঃ উহাকে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগের বলিয়া গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। সিরপুরলিপির প্রথমাংশেই [১১শ ও ১২শ পঙ্‌ক্তিতে] সূর্য্যবর্ম্মার পরিচয় খোদিত হইয়াছে, সুতরাং তাঁহাকে সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগ বা অষ্টম শতাব্দীর লোক বলিয়া গ্রহণ না করিয়া খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগের লোক বলিয়া গ্রহণ করাই সঙ্গত। সিরপুরলিপির তক্ষণকালে নিশ্চয়ই সূর্য্যবর্ম্মা বর্ত্তমান ছিলেন না, যেহেতু উহার রচয়িতা লিট্ বিভক্তিতে নিষ্পন্ন 'প্রাপ' পদের ব্যবহার করিয়াছেন। [১২শ পঙ্‌ক্তি]

অতএব মৌখরি ঈশানবর্ম্মার পুত্র সূর্য্যবর্ম্মা এবং সিরপুরলিপির সূর্য্যবর্ম্মা সমসাময়িক ইহা প্রতিপন্ন হইল। সিরপুরলিপিতে উক্ত হইয়াছে যে, মহাশিবগুপ্তের মাতামহ সূর্য্যবর্ম্মা মগধের বর্ম্মকুলে জন্মগ্রহণ করেন। এই বর্ম্মবংশীয় নরপতিগণ 'মগধাধিপত্য'হেতু গৌরবশালী

হইয়াছিলেন। মগধে দীর্ঘকাল ধরিয়া দুইটি বর্ম্মবংশ আধিপত্য করেন—পূর্ণবর্ম্মার বংশ এবং মৌখরি ঈশানবর্ম্মার বংশ। চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ন চোয়াং বলেন, পূর্ণবর্ম্মা মৌর্য্যরাজ অশোকের বংশধর।(৩৫) কিন্তু অশোকের বংশধরগণের মধ্যে এ পর্য্যন্ত সূর্য্যবর্ম্মা নামে কোনও নরপতির অস্তিত্ব জানা যায় নাই। সূর্য্যবর্ম্মাকে তদ্বংশজাত বলিবার কারণ নাই। সুতরাং বাকী থাকে এক মৌখরি বর্ম্মবংশ। এই বংশ যে খুব প্রাচীন তাহা নিঃসন্দেহ। পরলোকগত কানিংহাম সাহেব গয়ার সন্নিকটে পালিভাষায় "মোখলিনাম্"-উৎকীর্ণ এক মৃণ্ময় শিলমোহর প্রাপ্ত হন। উহার অক্ষর অশোকানুশাসনের অক্ষরের অনুরূপ। ফ্লিট্ বলেন, "মোখলিনাম্" পদের অর্থ—'মৌখরিদিগের।' (৩৬) এই সুপ্রাচীন মৌখরিবংশে ঈশানবর্ম্মার পুত্র এক সূর্য্যবর্ম্মারও নাম পাইতেছি। ইনি সিরপুরলিপির সূর্য্যবর্ম্মার সমসাময়িক; অতএব সিরপুরলিপির সূর্য্যবর্ম্মাকে ঈশানবর্ম্মার পুত্র সূর্য্যবর্ম্মা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

সিরপুরলিপিতে ব্যবহৃত "মগধাধিপত্য"-শব্দে রমেশবাবু সমগ্র মগধের আধিপত্য বুঝিয়াছেন। কিন্তু সূর্য্যবর্ম্মার বংশ অর্থাৎ মৌখরিবর্ম্মগণ যে সমগ্র মগধের আধিপত্যলাভ করেন নাই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। মৌখরিগণের আধিপত্যকালে দ্বিতীয় গুপ্তরাজবংশের পতন হয় নাই, সুতরাং মগধের নায়কত্বপদপ্রাপ্তির সম্ভাবনা মৌখরিগণের ছিল না। রমেশবাবুর ধারণা এই যে, মৌখরিগণের সহিত সূর্য্যবর্ম্মার সম্পর্ক ছিল না—তিনি স্বতন্ত্র বর্ম্মবংশোদ্ভব; খৃষ্টীয় সপ্তমশতাব্দীর প্রারম্ভে মৌখরিগণের প্রভাব লুপ্ত হয়, এক নূতন বর্ম্মরাজবংশ খৃষ্টীয় সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে সহসা প্রভাবশালী হইয়া উঠেন, এবং উত্তরাপথে গুপ্তবংশের পতনের পর তাঁহারাই সমগ্র

(৩৫) Watters, On Yuan Chwang, Vol. II, P. 115.

(৩৬) Fleet's Gupta Inscriptions, Introduction, P. 14.

মগধের অধীশ্বর হন।—কিন্তু ঈশানবর্ম্মার শিলালিপি আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্ব এখন উল্লিখিত অনুমান অসার বলিয়া পরিত্যক্ত হইতে পারে। [ঈশানবর্ম্মার শিলালিপি আবিষ্কারের পূর্ব্বেও] সিরপুর-লিপির উদ্ধৃতাংশের ভ্রান্ত অর্থ কল্পনা করিয়া এবং রায়বাহাদুর হীরালাল উহার কালসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার সত্যাসত্যতা বিন্দু-মাত্র না পরীক্ষা করিয়া রমেশবাবুর ন্যায় ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিও এই উদ্ভট ঐতিহাসিক তত্ত্বের প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সংস্কৃত ভাষার সহিত যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন, 'মগধাধিপত্য'-শব্দে সমগ্র মগধের আধিপত্য যেরূপ বুঝায়, সামান্যতঃ মগধদেশের অংশমাত্রে আধিপত্যও বুঝাইতে পারে। সিরপুরলিপিতে সূর্য্যবর্ম্মার 'নৃপ'-পদবী দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কোন্ সময় তিনি রাজা হন তাহা জানিবার উপায় নাই। সূর্য্যবর্ম্মার সময় মৌখরিবংশের পূর্ব্বগৌরব ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। নগণ্যপ্রতাপ হর্ষগুপ্তের শ্বশুর হইয়া যিনি অতুল গর্ব্ব অনুভব করিতেছেন তিনি মগধের রাষ্ট্র-নায়ক একথা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না।

মগধে মৌখরিবংশের আরও কয়েকটি শাখার পরিচয় পাওয়া যায়। দেওবরণার্কলিপিতে মৌখরি অবন্তিবর্ম্মার নাম আছে।(৩৭) শর্ব্ববর্ম্মকর্ত্তৃক পূর্ব্বে যে বরুণিকাগ্রাম প্রদত্ত হয়, অবন্তিবর্ম্মকর্ত্তৃক সেই বরুণিকাগ্রাম পুনর্ব্বার বরুণবাসী মন্দিরদেবতার পূজার নিমিত্ত প্রদত্ত হইয়াছিল। পণ্ডিতগণ মনে করেন, তিনি হর্ষবর্দ্ধনের ভগিনী-পতি গ্রহবর্ম্মার পিতা অবন্তিবর্ম্মা।(৩৮) হর্ষচরিতে অবন্তিবর্ম্মা ও গ্রহবর্ম্মার উল্লেখ আছে।(৩৯) গ্রহবর্ম্মা হর্ষবর্দ্ধনের ভগিনী রাজ্যশ্রীর

---

(৩৭) Gupta Inscriptions, P. 216. (৩৮) Ibid. P. 215.

(৩৯) হর্ষচরিত, ৺জীবানন্দ বিদ্যাসাগর কর্ত্তৃক সম্পাদিত, পৃঃ ২৯৮, ৩০৭, ৩১২, ৪২৫, ৪৭৯, ৮৫৪।

পাণিগ্রহণ করেন।(৪০) মুদ্রারাক্ষসের কোনও কোনও পুথিতে চন্দ্রগুপ্তের পরিবর্ত্তে অবন্তিবর্ম্মার নাম আছে। জর্ম্মাণ পণ্ডিত ইয়াকুভি ইঁহাকে কাশ্মীররাজ অবন্তিবর্ম্মা বলিয়া মনে করেন, (৪১) কিন্তু পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্গ বলেন, এই অবন্তিবর্ম্মা কাশ্মীররাজ অবন্তিবর্ম্মা নহেন—মৌখরি অবন্তিবর্ম্মা।(৪২) অবন্তিবর্ম্মার সতেরটি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহা হইতে ৫৫৬, ৫৬৯ এবং ৫৭০ খৃষ্টাব্দ এই তিনটি তারিখ পাওয়া যায়।(৪৩) সম্ভবতঃ শর্ব্ববর্ম্মার রাজত্বকালেই তিনি মগধের কিয়দংশে আধিপত্য করিতেছিলেন। 'হর্ষচরিতে' কথিত আছে, জনৈক মালবনরপতি অবন্তিবর্ম্মার পুত্র গ্রহবর্ম্মাকে পরাজিত ও নিহত করেন।(৪৪) বুলরের মতে ইনি মালবরাজ দেবগুপ্ত।(৪৫) হর্ষচরিতে ক্ষত্রবর্ম্মা নামে একজন মৌখর-নরপতির উল্লেখ আছে।(৪৬) কথিত আছে, তিনি চারণদিগের গান শুনিতে ভালবাসিতেন। একদা তাঁহার শত্রুগণ ক্ষত্রবর্ম্মার নিকট একদল চারণ প্রেরণ করে, তাহারা 'জয়শব্দ' উচ্চারণ করিতে করিতে ক্ষত্রবর্ম্মাকে নিহত করিয়াছিল। ক্ষত্রবর্ম্মা কোন্ সময়ের রাজা বলা যায় না।

নেপালের লিচ্ছবিবংশের সহিত মৌখরিগণের সম্পর্ক ছিল। অংশুবর্ম্মার একখানি শিলালেখ হইতে জানা যায়, মৌখরি শূরসেন

(৪০) ঐ পৃঃ ২৯৮, ৩১২।

(৪১) V. A. Smith, Early History of India, Third Edition, P. 43, Note 1.

(৪২) Mudraraksasa, Bombay Sanskrit Series, Introduction, P. 21.

(৪৩) J. R. A. S. 1906, P. 849. (৪৪) হর্ষচরিত, পৃঃ ৪২৪।

(৪৫) Epigraphia Indica, Vol. I, Pp. 69—70. (৪৬) হর্ষচরিত, পৃঃ ৪৭৯.

অংশুবর্ম্মার ভগ্নী ভোগদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। শূরসেনের পুত্রের নাম ভোগবর্ম্মা এবং কন্যার নাম ভাগ্যদেবী।(৪৭) উক্ত শিলালিপি ৩৯ শ্রীহর্ষাব্দে অর্থাৎ ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হয়। লিচ্ছবিরাজ জয়দেবের ১৫৩ শ্রীহর্ষাব্দে অর্থাৎ ৭৫৯ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপিতে লিখিত আছে, দ্বিতীয় শিবদেব ভোগবর্ম্মার কন্যা বৎসদেবীকে বিবাহ করেন। মগধরাজ আদিত্যসেনের এক কন্যার সহিত ভোগবর্ম্মা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।(৪৮) শ্রদ্ধেয় রাখালবাবু তাঁহার "বাঙ্গালার ইতিহাস" গ্রন্থে (৪৯) লিখিয়াছেন, গ্রহবর্ম্মা মৌখরিবংশের শেষ রাজা। কিন্তু ইহা গ্রহণ করা যায় না, যেহেতু মৌখরি ভোগবর্ম্মা সম্ভবতঃ গ্রহবর্ম্মার পরবর্ত্তী।

বরাবর ও নাগার্জ্জুনী গুহাগাত্রে উৎকীর্ণ কতিপয় শিলালিপি (৫০) হইতে আর একটি বর্ম্মোপাধিধারী মৌখরিশাখার অস্তিত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়। যজ্ঞবর্ম্মা এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহার পুত্রের নাম শার্দ্দূলবর্ম্মা; শার্দ্দূলবর্ম্মার পুত্র অনন্তবর্ম্মার রাজত্বকালে উল্লিখিত লেখমালা উৎকীর্ণ হয়। "বাঙ্গালার ইতিহাস"গ্রন্থে [পৃঃ ১০০] রাখালবাবু মৌখরি বর্ম্মগণের বংশতালিকা প্রদান করিয়াছেন। উহাতে যজ্ঞবর্ম্মাকে ভ্রমক্রমে ঈশানবর্ম্মার পুত্র বলিয়া গণনা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার কোনই প্রমাণ নাই। আশা করি, ভবিষ্যৎ-সংস্করণে উক্ত মারাত্মক ভুলটি সংশোধিত হইবে। ফ্লিট্ বলেন, হরিবর্ম্মার বংশব্যতীত মৌখরিগণের অপরাপর শাখাসমূহ তাদৃশ প্রভাবশালী ছিল না।(৫১) হরিবর্ম্মার বংশের সহিত অন্যান্য মৌখরি শাখার কি সম্বন্ধ তাহা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। আবিষ্কৃত-প্রমাণাবলীর সাহায্যে মৌখরিগণের

---

(৪৭) Indian Antiquary, Vol. IX, P. 171।

(৪৮) Ibid, P. 178. (৪৯) পৃঃ ৭৭

(৫০) Fleet, Pp. 221—23; 223—26; 226—28.

(৫১) Fleet, P. 15, Introduction.

নিম্নধৃত বংশলতিকা প্রদত্ত হইল :—
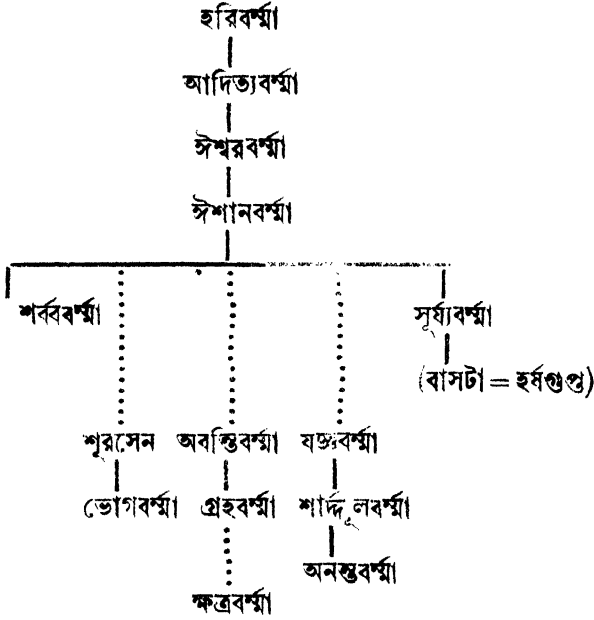
চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ন চোয়াং লিখিয়াছেন, কুশস্থল অঞ্চলে গৌড়াধিপ শশাঙ্কের পূর্ণবর্ম্মা নামে মৌর্য্যবংশীয় একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল।(৫২) শ্রদ্ধেয় রমেশবাবু পরিব্রাজকের এ মত বিদিত থাকিয়াও পূর্ণবর্ম্মাকে মৌখরিবংশজাত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মৌর্য্য ও মৌখরি সমার্থক ভাবিয়াই তিনি এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। অফসড়লিপিতে কথিত হইয়াছে, দামোদরগুপ্ত সুস্থিতবর্ম্মাকে পরাজিত করেন।(৫৩) ফ্লিট্, হর্ণলি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অনুমান করিতেন (৫৪) ইনিও মৌখরিবংশজাত, কিন্তু কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মার নবাবিষ্কৃত নিধানপুর তাম্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে, ইনি ভগদত্তবংশীয়।(৫৫)

(৫২) Wat[illegible]rs, On Yuau Chwang, Vol. II, P. [illegible]5.
(৫৩) Fleet, P. 203.
(৫৪) Fleet, P. 15; J. A. S. B., 1889, Part I, P. 102.
(৫৫) Epigraphia Indica, Vol. XII, P. 69,74.

দ্বিতীয় গুপ্তরাজবংশীয় নৃপতিগণ কখনও মৌখরিগণকে সম্পূর্ণভাবে বশীভূত করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তবে তাঁহারা যে সময়ে সময়ে গুপ্তরাজগণের বশ্যতা স্বীকার করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। মৌখরিগণের মুদ্রাসমূহই ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কোনও কোনও মৌখরি মুদ্রায় গুপ্তাব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। তাঁহারা নিজেও একটা নূতন অব্দ প্রচলন করেন। বার্ণ্ অনুমান করেন, মুখরাব্দ ৪৯৯ খৃষ্টাব্দ হইতে আরব্ধ হয়।(৫৬) কোন্ সময় মগধে মৌখরিবংশীয় বর্ম্মরাজগণের পতন হয় জানা যায় না। হর্ণলি অনুমান করেন, (৫৭) হর্ষবর্দ্ধনের সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বেই উত্তরাপথে মৌখরিগণের রাজত্বগৌরব খর্ব্বীভূত হইয়াছিল। সমগ্র মগধের অধিনায়কত্বলাভ মৌখরিগণের ভাগ্যে ঘটে নাই, গুপ্তরাজবংশের পতনের পর বিপ্লব ও বিসংবাদের গভীর আর্ত্তনাদ মগধের চতুর্দ্দিক্ হইতে উত্থিত হইতেছিল।

শ্রীননীগোপাল মজুমদার।

---

(৫৬) J. R. A. S. 1906, P. 848—49.

(৫৭) J. A. S. B., 1889, Part I, P. 102.

সুর

[কথা-চিত্র]

১

সে কেবল রঙের নেশায় বিভোর হইয়া থাকিত। যখন প্রথম পাখীর ডাকে জগৎকে ডাকিয়া তুলে, আকাশে সোনার আলো ছড়াইয়া পড়ে, সেও জাগে—জাগে...তাহার সেই অপার অনন্ত আকাশের কোলে রঙের পর রঙ কেমন খেলে তাহাই দেখিবার জন্য—আর সে অনিমেষ নয়নে তাহাই দেখে,—দেখে, দেখে,—ডুবিয়া যায়, তাহার চোখের তারকায় তখন আর রঙও থাকে না,...থাকে কেবল একটা খেলার ঢেউ যা তাহার অন্তরের অন্তরতম দেশে দুলিয়া দুলিয়া ছাপাইয়া উঠে। দিনের পর দিন এমনি করিয়া কাটিল, রঙের ঢেউ দুলিতে দুলিতে চলিল, তাহার জীবনের পাতেও অনেক রঙ ফলিল। সে হইল পটুয়া। লোকে বলিল ওটা পাগল... মাথায় একরাশ চুল, বসন ভূষণ অসংযত, চক্ষু উজ্জ্বল উদাস, চলিতে চরণ টলে,—যেন মাতাল। এম্‌নি বিভোরে দিন ভাসিয়া গেল। তুলি ধরে, দেখে, ছবি আঁকে।

২

চন্দ্রমা-শালিনী-নিশীথে পাগল একদিন দেখিল পাষাণ দীর্ণ করিয়া ঝর্ঝর করিয়া জলপ্রপাত ঝরিতেছে! চাঁদের আলো সেই ঝরণার উপর পড়িয়া সে এক রূপের খেলা খেলিতেছে। কিন্তু তাহার সঙ্গে এক করুণ সুর। সমস্ত আকাশ বাতাস ভরিয়া উঠিতেছে।—পাগল শুনিল একসুর—অন্তরের নিভৃত নিলয়ে সুপ্ত বীণার তার সঙ্গে সঙ্গে যেন বাজিয়া উঠিল।—পাগল দেখিল শুধু রঙ নয় সুর। পাগল খুঁজিতে গেল রঙে আর সুরে মিল কোথায়? মিলন না হইলে

যে প্রাণের পিয়াসা মিটে না। রঙের ভিতর যে লুক্কায়িত অভাব, যে বিরহ মিলনের জন্য হাহা করিতেছে তাহার সন্ধান করিতে চাহিল। পাগল বুঝিল শুধু রঙে চলে না সুর চাই। হৃদয়ের পাতে পাতে অন্বেষণ করিল, কানন কান্তারে, দরী গিরি কটীতটে, তুঙ্গশৃঙ্গে খুঁজিতে লাগিল সে সুর কোথায়...হাহা!...বিরহ ত্রিভুবন জুড়িয়া হাহা করিয়া উঠিল।

৩

দিন গেছে, বৎসর গেছে, পটুয়া বিশ্ববিশ্রুত নাম কিনিয়াছে, কত বিরাট পৌরাণিকী চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে। কত ক্ষুধিত নর-নারী শীর্ণ বিশীর্ণ নগ্ন কান্তি আঁকিয়াছে, কিন্তু তার সুরের তৃষা মিটে নাই। রঙের পর রঙ চাপায় মানুষে অবাক হইয়া দেখে বলে, ইহা প্রতিভা, অনন্যসাধারণ, ইহা জীবন্ত। কত সুন্দরী রূপসী চরণতলে লুটাইতে চায়। কত মহিমাই তার লোকের মুখে গীত হয়, তাহার উত্তরীয় স্পর্শের জন্য কত জনেই ব্যাকুল। কিন্তু হায়! পটুয়া, বিরস ক্ষুণ্ণ অন্তর্জ্বালায় জ্বলিয়া মরে...সেত তাহাদের চায় না—সে চায় চায় সুর, তাহা যে সে রঙের সহিত মিলাইতে পারে না। সে দারুণ বিরহের দহনে দগ্ধ, তাপে তাপিত, তৃষায় তৃষিত, সুধু কানের কাছে তার অন্তর পড়িয়া রহিয়াছে, সে যে বিরহী, চিরবিরহী এ কথা ত কেউ বুঝে না। লোকের গৌরব ত তার চরণের ধূলা। সেত পথের কথা। ধূলাখেলার রচনা। পটুয়া তখন ভাবিতেছিল, এই রঙেই কি আছে, যাতে সুর বাজে, নহিলে মিলন কি করিয়া হইবে। এ বিরহের কি শেষ নাই!

৪

পটুয়া গৃহকর্ম্ম দেখে না। রূপের কাছেই সে পড়িয়া থাকে। পটুয়ার প্রিয়তমা সুন্দরী। সে সৌন্দর্য্যের তুলনা হয় না। তার রূপ তারই রূপ। তার প্রিয়তমা চায় তাহার সৌন্দর্য্য উপভোগ করাইতে। সুন্দর যে ভোগেই চরম সার্থকতা লাভ মনে করে...

সে চায় আগুনে পুড়াইতে...কিন্তু হায়! পটুয়া সে রূপের আগুনে পতঙ্গবৃত্তিতে পুড়িতে পারিল না—সে যে চায় রঙের ভিতর সুর—তাহা কই! রূপের দীপ্তিতে প্রাণের তৃষা মেটে না. পটুয়া ভাবে ওই যে রূপের আড়ালে সুর লুকাইয়া আছে। সুর পলাইতে চায়, পটুয়া ধরিতে চায়। ভাবে এই রঙের ভিতরে আমি সুরের খেলা খেলিব। না হইলে জীবনই বৃথা। সুর বাজে, রূপ তাহারে লুকায়। এই লুকোচুরি ধরিতে পটুয়া দৃঢ়সঙ্কল্প হইল। সুন্দরী তাহাকে রূপে বাঁধিয়া রাখিতে চায়—পটুয়া সে খণ্ডরূপের মাঝে নিজেকে বাঁধ দিয়া রাখিতে পারে না...মুক্তি ও বাঁধনের দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল...তার পর পটুয়া একদিন রঙ ও তুলি লইয়া বসিল। মনে দৃঢ়, যে, সে আজ সুরকে এই রঙের মধ্যেই ধরিবে ও জগতের কাছে তাহাকে ধরিয়া দিবে। হারে চোর! তুমি কেমন করিয়া এতকাল লুকাইয়া বেড়াও দেখিব। কেবল রঙের ধোঁকায় আমাকে ভুলাইতে চাও। পটুয়া তুলি ধরিল। আকাশ, বাতাস, ধরা স্তম্ভিত, পটুয়া আজ সুরকে বাঁধিবে!!! রূপের দেশে সুরের নেশায় আজ পটুয়া নির্ম্মম হইয়া উঠিয়াছে। রূপ আজ সুরের ধ্যানে বসিল।

৫

পটুয়ার সম্মুখে প্রিয়তমা, ওদিকে তূর্য্যধ্বনি করিয়া প্রভাত, আলো ছড়াইয়া আসিতেছে...প্রভাতের আলোর উপরে সেই প্রিয়তমার রূপ—পটুয়ার তুলিকা নড়িতেছে, রঙের পর রঙ খেলিতেছে, কিন্তু তবুও সুরের আভাস পাওয়া গেল না। সুন্দরী দেখিল একি! এত শুধু আমি নয়, আমার রূপ নয়, পটুয়ার তুলিকা চলিতেছে—ওই চক্ষুতে, ওই অধরে, ওই উরসে, ওই পদতলে সহস্রদল ফুটিয়া উঠিতেছে, ওই বরণায়ত বর্ণিকাভঙ্গে রূপ ধরা দিয়াছে...কিন্তু সুর কই? কই সে সুর কই, কই! কই! সে মিলনের রাগিণী ওই বাজে না? বাজে...না...ওই পলায়...ওই যে বক্ষ দুলিয়া

উঠিল, ওই যে সুর ওই...ওই...না...তুলিকা স্থির—পটুয়া নিশ্চল, আর একবার শুনিলেই পটুয়া তাহাকে রঙের ভিতর ধরিবে—ওই, ওই যে অধর একটু পাপড়ি আলগা হইল, ওই সে নিশ্বাসে কি সুর বাজিল, ওই ওই, যে বাতাসে কার সুর...পটুয়া নাসার তিলক রচনার কাছে আর একবার তুলি স্পর্শ করিয়া বলিল..."ধরেছি ধরেছি" ...পরক্ষণেই তার প্রিয়তমা সেই অঙ্কিত চিত্রের তলে ঢলিয়া পড়িল...কি! কি!...পটুয়া দেখিল এই সুর...ঝনন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল...সুন্দরী তরুণীর তখন শেষ নিঃশ্বাস বাতাসে মিশাইয়া গেছে। ...পটুয়া নিজের বুকের ভিতর শুনিল—এক বিরাট ক্রন্দন, বিশ্বভরা বিরহের সুর। আকাশে তখন কোথা হইতে মেঘে ধারা বর্ষণ করিতে লাগিল।...পটুয়ার আঁখি-কোণে দুই বিন্দু জল টল্‌টল্ করিতেছে।

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

প্রেমভিখারী

আমার মাঝে
কি রস আছে
ওগো রসাধার !
তাই ভ্রমর হয়ে
গান বুকে ল'য়ে
ফের বারে বার ?
কতবার তোমারে
সবাকার মাঝারে
করেছি অপমান,
তবু নানা ছলে
কিছু নাহি বলে
গেয়েছ তব গান।
আমায় না হলে
লীলা নাহি চলে
ওগো লীলাধার !—
তাই এস ছুটে
সব বাধা টুটে,
প্রেমিক আমার !

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়।

গান

দাও দাও প্রাণের নিধি
প্রাণের প্রাণে বেঁধে দাও !
(আমার) সকল অঙ্গ কেঁদে মরে
চোখের কাছে এনে দাও !

আমি সইতে নারি দূরে থেকে
চোখের কাছে এনে দাও,
বুকের ধন বুকের মাঝে
বুকের 'পরে বেঁধে দাও।

ভাব্‌তে গেলে তোমার কথা
সকল অঙ্গ শিহরে ;—
ভুল্‌তে গেলে তোমার কথা
বুকের মাঝে বিহরে।

আমি, ভাব্‌তে নারি ভুল্‌তে নারি ! —
তোমার কাছে ডেকে নাও
বুকের ধন বুকের মাঝে
বুকের 'পরে বেঁধে দাও !

নারায়ণ

মাসিক পত্র।

সম্পাদক

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ।
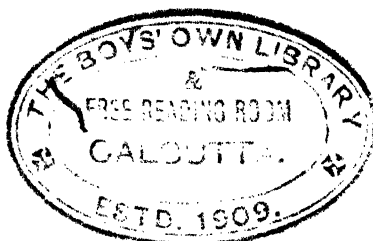
দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, ২য় সংখ্যা

আষাঢ়, ১৩২৩ সাল।

সূচী।

কলিকাতা, ২০ নং পটুয়াটোলা লেন,

বিজয়া প্রেসে,—শ্রীরমেশচন্দ্র চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"নারায়ণ" সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

নারায়ণের বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র অগ্রিম ৩।॰ টাকা। প্রতি সংখ্যা ।৴॰ আনা। বিশেষ সংখ্যার বিশেষ মূল্য। ভিঃ পিঃ মাশুল ৴॰ আনা।

প্রতি অগ্রহায়ণ হইতে নারায়ণের বর্ষ আরম্ভ হয়। কেহ বর্ষের মধ্যে গ্রাহক হইলে তাঁহাকে তৎপূর্ব্ব অগ্রহায়ণ হইতে নারায়ণ লইতে হইবে। গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ আমাদিগকে পত্র লিখিবার সময় তাঁহাদের গ্রাহক-নম্বর লিখিয়া দিবেন।

"নারায়ণ"-সম্পাদকের নামে চিঠীপত্র ও প্রবন্ধাদি সমস্তই "নারায়ণ"-কার্য্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধাদি মনোনীত না হইলে, "নারায়ণ"-সম্পাদক তাহা ফেরত পাঠাইবার ভার গ্রহণ করিতে অক্ষম। এইজন্য লেখকগণ তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন।

"নারায়ণ"-কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীবামাচরণ সেনের স্বাক্ষরযুক্ত রসিদ ব্যতীত কাহাকেও চাঁদা কিম্বা বিজ্ঞাপনের হিসাবে কেহ কোন টাকা দিলে নারায়ণ-কার্য্যালয় তাহার জন্য দায়ী হইবে না।

"নারায়ণ"-কার্য্যাধ্যক্ষকে পত্র লিখিলে বিজ্ঞাপনের দর ও নিয়মাবলী পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

শ্রীবামাচরণ সেন,
"নারায়ণ"-কার্য্যাধ্যক্ষ।

"নারায়ণ"-কার্য্যালয়, ২০৮।২ ডিঃ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

নারায়ণ

২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা] [আষাঢ়, ১৩২৩ সাল

"তদুচিত গৌরচন্দ্র"

[২]

(বৈশাখের "নারায়ণের" ৫৭১ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি)

মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনে, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাকে বিধেয়-স্বরূপ, আর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলাকে তাঁহার অনুবাদরূপে গ্রহণ করিলে, "তদুচিত গৌরচন্দ্রের" একটা সঙ্গত অর্থ হয়, সত্য; কিন্তু তাহাতেও সকল প্রশ্নের সমাধান হয় না।

প্রথমে আমাদের কথাই উঠে। গৌরাঙ্গলীলাও ত আমরা দেখি নাই। মহাপ্রভুর পারিষদেরাই তাঁর লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, আমাদের নিকটে কৃষ্ণলীলা যেমন পুরাণ কথা মাত্র, গৌরাঙ্গলীলাও তাই। উভয়ই আমাদের অজ্ঞাত, উভয়ই আমাদের নিকটে বিধেয় স্বরূপ। আমরা এই গৌরাঙ্গলীলার অনুবাদ কোথায় পাইব?

তারপর, মহাপ্রভুর আসন্ন ভক্তগণ সম্বন্ধেও সকল কথার সমাধান হয় না। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বাহিরের আচার আচরণই ইঁহাদের প্রত্যক্ষগোচর হইয়াছিল। মহাপ্রভুর শরীরে অনেক নানা প্রকারের ভাবান্তরই ইঁহারা চাক্ষুষ করিয়াছিলেন। এসকল

ভাবান্তর যে রসের লীলা; সাত্বিকী বিকার; পূর্ব্বরাগ, মিলন, বিরহ প্রভৃতি আন্তরিক অবস্থার প্রমাণ;—একথা বলিল কে? মহাপ্রভুর সমসাময়িক কোন কোন লোকে ত তাঁর এসকল সাত্বিকী বিকারকে উন্মাদ, অপস্মার, বা মৃগীরোগ বলিয়া মনে করিত। এসকল যে রোগের লক্ষণ নয়, উচ্চতম আধ্যাত্মিক অবস্থার পরিচায়ক, মহাপ্রভুর ভক্তগণই বা ইহা জানিলেন কিরূপে?

কবিরাজ গোস্বামী কহিতেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা পুরাকালে দুই ভিন্ন দেহেতে যে প্রেমলীলা বা রসলীলা প্রকট করিয়াছিলেন, অধুনা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, একই দেহেতে সেই লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। এখানে কোন্‌টিকে বিধেয়, আর কোন্‌টিকে অনুবাদ বলিব?

অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ

আগে অনুবাদ না কহিয়া, কদাপি বিধেয়ের উল্লেখ করিবে না। এখানে আগে ত রাধাকৃষ্ণের কথাই পাই।

রাধাকৃষ্ণ প্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মনাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়বিকাররূপিণী হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধা। অতএব —অর্থাৎ শক্তি আর শক্তিমান এক বলিয়া—রাধাকৃষ্ণ একই বস্তু, একাত্মা। তথাপি পুরাকালে ইঁহারা ভিন্ন দেহ ধারণ করিয়া বৃন্দাবনলীলা করিয়াছিলেন। অধুনা সেই দুই (রাধা আর কৃষ্ণ) এক হইয়া শ্রীচৈতন্য নামে প্রকট হইয়াছেন। রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ এই শ্রীচৈতন্যকে প্রণাম করি।

এখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতারতত্বটি বিধেয় স্বরূপ। ইহাই এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য। আর রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলাটি এখানে অনুবাদ স্বরূপ। কবিরাজ গোস্বামী ধরিয়া লইয়াছেন যে রাধাকৃষ্ণকে

লোকে জানে। রাধাকৃষ্ণ যে একই বস্তু, ইহাও লোকে জানে। একাত্মা হইয়াও পুরাকালে ইঁহারা ভিন্ন দেহেতে লীলা করিয়াছিলেন, একথাও লোকে জানে। এগুলি যে জ্ঞাত, ইহা ধরিয়া লইয়াই, গোস্বামী কহিতেছেন— সেই রাধাকৃষ্ণই অধুনা একই দেহেতে মিলিত হইয়া, এই শ্রীচৈতন্য নামে প্রকট হইয়াছেন। এই শ্রীচৈতন্য একদিকে জ্ঞাত। ইঁহার জন্মকর্ম্ম ঐতিহাসিক ঘটনা। ইঁহার মানবতা আমাদের জ্ঞাত। ইঁহার মানবদেহ লোকের চক্ষুগোচর হইয়াছিল। কিন্তু এই মানবরূপী শ্রীচৈতন্য যে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ, ইঁহার এই প্রত্যক্ষ রক্তমাংসের দেহই যে শ্রীরাধার ভাবকান্তির দ্বারা সুবলিত, এসকল কথা অজ্ঞাত।

সুতরাং এই শ্লোকেতে দুইটি অনুবাদ, ও তিনটি বিধেয় পাইতেছি। এখানে দুইটি বস্তু জ্ঞাত—প্রথম রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব, দ্বিতীয় শ্রীচৈতন্যের মানবত্ব। আর তিনটি অজ্ঞাত—প্রথম শ্রীচৈতন্যের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের একত্ব, দ্বিতীয় শ্রীচৈতন্যের দেহ শ্রীরাধিকার ভাবকান্তি দ্বারা সুবলিত; ও তৃতীয় তাঁহার শ্রীকৃষ্ণস্বরূপত্ব।

কিন্তু যে রাধাকৃষ্ণতত্ত্বকে কবিরাজ গোস্বামী এখানে অনুবাদরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কি সত্য সত্যই জ্ঞাত? আমরা কি এই তত্ত্ব জানি? যদি জানি বলি, তবে কখন, কোথায়, কিরূপে জানিলাম—এই প্রশ্ন উঠে। আর যতক্ষণ না এই গোড়ার প্রশ্নের একটা মীমাংসা হইয়াছে, ততক্ষণ কবিরাজ গোস্বামীর শ্লোকের কোনও অর্থ হয় না।

যদি বল, রাধাকৃষ্ণের কথা ভাগবতে আছে, ভাগবত পড়িয়া রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব জানি; তাহাও সত্য নহে। কারণ ভাগবতে আমরা কতকগুলি শব্দমাত্র দেখিতে পাই। শব্দ বস্তুর চিহ্ন বা সঙ্কেত মাত্র, বস্তু নহে। আর জানা ব্যাপারটা বস্তুর প্রত্যক্ষের অপেক্ষা রাখে। যে শব্দ যে বস্তুর চিহ্ন বা সঙ্কেত, সেই বস্তু যে দেখিয়াছে বা জানিয়াছে, সে'ই কেবল সে-শব্দের মর্ম্ম বুঝে। রাধা

আর হলাদিনী কথাটিও বুঝিতে যে না পারি এমনও নয়। প্রথম কারণটি প্রণয়—ভালবাসা। নিতান্ত হতভাগ্য না হইলে এই প্রণয়-বস্তুর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ আমাদের হইয়াছে। সুতরাং প্রণয় যে কি, ইহা মোটের উপরে জানি। আর ইহাও জানি যে কাউকে না কাউকে আশ্রয় করিয়া এই ভালবাসা আমাদের প্রাণে জাগিয়া উঠে; শূন্যকে ধরিয়া ভালবাসা জন্মে না। তারপর ইহাও দেখি যে ইচ্ছা করিলেই যাকে তাকে আমরা সত্যভাবে, গভীররূপে, ভালবাসিতে পারি না। এখানে কোনও প্রকারের জোরজবরদস্তি চলে না। আর এই ভালবাসার ভিতরে যেন একটা নিতান্ত খামখেয়ালি ভাব আছে,—এই ভালবাসার কোনও বোধগম্য হেতু নির্দ্দেশ করা যায় না। এবস্তু অহৈতুক। আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানে দেখি যে এই ভালবাসাতে আমরা যেমন আনন্দ পাই, তেমন আর কিছুতে পাই না। আর আমরা যাহাকে ভালবাসি সে আমাদের এই আনন্দের বা প্রণয়ের মূর্ত্তিরূপেই যেন আমাদের নিকটে প্রকাশিত বা উপস্থিত হয়। আমাদের অন্তরের প্রণয়বস্তু বা আনন্দবস্তু ঘনীভূত হইয়া, সাকার মূর্ত্তি ধরিয়া, আমাদের প্রণয়ী বা প্রণয়িনীরূপে, আমাদের সম্মুখে আসিয়া, আমাদের ভালবাসা গ্রহণ করে ও আমাদিগকে ভালবাসা দিয়া আনন্দিত করিয়া থাকে। আমাদিগকে আনন্দিত করে বা অনুপম সুখ দেয় বলিয়া, প্রণয়ের এই শক্তিকে হলাদিনী বলা হয়। যাহাকে আশ্রয় করিয়া প্রণয় পরিতৃপ্ত হয়, তাহা সেই প্রণয়েরই ঘনীভূত মূর্ত্তি বলিয়া, তাহাকে প্রণয়ের বিকার বলা যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ প্রণয়ী-বিশেষ। আমাদের প্রণয়ের অভিজ্ঞতা দিয়া তাঁর প্রণয়িত্বের অনুবাদ করিতে পারি। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের আশ্রয়। আমাদের প্রেমপাত্রের অভিজ্ঞতার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমপাত্রী শ্রীরাধিকার স্বরূপের কথঞ্চিৎ অনুবাদ করিতে পারি। আর আমাদের এই সামান্য সাধারণ অভিজ্ঞতার দ্বারা—"রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহলাদিনী শক্তিঃ"—নিজেদের অনুভবের সাহায্যেই এই প্লোকের

অর্থ বুঝিতে পারি। আর এই অনুভব যার হইয়াছে সে এইটুকু অন্ততঃ সহজেই বুঝিবে যে শ্রীকৃষ্ণ যিনিই হউন না কেন, তিনি প্রণয়ী; আর শ্রীরাধাও যিনিই হউন না কেন, তিনিই এই প্রণয়ীর প্রণয়পাত্রী। তার পর, প্রেমবস্তুর আস্বাদন যে'ই পাইয়াছে, সে'ই ইহা জানে যে প্রেমিক-প্রেমিকার ঐকান্তিক একাত্মতা সাধিত না হইলে প্রেম কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করে না, করিতে পারে না। মানুষ যখনই এই প্রেমে পড়ে তখনই আপনার প্রেমপাত্রের সঙ্গে নিঃশেষে মিলিয়া মিশিয়া যাই-বার জন্য আকুলি-বিকুলি করে। ইহারই জন্য আসঙ্গলীপ্সা প্রেমের একটা নিত্য ধর্ম্ম। পিপাসিত প্রেম তাই সর্ব্বদাই বলে—"অগরু-চন্দন হইতাম, তুয়া অঙ্গে মাখিতাম, ঘামিয়া পড়িতাম তুয়া পায়।" প্রেমের এই দুরন্ত, জ্বলন্ত পিপাসার উৎপত্তি কোথায়? ইহার হেতু কি? ইহার নিবৃত্তিই বা কোথায়? প্রেমের এই একাত্মতা-প্রাপ্তির পিপাসা পূর্ব্বসিদ্ধ একত্বের প্রমাণ করে। আর এই গভীর মর্ম্মশোষী আকাঙ্ক্ষা যদি কোথাও না কোথাও, কখনও না কখনও পরিতৃপ্ত হয়, তাহা হইলে প্রেমের কোনও সত্যতা এবং সার্থকতা থাকে না। এই অপূর্ব্ব রসবস্তু মায়ামরীচিকাতে পরিণত হয়। সমগ্র সৃষ্টি তবে নিষ্ফল হইয়া যায়। আবার প্রণয়ীযুগল যদি স্বরূপতঃ একই বস্তু না হয়, তাহা হইলেই বা এ আশঙ্কা নিবৃত্তির সম্ভাবনা কৈ? বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে প্রেম সম্ভবে না। সুতরাং ভালবাসার অনুভব যারই হইয়াছে, এই উন্নতোজ্জ্বলরসশ্রী যাঁর চিত্তে একবার ফুটিয়াছে, সে ইহাও জানে এবং বুঝে যে প্রণয়ীযুগলের দ্বৈত ও স্বাতন্ত্র্য আকস্মিক মাত্র, নিত্য নহে। তাঁহাদের ঐক্যই মৌলিক ও নিত্য। অতএব শ্রীকৃষ্ণ যিনিই হউন না কেন, শ্রীরাধা যিনিই হউন না কেন, ইঁহারা প্রণয়ীযুগল, এই কথা জানিলেই, ইঁহারা যে মূলে একাত্মা, প্রেম-প্রয়োজনে, লীলার জন্য, দেহভেদপ্রাপ্ত হইয়া-ছেন, ভালবাসার সত্য অনুভব যার হইয়াছে, সে'ই এই কথাও সহজেই বুঝিতে পারিবে। অতএব

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মনাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ—

এই শ্লোকার্দ্ধে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা অভিধেয়-স্বরূপ, আর আমাদের নিজ নিজ প্রণয়ের প্রত্যক্ষ অনুভব ও অভিজ্ঞতা, ইহার অনুবাদ-স্বরূপ হইয়াছে। নিজের প্রণয়ের প্রত্যক্ষ অনুভব ও অভিজ্ঞতার দ্বারা রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলার অনুবাদ করিতে হয়। এইরূপে, এই অনুবাদের সাহায্যে, রাধাকৃষ্ণলীলাটি যখন অন্তরঙ্গ অনুভবের বিষয় হইয়া উঠে তখন ইহাকেই আবার গৌরাঙ্গলীলার অনুবাদস্বরূপ গ্রহণ ও প্রয়োগ করিতে হয়। "রাধাকৃষ্ণপ্রণয়-বিকৃতি" ইত্যাদি শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে এই কৃষ্ণলীলা বিধেয়-স্বরূপ, আমাদের প্রেমের প্রত্যক্ষ অনুভব ইহার অনুবাদ। আবার এই শ্লোকের শেষার্দ্ধে শ্রীচৈতন্যের অবতার বিধেয়রূপে আর রাধাকৃষ্ণের লীলাই তার অনুবাদরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কারণ,—যে রাধাকৃষ্ণ মূলে একাত্মা হইয়াও, পুরাকালে দেহভেদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই আবার ঐক্যলাভ করিয়া অর্থাৎ একই দেহগত হইয়া, অধুনা শ্রীচৈতন্যরূপে প্রকট হইয়াছেন।

আমরা যদি এখন এই চৈতন্যলীলাকে কৃষ্ণলীলার অনুবাদরূপে ব্যবহার করিতে চাই, আর এই জন্য কৃষ্ণলীলাকীর্ত্তনের আদিতে বস্তুনির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ করিতে যাইয়া, "তদুচিত গৌরচন্দ্র" গান করি, তাহা হইলে আমাদিগকে এই চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষ অনুভব লাভ করিতে হইবে। নতুবা এই গৌরাঙ্গলীলাকীর্ত্তন বন্ধ্যাপুত্রবৎ অলীক ও কল্পিত থাকিয়া যাইবে।

ফলতঃ একটু তলাইয়া দেখিলে, শ্রীগৌরাঙ্গলীলা অপেক্ষা রাধা-কৃষ্ণলীলা বুঝা সহজ বোধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ প্রণয়ী, প্রণয়ীর শিরোমণি। শ্রীরাধিকা তাঁর প্রণয়িনী, তাঁর সর্ব্বার্থসাধিকা। আমাদের নিজেদের সামান্য প্রণয়ের অভিজ্ঞতার দ্বারা রাধাকৃষ্ণের এই প্রেমলীলার কিছু না কিছু আভাস পাইতে পারি। সত্য বটে, আমাদের প্রেম আবি-

লতাময়, রাধাকৃষ্ণ প্রেম অনাবিল। আমাদের প্রেমে আত্মসুখবাঞ্ছা আছে, ইহা অনেক সময় প্রেম নহে, কিন্তু কাম; রাধাকৃষ্ণপ্রেমে এই আত্মসুখবাঞ্ছার লেশমাত্র নাই। আমাদের প্রেমের সঙ্গে শারীর বিকার জড়াইয়া থাকে, রাধাকৃষ্ণপ্রেম বিশুদ্ধ, অশরীরী, আধ্যাত্মিক ব্যাপার। কিন্তু এসকল সত্বেও আমাদের এই অশুদ্ধ, কামগন্ধময়, আত্মসুখলীপ্সু ভালবাসাতেও প্রেমের সাধারণ ও নিত্য ধর্ম বিদ্যমান আছে। ঘোলা জলে আর নির্ম্মল স্বচ্ছ জলে যে পার্থক্য, অবিশুদ্ধ ও বিশুদ্ধ বায়ুতে যে পার্থক্য, আমাদের এই প্রেমে আর রাধাকৃষ্ণের প্রেমেও সেইরূপ পার্থক্য আছে, স্বীকার করি। কিন্তু ঘোলা জলও ত জল। বিশুদ্ধ স্ফটিকতুল্য জলেতে যেমন জলের সাধারণ ও নিত্য-ধর্ম্ম আছে, সেইরূপ অবিশুদ্ধ কর্দ্দমাক্ত জলেতেও তাহা অবশ্যই আছে, না থাকিলে ইহা জলই হইত না। সেইরূপ আমাদের এই অশুদ্ধ প্রেমেতে প্রেমের সাধারণ ও নিত্যসিদ্ধ ধর্ম্ম অবশ্যই আছে, না থাকিলে ইহা প্রেমপর্য্যায়ভুক্তই হইতে পারিত না। আর সাধারণ প্রেমধর্ম্মবশেই, আমরা আমাদের এই প্রেমের দ্বারাই, রাধাকৃষ্ণের প্রেমের একটু-আধটু আভাস পাইয়া থাকি। এই প্রেম দিয়া সেই প্রেমের স্বরূপ কিছুর অনুবাদ করিতে সমর্থ হই। এই প্রেম আর সেই প্রেম যদি একান্ত ভিন্ন হইত, তাহা হইলে আমরা রাধাকৃষ্ণের প্রেম যে কি, ইহা কিছুতেই বুঝিতে পারিতাম না।

আমাদের প্রেম যুগল নহিলে হয় না। এই প্রেমে দুইজন চাই, এক প্রণয়ী অপর তাঁর প্রণয়পাত্রী, এক নায়ক অপর নায়িকা, এক পতি অপর সতী। রাধাকৃষ্ণের প্রেমও সেইরূপ দুইকে লইয়া— এক কৃষ্ণ, অপর রাধা। অদ্বৈতের প্রেম যে কি, ইহা আমরা বুঝি না, ইহার কোনও অনুবাদ আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতাতে নাই। বিশুদ্ধ অদ্বৈত সম্বন্ধে উপনিষদ যেমন বলিয়াছেন—"কে কাহার দ্বারা কি দেখে? কে কাহার দ্বারা কি শোনে?" অদ্বৈতের প্রেম সম্বন্ধেও তাহাই বলিতে হয়—কে কাহাকে ভালবাসে?

ব্রহ্মেতে যখন আমরা প্রেমধর্ম্ম আরোপ করি, তখন অনেক সময় নিজেদেরে, এই জীবমণ্ডলীকে, সেই প্রেমের বিষয় বলিয়া ভাবিয়া লই। কিন্তু আমরা ত অপূর্ণ, অনিত্য, পরিণামী। অনিত্যকে ভাল-বাসিয়া নিত্যপ্রেম কদাপি তৃপ্ত হইতে পারে না, অপূর্ণকে প্রেম করিয়া পূর্ণপ্রেম কদাপি সার্থক হইতে পারে না। প্রেমে সজাতী-য়তা ও সমানধর্ম্ম অন্বেষণ করে। সমানে সমানে নইলে সত্য প্রেম হয় না, হইলেও পূর্ণতা লাভ করে না। অতএব অপূর্ণ ও পরিণামী জীবকে লইয়া পূর্ণব্রহ্মের নিত্যসিদ্ধ-প্রেম সম্ভব হইতেই পারে না। এই কারণেই, পরমতত্ত্বের প্রেমলীলার প্রয়োজনানুরোধে, পূর্ণব্রহ্মের অখণ্ড অদ্বৈত সত্তা ও স্বরূপের মধ্যেই দ্বৈতের ও ভেদের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। পরমতত্ত্ব একই সঙ্গে দ্বৈত ও অদ্বৈত। পরমতত্ত্বের অদ্বৈত-তত্ত্বই উপনিষদের ব্রহ্ম। আর তাঁহার দ্বৈত-তত্ত্বই ভাগবতের রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব। এইজন্য অদ্বৈত ব্রহ্মের প্রেম যে কি, ইহা আমরা বুঝি না। রাধাকৃষ্ণের প্রেম কিছু বুঝিতে পারি। কারণ, আমরা সাক্ষাৎভাবে, নিজেদের প্রেমের অভিজ্ঞতাতে প্রেম যে দুই না হইলে জন্মে না, যুগলাশ্রয়েই যে প্রেমের জন্ম হয়, আর এই প্রেম এই যুগলকে সর্ব্বদাই এক করিতে চাহে, ইহা দেখি। এই জন্য আমাদের এই প্রেমের দ্বারা আমরা রাধাকৃষ্ণলীলার কথঞ্চিৎ অনুবাদ করিয়া, তার নিগূঢ় মর্ম্ম গ্রহণ ও আস্বাদন করিতে পারি।

কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাতেও ত কোনও প্রত্যক্ষ দ্বৈতাশ্রয় বা যুগলাশ্রয় নাই। আমাদের প্রেমের অনুবাদে মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব প্রেমলীলা বুঝিতে হইলে নবদ্বীপে, সংসারাশ্রমে থাকিতে, শ্রীমতী লক্ষ্মী ঠাকুরাণী কিম্বা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর সঙ্গে তাঁর যে দাম্পত্য সম্বন্ধ গড়িয়াছিল, তাহারই অনুশীলন করিতে হয়। কিন্তু "তত্বচিত গৌরচন্দ্রে" কোথাও ত এরূপভাবে লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর বা বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর উল্লেখ নাই। মহাপ্রভু যে নিজের মধ্যেই নিজে পূর্ব্বরাগ, মিলন, মান, বিরহাদির অভিনয় ও আস্বাদন করিয়া

ছিলেন। তিনি যে আপনি একাধারে প্রণয়ী ও প্রণয়িণী, নায়ক ও নায়িকা, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা। আমাদের প্রেমে নায়ক-নায়িকা, পতি-পত্নী, পুরুষ-প্রকৃতি, এই যুগল সর্ব্বদাই প্রতিষ্ঠিত। এই জন্ম এই প্রেমের অনুবাদে আমরা রাধাকৃষ্ণের যুগল প্রেমের মর্ম্ম কিছু কিছু ধরিতে ও বুঝিতে পারি। শ্রীচৈতন্ম মহাপ্রভুর প্রেমলীলাতে এরূপ প্রত্যক্ষ কোনও যুগল-আশ্রয় ত নাই। এ অদ্ভুত প্রেমের অনুবাদ তবে পাই কোথায়?

তবে ইহাও আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভবের দ্বারা দেখি যে যেমন দ্বৈত, বা যুগল না হইলে প্রেম হয় না; আবার সেইরূপ, এই দুই যদি সজাতীয় না হয়, অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে যদি একটা মৌলিক একত্ব না থাকে, তাহা হইলেও প্রেম সম্ভব হয় না। আমাদের নিজ নিজ জীবনে প্রেমের অনুভব ও অভিজ্ঞতার দ্বারাই প্রেমের এই দ্বৈত-রূপ ও অদ্বৈত স্বরূপ উভয়ই প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের ভালবাসার বস্তু আপাতত আমাদের বাহিরে, আমাদের হইতে পৃথক হইয়া প্রকাশিত হইলেও, ইহা যে আমাদেরই অন্তরঙ্গ বস্তু, আমাদের প্রাণের, আমাদের আত্মার প্রতিরূপ, আমাদের প্রেমই সর্ব্বদা যেন এই কথা বলে। যাহা আমাদের ভিতরের নহে, তাহাকে আমাদের ভিতরে স্থান দিতে পারি না। যাহা আমাদের নহে, তাহাকে সত্যভাবে আমাদের করিতেও পারি না। যাহাকে ভালবাসি সে আমাদের ভিতরের বস্তু বলিয়াই, তাহাকে অমন করিয়া ভিতরে টানিয়া লইতে পারি। সে আমাদের আপনার বলিয়াই, অমন করিয়া তাহাকে আপনার প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন করিয়া গ্রহণ করি। তাহার সঙ্গে আমাদের একত্ব আজিকার সৃষ্টি নয়, কিন্তু নিত্যসিদ্ধ, এই জন্মই তাহাকে জ্ঞানতঃ নিজের করিয়া লইতে না পারিলে, আমাদের প্রেমের সঙ্গে প্রাণও যেন অপূর্ণ, আধখানা হইয়া রহে। ফলতঃ আমাদের ভিতরে, আমাদের আত্মার মধ্যে যার স্বরূপ লুকাইয়া নাই, বাহিরে তার রূপ দেখিয়া আমাদের অন্তরাত্মা আকুল হইয়া উঠে না।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই মনে হয়, প্রেমিকযুগল দুই নয়, কিন্তু এক। রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব প্রেমের সার্ব্বজনীনতত্ত্ব। রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী যাহা কহিয়াছেন, সকল প্রেমিকযুগল সম্বন্ধেই তাহা খাটে। প্রেমিকযুগল মাত্রই—

একাত্মনাবপি ভুবি দেহভেদং গতৌ তৌ—

একাত্ম হইয়াও এ সংসারে যেন ভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সর্ব্বত্রই প্রেমিকেরা এই কথা কহিয়াছেন। মার্কিণ ভাবুক থিওডোর পার্কার কোনও দিন ত রাধাকৃষ্ণের লীলাকথা শুনেন নাই, অথচ তিনিও প্রেমের বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে প্রেমিকপ্রেমিকার দুই দেহেতে যেন একই আত্মা বিরাজ করে, দুই হৃদ্‌যন্ত্রে একই প্রাণ যেন স্পন্দিত হয়। অতএব আমাদের এই পার্থিব প্রেমের অনুভবেও আমরা বাহিরের দেহভেদের সঙ্গে সঙ্গেই ভিতরের একাত্মতার সন্ধান পাই। আর এই সন্ধানের মধ্যেই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রেমলীলার মর্ম্ম ও অর্থের অনুসন্ধান করিতে হইবে।

আর এই অনুসন্ধানের গোড়াতেই একটা কথা ভাল করিয়া ধরিতে ও বুঝিতে হইবে। সে কথাটি এই যে, কবিরাজ গোস্বামী এখানে যে রাধাকৃষ্ণের কথা কহিয়াছেন তাহা যেমন তত্ত্ববস্তু; এই রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বের আশ্রয়ে তিনি যে চৈতন্যাবতার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহাও সেইরূপ তত্ত্ববস্তু। যাহার দ্বারা কোনও জিজ্ঞাসার নিঃশেষ নিবৃত্তি হয়, তাহাই তত্ত্ব। জিজ্ঞাসা অর্থ জানিবার ইচ্ছা। জানিয়াই কেবল জানিবার ইচ্ছার নিবৃত্তি হইতে পারে, অন্য উপায়ে হয় না। যাহা জানি তাহাই জ্ঞান। অতএব তত্ত্বমাত্রেই জ্ঞানগম্য, জ্ঞানবস্তু। আর জ্ঞানমাত্রেই অনুভূতিতে যাইয়া শেষ হয়। "অনুভূতি পর্য্যন্তং জ্ঞানং।" যে জ্ঞান অনুভূতিতে যাইয়া শেষ হয় না, তাহার দ্বারা কোনও জিজ্ঞাসার নিঃশেষ নিবৃত্তি হইতে পারে না। আর যাহাতে কোনও জিজ্ঞাসার নিঃশেষ নিবৃত্তি হয় না, তাহা যখন তত্ত্ব নয়; তখন যতক্ষণ না কোনও বস্তুর বা বিষয়ের পরিপূর্ণ ও

প্রত্যক্ষ অনুভব জন্মিয়াছে, ততক্ষণ তাহাকে তত্ত্ব বলা যায় না। এই জন্য পৌরাণীকি কিম্বদন্তির রাধাকৃষ্ণ-লীলা উপকথা মাত্র, তত্ত্ব নহে। যে রাধাকৃষ্ণ-লীলা সাধকের অপরোক্ষ অনুভূতিতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই কেবল তত্ত্ব।

এই তত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইলে, সর্ব্বসংস্কারবর্জ্জিত হইতে হয়। এবিদ্যা গুরুমুখী সত্য, কিন্তু গতানুগতিকপন্থী নহে। এপথে যে সংস্কারবদ্ধ হইল, সে তত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবে না। অন্ধকার রাত্রে বিজন, বিস্তীর্ণ প্রান্তরে মানুষকে যেমন ভূতে পায়, সংস্কারবদ্ধ সাধককে সেইরূপ এই সকল সংস্কারে পায় ও অপথে কুপথে লইয়া হায়রাণ করে। রাধাকৃষ্ণ যে তত্ত্ববস্তু, ইহা যে জ্ঞানগম্য জ্ঞানবস্তু, প্রত্যক্ষ অনুভব ব্যতীত এই তত্ত্বের মর্ম্ম বুঝা যে অসাধ্য, ইহা বিস্মৃত হইয়া, পুরাণ-কথা হইতে যে লৌকিক সংস্কার জন্মিয়াছে, তাহার দ্বারা জড়িত হইয়াই মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত অমন যে শুদ্ধা সাত্বিকী ভক্তিপন্থা, তাহার আশ্রয়ে সহজীয়া প্রভৃতি বামমার্গের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। যাঁহারা প্রকৃতিগত সমাজধর্ম্মের আনুগত্য নিবন্ধন এসকল বামাচার বর্জ্জন করিয়া চলেন, তাঁহারাও এই লৌকিক সংস্কারবদ্ধ হইয়া, অশেষবিধ কল্পনা-জালে জড়াইয়া এই শুদ্ধা সাত্বিকী ভক্তিপন্থাটিকে কুহেলিকাচ্ছন্ন করিয়াছেন। আর চৈতন্যাবতার-তত্ত্ব বুঝিতে হইলে, রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বটি বুঝিতে হয়, এবং এই রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব বুঝিতে হইলে, রাধাকৃষ্ণের লীলা-কথার সঙ্গে যেসকল কল্পনা ও কিম্বদন্তি জড়াইয়া গিয়াছে, সকলের আগে তাহাকে নিঃশেষে পরিষ্কার করিতে হয়।

অতএব সকলের আগে ইহা দৃঢ় করিয়া ধরিতে হইবে যে রাধাকৃষ্ণ দেবতা নহেন, রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি বা প্রতিমা নহেন, রাধাকৃষ্ণ রূপক নহেন, কবিকল্পনা নহেন ;—রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ববস্তু। তত্ত্ববস্তু মাত্রেই জ্ঞানগম্য, জ্ঞানবস্তু। জ্ঞান মাত্রেই অনুভূতিতে যাইয়া শেষ হয়। অর্থাৎ অনুভূতিতে যে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয় না,

তাহা পূর্ণ জ্ঞান নহে, তাহা অপূর্ণ, জ্ঞানাভাস মাত্র। অনুভূতি আমাদের আত্মার ধর্ম্ম। যে বস্তুকে আমরা আমি ও আমার বলি, শাস্ত্রে যাহাকে অহং বস্তু বলিয়াছেন, এই অস্মদপ্রত্যয়বাচক বস্তুই আমাদের আত্মা। এই আত্মা আমাদের অন্তরতর, অন্তরতম বস্তু। এই আত্মবস্তুর বা অহং বস্তুর আশ্রয়েই আমাদের যাবতীয় জ্ঞান প্রকাশিত হয়। এই আত্মার মধ্যে যাহা নাই, আমরা কিছুতেই তাহাকে বাহির হইতে আনিয়া আমাদের জ্ঞানরাজ্যভুক্ত করিতে পারি না। লৌকিক কথায় বলে "যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে"। এই ভাণ্ডই আমাদের আত্মবস্তু। যাহা আত্মার মধ্যে নাই, বাহিরে আমরা কিছুতেই তাহাকে আমাদের জ্ঞানের দ্বারা ধরিতে পারি না। ব্রহ্মাণ্ড বলিতে এই বিষয়রাজ্য বুঝি। এসকল বিষয় আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা এসকলকে আমরা আমাদের জ্ঞেয়রূপে লাভ করিয়াই, ইহারা যে আছে ইহা জানি। যাহা জানি না, তাহা আমাদের নিকটে নাই। তাহা যে আছে, আমরা এমন কথা বলিতে পারি না। যে জানে তার কাছে ইহা আছে; আমরা জানি না আমাদের নিকটে ইহা নাই। আর যাহা আমাদের আত্মাতে নাই, বাহির হইতে আমরা তাহাকে জানিতে পারি না বলিয়াই, লোকে বলে—যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে। ভিতরে যার সুরতাললয়ের জ্ঞান নাই, বাহিরেও সঙ্গীত বলিয়া কোনও কিছু তার নিকটে নাই। অন্তরে যার রূপের অনুভব নাই, যে জন্মান্ধ, বাহিরের রূপ তার নিকটে নাই। এই জন্যই পণ্ডিতেরা বলেন যে জ্ঞানমাত্রেই আত্মজ্ঞান। আত্মার আপনার অনুভূতিরূপেই যাবতীয় বিষয় আমাদের জ্ঞানগম্য হয়। আমি যখন বলি যে রামকে আমি জানি, তখন বাস্তবিক ইহাই বলিতে চাই যে আমি আমার নিজেকে রাম নামক ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞাতারূপে জানি। রামের রূপগুণাদি আমার নিজের ভিতরেই, আমার আত্মার ধর্ম্মরূপে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আমি এসকল যে আমার ভিতরে

আছে, ইহা জানিতাম না। রামকে দেখিয়া সেই সকল আত্মধর্ম্মই আমার জ্ঞানেতে ফুটিয়া উঠিল। রাম তখন আর আমার বাহিরের বস্তু রহিল না। আমার জ্ঞেয়রূপে, আমার আত্মার মধ্যে লীন হইয়া, আমার সঙ্গে একাত্ম হইয়া, আমি যে তাহার জ্ঞাতা, এই অনুভব বা উপলব্ধি জন্মাইল। ইহাই জ্ঞানের সার্ব্বজনীন পথ।

রাধাকৃষ্ণ যখন তত্ত্ব বস্তু, জ্ঞানগম্য জ্ঞানবস্তু, তখন এই পথেই এই তত্ত্বও আমাদের জ্ঞানেতে প্রকাশিত হইবে। ইহার ত আর অন্য পথ নাই। আর জ্ঞানবস্তু বলিয়া, এই রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব আমাদের ভিতরের বস্তু, বাহিরের নহে। আমাদের আত্মজ্ঞানের মধ্যে, আত্মজ্ঞানের সঙ্গে এই তত্ত্ববস্তু মিলিয়া, মিশিয়া, জড়িত হইয়া রহিয়াছে। এই আত্মা কোনও দেশেতে বা কোনও কালেতে আবদ্ধ নহে। এই আত্মা আপনার জ্ঞান-প্রয়োজনে আপনার মধ্যেই দেশ ও কালের প্রতিষ্ঠা করে। রাধাকৃষ্ণ যখন তত্ত্ববস্তু, জ্ঞানগম্য, জ্ঞানবস্তু; তখন ইহাও দেশকালের অতীত। দেশ-কালের সীমাতে ইহাকে আবদ্ধ করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণকে শাস্ত্রে ভূয়ো ভূয়ো "অদ্বয়জ্ঞানবস্তু" বলিয়াছেন। অদ্বয়জ্ঞান বলিলেন এই জন্য যে আমাদের প্রাকৃত জ্ঞানেতে আমরা আপাততঃ যে বিষয়-বিষয়ীর বা জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের একটা ভেদ প্রতিষ্ঠা করি, শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব-বস্তু, জ্ঞানগম্য, জ্ঞানবস্তু হইলেও, তাঁহার মধ্যে এই ভেদ নাই। আত্মতত্ত্ব যেমন অখণ্ড, অদ্বৈত-তত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব যেমন অখণ্ড অদ্বৈত তত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্বও সেইরূপ অখণ্ড, অদ্বৈততত্ত্ব। ব্রহ্মকে আমরা আমাদের জ্ঞানের বিষয় করিতে পারি না, কারণ আমাদের জ্ঞানের বিষয় মাত্রেই আমাদের জ্ঞাতৃত্বের অধীন হয়—আমাদের জ্ঞানের ছাঁচে পড়িয়া তবে আমাদের জ্ঞেয় হয়; কিন্তু ব্রহ্মবস্তু স্ব-তন্ত্র। ব্রহ্মতত্ত্বে আমাদের জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা, আমাদের জ্ঞাতৃত্বের সম্ভব তাঁহা হইতে, এই তত্ত্ব আমাদের জ্ঞাতৃত্বের অধীন নহে। আর

ব্রহ্মকে যেমন জ্ঞানের বিষয় করা যায় না, এই তত্ত্ব যেমন জ্ঞানের বিষয়রূপে জানা যায় না, অপরোক্ষ অনুভূতিতেই কেবল জ্ঞাতা বা বিষয়ীরূপেই ইঁহার উপলব্ধি হয়, কৃষ্ণতত্ত্বও সেইরূপ। কৃষ্ণতত্ত্বকেও আমাদের জ্ঞাতৃত্বের আয়ত্তাধীনে আনা যায় না। জগতের বিবিধ বিষয়কে যেভাবে আমরা জানি সেভাবে ব্রহ্মতত্ত্বকে বা কৃষ্ণতত্ত্বকে জানা যায় না। ফলতঃ যাহা ব্রহ্ম, তাহাই শ্রীকৃষ্ণ। নামভেদ মাত্র, বস্তুভেদ নাই। উভয়ই অদ্বয়জ্ঞানবস্তুর বিভিন্ন নাম মাত্র।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

তত্ত্ববস্তু যাঁহারা জানেন, তাঁহারা অদ্বয়জ্ঞানবস্তুকেই তত্ত্ব কহিয়া থাকেন। এই তত্ত্বকেই উপনিষদে ব্রহ্ম, যোগীজনেরা পরমাত্মা, আর ভাগবতেরা ভগবান বলিয়া থাকেন। আর এই ভগবানই শ্রীকৃষ্ণ। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।" শ্রীরাধা এই শ্রীকৃষ্ণেরই চিৎ-শক্তি। শক্তি আর শক্তিমান ত দুই বস্তু নয়। শক্তি ও শক্তি-মান একই, অদ্বয়বস্তু। অতএব শ্রীকৃষ্ণ যেমন জ্ঞানগম্য জ্ঞানবস্তু, শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরূপিণী শ্রীরাধাও সেইরূপ জ্ঞানগম্য জ্ঞানবস্তু। শ্রীকৃষ্ণকে আমরা আমাদের জ্ঞানের বিষয়রূপে জানিতে পারি না, শ্রীরাধাকেও পারি না। আমাদের নিজেকে জানিতে যাইয়াই যেমন আমরা সাক্ষাৎভাবে, অপরোক্ষ অনুভূতিতে শ্রীকৃষ্ণকে পরমতত্ত্ব বা অদ্বয়জ্ঞানবস্তুরূপে জানি; শ্রীরাধাকেও সেইরূপ, এই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গেই সাক্ষাৎভাবে, অপরোক্ষ অনুভূতির দ্বারা উপলব্ধি করিয়া থাকি। এ বস্তুর জ্ঞান কোনও ইন্দ্রিয়সাহায্যে লাভ করা যায় না। শাস্ত্রাদি পড়িয়াও ইহার অনুভব হয় না। নিজের মধ্যে, আপনার আত্মার সঙ্গে, আত্মজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা, সম্ভব ও প্রামাণ্যরূপেই এই রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হয়।

এই তত্ত্বের উপলব্ধি লাভ করিতে হইলে, প্রথমে আত্মা কি আর অনাত্মা কি, এই বিচার করিতে হয়। এই দেহটা কি আমার

আত্মা ? আত্মা জ্ঞানবস্তু, দেহের ত নিজের জ্ঞান নিজে লাভ করিবার শক্তি নাই। দেহ যে আছে, ইহা আত্মার অধিষ্ঠানেতেই আমরা জানি। দেহকে আত্মার জ্ঞেয় বা বিষয়রূপেই আমরা জানিয়া থাকি। সুতরাং দেহ নিজে জ্ঞানবস্তু নহে, দেহটা আমাদের অস্মদ্প্রত্যয়বাচক অহং বস্তু বা আত্মবস্তু নহে। এ সকল ইন্দ্রিয়ই কি আত্মা ? তাহাই বা বলিব কি করিয়া ? চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় জ্ঞানের যন্ত্র বা করণ মাত্র, ইহারা নিজেরা নিজেকে জানেনা, ইহাদেরে তবে জ্ঞানবস্তু বলিব কেমন করিয়া ? ফলতঃ চক্ষু রূপ দেখে, কাণ শব্দ শোনে, রসনা রস আস্বাদন করে, এ সকল কথা যে বলি, তলাইয়া দেখিলে ইহা কেবল কথার কথা মাত্র বলিয়াই প্রত্যক্ষ করি। কারণ চক্ষুর অন্তরালে যতক্ষণ মন আসিয়া না দাঁড়ায়, ততক্ষণ ত চক্ষুর সঙ্গে রূপের সান্নিধ্য সত্ত্বেও রূপের জ্ঞান জন্মায় না। আবার এই মনও ত আত্মা নহে, কারণ বুদ্ধি না হইলে মনের মন্তব্য সম্ভব হয় না। তার পর এই বুদ্ধিও স্বপ্রতিষ্ঠ নহে, বুদ্ধি অহংকারের অধীন, এই অহংকার বা empirical ego'র সান্নিধ্য ব্যতীত বুদ্ধি কিছুই বুঝে না। যাহাকে আমরা আত্মা বলি, অহং বলি, যাহা জ্ঞানগম্য জ্ঞানবস্তু, সেই আত্মতত্ত্ব এই অহঙ্কারতত্ত্বের বা empirical ego'রও উপরে। এই অহঙ্কারতত্ত্বকেও ছাড়াইয়া গেলে, তবে প্রকৃত আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি হয়। আর ব্রহ্মতত্ত্ব ও কৃষ্ণতত্ত্ব এই আত্মতত্ত্বের সঙ্গে জড়িত বলিয়া, এই আত্মার সাক্ষাৎকারেই কেবল ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ও কৃষ্ণসাক্ষাৎকার হয় বলিয়া, কৃষ্ণতত্ত্বের পথেও আত্মানাত্মবিবেক প্রথম সাধন।

এই বিবেকের পথ ব্যতিরেকী পথ। ইহার সূত্র "নেতি" "নেতি" ইহা নয়, ইহা নয়। চক্ষে যে রূপ দেখে, সে তাহা কৃষ্ণরূপ নহে; কর্ণে যে শব্দ শোনে, তাহা তাঁর মুরলীধ্বনি বা শ্রীমুখের বাণী নহে; এই যে স্পর্শ ত্বক অনুভব করে, তাহা তাঁর স্পর্শ নহে; এ রসনায় যে রস আস্বাদন করে, তাহা তাঁর রস নহে।

চিত্রে বা ভাস্কর্য্যে, পটে বা প্রস্তরে যেসকল মূর্ত্তি গঠিত হয়, তাহার এই কৃষ্ণরূপ নহে। মন এই জগতের দর্শনশ্রবণাদি হইতে যে সকল কল্পিত বস্তুর সৃষ্টি করিয়া, চিত্রের বা ভাস্কর্য্যের, কাব্যের বা কাহিনীর, নাট্যের বা সংগীতের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা করে, তাহাও এই কৃষ্ণরূপ নহে। এইভাবে সকল বাহ্য বিষয়কে, সকল কল্পনাজল্পনাকে, সকল অনুমান-উপমানকে অন্তর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া, নিজ-স্বরূপে অবস্থিতিলাভ করিলে পরে, সেই গভীরতম অধ্যাত্মযোগের ভূমিতে যেমন ব্রহ্মতত্ত্ব ও পরমাত্ম-তত্ত্ব, সেই রূপ রাধাকৃষ্ণতত্ত্বও প্রকাশিত হইয়া থাকে। সাধক তখন আপনার মধ্যেই রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপের ও নিত্যলীলার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। আর এই সাক্ষাৎকার যাঁর লাভ হইয়াছে, তিনিই কেবল, আপনার অন্তরঙ্গ, অপরোক্ষ অনুভবের অনুবাদে কবিরাজ গোস্বামী যে শ্রীশ্রীচৈতন্যাবতার-তত্ত্বের প্রচার করিয়াছেন, তাহার সত্য অর্থ করিতে সমর্থ হন। এ অবতারতত্ত্ব বাহিরের কথা নহে; ঐতিহাসিক ঘটনা নহে; শারীরপ্রকাশ নহে; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে; শ্রুতিলভ্য নহে। যে অপরোক্ষ অনুভূতিতে ইহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছে, সে-ই কেবল ইহার মর্ম্ম জানে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

রূপ

পুছিও না মোরে, সে কেমন জন, বলিতে নারিব আমি।
নয়ন দেখেছে, নয়ন না জানে, কেমন সে রূপখানি॥
সেরূপ পরশে, আঁধোয়া এ আঁখি, কে কারে দেখিবে বল?
কিবা সে বরণ, কিবা সে গঠন, (কেবল) মরম ছুঁইয়া গেল!
মরম ছুঁইয়া, পরাণে পশিয়া, সৃজিল আপন কায়।
পরাণ চিরিয়া, বাহির করিলে, দেখিতে পাইবে তায়॥
মিছা কহিলাম চিরিলে পরাণ, দেখা নাহি পাবে তার।
পিঞ্জর ভাঙ্গিবে, পাখী পালাইবে, ভাঙ্গা সুধু হবে সার॥

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

সেকালের নবদ্বীপ।

পঞ্চদশ শতাব্দীর নবদ্বীপ নগর বড়ই সমৃদ্ধিশালী ছিল। নবদ্বীপের মহিমা বর্ণনায় বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন:—

"নবদ্বীপ হেনগ্রাম ত্রিভুবনে নাই,
যাহে অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোঁসাই।
* * * *
নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিতে পারে,
এক গঙ্গা ঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে।
ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ,
সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সবে মহাদক্ষ।

সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে,
বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে।
নানাদেশ হৈতে লোক নবদ্বীপ যায়,
নবদ্বীপে পড়ি সেই বিদ্যারস পায়।
রমা দৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বৈসে,
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে। (চৈঃ ভাঃ—আদি)

কবি কর্ণপুরের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতের প্রথম প্রক্রমেও ইহারই অনুরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়, কেবল ধর্ম্মকথার বাহুল্যে তথায় কিঞ্চিৎ অতিশয়োক্তি যোগ আছে। চৈতন্য ভাগবতের অন্যত্র গৌরাঙ্গের নগর ভ্রমণের বর্ণনায় নবদ্বীপের সেকালের সমৃদ্ধির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। কবির লক্ষ লক্ষ বাদ দিয়াও বুঝা যায় যে বিভিন্ন পল্লীতে নানা জাতীয় বহুলোক বসতি করিত এবং নানা শ্রেণীর মধ্যে সমবেদনার অভাব ছিল না। হাট ঘাট, রাজপথ ও অট্টালিকার পারিপাট্যের উল্লেখও যথেষ্ট পাওয়া যায়।

কৃত্তিবাসের রামায়ণে 'সপ্তদ্বীপ মধ্যে সার নবদ্বীপ গ্রাম' আছে। পরবর্ত্তী কালে শ্রীগৌরাঙ্গের অবতার প্রসঙ্গে বৈষ্ণবাচার্য্যেরা নবদ্বীপের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদনের প্রয়াস পাইয়াছেন। নরহরি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের 'ভক্তি রত্নাকর' গ্রন্থে বিষ্ণুপুরাণ হইতে এক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে :—

ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নবভেদান্নিশাময়।
ইন্দ্রদ্বীপ কসেরুশ্চ তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্॥
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গান্ধর্ব্বস্ত্বথ বারুণ।
অয়ং তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগর সম্বৃতঃ॥
যোজনানাং সহস্রন্তু দ্বীপোয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ॥

চক্রবর্ত্তী মহাশয় "ভারতবর্ষভেদে শ্রীনবদ্বীপ হয়। বিস্তারিয়া শ্রীবিষ্ণু-পুরাণে নিরূপয়" বলিয়া শ্লোকের টীপ্পনিতে লিখিয়াছেন :—

"সাগরসম্ভূত ইতি সমুদ্রপ্রান্তবর্ত্তীতি শ্রীধরস্বামী ব্যাখ্যা। নবমস্যাস্য পৃথঙ্‌নামাকথনাৎ নাম্নাপি নবদ্বীপোঽয়মিতি গম্যতে"। নবম দ্বীপের পৃথক্ নাম লেখা হয় নাই বলিয়াই শেষ দ্বীপটি নবদ্বীপ, কেননা নামেও মিল আছে, ইহাই নির্গলিতার্থ। কথিত শ্লোকে যে ভারতবর্ষের নবমভাগের এক ভাগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, চক্রবর্ত্তী মহাশয় সেকথা মনে করেন নাই, এবং বদ্বীপমধ্যস্থ নবদ্বীপ গ্রামের অস্তিত্ব পুরাণবর্ণিত যুগে সম্ভব কি না তাহা অবশ্য তখন আলোচিত হইবার নহে। এইরূপে অগ্রদ্বীপও গোপীনাথের কল্যাণে প্রাচীনত্ব পাইতে পারে। চক্রবর্ত্তী কবি অন্যত্র লিখিয়াছেন :— 'নদীয়া পৃথক্ গ্রাম নয়, নবদ্বীপে নবদ্বীপ বেষ্টিত যে হয়'। অতঃপর নবদ্বীপের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলিকে দ্বীপ কল্পনা করিয়া তাহাদের সংস্কৃত নামকরণ হইয়াছে, যথা সীমন্তদ্বীপ (সিমলা), গোদ্রুম (গাদিগাছা), মধ্যদ্বীপ (মাজিদা), কোলদ্বীপ (কুলিয়া), ঋতুদ্বীপ (রাতু ও রাহুতপুর), মোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, মাউগাছি), জহ্নুদ্বীপ (জাননগর), রুদ্রদ্বীপ (রাহুপুর), শেষ অর্থাৎ নবমটিকে অন্তর্দ্বীপ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, ইহারই মধ্যে মায়াপুর শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি। সেকালের ঘটকদের গ্রন্থে অন্যভাবে গঙ্গাগর্ভোত্থিত চক্রদ্বীপ, জয়দ্বীপ, অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপের কথা আছে ; এই উক্তি কৃত্তিবাসের কথার সহিত মিলে। বৈষ্ণব লেখকেরা ক্রমে ব্রজলীলার অনুসরণে ভাগীরথীর উভয় তীরের ষোলক্রোশ বিস্তীর্ণ ভিন্ন ভিন্ন পল্লীকে গৌড়লীলার 'বৃন্দাবন' ধরিয়া লইয়াছেন। অবশেষে প্রেমভক্তির প্রকোপে নদীয়ার বুড়ো শিব ও পোড়া মাকেও ব্রজের কালভৈরব ও যোগমায়া বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। যাহা হউক উক্ত দ্বীপ বা ধামগুলির সন্ধানে যাওয়ায় আমাদের বিশেষ লাভ নাই ; তবে সেকালের নবদ্বীপের পার্শ্ববর্ত্তী কুলিয়া, বিদ্যানগর, জাননগর প্রভৃতি পল্লীরও যে যথেষ্ট শ্রী ছিল, তাহার পরিচয় বৈষ্ণব সাহিত্যে পাইতে পারি। স্মরণ রাখিতে হইবে যে

তখন ভাগীরথী নবদ্বীপের পশ্চিমপ্রান্তবাহিনী ছিলেন এবং পর-পারেই উক্ত বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামগুলি স্থাপিত।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চার সমধিক উন্নতি লক্ষিত হয়। চৈতন্য ভাগবতে 'সবে মহা অধ্যাপক' উক্তির সহিত নানা দেশ হইতে বিদ্যার্থী আসার সংবাদ পাইতেছি। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে যে বিদ্যালাভের জন্য 'বড়গঙ্গাপাড়ে' যাইতে হইত একথা কৃত্তিবাসী রামায়ণের নবাবিষ্কৃত ভূমিকায় এবং বাসু-দেব সার্ব্বভৌম ও রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতির মিথিলায় পাঠ শেষ করিবার কথায় পাওয়া যায়। যে নবদ্বীপ বল্লাল ও লক্ষ্মণ সেনের গঙ্গাবাসের সঙ্গে সঙ্গে গৌড়ীয় পণ্ডিত সমাজের লীলাভূমি হইয়াছিল, যেখানে মহামনস্বী পশুপতি এবং হলায়ুধ প্রমুখ পণ্ডিতবর্গের বেদো-জ্জ্বলা বুদ্ধিতে হিন্দুসূর্য্যের পাটে বসিবার সময়ে একবার রক্তসন্ধ্যা দেখা দিয়াছিল; যথায় 'ধোয়ী কবিঃ ক্ষাপতিঃ' মেঘদূতের কনিষ্ঠ সহো-দর পবনদূতকে প্রেরণ করিয়া গৌড়জনের গৌরববার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া-ছেন; উমাপতি ধর বাক্য পল্লবিত করিয়া ভবিষ্যৎ বাক্‌সর্ব্বস্ব বাঙ্গা-লীকে ভাষা ফেণাইবার আদর্শ দেখাইয়াছেন, সর্ব্বশেষ পদ্মাবতী চরণ চারণ চক্রবর্ত্তী অজেয় কবি জয়দেব অজয়ের মরাগাঙ্গে সন্দর্ভ-শুদ্ধ ললিত ভাষায় প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিয়া ভাগীরথীও ভাসাইয়া তুলিয়াছেন, পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সেই নবদ্বীপের দুর্দ্দশা দেখা দিয়াছিল। স্মৃতির স্মৃতি নবদ্বীপে যে এক-বারেই লুপ্ত হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না; শূলপাণি নদীয়া অঞ্চলেরই লোক এবং দেশীয় প্রবাদ জীমূতবাহনকে নবদ্বীপেই টানিয়া লইয়াছে। তুর্কীদল নদীয়ার সারস্বত ভাণ্ডার লুণ্ঠন করে নাই বটে, কিন্তু নগর ধ্বংসের সহিত উহাও যে মাটিচাপা পড়িয়া-ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। দুই শত বর্ষের প্রবল পাঠান-পীড়নে ম্রিয়মাণ বঙ্গীয় সমাজ রাজা গণেশের সময়ে চকিত মাত্র মাথা তুলিয়াছিল। সেই সময়ে রাজসভায় 'রায়মুকুট' উপাধিপ্রাপ্ত

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ অন্বর্থনামা বৃহস্পতি স্মৃতির নূতন নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের গ্রন্থে বৃহস্পতির বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। রঘুনন্দন স্বয়ং বৃহস্পতির শিষ্য শ্রীনাথ আচার্য্যের নিকট পাঠ শেষ করেন বলিয়া প্রবাদ আছে। গৌড়ের বাদশা হোসেন শার শান্তিময় শাসনের ফলে দেশে আবার শাস্ত্রচর্চ্চার সুবিধা হইয়াছিল; নবদ্বীপেও ক্রমশঃ অনেক পণ্ডিতের আবির্ভাব হইল। স্মৃতিশাস্ত্রে রঘুনন্দনের পিতা হরিহর বন্দ্যোও এক খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন। বিশারদ ও অন্যান্য অনেক পণ্ডিত নবদ্বীপে টোল স্থাপন করিয়াছিলেন।

নবদ্বীপ সমাজ।

বিশারদ পণ্ডিতের পুত্র বাসুদেব মিথিলায় গিয়া মহামহোপাধ্যায় পক্ষাধর মিশ্রের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সার্ব্বভৌম উপাধি লইয়া দেশে ফিরিলেন। সেকালে সম্ভ্রম রাখিবার জন্য মিথিলার অধ্যাপক মহাশয়েরা পুঁথি নকল করিয়া লইতে দিতেন না; অসাধারণ স্মৃতিশক্তিবলে দেশে ফিরিয়া বাসুদেব কয়েকখানি পুঁথি অবিকল লিখিয়া ফেলেন (১)। শুনা যায়, 'সার্ব্বভৌম নিরুক্তি' নামে তাঁহার এক ন্যায়ের টীকাও ছিল। বিদ্যানগরের চতুস্পাঠীতে দর্শন শিক্ষা দিয়া কিয়ৎকাল পরে তিনি উড়িষ্যায় রাজপণ্ডিত হইয়া যান; কিন্তু তাঁহার সহোদর বিদ্যাবাচস্পতি বাটীর টোল চালাইয়াছিলেন। বাসুদেবের সুযোগ্য ছাত্র মহামনস্বী রঘুনাথ পক্ষধরের নিকট পাঠ শেষ ও শিরোমণি উপাধি লাভ করিয়া আসিয়া নবদ্বীপে নব্য ন্যায়ের

(১) একালে কেহ কেহ রঘুনাথ শিরোমণিই ন্যায় কণ্ঠস্থ করিয়া আসেন, এই অলীক প্রবাদ প্রচার করিতেছেন। কুশাগ্রধী শিরোমণি মুখস্থ করার ছেলে ছিলেন না। আমরা ৪০ বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপে বাসুদেবের স্মৃতিশক্তির প্রবাদ শুনিয়াছি, এখনও ইহা চলিত আছে। সার্ব্বভৌম পুঁথি না আনিলে নব্য ন্যায়ের অধ্যাপনা চলিল কিরূপে?

সম্যক্ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের যশঃ-সৌরভ সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়া সেকালের স্মৃতি ও দর্শনের ছাত্রদিগকে নবদ্বীপে আকর্ষণ করিয়াছিল। এই কারণেই বৈষ্ণব কবি 'সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সবে মহাদক্ষ' বলিয়া উল্লসিত হইয়াছেন। তখন হইতে পণ্ডিতের নবদ্বীপ বঙ্গে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে।

নবীন যুবক নিমাই পণ্ডিতও (শ্রীগৌরাঙ্গ) অল্পবয়সে নবদ্বীপেই পাঠ শেষ করিয়া ব্যাকরণের. টোল খুলিয়া শব্দ ও অলঙ্কার শাস্ত্রে অসাধারণ প্রতিভা দেখাইয়াছিলেন। যৌবনে পাণ্ডিত্যগর্ব্বে তিনি যার তার সঙ্গে ফাঁকি তর্ক করিয়া বেড়াইতেন। প্রাচীন বৈষ্ণব কবিরা শ্রীগৌরাঙ্গের প্রাথমিক বিদ্যাবত্তা বিষয়ে এই পর্য্যন্ত বলিয়া এবং দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের শ্লোকে দোষ দর্শাইবার দৃষ্টান্ত দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন (২)। কিন্তু নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজের মধ্যে লালিত হইয়া গৌরাঙ্গের বিদ্যা যে কেবল ব্যাকরণ অলঙ্কারেই সীমাবদ্ধ থাকিবে, ইহা পরবর্ত্তী ভক্তদিগের অসহ্য হইল। যে কাণ ভট্ট রঘুনাথ শিরোমণি ধীশক্তির নিমিত্ত দেশপ্রসিদ্ধ, শ্রীচৈতন্যের বুদ্ধিবৃত্তি যে তাহা অপেক্ষাও প্রখরা, তিনি যে 'সব বিষয়ে সবার সেরা' এরূপ না দেখাইতে পারিলে যুগাবতারের সম্মান কোথায়? ক্রমশঃ প্রচারিত দুই একটি গল্পে শ্রীগৌরাঙ্গকে শিরো-

(২) চৈতন্য ভাগবত ও চরিতামৃত।

'ব্যাকরণী তুমি নাহি পড় অলঙ্কার, তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার'—চরিতামৃত। চরিতামৃতের কোন টীকাকার এই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে 'কেশব কাশ্মিরী' ধরিয়া লইয়া এই বিষয়টির গুরুত্ব সমধিক বর্দ্ধিত করিয়া ফেলিয়াছেন। নিম্বকি মতাবলম্বী কেশব কাশ্মিরী কবি নহেন। চৈতন্যদেব তর্কে যে দর্শন জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্বাভাবিকী প্রতিভা-প্রসূত। তিনি যে পরে শুষ্ক জ্ঞানবাদীদিগকে ভক্তিমার্গে প্রণোদিত করিয়াছেন, ইহা যাঁহারা বিদ্যার জোরে বলিতে চান, তাঁহাদিগকে একালের রামকৃষ্ণ-পরমহংসদেবের দৃষ্টান্ত মনে রাখিতে বলি।

মণিরও শিরোমণি করা হইয়াছে। (প্রথম) রঘুনাথ একদিন গাছ-তলায় বসিয়া এক অতি জটিল প্রশ্নের সমাধানে সমাহিতচিত্ত আছেন, পৃষ্ঠদেশে কাকে মলত্যাগ করিয়াছে, জ্ঞান নাই; এমন সময়ে নিমাই পণ্ডিত স্নান করিয়া ফিরিতেছেন, বালক নিমাইএর স্নানের ঘাটে উৎপাতের কথা বাল্যলীলাপ্রসঙ্গে বৃন্দাবন দাস বর্ণন করিয়াছেন। তাহারই উপসংহারে গল্প-রচয়িতা বলিতেছেন :—রহস্যপ্রিয় নিমাই পণ্ডিত ভিজা কাপড় নিঙ্ড়াইয়া রঘুনাথের পৃষ্ঠে জল দেওয়ায় তিনি চমকিত হইয়া উঠিয়া বলিলেন—'কিহে নিমাই, ব্যাপার কি?' নি—'পিঠে কাকে যে বাহ্যে করেছে?' রঘু—'পড়াশুনা করতে হলে মনঃসংযোগ চাই, তোমার মত ভেসে ভেসে বেড়ালে চলে না।' চিন্তার বিষয়টা কি জিজ্ঞাসায় রঘুনাথ যে সমস্যার আলোচনা করিতেছিলেন তাহাতে ছয় প্রকার পূর্ব্ব পক্ষ এবং সেই সমস্তের যথাযথ মীমাংসা শুনাইয়া অবশেষে যে আপত্তি উঠিতে পারে তাহা জ্ঞাপন করিলে গৌরচন্দ্র অনুমাত্র চিন্তা না করিয়াই তাহার সদুত্তর দিলেন।

(দ্বিতীয়) এক সময়ে রঘুনাথ ও নিমাই একসঙ্গে খেয়ার নৌকায় গঙ্গাপার হইতেছিলেন। বগলে কি পুঁথি জিজ্ঞাসায় নিমাই উত্তর দিলেন, তাঁহার স্বরচিত ন্যায়ের টীকা। রঘুনাথ তাহা একবার দেখিয়া লইয়া বিষণ্ণ বদনে বলিলেন, "এই ন্যায়ের টীকা প্রচারিত হইলে আমার টীকার আর কিছুই আদর হইবে না।" রঘুনাথের দুঃখ দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ তৎক্ষণাৎ ঐ পুঁথি গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলেন, ইতি। গঙ্গাজলে পুঁথি ফেলিয়া দেওয়ার গল্পটি ঈশান দাসের (নাগর) অদ্বৈতপ্রকাশে দেখা দিয়াছে। তখন শ্রীচৈতন্য অবতার বলিয়া বৈষ্ণব-সমাজে স্বীকৃত। কিন্তু ঐ পুস্তকেও রঘুনাথ শিরোমণির নাম নাই, কোন এক পণ্ডিতের প্রসঙ্গে উহা কথিত হইয়াছে। এই স্বার্থ-বিসর্জ্জনের গাল-গল্পের সমালোচনা বৃথা। অবশ্য শ্রীচৈতন্য-চরিত স্বার্থত্যাগের সুন্দর আদর্শ বটে, এবং শিশির বাবুর মত

ভক্ত ব্যক্তি ‘অফল শাস্ত্র টানিয়া ফেলাইতে’ পারিলেও পারেন। কিন্তু একখানি মূল্যবান গ্রন্থের বিনাশে জগতের যে ক্ষতি, তাহাতে স্বার্থ কোন্ দিকে কে তাহার মীমাংসা করে? কেহ কেহ কথিত ন্যায়ের টীকা রঘুনাথের প্রথম বয়সের লেখা বলিয়া গোল মিটাইতে চান।

এখন চৈতন্যদেবের সমসাময়িক নবদ্বীপ-সমাজের শিক্ষা দীক্ষার কথা আর কি জানা যায় দেখা যাউক। বিশ্বম্ভর ওরফে নিমাই উপনয়নান্তে ‘ত্রিকচ্ছ বসন’ পরিয়া গঙ্গাদাস পণ্ডিতের ব্যাকরণের টোলে পড়িতে যান। তাহার অদ্ভুত ব্যাখ্যা শুনিয়া গুরু বড়ই তুষ্ট হইলেন :—

গুরু বলে বাপ তুমি মন দিয়া পড়।
ভট্টাচার্য্য হৈবা তুমি বলিলাম দৃঢ়॥

* * * *

আপনি করেন তবে সূত্রের স্থাপন,
শেষে আপনার ব্যাখ্যা করেন খণ্ডন।

ইহাতে সেকালের শিক্ষার প্রণালীর কথাও পাইতেছি। নোট্ লিখাইয়া দিয়া বা প্রাত্যহিক পরীক্ষা সহযোগে তখনকার পাঠনা হইত না। গঙ্গাদাসের সভায় বা টোলে ‘পক্ষ প্রতিপক্ষ প্রভু করেন সদায়,’ তখন ষোড়শ বর্ষ মাত্র বয়স। ‘যোগপট্ট ছাঁদে বস্ত্র করিয়া বন্ধন, বৈসেন সভার মধ্যে করি বীরাসন’ এই হইল বসিবার প্রণালী। মুরারী গুপ্ত ‘স্বতন্ত্রয়ে পুঁথি চিন্তে’, তাঁহার নিকট প্রশ্ন করে না, দেখিয়া নিমাই বলিলেন, ‘ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষম অবধি, কফ পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাই ইথি।’ গুপ্তের ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া অন্যরূপে বুঝাইয়া দিলে মুরারী বলিল, ‘চিন্তিব তোমার স্থানে শুন বিশ্বম্ভর।’ মুকুন্দ পণ্ডিতের বাড়ীতে বড় চণ্ডীমণ্ডপ, তাহাতে বিস্তর পড়ুয়া ধরে।’ গোষ্ঠী করিয়া নিমাই সেখানে অধ্যাপনা করেন, এবং ‘হেন জন দেখি ফাঁকি বলুক আমার,’ তবে জানি ভট্ট মিশ্র পদবী

তাহার' বলিয়া আস্ফালন করেন। এইরূপে 'বিদ্যারসরঙ্গে' গৌরাঙ্গ কিছুদিন ফাঁকি তর্ক করিয়া বেড়াইলেন। 'ব্যাকরণ শাস্ত্র সবে বিদ্যার আদান; ভট্টাচার্য্য প্রতিও নাহিক তৃণজ্ঞান,' অলঙ্কার বিচারেও ঐ প্রকার। একদিন ন্যায়ের পড়ুয়া গদাধরকে ধরিয়া "মুক্তির প্রকাশ, আত্যন্তিক দুঃখনাশ" এই উক্তি ও 'নানারূপে দোষে প্রভু সরস্বতী পতি।' শেষে লোকে ফাঁকি জিজ্ঞাসার ভয়ে তাঁহার নিকট ঘেঁসে না। 'উদ্ধতের চূড়ামণি' বলিয়া তাঁহার খ্যাতি তখন নবদ্বীপে প্রচারিত; স্নানের ঘাটেও অন্য ছেলেদের জোটাইয়া তিনি কত উৎপাত করেন। অবশ্য দাস ঠাকুর কৈশোর-লীলাপ্রসঙ্গেই এই সকল উত্থাপন করিয়াছেন; কৃষ্ণলীলার সহিত কতকটা সঙ্গতি রাখা ত চাই।

মুকুন্দ সঞ্জয় পুণ্যবন্তের মন্দিরে চণ্ডীমণ্ডপে টোল করায় নিমাই পণ্ডিত রীতিমত অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন; তৎপূর্ব্বেই তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত টোলে পাঠনা, পরে গঙ্গার ঘাটে জ. ক্রীড়া, বৈকালে ভ্রমণের সময়ে 'গঙ্গাতীরে শিষ্যসঙ্গে মণ্ডলী করিয়া' বসিয়া পাঠাদির আলোচনা, এইরূপে দিবা অতিবাহিত হইত। সেকালের পড়ুয়াদেরও ক্লব কমিটী ছিল।

যদ্যপিও নবদ্বীপ পণ্ডিত সমাজ,
কোটার্ব্বুদ অধ্যাপক নানা শাস্ত্র সাজ।
ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র বা আচার্য্য,
অধ্যাপনা বিনা কার আর নাহি কার্য্য।
যদ্যপিও সবেই স্বতন্ত্র সবে জয়ী,
শাস্ত্রচর্চ্চা হইলে ব্রহ্মারও নাহি সহি। (বৈঃ ভাগবত)

তথাপি প্রভুর প্রতি 'দ্বিরুক্তি করিতে কার নাহিক শক্তি' এই বলিয়া কবি দিগ্বিজয়ী বিজয়োপাখ্যানের সঙ্গে বিশ্বম্ভরের বিদ্যাচর্চ্চার উপসংহার করিয়াছেন। কবিকল্পিত 'কোটার্ব্বুদ' বাদ দিয়াও আমরা নবদ্বীপের অধ্যাপক সমাজের সেকালের প্রতিষ্ঠার কথা অনুমান করিতে পারি।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম শেষ বয়সে উৎকল রাজের আমন্ত্রণে তথায় সভা-পণ্ডিতের কার্য্য স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন; ভাগবত পাঠের সহিত দ্বিতীয় বর্গের চিন্তাও ছিল কি না, কে বলিবে; (৩) কিন্তু,

সার্ব্বভৌম ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি নাম
শান্ত দান্ত ধর্ম্মশীল মহাভাগ্যবান্

বিদ্যানগরের বিদ্যাচর্চ্চা হীনপ্রভ হইতে দেন নাই। ভবিষ্যৎ সনাতন গোস্বামী প্রভৃতি এই বিদ্যাবাচস্পতির ছাত্র। সে সময়ে সার্ব্বভৌমের শিষ্য রঘুনাথের প্রভায় নবদ্বীপের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের সর্ব্বভূমিও উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল। তাঁহার কথা পরে বলিব।

শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

(৩) জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে উল্লিখিত মুসলমানের অত্যাচারে 'বিশারদ সুত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য; সবংশে উৎকল গেলা ছাড়ি গৌড়রাজ্য' কথায় সন্দেহ হয়; ইহা বারান্তরে আলোচ্য।

মাথুর

১

বঁধু যাবে মধুপুরে নিশি হ'লে অবসান
বিঁধি বিনোদিনী-বুকে দারুণ বিরহ-বাণ,—
কে হেন নিঠুর প্রাণী এমন কঠিন বাণী
কহিবে সখীরে আজি, ভাঙ্গিবে কোমল প্রাণ?
শুনিলে, বুঝি বা বালা গরল করিবে পান!

২

নিশি না পোহাতে বালা পাতিয়া থাকিত কান,
কখন বাজিবে শিঙা, রাখাল গায়িবে গান।
শুনিলে শিঙার ধ্বনি চমকি চাহিত ধনী
বাতায়নে সঙ্গোপনে, পিপাসিত দুনয়ান
হেরিতে বঁধুর মুখ—উষার প্রথম দান!

৩

দিবসে গৃহের কাজে নিরত রহিলে কর,
বিভোর রহিত হিয়া বঁধু-প্রেমে নিরন্তর।
ক্ষণে ক্ষণে কি স্বপনে চমকি উঠিত মনে,
দেখিত বঁধুর ছায়া, শুনিত বঁধুর স্বর,
সহসা পুলকভরে শিহরিত কলেবর!

৪

তরুর দীঘল ছায়া পড়িলে অঙ্গনে তার,
ছুটিত যমুনা-জলে লইয়া কলস-ভার।
গোঠ হ'তে ক্লান্ত যবে ফিরিত রাখাল সবে,
আড়ালে দেখিত বালা মুখ-বিধু বঁধুয়ার,
লুকালে পথের ধূলি চুমিত সে বার বার।

৫

গুরুজন পাশে বসি' শুনিয়া বাঁশীর গান,
আবেগ লুকাতে গিয়া আবেশে বিবশ প্রাণ।
বঁধুর মিলন-সুখে হার না পরিত বুকে;
ঘুমালে, বঁধুরে ঘুমে সোয়াথি করিতে দান
পয়োধরে পদ চাপি' নিশি হ'ত অবসান।

৬

এমন গভীর মরি বঁধুর পিরীতি যার,
সে কেমনে বঁধু বিনে বহিবে জীবন-ভার?
বৃন্দা কহে—"লো বিশখা! নিঠুর হবে কি সখা?
দলিতে চরণ-লতা ব্যথা কি পাবে না আর?
চল্ যাই, পায়ে ধরি' হৃদয় ফিরাই তার।"

৭

বিশখা কহিছে বাণী—"তারে কে বুঝাবে বল্?
পরের পরাণ ল'য়ে খেলা করা তার ছল!
নিজে না পিরীতি করে, পর সে পিরীতে মরে,
তাহার সোহাগ শুধু সুধামাখা হলাহল,
তাহারে বাসিলে ভাল সম্বল নয়নজল!"

৮

সহসা দেখিল সবে—পিছনে দাঁড়ায়ে রাই,
চোখে জল, ওষ্ঠে হাসি, বদনে বিষাদ নাই!
কহিল—"দূষ না তাঁরে আমি ভালবাসি যাঁরে,
এমন গভীর প্রেমে বিরহের নাহি ঠাঁই,
জীবন মরণ দিয়ে বঁধুরে পূজিতে চাই।"

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

শিল্পী

১

সভায় আসিয়া রাজা ডাকিলেন, "মন্ত্রী!"

মন্ত্রী দেখিলেন সুরটা ঠিক বাজিল না, স্বরে একটা কিছু গোলমাল আছে। করজোড়ে কহিলেন, "মহারাজ!"

রাজা বলিলেন, "রাজশিল্পীকে যে দেখ্‌তে পাচ্ছিনে, তিনি কোথায়?"

মন্ত্রী উত্তর দিবার পূর্ব্বেই বিদূষক বলিয়া উঠিলেন, "আজ্ঞে, শিল্পী মহাশয়ের ঘুম ভাঙ্‌তেই আজকাল দিন শেষ হ'য়ে যায়—আর লোকপরম্পরায় শুনচি—"

রাজা ধমক দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "চুপ কর। এ সময় ঠাট্টা শোভা পায় না।" এই বলিয়া মন্ত্রীর দিকে চাহিলেন। দৃষ্টিটা কিছু তীব্র।

অপ্রস্তুতভাবে মন্ত্রী কহিলেন, "আজ্ঞে তাঁরে ত দেখ্‌ছিনে। আমি এখনি তাঁর কাছে লোক পাঠাচ্ছি।

রাজা বিরক্তির স্বরে কহিলেন, "তুমি নিজে যাও—লোক পাঠাতে হবে না।"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া মন্ত্রী বাহির হইয়া গেলেন।—অল্পদূরে গিয়াই দেখিলেন, শিল্পী সভার দিকে আসিতেছেন। মন্ত্রী ছুটিয়া গিয়া রাজার কথা তাঁহাকে জানাইলেন।

সভায় আসিয়া শিল্পী কহিলেন, "মহারাজ, এ অধীনকে স্মরণ করেছেন?"

রাজা বলিলেন, "হ্যাঁ তোমাকে ডেকেছিলুম। একটা বিশেষ কাজের কথা আছে।"

শিল্পী করজোড়ে কহিলেন, "আজ্ঞা করুন।"

রাজা বলিতে লাগিলেন, "দেখ শিল্পি, সেদিন রাণী তাঁর সখী দক্ষিণরাজমহিষার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়াছিলেন। সেখানে রাণীর সঙ্গে তাঁর ছবির সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল। কথায় কথায় রাণী তোমার ছবি আঁকার খুব প্রশংসা করছিলেন। দক্ষিণরাজপত্নী সে কথায় কর্ণপাত না ক'রে রাণীকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে একটা ছবি দেখিয়ে বল্লেন, 'এই ছবিটার মতন কোন ছবি দেখেছ কি?' রাণী সেই ছবি দেখে একেবারে মোহিত। তিনি বল্লেন, 'না এরকম ছবি আমি কোথাও দেখিনি।' রাণী কাল প্রাসাদে ফিরে এসেছেন। এখন তিনি বলছেন যে, তোমাকে এমন একটা ছবি এঁকে দিতে হবে যে, সেই ছবিটাকে হার মানায়। বুঝলে? রাণীর এই আজ্ঞা।"

চিত্রকর বিনীতভাবে কহিলেন, "আমি সে ছবি দেখেছি মহারাজ, তার সমান ছবিও যে আমি আঁকতে পারব সে ক্ষমতা আমার নাই।"

উত্তেজিত স্বরে রাজা বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু আমি বলছি তোমাকে পারতেই হবে। রাণীর সখী তিনদিন পরে এখানে নিমন্ত্রণে আসছেন। সেদিন তাঁ'কে ঐ ছবি দেখাতে হবে। এখন আমার মানসম্ভ্রম সব তোমার হাতে।"

শিল্পী নতমুখে কহিলেন, "মহারাজ, তিনদিনে আমি কি তা' পারব?"

"সে আমি শুনতে চাইনে। তিন দিন সময়।" এই বলিয়া রাজা আসন ছাড়িয়া উঠিলেন।

বিদূষক একটু কাশিয়া লইলেন। সেটুকুর অর্থ, "ইনিই আবার রাজশিল্পী!"

শিল্পী চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন সকলেরই মুখে ঘৃণার ভাব। ঊর্দ্ধে জালায়নের ভিতর দিয়া নূপুর ও বলয়ের মিশ্রিত ধ্বনি শিল্পীর

কানে আসিয়া পৌঁছিল। কিন্তু তাহা মিঠা লাগিল না; মনে হইল যেন উপহাস করিতেছে।

২

শিল্পী শূন্য বাসগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মুখ আজ অত্যন্ত গম্ভীর। কানন অতিক্রম করিয়া ভারাক্রান্ত মনে শিল্পী ধীরে ধীরে গৃহসম্মুখস্থিত মর্ম্মর-বেদীর উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ফাল্গুনের প্রথম পূর্ণিমায় আম্রমুকুলের গন্ধ লইয়া নববসন্তের বাতাস মুক্ত বাতায়ন-পথ দিয়া নগরের গৃহে গৃহে ফিরিতেছিল। তাহা শিল্পীকে ক্ষণেকের জন্য বিচলিত করিল মাত্র; কিন্তু শিল্পী আজ নিরানন্দ। হৃদয়ের ভারে শিল্পী বেদীর উপর বসিয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, তিন দিনের মধ্যে চিত্র সমাপ্ত করিয়া দিতে হইবে। হায়, তিনি কি করিবেন, কি আঁকিবেন?

ইতিমধ্যে রাজা আদেশ দিয়াছেন তিন দিন শিল্পীর সঙ্গে কেহ দেখা করিতে পারিবে না।

শিল্পী ভারাক্রান্ত মনে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "দেবি, ভক্তকে রক্ষা কর, এ সঙ্কটের হাত থেকে তুমি রক্ষা কর!"

নূপুর বাজিল। ফুলের গন্ধে বাতাস ভরিয়া উঠিল। শিল্পী অপূর্ব্ব ছায়া-প্রতিমা সম্মুখে দেখিলেন। কানে শুনিলেন, "শিল্পী তুমি তোমার নিজের মূর্ত্তি আঁক।"

শিল্পী ভাষা শুনিলেন কি সঙ্গীতের ঝঙ্কার শুনিলেন, ঠিক করিতে পারিলেন না। কেবল কানে রহিয়া গেল "শিল্পী তোমার নিজের মূর্ত্তি আঁক।"

"তাই আঁকব—আমি নিজের মূর্ত্তিই আঁকব" বলিয়া উন্মত্ত-প্রায় শিল্পী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ঘর হইতে আঁকিবার সরঞ্জামগুলি বাহির করিয়া আনিলেন।

শিল্পী তুলি লইয়া বসিয়া গেলেন। একমনে।

৩

সহসা রাজা শুনিলেন, শিল্পী নাই! শিল্পী নাই! সভাসদেরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করিয়া বসিয়া আছে। শিল্পী নাই!

মন্ত্রী সভয়ে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ, রাজশিল্পীকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।"

রাজা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "পাওয়া যাচ্ছে না? সে আমি শুন্‌তে চাইনে। মন্ত্রী, তুমি তাঁকে যেখান থেকে পার খুঁজে নিয়ে এস। নইলে—"। ক্রোধে রাজার স্বর বন্ধ হইয়া আসিল।

মন্ত্রী ভয়ে ভয়ে কহিলেন, "মহারাজ, আমি ত চারিদিকে লোক পাঠিয়েছি। তা'রা সকলে ফিরে এসে বল্‌ছে তাঁ'কে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না, তিনি কোথাও নেই।"

"কোথাও নেই! মন্ত্রী, তুমি জান, তাঁর হাতে আমার সমস্ত মান সম্ভ্রম নির্ভর কর্‌ছে? তুমি চারিদিকে আবার লোক পাঠাও। আমি নিজে শিল্পীর বাড়ী যাচ্ছি।"

চারিদিকে আবার লোক ছুটিল।

রাজা স্বয়ং শিল্পীর গৃহদ্বারে উপস্থিত। চারিধার নিস্তব্ধ, কোথাও একটুও সাড়াশব্দ নাই। রাজা দেখিলেন, মর্ম্মর-বেদীর উপরে তুলি ও বর্ণপাত্র পড়িয়া আছে, কিন্তু শিল্পী নাই।

রাজা পাগলের মতন এঘর ওঘর ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হঠাৎ একটি ঘরে প্রবেশ করিয়া রাজা আবার দুই হাত পশ্চাতে সরিয়া আসিলেন।

একি! একি চিত্র, না এ সত্য? একি রঙের খেলা, না প্রাণের?

রাজা নির্নিমেষনয়নে চিত্রফলকের দিকে চাহিয়া রহিলেন। দূত আসিয়া খবর দিল, "মহারাজ, রাজশিল্পীকে কোথাও পাওয়া গেল না।"

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়।

বুড়ার অ্যালবাম

[১]

বৃদ্ধের সম্বল কি তোমরা কেহ জাননা বোধ হয়। একে একে বৃদ্ধের নিকট হইতে যখন সকলেই সরিয়া যায়, শৈশবের সরলতা, যৌবনের উৎসাহ, আশা, ভরসা, এমনকি প্রাণাধিক আত্মীয়-স্বজন সকলেই চলিয়া যায়, তখন থাকে কি? থাকে কে? থাকে তাহার লোল, কম্প্র জরাজীর্ণ দেহ-যষ্টিখানি—'আমি' আর আমার লোহার সিন্ধুক। 'আমি' কে জান কি? আমি তোমাদের সেই নির্জ্জন সঙ্গিনী, আনন্দ ও দুঃখ-সুখবিধায়িনী ত্রিকাল-চিত্রকরী শ্রীমতী স্মৃতি। আমারই লোহার সিন্ধুকটি বুড়ার সম্বল। বৃদ্ধের যা কিছু সম্বল উহার মধ্যেই সঞ্চিত। এবং ইহাই তাহার নীরস দীর্ঘ দিবস যাপনের চিত্তবিশ্রাম। আমিই তাহার তন্দ্রাহীন রজনীর শয্যা-সঙ্গিনী। বৃদ্ধ ইহাকেই আগুলিয়া বসিয়া থাকে; দিনের মধ্যে শতবার খোলে ও দেখিয়া তৃপ্ত হয়। কাহাকেও দেখাইতে চায় না। তোমরা কি দেখিতে চাও? তবে এস আমি দেখাইব। তোমাদের বিচরণ-ক্ষেত্র মহার্ঘ, বিচিত্র শ্যাম-গালিচামণ্ডিত; তোমাদের দিক্ চক্রবাল নবসূর্য্যপ্রভাসমন্বিত। তোমাদের রত্নমণ্ডিত অ্যালবাম জগতের সুন্দর সুন্দর দেশ বিদেশের উৎকৃষ্ট চিত্রে সুশোভিত। বুড়ার অ্যালবাম দেখিতে ভাল লাগিবে কি? যাই হ'ক দেখিতে যখন ইচ্ছা হইয়াছে তখন দেখ।

প্রথম চিত্রে ঐ দেখ হংসকারণ্ডবসমাকুল, স্বচ্ছ দর্পণতুল্য বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা। চতুষ্পার্শে আম, জাম, রসাল, সুপারি, নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষরাজি ফলভরে অবনত। পশ্চিমে বাঁশ-বন সমীরে আন্দোলিত হইয়া কখনও আকাশ, কখনও ভূমি চুম্বন করিয়া উঠিতেছে

পড়িতেছে। খেজুরের স্কন্ধদেশে সারি সারি মৃত্তিকা কলসগুলি বাঁধা রহিয়াছে। বুলবুলির ঝাঁক ভিড় করিয়া কলসনিহিত রসাস্বাদনে ব্যগ্র। হরিদ্রা বর্ণের বেনে বউগুলি মধুর স্বরে গান করিতে করিতে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উড়িয়া উড়িয়া বসিতেছে। কুলবধূরা নাসিকা অবধি ঘোমটা টানিয়া জলে আগ্রীব নিমজ্জিত হইয়া মৃদু মৃদু রসালাপ করিতে করিতে তনুলতা মার্জ্জিত করিতেছে। প্রাচীনারা স্নানান্তে আর্দ্র বসনে ধৌত সোপানে সন্ধ্যাহ্নিকে নিমগ্না। ঘাটের এক পার্শ্বে মৃত্তিকার উপর বসিয়া, মাথায় ঝুঁটি বাঁধিয়া, কোমরে কাপড় জড়াইয়া ঘস্ ঘস্ করিয়া বাসন মাজিতে মাজিতে ঝীয়েরা কোন্দল বাঁধাইয়া দিয়াছে। মার্জ্জনার চোটে হাতের বাসন যেমন উজ্জ্বল হইতেছে ঝগড়ার দাপটে গলার স্বরও তেমনি ক্রমে সপ্তমে উঠিতেছে। চাকরেরা পিত্তলের কলস স্কন্ধে লইয়া ঘাটের দ্বার-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া "ঘাটে যাবো গো?" বলিয়া আদেশের অপেক্ষা করিবার কালে গোপনে সরোবর-রহস্য দেখিয়া লইতেছে। ঐ দেখ বড় উঠানের এক পার্শ্বে প্রকাণ্ড মরাই সোনার ধান বুকে ধরিয়া গৌরবে শির উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অপর দিকে রান্নাঘরের চালের মাথা দিয়া ধূম উত্থিত হইতেছে, যেন নীলগিরি শ্রেণীতে কুজ্ঝটিকার সমাবেশ হইয়াছে। বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ গোময় লেপিত হইয়া পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হইয়াছে। রান্নাঘরের দাওয়ার উপর পিতলের গামলা, কাঠের পিঁড়া, বড় বড় বঁটি, তরকারীর চাঙ্গারী, বউ ঠাকুরাণীদের সুগোল বলয়শোভিত, সাংঘাতিক কোমল করস্পর্শের অপেক্ষা করিতেছে। একদিকে গোল হইয়া বসিয়া ছোট ছোট বালকবালিকারা বাসী লুচি-সন্দেশের সদ্ব্যবহারে নিমগ্ন। বিড়াল শাবকগুলি সকরুণ "মিউ-মিউ" স্বরে চক্ষু মুদিয়া ডাকিতেছে, আর ছোট ছোট হাতের মৃদু চাপড় খাইয়া এক একবার পিছু হঠিতেছে। ঠাকুরঘরে গোপাল জিউ বিগ্রহের নিত্য পূজা আরম্ভ হইয়াছে। রূপার সিংহাসনের উপর গোপাল বসিয়া আছেন; হাতে বালা,

মাথায় চূড়া, গলায় তক্তি, কণ্ঠমালা, কোমরে বোর। গোপালের হাসিমুখ; হাতে সোনার বাটীতে মাখন। গোপালের ঘরের পার্শ্বের ঘরে ঘোলমওয়া চলিতেছে, তাহার মৃদু মধুর শব্দ উঠিয়াছে। সম্মুখের দালানে নগ্নপদে বাটীর কর্ত্তারা ও যুবকেরা বিগ্রহের আরতি দেখিতেছেন। বালকেরা ছোট ছোট হাত দুলাইয়া রূপার চামর ব্যজন করিতেছে। ঠাকুরঘরের চাকর কাঁসার ঘড়ী পিটিতেছে। পুর-মহিলারা স্নাত হইয়া ঠাকুরঘরের মধ্যে যুক্তকরে দাঁড়াইয়া নন্দকিশোরকে দর্শন করিতেছেন। ঐ দেখ, সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য তিলক ও মাল্যচন্দনে চর্চ্চিত হইয়া বাহিরের একটি ঘরে সতরঞ্চের উপর কতকগুলি ছাত্র-ছাত্রী লইয়া অধ্যাপনায় নিযুক্ত। কাহাকেও চাণক্যের শ্লোক, কাহাকেও বা মুগ্ধবোধের সহর্ণের ঘঃ বুঝাইতেছেন। দুর্গাবাড়ীর সুবৃহৎ প্রাঙ্গণের আটচালায় পাঠশালা বসিয়াছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তালপাতার গোছা জড়াইয়া, মাটির দোয়াত, খাঁকের কলম লইয়া বেত্রধারী গুরুমহাশয়ের নিকটে ভীতচিত্তে উপস্থিত হইতেছে। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক বালকেরা, কড়ানে, গণ্ডাকে, সিরকে, পুণকে চীৎকার করিয়া সুর তুলিয়া মুখস্থ করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে সহপাঠীর কোঁচড়ের মুড়ীর মোওয়ার দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। আরও দেখ বাহিরের ফটকস্থ সম্মুখের ময়দানে ভীমদর্শন দ্বারবানেরা মোচ মুচড়াইয়া কানের পাশে তুলিয়া দিয়াছে; রক্তচন্দনের রেখায় বাহু ও ললাট অঙ্কিত করিয়া গেরুয়া মালকোচা বাঁধিয়া বাহ্বাস্ফোট করিয়া কেহ কুস্তী করিতেছে, কেহ মুগুর ভাঁজিতেছে, কেহ বা সিদ্ধি ঘুঁটিতেছে। দেউড়ীর মধ্যে ঢাল তরবারি শোভা পাইতেছে। বৈঠকখানার নিম্নে দেউড়ীর পাশের ঘরে কাছারী বসিয়াছে। কর্ত্তা মছলন্দের উপর তাকিয়া হেলান দিয়া প্রফুল্ল-চিত্তে শটকা টানিতেছেন। তাঁহার দক্ষিণে বিস্তৃত গালিচার উপর লম্বিতশিখা নামাবলীধারী ন্যায়রত্ন, তর্কালঙ্কার, বিদ্যাবাগীশের দল শাস্ত্র আলোচনায় নিযুক্ত। সম্মুখে

নস্যের ডিবা। বাম দিকে পারিষদবর্গ; ঘোষজা, বোসজা, মিত্রজা প্রভৃতি; খোসগল্পে রত। সম্মুখে দেওয়ানজী, গোমস্তা নায়েবাদি নাকে চশমা, কানে কলম, সম্মুখে দপ্তর, হিসাব নিকাশে ব্যস্ত। কাছারীর বাহিরের রোয়াক ও প্রাঙ্গণে, পাইক, মোড়ল, প্রকৃতি-বর্গ, পিতৃদায়, কন্যাদায়গ্রস্ত গরীব লোকের ভিড়।

দ্বিতীয় চিত্রে দেখ—স্বর্ণাম্বরী, তপ্তকাঞ্চনবরণী, অম্বুজনয়না, বিমল জ্যোৎস্না-হাসিনী শরৎসুন্দরী পথে পথে শারদার আগমন সূচিত করিয়া দিতেছে। কাশ-বালকগুলি যেন শুভ্র পতাকা হস্তে ধরিয়া পথের ধারে ধারে দণ্ডায়মান। দেবীর চরণস্পর্শ লাভার্থ ব্যগ্র হইয়াই যেন কমলবনগুলি এক কালে দীর্ঘিকা আচ্ছন্ন করিয়া প্রস্ফুটিত হইয়াছে। কোমল সুমিষ্ট গন্ধে দিকসকল আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে। পল্লী-বালকবালিকারা কোমল মৃণাল তুলিয়া কেহ মালা গাঁথিয়া গলায় পরিতেছে; কেহবা উহা ভক্ষণে রত হইয়াছে। পূজার বাটী সহসা অমল ধবল কান্তি ধারণ করিয়া হাসিতেছে। ঘেরাটোপরূপী খেরকা বা অবগুণ্ঠনমুক্ত হইয়া ঝাড়-লণ্ঠনরূপিণী স্বচ্ছাঙ্গিনীরা সর্ব্বাঙ্গ মাজিয়া ঘসিয়া জ্যোতির্ম্ময় প্রিয় সমাগমের আশায় শুভ রাত্রির অপেক্ষা করিয়া ঐ দেখ মহা উল্লাসে, দুলিতেছে, ঝুলিতেছে, টুং-টুং ঠুং-ঠুং চিক্-মিক্ ঝিক্-মিক্ করিতেছে এবং ইন্দ্রধনুর সপ্তবর্ণের শাড়ী পরিয়াছে। ওদিকে খই-মুড়কীর ঘরে বৃহৎ বৃহৎ হোগলার ডোলের মধ্যে মুড়কীর নারিকেল-লাড়ুর গন্ধমাদন স্থাপিত হইতেছে। ভিয়ান-বাড়ীতে তিড়ুড়ী কাটা ও কাঠ চালা হইতেছে। ছিষ্টে (সৃষ্টিধর) বাড়ীর শ্যাকরা "হার কই, মাকড়ী কই, তাগা কই, আংটী কই, কবে আর হবে" প্রভৃতি বউ ঠাকুরাণীদের তাগাদায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে।

ঐ দেখ আজ পূজার ষষ্ঠী, পূজার দালান আলোকে পুলকে গন্ধে আনন্দে ভরপূর বধূমাতা ও কন্যাকাগণে পরিবেষ্টিতা গৃহিণী, করে রতনচূড় পরিধান করিয়া, মাথায় বরণডালা ধারণ করিয়া প্রতিমা

প্রদক্ষিণ করিতেছেন; বধূমাতারা অলক্তরঞ্জিত চরণে মুখর নূপুর পরিধান করিয়া গৃহিণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুবর্ত্তন করিতেছেন; হাতে হাত-ঝুম্‌কাগুলি দুলিয়া দুলিয়া ঝুণ ঝুণ করিয়া বাজিতেছে। শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর সানাই আর বালকবালিকার কলকণ্ঠে পূজাবাড়ী মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে; রঙ্‌ বেরঙের শাটীর তরঙ্গে বরাঙ্গে মেঘ-ডম্বর-অম্বরের মধ্য দিয়া কনক-নিকষ-বিদ্যুৎ-দীপ্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগিরিন্দ্রমোহিনী দাসী।

পূর্ব্ব রাগ

১

[নায়িকা পক্ষে]

সখি! কি আর কহিব তোরে!
আপনি না বুঝি আপন বেদন
পরাণ কেন যে এমন করে॥

(আমি) জানি না এ হিয়া কিসের লাগিয়া
সদাই অধীর হইয়া ছুটে।
চিনে না যাহারে স্মরিয়া তারে
কেনে গো গুমরি গুমরি উঠে॥

শুধাইলি যদি, শোন্‌ তবে বলি
কেন যে আমার এমন ভেল।

দুটি আঁখি দিয়া, জড়াইয়া মোরে
কেমনে মরমে বিঁধিল শেল ॥

* * *

(একদিন) বসন্ত দুপরে আঙ্গিনার ধারে
বসিয়া বকুল-ছায়।
অপরূপ রূপ লাগিনু আঁকিতে
যেমন পরাণে ভায় ॥

মাথার উপরে দুলিল মাধবী,
আকুল ভোমরাকুল ;
সমুখেতে নীল স্বচ্ছ সরোবরে
ফুটিল কতই ফুল ॥

শ্যামল তৃণের কোমল আসনে
আবেশে বসিল সে।
ডাহিনে হেলিয়া, পড়িছে ঢলিয়া
পুলকে পূরিছে দে' ॥

আঁকিতে আঁকিতে শোভন সে-রূপ
নিঁদ আঁখিতে ছায়।
শ্রীমুখ তাঁহার, নারিনু তুলিতে
ঘুমা'য়ে পড়িনু হায় ॥

* * * *

জাগিয়া দেখিনু বেলা অবসান
একেলা চলিনু জলে।
আমাতে গো যেন, আমি আর নাই
(যেন) চলেছি স্বপন বলে ॥

সে মধুর রূপে ভরল এ দিঠি
(শুনি) কি মধুর গীতি কাণে।
সে রূপে সে গীতে, মন্ত্রমুগ্ধ যেন
ডুবিনু তাহারি ধ্যানে ॥

* * * *

জানি না কেমনে জাগিনু সহসা
চকিতে মেলিনু আঁখি।
যেই মুখ-খানি নারিনু আঁকিতে
তাই কি সমুখে দেখি!
(অমনি) মুদিল নয়ান, কাঁপিল হৃদয়
মোহে ঝাঁপিল চিত।
জীবনে মরণে করে কোলাকোলি
বুঝি না একি এ রীত ॥

২

[নায়ক পক্ষে]

বরণে কিরণে খেলে লুকাচুরি,
বাসন্তী সাঁঝের বেলা।
অকারণে হিয়া, উঠিল কাঁদিয়া,
জুড়াতে করিনু মেলা ॥

কোথা বা যাইব, কিসে জুড়াইব,
কিছুই নাহিক জানি।
দুটি চক্ষু মোর পড়িল যে দিকে
ধরিনু সে পথখানি ॥

কভু আশে পাশে কভু বা আকাশে
চাহিয়া চলিনু বাটে।
সহসা চমকি, দেখিনু তাহারে
জলেরে যাইছে ঘাটে ॥

* * * *

রাঙ্গা-বাস পরি' নামিছে সন্ধ্যা
পছিম গগন-কোলে।
পূজিবারে তারে, নাহিছে জগত
অলকা-আলোক-জলে ॥

লতায় পাতায়, ধরণীর গায়
পড়িছে গলিয়া সোণা।
(সেই) সোণার তরঙ্গে লাবণির তরী—
ভাসে মরাল-গমনা ॥

* * * *

সোণার কলসী ধরিয়া কক্ষে
পৃষ্ঠে দুলা'য়ে বেণী।
বিজন পথেতে, আপন ভাবেতে
মগন চলেছে ধনি ॥

কোথা তার প্রাণ, কোথাই বা দেহ,
কিছু যেন নাহি জানে।
হেন মনে লয়, মুরলী কাহারো
বুঝিবা বাজিছে কাণে ॥

ডাগর ডাগর নীরদ নয়ন
চেয়ে যেন কারো পানে।

সে রূপ-সায়রে ডুবিবার তরে
চলেছে সিনান-ভাগে ॥

* * * *

ছায়াটা আমার পড়িল সহসা
তাহার চরণ আগে।
হরিণীর মত চমকিয়া উঠি
চাহিল আমার বাগে ॥

তড়িত-চমকে সে আঁখির জ্যোতিঃ
লাগিল আমার চোকে।
নিভিল তখনি, আঁধার ভুবন—
আগুন আমার বুকে ॥

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

পার্ব্বতীর প্রণয়

আমরা আজ কালিদাসের একটি প্রণয়ের অদ্ভুত চিত্র দেখাইব। আমাদের কবিরা যে প্রণয়ের বর্ণনায় কত উচ্চে উঠিতে পারিতেন তাহা দেখান এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। কিন্তু তাহা দেখাইবার পূর্ব্বে লোকে যে বলে কালিদাস বড় অশ্লীল সেই কথাটার একটা মীমাংসা করিতে হইবে। সত্য সত্যই কি কালিদাস অশ্লীল? সত্য সত্যই কি তাঁহার কাব্য পড়িলে লোকের মনে কুভাবের উদয় হয়, ইন্দ্রিয়বিকার উপস্থিত হয়? সত্য সত্যই কি তিনি স্থানে অস্থানে কেবল বখামীই করিয়া গিয়াছেন। আমার ত বোধ হয় তিনি তাহা করেন নাই। তিনি অতি বড় কবি। জগতের এমন সুন্দর

পদার্থ কিছুই নাই যাহা তিনি বর্ণন করেন নাই। স্ত্রীপুরুষের মিলন জগতের একটা সুন্দর হইতেও সুন্দরতর জিনিস, সুতরাং সে জিনিস-টাও তাঁহাকে বর্ণনা করিতে হইয়াছে। মালবিকাগ্নিমিত্রে, বিক্রমো-র্ব্বশীতে, শকুন্তলার এই মিলনই মূলমন্ত্র, তাহার সঙ্গে আরও অনেক ভাল কথা আছে। কুমার ও রঘুতে সারা জগৎটাই আছে, তাহার মধ্যে এ মিলনও আছে। সুতরাং যাঁহারা মনে করেন কালিদাস ঐ কথা বই আর অন্য কথা কহেন না, তাঁহারা বড়ই বাড়াবাড়ি করেন বলিয়া মনে হয়। কালিদাস এক জায়গায় বাধ্য হইয়া কামকলার বর্ণনা করিয়াছেন। সে রঘুবংশের ঊনবিংশে—সর্গটীর নাম "অগ্নিবর্ণ—"। কিন্তু তাহার বর্ণনাও কত চাপা। একজন বড় রাজা, বয়স অল্প, রাজকার্য্য ছাড়িয়া দিয়াছেন, মন্ত্রীরা তাঁহার দেখা পায় না, প্রজারা দেখিবার জন্য বড় হৈচৈ করিলে জানালা দিয়া পা বাড়াইয়া দেন। তিনি উন্মাদের মত হইয়া কেবল স্ত্রীলোক লইয়াই আছেন। অথচ সেখানকার লেখা পড়িলে কালিদাস কত সাবধানে এই ভোগবিলাস বর্ণনা করিয়াছেন তাহাই দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়; অশ্লীলতায় তত নহে।

এইরূপ স্থলে অন্য কবিরা কি করিয়াছেন, যদি দেখা যায়, কালিদাসকে পূজা করিতে ইচ্ছা করে। নৈষধকার শ্রীহর্ষ অষ্টাদশ সর্গে নলদময়ন্তীর মিলন বর্ণনা করিয়াছেন। সর্গের গোড়াতে তিনি বলিলেন বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রাদিতে যাহা কল্পনা করিতে পারে নাই, আমি এমন সব জিনিস বর্ণনা করিব। বলিয়াই তিনি নলকে দম-য়ন্তীর মহলে লইয়া গেলেন। মহলের প্রথমেই সব অদ্ভুত ছবি। প্রথম খানিতে ব্রহ্মা কামাতুর হইয়া কন্যা সন্ধ্যার প্রতি ধাবমান। তাহার পরই ইন্দ্র কিরূপে অহল্যাহরণ করিতেছেন তাহার নাটক, এইরূপ প্রায় কুড়িটি শ্লোক। তাহার পর নল, দময়ন্তীর ঘরে গেলেন। সেখানকার সাজপাট সবই ঐ রকম। তাহার পর বিছা-নায় উঠিলেন, সখীরা সরিয়া গেল। এইখানেই থামিয়া গেলে আমার

পক্ষে ভাল হইত। কিন্তু ঐ সর্গের ১৪০ হইতে ১৫২ শ্লোক এত ভয়ানক যে স্ত্রীপুরুষেও বসিয়া পড়া যায় না। যাঁহারা সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয়ের ছোট ছোট নবেলগুলি পড়িয়া নাক সিটকান, আর নারায়ণের নিন্দা করেন, তাহারা যদি একটু শ্রমস্বীকার করিয়া নৈষধের ঐ সর্গটি পড়িয়া দেখেন, বড় ভাল হয়। তাহার উপর আবার বলি, ঐ সর্গটি সংস্কৃত উপাধিপরীক্ষায় পাঠ্য। টোলে টোলে উহা পড়াইবার কথা। সংস্কৃত পরীক্ষার বোর্ড উহা পাঠ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সভায় সভাপতি স্বয়ং আশুতোষ, বড় বড় মহামহোপাধ্যায়গণ উহার মেম্বর। টোলের এবং কলেজের অধ্যাপকগণও মেম্বর। শুনিলাম, নাকি যিনি অশ্লীলতার উকীল সরকার, পবলিক প্রসিকিউটার, যিনি লোকের অশ্লীলতা লইয়া অনেকবার নালিসবন্দ হইয়াছেন, তাঁহারই প্রস্তাবে ঐ সর্গ পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এসব বর্ণনার সঙ্গে তুলনা করিলে কালিদাস ত বাপের ঠাকুর। সত্য সত্যই ঋষি। তাহার বর্ণনা খুব চাপা—রঘুর ঊনবিংশ হইতেই একটি শ্লোক তুলিতেছি—

চূর্ণবভ্রু লুলিতস্রগাকুলং
ছিন্নমেখলমলক্তকাঙ্কিতম্
উত্থিতস্য শয়নং বিলাসিন-
স্তস্য বিভ্রমরতান্যপাবৃণোৎ ॥

তিনি আরও দুই চারি জায়গায় বাধ্য হইয়া একটু একটু অশ্লীলতা আনিয়াছেন। কিন্তু তাহা যে অশ্লীল তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বুঝিতে পারেন নাই, কারণ তিনি ছাত্রদের জন্য যে সকল এডিশন্ করিয়াছেন তাহাতে উহা বাদ দেন নাই। যথা—

পর্য্যাপ্ত পুষ্পস্তবকস্তনাভ্যঃ
স্ফুরৎ প্রবালোষ্ঠমনোহরাভ্যঃ।
লতাবধূভ্যস্তরবোঽপ্যবাপুঃ
বিনম্রশাখাভুজবন্ধনানি ॥

এসকল কবিতার তর্জ্জমা করিয়া দিলেও কেহ বুঝিতে পারিবেন না যে উহায় রুচিবিরুদ্ধ কোন জিনিস আছে। না বুঝাইয়া দিলে কেহ সেকথা বুঝিতে পারিবেন না।

না হয় মানিয়া লইলাম, কালিদাস যে প্রণয়ের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে রুচিবিরুদ্ধ কিছু না থাকিলেও, ইহলোকের কথাই প্রবল। কিন্তু আমরা আজি যে কথা বলিতেছি তাহা অপেক্ষা উচ্চ অঙ্গের প্রণয়, বোধ হয়, ঋষিরাও কল্পনা করিতে পারিয়াছেন কি না? অন্য কবিদের ত কথাই নাই।

সে প্রণয় পার্ব্বতীর প্রণয়, শিবের প্রতি প্রণয়। যে প্রণয়ে দুয়ে মিশিয়া এক হইয়া যায়, সেই প্রণয়। এই প্রণয়ের মহত্ব বুঝিতে হইলে, ইহার পবিত্রতা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, ইহার অলৌকিক ভাব বুঝিতে হইলে, আগে পার্ব্বতী কে ও শিব কে তাহা জানা আবশ্যক; নহিলে এ আকর্ষণের উদারতা বুঝা যাইবে না।

পার্ব্বতী পূর্ব্বজন্মে দক্ষপ্রজাপতির কন্যা ছিলেন। স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া মহাদেবকে বিবাহ করিয়াছিলেন, দক্ষ তাহাতে বড় চটিয়া যান। তিনি এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করেন। যজ্ঞে সকল দেবতার নিমন্ত্রণ হয়। মহাদেবের হয় না। দক্ষের কন্যা সতী ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া স্বামীর অনুমতি লইয়া বাপের বাড়ী যান। সেখানে দক্ষ শিবের অনেক নিন্দা করেন, সেই নিন্দা শুনিয়া সতী দেহত্যাগ করেন। তিনি দেহত্যাগ করিলে মহাদেব শক্তিশূন্য হইলেন, তিনি সব সঙ্গ ত্যাগ করিয়া তপস্যায় ধ্যানে মগ্ন হইলেন। তাঁহার গণ নন্দী ভৃঙ্গী ইত্যাদি যা খুসী তাই করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কখন মনছাল গায়ে মাখে, কখন নমেরুর ফুল দিয়া সাজসজ্জা করে, কখন ভূর্জ্জপত্রের কাপড় পরে, কখন শুয়ে থাকে, কখন বসে থাকে, কখন লাফালাফি করে।

মহাদেব মৃত্যুঞ্জয়! তিনি ধ্যানেই মগ্ন থাকেন, গঙ্গার ধারে একটা দেবদারুগাছের তলায় থাকেন, মৃগনাভির গন্ধ শুঁকেন, বাঘছাল

পরেন আর কিন্নরদের গান শুনেন। পার্ব্বতী ত মৃত্যুকে জয় করিতে পারেন নাই। তিনি মরিয়াছিলেন ; আবার জন্মিয়াছেন। এবার তাঁহার পিতা হিমালয়, মাতা মেনকা, ভাই মৈনাক। তিনি একমাত্র কন্যা ; বড় আদরের ধন। তাঁহার আদরের আরও কারণ এই যে, ইন্দ্র পাছে ডানা কাটিয়া দেন, এই ভয়ে তাঁহার ভাই জলেই ডুবিয়া থাকেন, বাড়ী আসিতে পারেন না।

পার্ব্বতী এবার বড়—বড় ঘরে জন্মিয়াছেন। কালিদাস প্রথমেই তাহার বাপের বর্ণনা করিয়াছেন। এবং সে বর্ণনায় সতরটি কবিতা খরচ করিয়াছেন। তিনি হিমালয়ের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা জগতে অতুলনীয়, আমরা এবার সে বর্ণনার কথা বলিব না। তবে তিনি যে প্রকাণ্ড, তিনি যে পূর্ব্বসমুদ্র হইতে পশ্চিমসমুদ্র পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছেন, সে কথাটা বলিতে হইবে, আর তিনি যে কত উঁচু সে কথাটাও বলিতে হইবে। তিনি মেরুর সখা অর্থাৎ মেরু যত উঁচু তিনিও তত উঁচু। সূর্য্য মেরুর যেমন চারিদিকে ঘোরেন, তাঁহারও তেমনি চারিদিকে ঘোরেন। তাঁহার শিখরে যে সব পুকুর আছে, সে পুকুরে ত পদ্ম হয়। কিন্তু সূর্য্য যদি নাচুর দিকে রহিলেন তবে সেখানে পদ্ম ফোটে কি করিয়া। তাই কালিদাস বলিয়াছেন সূর্য্য উপরের দিকে কিরণ পাঠাইয়া সে সব ফোটান, তাঁহার মাথা সূর্য্যমণ্ডলেরও উপর। এ ত তাঁহার স্থূল দেহ, তাঁহার সূক্ষ্মদেহ একটি দেবতা। প্রজাপতি দেখিলেন, সোমের উৎপত্তি ত হিমালয় ছাড়া হয় না, তাই তিনি হিমালয়কে দেবতা করিয়া দিলেন, এবং তাঁহাকে যজ্ঞের একটা ভাগ দিলেন, সকল পর্ব্বতের রাজা করিয়া দিলেন। কালিদাস, যজ্ঞের ভাগ দিলেন,—এইটুকু বলিয়াছেন, কি ভাগ দিলেন তাহা বলেন নাই। বেদে আছে যজ্ঞে যে হাতী মারা হয়, সেই হাতীটি হিমালয়ের ভাগ, সুতরাং প্রজাপতির সৃষ্টিতে যাহা কিছু বড় সকলই হিমালয়ের সঙ্গে জড়িত।

এই যে এত বড় হিমালয়, ইনি বিবাহ করিলেন কাহাকে ?

এত বড় বরের এত বড় কনে নহিলে ত সাজে না। এ মেয়ে কোথায় মিলে। মিলিল মেনকা। মেনকা কে? বেদে দ্যৌঃ আর পৃথিবী দুটিকে জুড়িয়া দ্যাবাপৃথিবী নামে এক জোড়া অথচ এক দেবতা আছেন। সেই দেবতাকে কথনও কথনও দ্বিবচনে "মেনে" বলিত। মেনা শব্দের দ্বিবচনে মেনে। মেনা হইতে মেনকা করা বিশেষ কঠিন নয়। এখন দেখুন পৃথিবী ও আকাশ জুড়িয়া যে দেবতা আছেন, মেনকা সেই দেবতা। হিমালয় যেমন বর, কনেটি ঠিক তাহার সাজন্ত হয় নাই? তাই কালিদাস মেনকার বিশেষণ দিয়াছেন "আত্মানুরূপাং" অর্থাৎ হিমালয়ও যেমন, মেনকাও তেমনি। বেশ জোড় মিলিয়াছে। এই যে হিমালয় ও মেনকায় বিবাহ, এ যে কেহ কবির চক্ষে দিগন্তের কোলে হিমালয়কে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছেন, তিনিই ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছেন।

এই যে দ্যাবাপৃথিবীর সহিত হিমালয়ের বিবাহ, এ বিবাহে প্রথম সন্তান মৈনাক অর্থাৎ সমুদ্রের পর্ব্বত। সেও বাপের মত দিগন্ত বিস্তৃত। তবে সে হিমালয়ের মত অচল নহে। আজ এ-সমুদ্রে, কাল ও-সমুদ্রে তাহার প্রভাব দেখা যায়। তাই কবি বলিয়াছেন, সকল পর্ব্বতের ডানা কাটা গিয়াছে, মৈনাকের ডানা কাটা যায় নাই। সে লুকাইয়া সমুদ্রের মধ্যে আছে, এবং এখনও নড়িয়া বেড়াইতে পারে। পর্ব্বতের ডানা কাটা কথাটি নিতান্ত গাঁজাখুরী নহে। যে কেহ মুসুরীর বাজারে দাঁড়াইয়া একবার শিবালয় পর্ব্বতের দিকে দেখিয়াছেন, তাঁহারই মনে হইয়াছে, যেন একসার ডানাকাটা পায়রা পড়িয়া আছে।

হিমালয় ও মেনকার দ্বিতীয় সন্তান পার্ব্বতী। যেমন মা, যেমন বাপ, যেমন ভাই,—মেয়েও তেমনি। তিনি জগত-জননী, তিনি আদ্যাশক্তি, সর্ব্বব্যাপিনী। তাঁহার অন্তর্ধানে মহাদেব শক্তি-শূন্য, কেবল ধ্যান করিতেছেন—আবার কবে আমার শক্তি আসিবে। কালিদাস বলিয়াছেন, "কেনাপি কামেন তপশ্চচার"। যিনি অন্যে

তপস্যা করিলে তাহার পুরস্কার প্রদান করেন, তিনি আবার কিসের জন্য তপস্যা করিবেন। তাঁহার কি কামনা থাকিতে পারে? কোন অনির্ব্বচনীয় কামনা আছেই। সে কামনা আবার শক্তিলাভ। কালিদাস "কিম্" শব্দের "অনির্ব্বচনীয়" অর্থ আরো স্থানে স্থানে করিয়াছেন।

আরও একটা কথা, দেবতাদের একজন নূতন সেনাপতির দরকার। ব্রহ্মা তারকাসুরকে বর দিয়াছিলেন, তুমি দেবগণের অবধ্য হইবে। সুতরাং সে এখন প্রবল হইয়া দেবতাদের স্বর্গচ্যুত করিয়াছে এবং নানারূপে তাঁহাদের কষ্ট দিতেছে। ব্রহ্মা বলিয়া দিয়াছেন, তোমরা তাহাকে জয় করিতে পারিবে না। মহাদেবের ছেলে হইলে সেই তাহাকে জয় করিতে পারিবে। কিন্তু মহাদেব ধ্যানমগ্ন। তিনি পরঞ্জ্যোতিঃ, আমিও তাঁহার ঋদ্ধি ও তাঁহার প্রভাব ইয়ত্তা করিতে পারি না, বিষ্ণুও পারেন না। সুতরাং আমরা যে তাঁহাকে বুঝাইয়া বিবাহ করাইব, সে ক্ষমতা আমাদের নাই। তবে তিনি উমার রূপে আকৃষ্ট হইতে পারেন। যাহাতে হন, তোমরা তাহাই কর। তিনি আকৃষ্ট হইবেন, বিবাহ করিবেন, তাঁহার ছেলে হইবে, সেই ছেলে তারকাসুরকে বধ করিবে।

এই পার্ব্বতী ও মহাদেবের প্রণয় আমাদের বর্ণনীয় পদার্থ। নারদ একদিন হিমালয়ের বাড়ীতে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার নিকটে পার্ব্বতী রহিয়াছেন। তিনি বলিলেন, এই মেয়েটি মহাদেবের একমাত্র পত্নী হইবেন এবং একদিন তাঁহার অর্দ্ধেক শরীর লাভ করিবেন। এই কথা শুনিয়া হিমালয় আর অন্য বরের চেষ্টা করিলেন না; কিন্তু বড় বিপদে পড়িলেন। তিনি ত আর যাচিয়া কন্যা দিতে পারেন না, তাহাতে আবার মহাদেব কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন, এ সময়ে বিবাহের কথাই হইতে পারে না। তাই তিনি একদিন মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া প্রার্থনা করিলেন আমার এই মেয়েটি আপনার আরাধনা করিবেন, আপনি অনুমতি

করুন। মহাদেব বলিলেন "আচ্ছা" ; কেন, মহাদেব বেশ জানেন যে তাঁহার কিছুতেই চিত্তবিকার হইবে না।

পার্ব্বতী সেই অবধি অনন্যমনে মহাদেবের সেবাশুশ্রূষা করেন, তাঁহার পূজার ফুল তুলিয়া দেন, তাঁহার পূজার যায়গা করিয়া দেন, তাঁহার জল তুলিয়া দেন, তাঁহার কুশ আনিয়া দেন। এই-রূপে নিত্যই তাঁহার সেবা করেন। মহাদেব তাঁহাকে কিরূপভাবে দেখেন সে কথা কবি বলেন নাই ; তবে তিনি বলিয়াছেন যে পার্ব্বতী মহাদেবের মাথায় যে চন্দ্রকলা আছে তাহারই কিরণে আপনার ক্লান্তি দূর করেন। তাহাতে এইমাত্র বুঝায় যে ঐ টুকুই এত সেবার পুরস্কার। মহাদেব তাঁহাকে তাঁহার কপালের চাঁদের জ্যোৎস্নায় বসিতে দেন, তাহাতেই পার্ব্বতী কৃতার্থ।

এইভাবে দিন কাটিতেছে। কিন্তু দেবতাদের দেরী সয় না। তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ইন্দ্র সভা করিয়া মদনকে ডাকিলেন। তাঁহাকে দেবতাদের অবস্থা বুঝাইয়া বলিলেন। বলিলেন, "তুমি একটা বাণ মারিয়া আমাদের রক্ষা কর"। মদন ভাবিলেন কাজটি খুব সোজা—তিনি বসন্তকে ডাকিলেন, রতিকে সঙ্গে লইলেন ও মহাদেবের আশ্রমে গিয়া পঁহুছিলেন। বসন্ত অকালে হিমালয়ে আবির্ভূত হইল। স্থাবর জঙ্গম সব আনন্দিত ও মিলনের আশায় উৎফুল্ল। আশ্রমের বাহিরে ফুল ফুটিল, পশু-পক্ষী জোড় বাঁধিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্নর কিন্নরী গলা মিলাইয়া গান করিতে লাগিল। মহাদেবের গ্রাহ্যও নাই। তিনি যথাসময়ে ধ্যানস্থ হইলেন। নন্দী দেখিলেন, গণেরা বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি একটি আঙ্গুল মুখে তুলিয়া তাহাদের বলিয়া দিলেন "ঠাণ্ডা হও"। অমনি গণেরা চুপ। বসন্তের সব জারি-জুরি ভাঙ্গিয়া গেল। মদনও পিছন হইতে বাণ উঁচাইতেছিলেন। কিন্তু মহাদেবের চেহারা দেখিয়াই তাহার হাত থেকে ধনুক ও বাণ পড়িয়া গেল ; তাহা তিনি টেরও পাইলেন না। তাঁহারও জারিজুরি

সব ভাঙ্গিয়া গেল। এমন সময়ে পার্ব্বতী আসিলেন। মদন লুকাইয়া নন্দীকে এড়াইয়া আশ্রমের মধ্যে ঢুকিয়াছিলেন। বসন্ত তাহাও পারেন নাই। তিনি এখন পার্ব্বতীকে আশ্রয় করিয়া, তাহাকে ফুলের গহনা পরাইয়া, সেই সঙ্গে কোনওরূপে আশ্রমে আসিলেন। পার্ব্বতীও আসিলেন, মহাদেবেরও ধ্যানভঙ্গ হইল। মদনেরও আশা হইল, ভরসা হইল। পার্ব্বতী রীতিমত পূজা করিলেন। তাহার পর একগাছি পদ্মের বিচির মালা লইয়া মহাদেবকে দিতে গেলেন, মহাদেবও হাত বাড়াইয়া লইলেন এবং "অনন্যসাধারণ পতি লাভ কর" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। মদন ভাবিল, মাহেন্দ্রক্ষণ; সে বাণ জুড়িল। মহাদেবের মনের ভিতরে যে মন আছে তাহাতে একটু কেমন কেমন করিয়া উঠিল। তিনি চারিদিকে চাহিলেন। দেখিলেন মদন, তাঁহার ক্রোধ হইল, তাঁহার কপালের চক্ষু হইতে আগুন বাহির হইল, আর অমনি মদন ভস্মসাৎ। মহাদেবের রূপজ মোহ নাই, ইন্দ্রিয়-বিক্ষোভ নাই, তাই তিনি মোহের যিনি কর্ত্তা তাহাকে পুড়াইয়া ফেলিলেন ও সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। তিনি সর্ব্বময়, কোথায় গেলেন কেহই জানিল না।

মদন যখন বাণ ছুঁড়াইয়াছিলেন, তখন পার্ব্বতী মহাদেবের সম্মুখে, সে বাণে তাঁহারও রোমাঞ্চ হইল। তাঁহার লজ্জা আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি মুখ হেট করিয়া নীচের দিকে চাহিয়া রহিলেন। একটু সামলাইয়া উঠিলে তাঁহার বড় দুঃখ হইল, যে বাবার এত বড় আশা ব্যর্থ হইল। তিনি নিজ রূপের উপর ধিক্কার দিতে লাগিলেন এবং শূন্যমনে বাড়ীর দিকে যাইতে লাগিলেন। এমন সময়ে তাঁহার পিতা আসিয়া তাঁহাকে কোলে করিয়া বেগে প্রস্থান করিলেন। সব ফুরাইয়া গেল। হিমালয়ের আশালতা নির্ম্মূল, দেবতাদের আশা নির্ম্মূল। মদন পুড়িয়া ছাই; রতি মূর্চ্ছিত। পার্ব্বতী কিন্তু আশা ছাড়িলেন না।

মহাদেব চোখের উপর মদনকে যখন ভস্ম করিয়া ফেলিলেন,

তখন আর কি আমার দিকে চাহিবেন, এই ভাবিয়া পার্ব্বতী বড় ম্রিয়মাণ হইয়া গেলেন। বৃথা আমার রূপ হইয়াছিল, বলিয়া মনে মনে আপনার উপর তাঁহার বড়ই অবজ্ঞা হইল। আর সকল পথই ত বন্ধ; সুতরাং এখন তপস্যা ছাড়া উপায় নাই। সুতরাং তিনি তপস্যা করিতে সংকল্প করিলেন। মা ত শুনিয়া বারবার বারণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু নিবারণ করিতে পারিলেন না। কেমন করিয়াই বা পারিবেন। জল নিম্নমুখ হইলে তাহার গতি যেমন রোধ করা যায় না, তেমনি যে মনে মনে স্থিরসংকল্প করিয়াছে, তাহারও গতি কেহ রোধ করিতে পারে না।

ক্রমে কথা বাপের কানে পঁহুছিল। তিনি বড় খুসী হইলেন। এত কঠোর না করিলে কি অমন স্বামী পাওয়া যায়। তপস্যায় অনুমতি দিলেন। পার্ব্বতীও তপোবন যাত্রা করিলেন। সেখানে, মাথাপোরা চুল ছিল তাহাতে জটা পড়িয়া গেল, হাতে রুদ্রাক্ষের মালা হইল, ভূমিতে শয্যা হইল। চক্ষের আর সে চঞ্চলভাব রহিল না। নিজেই জল তুলিয়া গাছে দিতে লাগিলেন। হরিণগুলিকে নিজ হাতে খাবার দিয়া বশ করিয়া লইলেন। তিনি যখন স্নান করিয়া, অগ্নিতে আহুতি দিয়া, বাঘছালের উড়ানি পরিয়া, বেদ পড়িতে বসিতেন, ঋষিরাও তাহাকে দেখিতে আসিতেন। ক্রমে তপোবন পবিত্র হইয়া উঠিল, জন্তুরা পরস্পর হিংসা ত্যাগ করিল, অতিথিসেবার জন্য ফলমূল তপোবনেই ফলিতে লাগিল, নূতন খড়ের ঘরে যজ্ঞের অগ্নি জ্বলিতে লাগিল।

ইহাতেও যখন মহাদেবের দয়া হইল না, তখন পার্ব্বতী আরও কঠিন তপস্যা আরম্ভ করিলেন। গ্রীষ্মকাল, মাথার উপর সূর্য্য, চারিদিকে চারিটা আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়া পার্ব্বতী পঞ্চতপা করিলেন। তাহার চোখের কোলে কালি পড়িয়া গেল। উপবাসের পর তাহার পারণা হইত, আকাশের জল আর চন্দ্রের কিরণ। যখন বর্ষা আসিল, নূতন জল পড়িল, তাঁহার শরীর হইতে গরম বাহির হইতে লাগিল। তিনি ঘরে

থাকা বন্ধ করিলেন, আকাশের তলায় পাথরের উপর শয়ন করিয়া থাকিতেন। পৌষ মাসে জলে ডুবিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিতেন। তাঁহার মুখখানি পদ্মের মত জলের উপর ভাসিত। ঝরাপাতা খাইয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারিলেই লোকে মনে করে তপস্যার চরম হইল। কিন্তু পার্ব্বতী তাহাও ছাড়িয়া দিলেন। পাতার এক সংস্কৃত নাম পর্ণ। পাতা খাওয়াও ছাড়িয়া দিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইল অপর্ণা। তপস্বীরাও এত কঠোর করিতে পারেন নাই।

এই অবস্থায় একদিন তাঁহার আশ্রমে একজন জটাধারী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইবার পার্ব্বতীর অগ্নিপরীক্ষা আরম্ভ হইল। জটিলের চেহারাটি খুব ভাল। তিনি আশ্রমে আসিয়া অতিথি হইয়াছেন; পার্ব্বতী ত যতদূর সম্ভব তাহার সৎকার করিলেন। জটিলও জমকাইয়া বসিয়া আরম্ভ করিলেন—আপনি কেমন আছেন? আশ্রমের মঙ্গল ত? গাছপালা বেশ জল পায় ত? ইত্যাদি ইত্যাদি। তোমার এমন রূপ, তুমি এমন রাজার মেয়ে, তুমি তপস্যা কর কেন বল দেখি? কি কোন বরের কামনায়? আমি ত এমন কোন যুবক দেখি না যে তুমি কামনা করিলে, আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া মনে না করিবে। দেবতা চাও, তাহারা ত তোমার বাবার রাজ্যেই বাস করে। তোমায় হয় ত কেহ কোনও প্রকার অবমাননা করিয়াছে, তাই তুমি তপস্যা করিতেছ। তাহাও ত বোধ হয় না; তুমি হিমালয়ের মেয়ে, তোমায় অপমান করিতে পারে এমন কে আছে? যাহাই হউক, তুমি বড়ই কষ্ট পাইতেছ। আমার একটা কথা আছে, শোন, আমার অনেক সঞ্চিত তপস্যা আছে, তাহার অর্দ্ধেক তোমায় দিতেছি, তুমি আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া লও।

জটিল যখন পার্ব্বতীর হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিয়া এইমত কথা সব বলিল, তখন পার্ব্বতী সখীর প্রতি ইঙ্গিত করিলেন, সে সকল কথা বলিল। পার্ব্বতী যে মহাদেবের প্রতি আসক্ত, তাহা সে প্রথম

কথায়ই বলিয়া ফেলিল। বলিল মহাদেবের হুঙ্কারে মদনের যে বাণ ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছিল সে বোধ হয়, ইঁহারই হৃদয়ে বিঁধিয়া আছে। সেই অবধি ইনি বড় উন্মনা হইয়াছেন। কিছুতেই ইঁহার শরীর শীতল হয় না। কিন্নরীরা যখন মহাদেবের চরিত গাহিতে থাকে, তখন ইনি ভাবাবেশে গাইতে পারেন না, ইঁহার গলা ধরিয়া যায়, স্বরস্খলিত হয়, কিন্নরীরা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলে। শেষ রাত্রিতে অনেক বার স্বপ্নে মহাদেবকে পাইয়া "হে নীলকণ্ঠ তুমি কোথায় ?" বলিয়া জাগিয়া উঠেন। তখন দেখা যায়, উঁহার হাত দুটি যেন কাহারও গলা জড়াইয়া আছে। অতি গোপনে নিজের হাতে মহাদেবের ছবি আঁকিয়া তাঁহাকে এই বলিয়া তিরস্কার করেন "তোমায় পণ্ডিতেরা "সর্ব্বগত" বলেন; আমি যে তোমার তরে কাতরা, এটা কি তুমি জানিতে পার না ? ইনি এতকাল তপস্যা করিতেছেন, যে উঁহার হস্তার্জ্জিত গাছেও ফল ধরিল। ইঁহার কিন্তু মনের অভিলাষ পূর্ণ হইল না, হইবার কোনও লক্ষণও দেখা যায় না। কবে যে দেবাদিদেব সখীর প্রতি দয়া করিবেন জানি না। সখীরা আর উঁহার মুখের দিকে চাহিতেও পারে না।

জটিল এই সব কথা শুনিয়া পার্ব্বতীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, এ সব কথা কি সত্য ? না পরিহাস ?

পার্ব্বতী এতক্ষণ স্ফটিকের অক্ষমালা জপিতেছিলেন। এখন মালা ছড়াটী হাতের আগায় রাখিয়া কথা কহিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কথা কিন্তু ফুটিতে চাহে না। অনেক যত্নের পর কয়েকটি মাত্র কথা তাহার মুখ হইতে বাহির হইল। পার্ব্বতী যে, মহাদেবের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী একথা আমরা এতক্ষণ, পরে পরেই শুনিতেছিলাম, আর তাঁহার আচার ব্যবহার দেখিয়া অনুমান করিতেছিলাম। এইবার তাঁহার নিজমুখে তাঁহার মনের কথা শুনিতে পাইব। সেও অতি অল্প কথা। কথাটা কি ? জানিবার জন্য আমরা বড়ই উৎসুক। পার্ব্বতী বলিলেন, "আপনি যাহা শুনিয়াছেন

সবই ঠিক। আমার আশা বড়ই উচ্চ; তাহারই জন্য এ তপ। কারণ—"মনোরথানামগতির্ন বিদ্যতে।"

পার্ব্বতীর মুখে এই যে অনুরাগের কথা শুনিলাম, এরূপ আর কোথাও কেহ শুনিয়াছ কি? ইহাতে চাঞ্চল্য নাই, ইন্দ্রিয়-বিক্ষোভ নাই। ইহকালের কথাও নাই। ইহা স্থির, ধীর, অটল ও অচল প্রণয়। আমি কিছুই নই, আমার আকাঙ্ক্ষা দুরাকাঙ্ক্ষামাত্র। কিন্তু আমার আর উপায় নাই, তাই আমি কঠোর তপস্যা করিতেছি। এই কথায়, কত দৈন্য, কত আত্ম বিসর্জ্জন, মহাদেবের প্রতি কত ভক্তি, কত শ্রদ্ধা ও কত প্রেম প্রকাশ পাইতেছে।

জটিল বলিল মহেশ্বরকে ত আমরা জানি। আবার তুমি তাঁহা-কেই প্রার্থনা করিতেছ। তিনি অমঙ্গলময় ইহা আমি জানি। আমি তোমার কথায় সায় দিতে পারি না। বড় অসদৃশ সম্বন্ধ—তোমার হাতে থাকিবে বিবাহের সূতা আর তাঁর হাতে থাকিবে সাপের বালা। এ দুটা কি খাপ খায়? তুমি খাসা চেলী পরিয়া বিবাহ করিতে যাইবে, আর তাঁর গায়ে হাতীর কাঁচা চামড়া হইতে টাটকা রক্ত পড়িবে। তিনি দেখাইয়া দিলেন, মহাদেবের সঙ্গে পার্ব্বতীর বিবাহ কিছুতেই হইতে পারে না। বলিয়া তিনি মহাদেবের কতই নিন্দা করিতে লাগিলেন। যিনি বাপের মুখে শিবনিন্দা শুনিয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনি অপরিচিতের মুখে এত শিবনিন্দা শুনিয়া সহ্য করিবেন, কখনই সম্ভব নয়। যিনি "আমি শিবের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী" এই কথা কয়টিও কহিতে পারেন নাই, বলিয়াছিলেন "আপনি যাহা শুনিয়াছেন সব সত্য", এখন তাঁহার ভাব অন্যরূপ হইয়া গেল, তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, চক্ষুর কোণ রাঙা হইয়া উঠিল, কোপে তাঁহার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল, মুখে খৈ ফুটিতে লাগিল। তিনি স্থির স্বরে বলিতে লাগিলেন,—তুমি হরকে ঠিক জান না, জানিলে তুমি এমন কথা কেন বলিবে? নির্ব্বোধ লোকে মহাত্মার চরিত্র বুঝিতে পারে না, কারণ তাঁহার চরিত্র সাধারণ লোকের

মত নয়; তাহারা চিন্তা করিয়াও তাঁহার মর্ম্ম বুঝিতে পারে না। এই বলিয়া ক্রমে জটিল মহাদেবের বিরুদ্ধে যত কথা বলিয়াছিল, সমস্ত গুলিই খণ্ডন করিয়া দিলেন। তিনি শেষে বলিলেন, তোমার সহিত বিবাদে আমার প্রয়োজন নাই। তুমি তাঁহাকে যত মন্দ বলিয়া জান, তিনি তাই হোন। কিন্তু আমার মন তাহাতেই পড়িয়াছে, সে আর ফিরিবে না। আমি ইচ্ছায় তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, আমি নিন্দার ভয় করি না।

তাঁহার বাক্য শেষ হইলে তিনি দেখিলেন জটিলের ঠোঁট নড়িতেছে সে আবার কিছু বলিতে চায়। তিনি সখীকে বলিলেন—তুমি উঁহাকে বারণ কর, কারণ যে বড় লোকের নিন্দা করে সেই যে কেবল অপরাধী হয় এমন নহে। উহার কথা যে শোনে সেও তাই হয়। অথবা কথায় কাজ নাই, আমি এখান হইতে সরিয়া যাই।

বলিয়া তিনি যেমন সরিয়া যাইবেন, অমনি মহাদেব নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহার হাত ধরিলেন। পার্ব্বতীর একটি পা উঠিয়াছিল। সেটি সেই ভাবেই রহিল। তিনি ন যযৌ ন তস্থৌ হইয়া রহিলেন, তাঁহার শরীর ঘামে ভিজিয়া গেল ও কাঁপিতে লাগিল। মহাদেব বলিলেন, তুমি তপস্যা করিয়া আমায় কিনিয়াছ, আমি তোমার দাস। পার্ব্বতী যে এত কঠোর করিয়াছিলেন, তিনি সব ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার দেহে যেন নূতন স্ফূর্ত্তি আসিয়া পৌঁছিল।

এই যে প্রণয়, ইহাতে কামগন্ধের লেশও নাই। তাই সুরুতেই কামদেব ভস্ম হইয়া গেলেন। কাম বলিতে "স্পর্শ বিশেষ" বুঝায়; কিন্তু এখানে কাম শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয় মাত্রেই। আমি আমার বাঞ্ছিতকে দেখিতেও চাই না, স্পর্শ করিতে চাই না, তাঁহার স্বর শুনিতেও চাই না, তাঁহার গাত্রগন্ধ আঘ্রাণও করিতে চাই না। চাই শুধু আপনার সব—মনপ্রাণ সব—সমর্পণ করিয়া তাঁহার পূজা করিতে; তিনি আমায় পায়ে রাখেন, এইটি জানিলেই আমি কৃতার্থ;

এই যে অপূর্ব্ব প্রণয়, এ একটা বড় তপস্যা। এই নিঃস্বার্থ প্রণয় লাভ করাও অনেক তপস্যার ফল। তাই পার্ব্বতী কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার মনোরথ সিদ্ধও হইয়াছিল। মহাদেব স্বয়ং তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। পরীক্ষায় জানিয়াছিলেন, পার্ব্বতী কাঁচা সোণা। তাই আপনাকে তাঁহার ক্রীতদাস বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। নিজে উপযাচক হইয়া, ঘটক খুঁজিয়া, তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহের পর মদনকে বাঁচাইয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর দু'জনে মিলিয়া এক হইয়া, গিয়াছিলেন। পার্ব্বতী শিবের অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনী হইয়াছিলেন। আর কাহারও ভাগ্যে তাহা হয় নাই। কোন দেবতারও নয়।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

অন্তর্যামী

মন্দিরে মম হয় না আরতি
বাজে না ঘণ্টা কাঁসি,
বরণের ডালা পঞ্চপ্রদীপ
নাহি সাজ, নাহি হাসি।
সকাল সন্ধ্যা জনতা ভিড়ায়ে
বলিনি মন্ত্র বিনায়ে বিনায়ে,
পাড়া-প্রতিবেশী জটলা পাকায়ে
ফিরেনাকো করি ছল,
দেবতা আমার, নয়নের জলে
পূজি গো চরণতল!

ডাকিনি তোমারে সবে হেলাভরে
দেখায় রক্ত আঁখি,
ঢাকি নাই কিছু রাখি নাই বাকি
সাধ্য কি দিব ফাঁকি!
সকলের কাছে যতটুকু পাই,
তার বেশী দাবী কভু করি নাই,
যত ভালবাসা যত মোর আশা
তোমাতে লভেছে প্রাণ,
গোপনে তোমারে দিছি তা' ফিরায়ে
তুমি যা' করেছ দান!

হৃদয়-রতন, মনের মতন
কথা হয় শুধু কথা,

স্নেহ পরশনি ভুলায় বুলায়ে
যেখানে জাগিছে ব্যথা !
দুঃখেরে তাই করিয়াছি জয়,
শোক বেদনায় করি নাকো ভয়,
তুমি এসে নামি, অন্তরযামী
সবার আড়ালে একা,
তোমার মিলন কাহিনী আমার
নয়নের জলে লেখা !

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ

ছোট গল্প

ওরে বদরি! সত্যেনবাবুকে চা দিতে বল; আর ভূষণবাবুর তাওটা বদলে দে। আর দেখ, যে বাবু এই চিঠীটা এনেছেন তাঁকে পাঁচ টাকা, আর এইটে যিনি এনেছেন তাঁকে দশ টাকা দিয়ে দে; বুঝলি? তারপর সত্যেনবাবু, খবর কি?

খবর ছোট গল্প চাই।

কত ছোট?

এই আন্দাজ তিন চার পৃষ্ঠা।

কেন, এবার ছোট গল্প আসেনি? প্রভাত মুখুযো, খগেন মিত্র, সরোজ ঘোষ, দীনেন্দ্র রায় প্রভৃতির মধ্যে কেউ পাঠান নি?

না। তবে এয়েছে একটা বটে; সেই আমাদের নূতন লোকটি পাঠিয়েছে; কিন্তু সে চল্‌বে না।

কেন, চল্‌বে না কেন?

তার মধ্যে যে 'সুবিধা গ্রহণ'; 'গরম নিঃশ্বাস'; 'ঠাণ্ডা তারা'; 'ঠাণ্ডা জ্যোতি দিচ্চে' প্রভৃতি সব বাঙ্গলা কথা রয়েছে। সে ত আর আপনার কাছে চল্‌বে না। তা ছাড়া গল্পটার শেষ হয়নি। মানে, ক্রমশঃ?

না। তা হ'লে ত ছোট গল্প হ'ল না। গল্পটা এত হঠাৎ থেমে গেছে বা সমাপ্ত হয়েছে যে তাকে শেষ হয়েছে বলা যায় না এবং সে শেষে আর্টও মোটেই নেই।

আচ্ছা আপনি ঐ সেই গল্পটা পড়েছিলেন? ঐ যে কি একটা কাগজে বেরিয়েছিল—কে একজন শর্ম্মা লিখেছিল?

নায়িকা বিধবা; জোর করে তার বিয়ে দেয়, তারপর ফুল-শয্যার রাত্রে সে আত্মহত্যা করে এবং তার স্বামীকেও বিষদান করে। মৃত্যুর পূর্ব্বে তার ভাজকে একখানা চিঠীতে লিখে যায় কেন সে এমন কল্লে? সে চিঠীখানা মনে আছে?

ও বুঝেছি। আপনি "বিধবার প্রতিদান" বলে জাহ্নবীতে যে গল্প বেরিয়েছিল তার কথা বল্‌চেন? সে ত চমৎকার গল্প। তাতে ত আর্টের একেবারে পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে। তিন পাত ত মোটে গল্পটা, তার আবার অর্দ্ধেক কোটেসানে পূর্ণ, তাতে আবার পাঁচ সাতটা character, সব গুলো সমান ফুটেছে। আর চিঠী-খানা ত masterpiece। তবে নীতির বা সমাজের হিসাবে ধর্‌তে গেলে গল্পটা বোধ হয় না-বেরণই উচিত ছিল। নায়িকা প্রভা কুন্দ-নন্দিনীকেও পরাস্ত করেছে।

বিলক্ষণ! তা হলে ত প্রায় সব বড় বড় ফরাসী ও ইংরেজ লেখকের অধিকাংশ গল্পই বেরণ উচিত ছিল না। যাই বলুন প্রকৃ-তির প্রতিশোধ কেউ রদ করতে পারবে না। আর realism এর একটু আদটু touch না থাকলে লেখাও ত যায় না। খাঁটী idealistic লেখা, সে ত দর্শন—life নয়। যাক্‌ আপনি এক কাজ করুন না কেন? সেই ফরাসী গল্পটা বাঙ্গলা করে দিয়ে দিন না কেন?

কোন্‌টা বলুন দেখি ?

সেই যে একদিন সন্ধ্যার সময় সেণ্ট মাইকেলের গিরজায় একটা sexton ঘণ্টা বাজাচ্ছিল ; তার পর একজন সবে মাত্র বিধবা হয়েছে এসে বল্লে, তুমি যদি আমায় সন্তান প্রদান কর্‌তে পার ত তোমায় একশ না কত ফ্রাঙ্ক দেব। তার পর টাকা দিলে না ; তাই নিয়ে মামলা আদালত অবধি গড়াল ; তখনও স্ত্রীলোকটী sextonএর ঔরসজাত শিশু প্রসব করেনি ; উভয় পক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দীতে কোনও কথাই পরিষ্কার হ'ল না দেখে জজ মহা মুস্কিলে পড়্‌লেন—এ মোকদ্দমার বিচার কিরূপে হয়। শেষ মাঝামাঝি রকমের কি একটা নিষ্পত্তি হয়ে গেল ? আপনার মনে পড়চে না ?

খুব পড়চে। কিন্তু সে গল্প কি এদেশে রুচি-সঙ্গত হবে ?

কেন হবে না ? তবে, অবশ্য, সে রকম করে লিখ্‌তে পারা চাই। তেমন delicate handling না হলে জিনিসটা মাটি হয়ে যাবে। তা ছাড়া আরও দেখুন ; মানুষের হৃদয় বলে যে জিনিসটা আছে তার সম্বন্ধে, কি মানব-জীবনের সম্পর্কে কি দেশ কাল পাত্র ভেদে বিচার করা চলে ? আমাদের অর্থাৎ যে কোনও একটি জাতি বিশেষের শাস্ত্র, রীতি ও সংস্কারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে ত আর দুনিয়া পড়ে থাকতে চায় না ; পারেও না। যাক্। যে লেখাটা এসেছে তার প্লট-টা কি ও কি রকমের বলুন দেখি ?

প্লটের রকম ত কিছুই নেই। মানে, প্লটই নেই, তার আর রকম কি থাক্‌বে ?

না, না, আমি বলচি গল্পটা কি ? ট্রাজিডি, না মিলনাত্মক না কি ?

ট্রাজিডিও নয়, মিলনাত্মকও নয়, এমন কি ফার্সও নয়। কেন না লেখার মধ্যে রসিকতার যে একটু আদটু উদ্যম আছে তাতে হাসি আসে না। বরং ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বলা যেতে পারে।

আপনি দেখছি বড় বিপদে ফেল্‌লেন। গল্পের নায়ক-নায়িকা

করতে চায় কি? নায়িকা অবশ্য, কেরোসিন তেল গায়ে ঢেলে পুড়ে মরেনি সেটা বোঝা যাচ্ছে। কেন না আপনি বল্লেন গল্পের শেষ কিছু হয়নি। সুতরাং আফিমও খায়নি, জলেও ডোবেনি, উদ্বন্ধনেও ঝোলেনি। এখন যা হ'ক ভাষা সুধরে কাটাকুটি করে একটা দাঁড় করাতে হবে ত? নায়ক ছোকরা করে কি? পাস্-টাস্ করেছে? বয়েস কত? কবিতা কি গল্প-টল্প লেখে?

বয়েস আন্দাজ তেইশ চব্বিশ হবে। মাঝে একবার আই, এ, ফেল করেছিল। উপস্থিত এম, এ, দিয়ে পিতৃবন্ধুর ওখানে, পুরীতে, বেড়াতে গেছে। সঙ্গে সমবয়সী খুড়তুতো ভাই আছে; তার বিবাহ হয়েছে। যাবার সময় তার স্ত্রী মাথার দিব্যি দিয়ে বলে দিয়েছে, "দেখ ঠাকুর-পো ওঁকে যেন সেখানে বেশী দিন ধরে রেখ না।" উত্তরে নায়ক বলেছেন—"ভয় নেইগো আমি পর্ছছেই তোমার ওনাকে রেজেষ্ট্রী খামে ফিরতি ডাকে পাঠিয়ে দেব।"

বেশ। তার পর?

তার পর সেই পিতৃবন্ধুর এক সমর্থ মেয়ে সেখানে আছে।

বুঝিছি; দেখতে কি রকম সেই মেয়ে?

সেইটে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। রূপ-বর্ণনার মধ্যে কেবল সুন্দর কোঁকড়া চুলের উল্লেখ আছে। বাকি টুকু উপমায় সেরেছেন। ঝরা ফুল; হাতের মধ্যে রাখলে যেমন অঙ্গুলের চাপে ম্লান হয়ে পড়ে, ভাবটা অনেকটা সেই রকম। ফুলটি গোলাপ কি পলাশ; চাঁপা কি টগর; যূঁই কি শেফালি; বেলা কি মল্লিকা; সেটা ঠিক ধরা গেল না। তবে শেষের চারিটির মধ্যে যা হয় একটি হবে; কেন না, মেয়েটি বিধবা এবং শাদা থানই তার দেহ-লতার আবরণ।

বটে? তার পর?

তার পর আর এমন কিছু নয়। মাসখানেক না যেতে যেতে তার অমন সুন্দর কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলি ছোট ছোট করে কেটে ফেল্লে; নিজের হাতে রেঁধে একবেলা করে খেতে লাগল। আর

নায়ক'ও নাকি মেয়েটিকে সমুদ্রের বিজন বিস্তীর্ণ বেলা ভূমির উপর বসে দু'একদিন কাঁদ্‌তে দেখেছিল এবং রকম সকমে বুঝ্‌তে পেরেছিল নায়ককে লুকিয়েই কান্নাটা কাঁদা হয়।

তবে আবার এমন কিছু নয় বল্‌চেন কেন ? এই ত বেশ হচ্চে, তার পর ?

হলে ত বেশই হ'তে পার্‌ত, কিন্তু তাত আর হল না। মানে তার পরই হয়ে গেল; উপসংহারটা কি হ'ল বা হ'তে পার্‌ত, তা ত আর জানা গেলনা কি না। এই কন্নাকাটির ব্যাপার দেখে নায়ক তার ভাইকে নিয়ে রাতারাতি সরে এল; মেয়েটি তখনও ফোঁপাচ্চে। এই হ'ল গল্পের শেষ।

পাগল আর কি! তা ত হ'তে পারে না কিনা। যাহ'ক আপনি কি কর্‌তে চান ? নায়ককে মারতে চান না নায়িকাকে সরাতে চান ? গল্পের ধাঁজটা যে রকম তাতে মিলন হ'তে পারে না। নায়কটা লিটারেচারে এম, এ, দিয়েও কি রকম অসম্ভব ভীরু কাপুরুষ সেটা বুঝচেন ত ?—He is deserting the situation of his own creation সে সম্বন্ধে আর ভুল নেই। এক ওটাকে পাগল করে দেওয়া যেতে পারে, কিম্বা সন্ন্যাসী। আর একটা character থাকলে আপনি না হয় নায়িকার যা হ'ক একটা সুবিধে করে দিতেন তাতে আমার আপত্তি ছিল না। না কি ? ঐ খুড়তুতো ভাইকে জড়াবেন ? ও বেচারীর কিন্তু স্ত্রী রয়েছে যে; complications বেশী বাড়াতে গেলে এদিকে আবার ছোট গল্পের সীমা অতিক্রম করে ? যা হ'ক কি বলেন ? শেষ ত করা চাই।

তা হ'লে নায়ক নায়িকার মিলন ঘটিয়েই শেষ কর্‌তে হয়। নইলে আবার poetic justice অর্থাৎ কাব্য-সঙ্গতি বজায় থাকে না যে।

ওঃ poetic justice ! আপনি যে দেখচি Nahum Tait হয়ে পড়লেন। কি বলেন ভূষণ বাবু, আঁ্যা ?

আমি আর কি বল্‌ব বলুন ?

তবে আর কি ? শুনলেন ত সত্যেন্দ্র বাবু ?

তা ত শুনলাম। উপস্থিত ওসব শুনে ত ফল নেই। এখন গল্পের কি করা যায় ?

করবেন আবার কি ? এই নিন না। দেখুন দেখি, এতে তিনচার পাত হবে না ? আমার বোধ হয় বরং বেশী হবে। তা এর কমে ত আর ছোট গল্প হয় না। তাতে আবার দু'তিনটে ছোট গল্প এক সঙ্গে। আপনি বুঝি ভাবছিলেন আমি আর কি লিখচি ?

তা হ'লেও ত সেই রইল—যথা পূর্ব্বং তথা পরং। গল্পের শেষ ত আর হ'ল না।

তা বেশ এক কাজ করুন ; একখানা চিঠীর অবতারণা করে পাঁচ সাত দশ লাইনের মধ্যে যা হ'ক একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলুন। সেইটেই সবচেয়ে সহজ এবং শীঘ্র হবে। ঐ প্রিণ্টারও আসছে তাগাদা কর্‌তে। কি রমেশ, এই যে হচ্চে, হচ্চে ; আর, দু'দশ মিনিটের মধ্যেই তোমায় কাপি দিচ্চি। নিন সত্যেন্দ্র বাবু সেরে ফেলুন। চিঠীটা নায়িকাই লিখুক ঐ খুড়তুতো ভায়ের স্ত্রীকে। নিন লিখুন দেখি ?

তা লিখছি, কিন্তু আপনিও যেন নিতান্ত সংক্ষেপ করবেন না। খাপছাড়া যেন না হয় ; বলুন।

ভাই বৌ-দিদি,

আপনার দেবরের বিবাহে নিমন্ত্রণ করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা পাইয়াছি, আমার উপর আপনার বড় দয়া। এই ছয় মাসের পত্র ব্যবহারে তাহা বুঝিয়াছি। বিবাহের যৌতুক স্বরূপ বরের জন্য সোনায় বাঁধান এক ছড়া চুলের চেন ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর জন্য সিন্দূরপূর্ণ একটি সুবর্ণ কৌটা পাঠান হইল। আমার সিন্দুর দানের অধিকার নাই, সুতরাং এ উপহার মরি। চেনের সঙ্গে লকেট দিতে হয় আপনি আমার হইয়া একটি উপযুক্ত

লকেট চেনে পরাইয়া দিবেন। একটি সাধ আমার আছে; ইচ্ছা করিলে পূর্ণ করিতে পারেন। দয়া করিয়া তাহা করিবেন কি? আপনার দেবরের সন্তান হইলে তাহার অন্নপ্রাশনে তাহাকে কোলে লইবার ও নামকরণ করিবার ইচ্ছা আছে। যদি সে অধিকার দেন তবে সংবাদ পাইলে তখন যাইব। আশা করি ততদিন জীবিত থাকিব। এখন আমার যাওয়া হইল না। বাবা একলাই যাইতেছেন। শুভপরিণয় নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হ'ক। আপনি আমার প্রণাম জানিবেন। ইতি—

আপনার ভগ্নী অপর্ণা।

পুঃ—এখানে যখন আসেন, আপনার দেবরের একখানি খাতার মধ্যে চোতা কাগজে লেখা এই কবিতাটি ছিল:—

সাধের প্রতিমা, সখি, দূরে দূরে সাজে ভাল;
চেয়োনা পারশে তারে—পরশে সে হবে কাল।
স্মৃতির মন্দির মাঝে,
যে রাজে মধুর সাজে
কেন তারে পেতে কাছে সতত ব্যাকুল, বল?
সাধের প্রতিমা, সখি, দূরে দূরে সাজে ভাল।
অভাব, অমর প্রীতি
মিলনে বিরহ—ভীতি
বিরহ অসহ নহে; মোছ মোছ, আঁখিজল;
চেয়োনা পারশে তারে—পরশে সে হবে কাল!

কবিতাটি আমার এক বান্ধবী হস্তগত করিয়াছেন; তাঁর জানা এক মাসিকপত্রে এটি প্রকাশ করিতে চান। লেখাটি আপনার দেবরের বা অন্য কাহার অথবা কোন বই থেকে তোলা কি না-জানিলে তিনি উটি ছাপাইতে পারিতেছেন না। লেখকের নাম এবং লেখায় তিনি নাম দিতে রাজী কি না যদি অনুগ্রহ করে জানান ত বড় উপকার হয়।

দেখুন দেখি সত্যেন বাবু চল্‌বে ত?

খুব চল্‌বে। চমৎকার হয়েছে।

ভূষণ বাবু, আপনার কি মত?

আমার মত, আর্ট আপনার হাতধরা।

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব

(১৪)

[বৈশাখের নারায়ণের ৬৮০ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি]

ভগবদগীতায় কৃষ্ণজিজ্ঞাসা (৯)

"জীবভূতা পরাপ্রকৃতি।"

আমাদের সকলেরই জীবাভিমান আছে। আর ভাষায় জীব শব্দে চেতনাবান পদার্থ মাত্রকেই বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং আমরা যে জীব শব্দ বাচ্য নই, এমনও বলিতে পারি না। জীব ধাতুর অর্থ প্রাণধারণ, এই ধাত্বর্থের দ্বারাও আমাদের জীবত্ব নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু গীতায় ভগবান যে জীবকে তাঁর পরাপ্রকৃতি কহিয়াছেন, তাহার একটা বিশিষ্ট লক্ষণ বা ধর্ম্ম আছে। সে লক্ষণটি—জগৎধারণ। "যে জীবের দ্বারা আমি এই জগৎকে ধারণ করিয়া আছি, তাহাই আমার পরা প্রকৃতি"—গীতায় ভগবান ইহাই কহিতেছেন।

যাহার দ্বারা ভগবান এই জগতকে ধারণ করিয়া আছেন, তাহার একটি নয়, কিন্তু তিনটি বিশেষ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে :—১ম

জগৎ-ধারণতা; ২য় পরাত্ব; ৩য় জীবত্ব। ভূম্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া অহঙ্কার-তত্ত্ব পর্য্যন্ত ভগবানের অষ্টধা অপরা প্রকৃতি। জীব তাঁর পরা প্রকৃতি। অতএব ভূম্যাদি হইতে অহঙ্কার পর্য্যন্ত যা কিছু এই জীব তাহা হইতে ভিন্ন—"অন্য"। তারপর ভূম্যাদি জগতের উপাদান—এ সকলকে লইয়াই এই জগৎ রচিত। এ সকলের দ্বারাই এই জগৎগ্রথিত। ভূম্যাদি হইতে অহঙ্কার পর্য্যন্ত সকলে একটা বিশাল ও জটিল সম্বন্ধের জালেতে আবদ্ধ। পঞ্চমহাভূত পঞ্চতন্মাত্রার আশ্রিত। কারণ, রূপরসাদিতেই ভূম্যাদির প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা। আবার রূপরসাদি পঞ্চতন্মাত্রা আমাদের চক্ষুরাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের আশ্রিত। এই সকল ইন্দ্রিয়ানুভূতিতেই রূপরসাদির প্রামাণ্য ও প্রতিষ্ঠা। চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয় আপনারাও স্বপ্রতিষ্ঠ নহে। মনের আশ্রয় ব্যতীত ইহারা দর্শনাদি ক্রিয়া সাধন করিতে পারে না। মন আপনি আবার বুদ্ধির আশ্রিত। বুদ্ধি যতক্ষণ না খণ্ড খণ্ড ইন্দ্রিয়ানুভবগুলিকে ধারণ করে, ততক্ষণ মনের মন্তব্য বা বিষয়ের ধ্যান সম্ভব হয় না। এই বুদ্ধি আবার অহঙ্কারের অধীন। আমিত্ববোধ না থাকিলে, কে কাকে দেখে, কে কাকে ধরে, কে কাকেই বা জানে? এইরূপে ভূম্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া অহঙ্কার পর্য্যন্ত সকলে এক বিশাল ও জটিল সম্বন্ধজালে বাঁধা পড়িয়া রহিয়াছে। সম্বন্ধ বলিলেই একাধিক বস্তুর যোগ বুঝি। যোগ বলিলেই যোগ-সূত্রের প্রতিষ্ঠা আবশ্যক হয়। যে সূতা দিয়া বহুসংখ্যক মণি একত্র গাঁথিয়া হার প্রস্তুত হয়, সেই সূতা প্রত্যেকটি মণিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে ছাড়াইয়া, অন্য মণিতে প্রবেশ করিয়া, তবে তাদের মধ্যে হার-রূপ সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করে। কতকগুলি মণি একটা সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াই, হার প্রস্তুত করে। সেইরূপ এই দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া অহঙ্কার বা empirical ego পর্য্যন্ত আমাদের জীবত্বের যত কিছু উপাদান ও আশ্রয়, সকলে একটা সম্বন্ধ-জালেতে বাঁধা রহিয়াছে। কেউ কাউকে ছাড়িয়া নয়। এই

সম্বন্ধ যখন ভাঙ্গিয়া যায়, তখনই আমাদের মৃত্যু হয়। তখন এই দেহের পঞ্চভূতের সঙ্গে পঞ্চতন্মাত্রার, পঞ্চতন্মাত্রার সঙ্গে পঞ্চেন্দ্রিয়ের, পঞ্চেন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের, মনের সঙ্গে বুদ্ধির, বুদ্ধির সঙ্গে অহঙ্কারের বা আমিত্ববোধের—এই যে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ এখন জীবদ্দশায় আছে, তাহা আর থাকে না। এই জন্যই লোকে মৃত্যুকে স্মরণ করাইয়া বলে—

একদিন ত এমন হবে, এ মুখে আর বলবে না,
এ হাতে আর ধরবে না, এ চরণে আর চলবে না॥
নাম ধরে ডাকিবে সবে, শ্রবণে তা শুনবে না।
পুত্রেমিত্রে জগৎচিত্রে নেত্রে নিরখিবে না॥

জীবন বলিতে, এই জন্যই, দেহাদি হইতে আরম্ভ করিয়া অহঙ্কার পর্য্যন্ত আমাদের মধ্যে যা-কিছু আছে, তৎসমুদায়ের একটা বিশিষ্ট সম্বন্ধ বুঝি। এই সম্বন্ধের সমষ্টিই জীব। এই সম্বন্ধ-সমষ্টিতেই আমাদের জীবত্ব। প্রশ্ন এই—এই সম্বন্ধের সূত্র কি? কে আমার দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া অহঙ্কার বা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-বোধ পর্য্যন্ত সমুদায় বস্তুকে ধরিয়া রাখিয়া আমার এই জীবত্বকে সম্ভব করিতেছে? এই প্রশ্নের উত্তরেই গীতায় ভগবান কহিতেছেন:—এ বস্তু তাঁহারই জীবাখ্যা পরা-প্রকৃতি।

আমাদের নিজেদের এই জীবত্ব যেমন একটা সম্বন্ধের সমষ্টি, এই জগৎও সেইরূপ একটা বিশাল সম্বন্ধ সমষ্টি ভিন্ন ত আর কিছুই নহে। স্ব-তন্ত্র, পরিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ ও নিঃসম্পর্ক এই বিশ্বে ত কিছুই খুঁজিয়া পাই না। যাহা কিছু দেখি তাহাই ত রূপরসাদির একটা বিশিষ্ট সম্বন্ধ মাত্র। এই প্রত্যক্ষ জগৎ যে আছে, ইহার প্রমাণ আমাদের অনুভব নয় কি? আর এই অনুভব কিসের? না জগতের রূপরসাদির নয় কি? জড় বলি, উদ্ভিদ বলি, চেতন বলি, জগতের যাবতীয় বস্তু, আমাদের অনুভবের বিষয়রূপেই প্রকাশিত

ও প্রতিষ্ঠিত। আর রূপরসাদির বিশেষ বিশেষ সংযোজন ও বিন্যাসের উপরেই কি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের ব্যষ্টিত্ব বা স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত নয়? রূপের তারতম্য, গন্ধের তারতম্য, স্পর্শের তারতম্য, শব্দের বা ধ্বনির তারতম্য, এ সকলের দ্বারাই ত আমরা এক বস্তুকে অপর বস্তু হইতে পৃথক বলিয়া জানি। ক-নামক পদার্থের রূপরসাদি পরস্পরের সঙ্গে যে ভাবে সম্বন্ধ, খ-নামক পদার্থে এগুলি অন্যভাবে অন্যবিধ সম্বন্ধেতে প্রকাশিত, এই জন্যই ক যে খ নহে, ইহা আমরা বুঝি। আর ক'এর ও খ'এর ভিতরকার সম্বন্ধের দ্বারা যেমন ইহাদের পরস্পরের ব্যষ্টিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য বুঝি; সেইরূপ আবার ইহাদের বাহিরের সম্বন্ধের দ্বারা ক যে খ নয়, ইহাও বুঝি। যেখানে এক বস্তু অপর বস্তু নয় বলি, সেখানেও এই না-'এর ভিতর দিয়াই ইহাদের মধ্যে একটা সম্বন্ধ যে আছে, ইহা প্রত্যক্ষ করি ও স্বীকার করিয়া লই। অতএব সাম্যের দিক দিয়াই দেখি, আর বৈষম্যের দিক দিয়াই দেখি; হাঁ'-এর দিক দিয়াই ধরি আর না'-এর দিক দিয়াই ধরি; যে দিক্ দিয়া, যে ভাবেই এই জগৎকে জানিতে যাই না কেন, একটা বিশাল সম্বন্ধ-জালের প্রত্যক্ষ লাভ করিয়া থাকি। আমাদের নিজেদের আমিত্ব বা ব্যক্তিত্ব যেমন একটা সম্বন্ধের সমষ্টি মাত্র, সেইরূপ আমাদের বাহিরে যাহা কিছু আছে বলিয়া মনে করি, তাহাও একটা বিশাল ও জটিল সম্বন্ধ-সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। কতকগুলি সম্বন্ধের আশ্রয়ে আমাদের ব্যক্তিত্ব ও জগতের জগত্ব উভয়ই প্রতিষ্ঠিত। আর আমাদের নিজেদের আন্তরিক অভিজ্ঞতার আলোচনা করিয়া যেমন এই সম্বন্ধের সূত্র কি, এই জিজ্ঞাসার উদয় হয়; সেইরূপ এই বহির্জগতের যাবতীয় অভিজ্ঞতার ও অনুভবের আলোচনা করিতে যাইয়াই—এই সকল সম্বন্ধের সূত্র কি, সেই একই জিজ্ঞাসারই উদয় হইয়া থাকে। আর এই দ্বিবিধ জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি করিতে যাইয়াই গীতায় ভগবান তাঁর এই জীবাখ্যা পরা-প্রকৃতি-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

আর ভগবান তাঁর এই পরা-প্রকৃতিকে জীবাখ্যা দিলেন এই জন্য যে জীব ধাতুর অর্থ প্রাণ ধারণ। আর প্রাণী মাত্রেই চেতন-লক্ষণযুক্ত। যে বস্তুর দ্বারা এই জগৎধৃত হইয়া রহিয়াছে, তাহা অচেতন জড়বস্তু নহে, কিন্তু সচেতন প্রাণ বস্তু। অর্থাৎ আমাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতাতে সম্বন্ধ-মাত্রেই যেমন আমাদের জ্ঞান-গ্রাহ্য ও জ্ঞানেতে প্রতিষ্ঠিত, সেইরূপ এই বিশ্বের যে বিশাল সম্বন্ধ-জাল তাহাও জ্ঞানগম্য, জ্ঞান্‌প্রতিষ্ঠ। জ্ঞানেতেই এই জগতের প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু কার জ্ঞানে? আমরা যাহাকে আমাদের জ্ঞান বলি,—"আমি জানি" এই প্রত্যয়ের উপরে যে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা, তাহাতে যে এই জগৎ প্রতিষ্ঠিত নয়, ইহা প্রত্যক্ষ কথা। প্রথমতঃ প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা নূতন নূতন বস্তু ও বিষয় জানিতেছি। জ্ঞানমাত্রেই বস্তুতন্ত্র বস্তুর অধীন; বস্তুসাক্ষাৎকারে উৎপন্ন হয়। যাহা এখন জানিতেছি, পূর্ব্বে জানি নাই; তাহাও ত বস্তু, অবস্তু নহে। আর বস্তু হইলেই তাহা আমার জ্ঞানগম্য হইবার পূর্ব্বেও ছিল, আমার জ্ঞান-সীমার বাহিরে গেলেও থাকিবে, কারণ অবস্তু হইতে বস্তুর উৎপত্তি হয় না, হইতেই পারে না। সুতরাং এই জগতের সকল পদার্থ আমার জ্ঞানেতে প্রতিষ্ঠিত নহে, হইতেই পারে না। দ্বিতীয়তঃ আমি ঘুমাইয়া থাকি, তখনও ত এই জগৎ থাকে। তখন ত আর আমার জ্ঞানেতে ইহার স্থিতি হয় না, আমি যে তখন অজ্ঞান। তৃতীয়তঃ যাহাকে "আমি" "আমি" বলিয়া থাকি, যাহা ভূম্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া অহঙ্কারতত্ত্ব পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছে, এই দেহে যার স্থিতি, এই সকল ইন্দ্রিয় যার করণ, দেহেন্দ্রিয়াদির সম্বন্ধেতে যে জড়িত, সেই "আমি" আমার জন্মের পূর্ব্বে ছিল বলিয়া জানি না। মরণের পরপারে থাকিবে কি না, বুঝি না। অথচ আমার জন্মের পূর্ব্বে এই জগৎ ছিল—হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি যুগ ধরিয়া ছিল, আর আমার মৃত্যুর পরেও থাকিবে। সুতরাং আমার

যে জ্ঞান এই আমির বা অহঙ্কারের বা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বা empirical ego'র সঙ্গে জড়িত ও তাহার উপরেই প্রতিষ্ঠিত, সেই আমির জ্ঞানেতে এই বিশ্বের প্রতিষ্ঠা নহে, হইতেই পারে না। এই বিশ্বের প্রতিষ্ঠা কেবল তেমন জ্ঞানেতেই সম্ভব যাহা চিরন্তন, যাহা নিত্য-জাগ্রত, যাহা অনাদি ও যাহা অনন্ত। সেইরূপ জ্ঞানের দ্বারাই কেবল এই জগৎ বিধৃত হইয়া থাকিতে পারে। আর ভগবান গীতায় যাহাকে তাঁর জীবাখ্যা পরাপ্রকৃতি বলিয়াছেন তাহা এই অনাদ্যনন্ত, অখণ্ড ও অদ্বৈত জ্ঞানবস্তু। আমরা নিজেদেরে যে জীব বলিয়া জানি, এই জীব যে তাহা হইতে "অন্য" ইহার কি আর কথা আছে?

তবে ভগবানের এই পরাপ্রকৃতিকে যে জীব বলা হইয়াছে, ইহার অর্থ এই যে জীব বলিতে আমরা যাহা সচরাচর বুঝিয়া থাকি, তাহার সঙ্গে ইহার অনেক সামান্য ধর্ম্ম আছে। এই জগতের জীব সচেতন, ইহার জ্ঞান আছে; কিন্তু কেবল এই জন্যই যে পরাপ্রকৃতিকে জীবাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহা নহে। কারণ এই জ্ঞান-ধর্ম্ম যেমন জীবের আছে, সেইরূপ ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের বা ভগবানেরও ত আছে। সুতরাং এই জ্ঞানসামান্য হইতেই যে ভগবান তাঁর এই পরাপ্রকৃতিকে "জীবভূতাং" বলিয়াছেন, এমন মনে করা যায় না। জীবের সঙ্গে এই পরাপ্রকৃতির অন্য কোনও গুণসামান্য অবশ্যই আছে,—এমন কিছু জীবেতে আছে, যাহা ব্রহ্মেতে বা ঈশ্বরেতে বা ভগবানেতে নাই, কিন্তু তাঁর এই পরাপ্রকৃতির মধ্যে আছে, আর তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ইহাকে জীবাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। সে বস্তুটি কি?

গীতায় ভগবান তাঁর "জীবভূতা" পরাপ্রকৃতির যে মূল লক্ষণটি নির্দ্দেশ করিয়াছেন. তাহারই মধ্যে এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয়। সেই লক্ষণটি—"যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।" যাহার দ্বারা এই জগৎ ধৃত হইয়া আছে। দেখিয়াছি যে এই জগৎ বলিতে আমরা রূপরসাদির সমষ্টি বুঝি। আর রূপরসাদি যে

আছে ইহার প্রমাণ রূপরসাদির জ্ঞান। যার জ্ঞানেতে জগতের নিখিল রূপরসাদির সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত, তাহাই ভগবানের পরাপ্রকৃতি, ইহাই গীতার কথা। কিন্তু রূপের প্রামাণ্য দর্শনে, শব্দের প্রামাণ্য শ্রবণে, গন্ধের প্রামাণ্য আঘ্রাণে, জড়জগতের প্রামাণ্য ও প্রতিষ্ঠা চক্ষুশ্রুতি প্রভৃতিতে। চক্ষুশ্রুতি বলিতে এখানে এই শরীরের দর্শণেন্দ্রিয়াদিকে নির্দ্দেশ করিতেছি না, কিন্তু দর্শনাদির শক্তিকেই নির্দ্দেশ করিতেছি। এ সকল ইন্দ্রিয়কে নহে, কিন্তু তাহাদের গুণাভাসকেই লক্ষ্য করিতেছি। ফলতঃ আমাদেরও চক্ষুর গোলকেই যে রূপ দেখে, বা কর্ণপটহেই যে শব্দ শোনে, তাহা ত নহে; এসকল রূপাদির জ্ঞানলাভের করণ বা যন্ত্র মাত্র। যে দেখে সে চক্ষুর অন্তরালে আছে, সে "চক্ষুষ-শ্চক্ষুঃ"। যে শোনে সে শ্রুতির অন্তরালে আছে—সে যে "শ্রোতস্য শ্রোত্রং"। সুতরাং এই স্থূল জড় চক্ষুরাদি করণের সাহায্য ব্যতীত যে রূপাদির জ্ঞানলাভ অসাধ্য বা অসম্ভব, এমন কথা বলিতে পারি কি? তবে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে স্থূল হউক, সূক্ষ্ম হউক, কোনও না কোনও বিশিষ্ট করণ গ্রহণ না করিয়া, রূপরসাদির জ্ঞান যে সম্ভব ইহাও বলা যায় না। অতএব ভগবান তাঁর যে জীবভূতা পরাপ্রকৃতি দিয়া এই জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন, তাহা যেমন জ্ঞানবস্তু, বা চিদ্বস্তু, সেইরূপ চিদিন্দ্রিয়সম্পন্নও বটে। দেশকালের সীমাতে আবদ্ধ, উপচয়-অপচয়-ধর্ম্মাধীন, জড় উপা-দানে-রচিত চক্ষুরাদি করণ তাঁহার নাই; কিন্তু দেশকালাতীত, উপচয়-অপচয়-ধর্ম্মবিহীন, নিত্যজাগ্রত, রূপরসাদি গ্রহণ-ও-ধারণক্ষম চিদিন্দ্রিয় অবশ্যই আছে। না থাকিলে, এই জগতের রূপরসাদির প্রামাণ্য ও প্রতিষ্ঠা থাকে না। এসকলকে অলীক, মায়িক, স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দিতে হয়। কিন্তু ইহাতেও কেবল মনকেই চোক ঠা'র দেওয়া হয়, মূল সমস্যার মীমাংসা হয় না। কারণ, জগৎ যদি মিথ্যা হয়, এই মিথ্যারই বা উৎপত্তি হইল কোথা হইতে? সত্য হইতে মিথ্যা সম্ভব হয় না, হইতেই পারে না। জগৎ মিথ্যা

হইলে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে—জন্মাদ্যস্য যতঃ বলিয়া জগতের অনাদি-আদি কারণরূপে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয় না। কিন্তু সে কথা এখানে তুলিব না। গীতা জগতকে প্রবাহরূপেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ভগবানের জীবাখ্যা পরাপ্রকৃতি এই জগৎপ্রবাহ ধারণ করিয়া আছেন। কিসের দ্বারা? না তাঁর অনাদিসিদ্ধা, নিত্যপ্রবুদ্ধা স্বাভাবিকী ইন্দ্রিয়-শক্তির দ্বারা। এই প্রশ্নের আর কোনও উত্তর সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। আর কেবল জ্ঞান-সামান্যতা হেতু নহে, কিন্তু জ্ঞানসাধক ইন্দ্রিয়শক্তির সামান্যতা নিবন্ধনও আমাদের সঙ্গে ভগবানের এই পরাপ্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্যহেতুই আমরা যেমন জীব, তাঁহার মধ্যেও সেই জীবধর্ম্ম আছে। এই কারণেই ভগবান তাঁর এই পরাপ্রকৃতিকে "জীবভূতাং" বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্ট করিয়াছেন।

এই জীবভূতা পরাপ্রকৃতির প্রধান লক্ষণ এই যে ইহা এই জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। "যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ"—যাহার দ্বারা এই জগৎ বিধৃত রহিয়াছে, তাহাই আমার পরাপ্রকৃতি। প্রশ্ন উঠে কখন হইতে ধারণ করিয়া আছে? এই জগৎ জন্য বস্তু, ইহা কার্য্য। ইহার পশ্চাতে উপযুক্ত কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। বৃক্ষের মূলে যেমন বীজ থাকে, জগতের মূলে সেইরূপ একটা না একটা জগদ্বীজ অবশ্যই আছে। না থাকিলে, এই জগতের উৎপত্তি হইল কোথা হইতে, কেমনে? বীজ হইতে লতা সকল উৎপন্ন হয়, তার পর সেই লতাকে ধরিয়া রাখে কোনও গাছ বা অন্য কিছু; লতার বীজ এক, আশ্রয় অন্য। এই জগৎ সম্বন্ধেও কি তাহাই বলিব? জগতের বীজ এক; তার আশ্রয় অন্য? আপনার বীজ হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তারপরে ভগবানের পরাপ্রকৃতি তাহাকে ধারণ করিয়াছে? ভগবানের এই জীবভূতা পরাপ্রকৃতি কি জগদুৎপত্তির পরে জগতকে ধরে, না নিত্যকালই তাহাকে ধরিয়া আছে? জগৎকারণ কর্ম্ম কালেতে আরম্ভ হয়, না অনাদিকৃত? ভূম্যাদি অপরা প্রকৃতির

উৎপত্তি কালেতে হয়; এই জন্যই এগুলিকে ভগবান তাঁহার অপরাপ্রকৃতি বলিয়াছেন। কিন্তু যে জীবাখ্যা পরাপ্রকৃতি জগৎ-ধারণ করিয়া আছে, তাহা নিত্য। জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে তাহাই জগদ্বীজকেও ধরিয়া রাখিয়াছিল। এই বীজ বস্তুটি কি? জগতের রূপ যাহাতে নিত্যসিদ্ধ হইয়া আছে, তাহাই ত জগতের বীজ। বটগাছের পরিপূর্ণ ধর্ম্ম ও আকার বটবীজের মধ্যে নিত্যসিদ্ধ। বটগাছের সমগ্র জীবনেতিহাসের অভিনয়টি ঐ ক্ষুদ্রতম বীজের মধ্যে নিত্যসিদ্ধ বা eternally realised হইয়া আছে। সেই নিত্যসিদ্ধ ইতিহাসটিই দেশকালের রঙ্গমঞ্চে তিলে তিলে ফুটিয়া উঠিয়া, বটগাছের পরিণাম বা অভিব্যক্তি সম্ভব ও সাধন করিতেছে। ভগবানের পরাপ্রকৃতি যে জীবতত্ত্ব, তাহাও সেইরূপ সমগ্র বিশ্বের অভিব্যক্তির ইতিহাসটি আপনার মধ্যে নিত্যসিদ্ধ বা eternally realised করিয়া রাখিয়াছে। অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপের অন্তর্গত যে তত্ত্ববস্তু হইতে এই স্থষ্টিধারা প্রবৃত্ত হইতেছে, তাহাই তাঁহার জীবাখ্যা পরাপ্রকৃতি। তাহারই দ্বারা তিনি এই জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। এই জীবাখ্যা পরাপ্রকৃতির মধ্য দিয়াই এই জগৎপ্রবাহের বা স্থষ্টিপ্রবাহের সঙ্গে তাঁর যা-কিছু সম্পর্ক। এই জন্য তাঁর এই জীব-প্রকৃতি পরাপ্রকৃতি হইয়াও তটস্থা, অন্তরঙ্গা নহে। আর এই তটস্থা যে জীবপ্রকৃতি ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই, মনে হয়, গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবানের অবতার-তত্ত্বের অবতারণা হইয়াছে। এই জীবপ্রকৃতিকে না বুঝিলে গীতার অবতারবাদও বুঝা যায় না, আর গীতার যে প্রধান কথা—পুরুষোত্তম-তত্ত্ব, তাহাও ভাল করিয়া ধরিতে পারা যায় না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

রাণী

[কথা-চিত্র]

বিলাত হইতে ফিরিয়া সবই কেমন শূন্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। মনে হইতেছিল যেন এ কোন্ নূতন জগতে আসিলাম। লোকগুলা সবই জানা-জানা, অথচ যেন কেমন একটা কুয়াসায় ঢাকা, কেবল দৃশ্যগুলি চিরপরিচিত ও বৈচিত্র্যবিহীন। সে কুয়াসার যবনিকার ভিতর হইতে জানা-অজানার মাঝে কেমন যেন মনে হইতেছিল; নূতনের সে সজীবতা নাই, সবই কেমন পুরাতন, তিক্ত, বিস্বাদ ও নির্ম্মম।

বিলাতে বিলাতী সাহিত্যের মধ্যে ডুবিয়াছিলাম। ইব্‌সেন্, নিয়েট্‌সে, ও কাংড়ার নূতন সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে মিলাইতে চাহিতাম। বিলাতী জীবনের সঙ্গে বিলাতী সাহিত্যের মিল দেখিতাম না। আমার জীবনকে নিয়েট্‌সের কল্পপন্থা ও ইব্‌সেনের বস্তু-পন্থার দিক দিয়া মিলাইতে চাহিতাম। সাহিত্য-চর্চ্চা করিতাম, নানান রকম খেলায় যোগ দিতাম। জীবনটাকে ভাল করিয়া জীবনের মত করিয়া উপভোগ করিতাম। ভারতের তটের সহিত যেন কোন স্মৃতিই জড়িত ছিল না, কোন ঢেউই সেখানে আছাড়িয়া পড়িত না। তার আর আমার মাঝে সাত সমুদ্র ও তের নদী বহিত।

মাতার অপার স্নেহ কিন্তু সে পারে আসিয়া তেম্‌নি ঢেউ তুলিত, সে কল-কোলাহলের সঙ্গে পিতার স্নেহ-দৃষ্টি ও আশীর্ব্বাদ তেম্‌নি আমার শিরে স্পর্শ করিত।

কিন্তু কোথায় হৃদয়ের নিভৃত কোণে কি এক অব্যক্ত বেদনা লুকাইয়া ছিল, সে ব্যথায় মাঝে মাঝে বুকের ভিতর ঝন্ ঝন্

করিয়া উঠিত। প্রাণ কেমন হইয়া যাইত, অবসাদ আসিত, জীবনটা যেন ব্যর্থ বলিয়া মনে হইত। মা বুঝাইতেন, পিতা চক্ষের সম্মুখে আদর্শ ধরিয়া দিতেন...শাস্ত্র উপদেশ দেখাইতেন, আমার স্বেচ্ছা-চারিতার বিষময় ফল বুঝাইতে চাহিতেন...আমার সেসব ভাল লাগিত না। তাঁহাদের স্নেহের দাম থাকিতে পারে, কিন্তু কথার কোন মূল্যই নাই বলিয়া মনে হইত।...মানুষের জীবন কি পদে পদে শাস্ত্র-উপদেশ দিয়া গণ্ডী টানিয়া চলিবার জন্য...এ কথা আমার ভাল লাগিত না...লাগেও না। পিতা বুঝাইতেন, কাব্য-শিল্প-চর্চ্চায় মানুষ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়; অর্থের প্রতি আকর্ষণ থাকে না, অর্থকরী বিদ্যা না হইলে সে বিদ্যায় কোন সার্থকতা নাই। মনুষ্যজন্মের সার্থকতা শুধু কুবেরের কিঙ্কর হওয়া; সকল বিদ্যা, সকল কর্ত্তব্য, সব ধর্ম্ম ওই যক্ষরাজের চরণে। জীবন ওই খানে উৎসর্গ কর, ওই ত শান্তি, ওই ত তৃপ্তি! বুঝিবা ওই তাঁদের মুক্তি। এত টাকা খরচ করিয়া বিলাত পাঠাইয়া লেখাপড়া আইন শিখাইয়াছি শুধু ওরই জন্য। না হইলে সবই ভস্মে ঘি!

ভাই ভগ্নীরা চিরকালই পর ছিল, তারাও আমার আপনার নয়। আমি ত কাহাকেও আপনার করি নাই। মাঝে মাঝে চিঠী পাইতাম, তাহার উত্তর দিতাম না...মনে হইত ছলনা করা ভাল নয়। তাহারা বলিত, আমি তাদের ভালবাসি না।...বুঝি নিজে-কেই নিজে ভালবাসিতাম না।

বাকী বন্ধুরা: তাঁহারা সেই ষ্টেসনে গাড়ীর ধূমের সঙ্গে সঙ্গে সব স্মৃতি ধোঁয়ার মত বাষ্পাকারে রচনা করিয়া লইয়াছেন। তাঁদের ধার পথেই শোধ হইয়া গেছে।

বৈঠকে ও সভায় আমার স্থান নাই, সেখানে কেবল চশমার আড়ালে সবাই কথার বাচ খেলে।

এক বন্ধন সাহিত্যের...তাও ছিল না। যে দেশে জীবনের সঙ্গে মিল নাই, সে দেশে আবার সাহিত্যের বন্ধন। রসিক বন্ধুদের

কল্পনা ও অনুভূতির চরম সীমা, রবিবাবুর গান, কবিতা, যৌবনের প্রলাপ বার্দ্ধক্যে জীবনের উপর চাপান, আর ধোঁয়ায় নাটকের স্ফূর্ত্তি...রক্তমাংসের ভিতর দিয়া আসল কথা বলিতে যাওয়া, অর্ব্বাচীনতা, সে ত প্রবৃত্তির স্তরের কথা, ও ত বাস্তব ও কিছু না! জীবন শুধু খেলা, ছুটী, আনন্দ...অহোরাত্র চাকায় পেষিত হইয়া জীবনের অস্থি পঞ্জর যে জগন্নাথের রথের তলে পড়িয়া পিষিয়া ধুলায় মরিতেছে, সে সুরের ক্রন্দন তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করে না, সে বাজনা তাদের বুকের তারে বাজে না। সব-হারা-দেশ, যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লইতে অক্ষম, ওই একটু ধোঁয়ার স্ফূর্ত্তিতে জীবনের চরিতার্থতা সাধে, সব-পেয়েছির-দেশের কথা ভাবে, এত জ্বালার, যাতনার ভিতর একটুও ত শান্তি চাই, বটে...হাহা হা!...কাষেই আফিমখোরের মত নেশায় ভোর হইয়া থাক! আয়র্লণ্ডেও তাই কবি য়েটস্ জন্মায়, হৃদয়ের চির আকাঙ্ক্ষার দেশ রচে, জলের ছায়ায় দিশে হারায়, বলে আমরা রূপক রচনা করিতেছি। নাটককার সিন্‌জে জন্মায় রসিকতা করে। ম্যাটার্লিঙ্কের অনুকরণ করিয়া মৌলিকতার পরিচয় দেয়, জীবনকে আনন্দের মত বেশ উপভোগ করে; তাই এদেশের আরাম-কেদারায় রবীন্দ্রনাথ জন্মায়। জীবনের সঙ্গে ত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই, সাধনাও নাই। কবীরের দোঁহা পড়িয়া অসীমকে কুক্ষীতলে চাপা দিয়া সীমা ও অসীমের মাঝে ধোঁয়ার সিঁড়ী তৈয়ারী করে...হাফেজ পড়িয়া গোলাপ রাঙাইয়া তুলে; তাদের আর্ট যে 'দ্রষ্টা' আমির আর্ট : খেয়াল। ইব্‌সেন, নিয়েট্‌সে, কাংড়ার নামে একটু শিহরিয়া উঠিবেন বৈকি! এই সব সাহিত্যিক দলের চাল-চলন দেখিলে, তাহাদের সাহিত্যের ধারা পড়িলে, অত্যন্ত ঘৃণাবোধ হইত। জীবনকে বাদ দিয়া ঝিরঝিরে গতিয়ের মত যারা মুক্তা-শুক্তির ঝালোরের' তলে ঝিঁঝিঁর ডাকে মৌজ হইয়া কাব্য উপভোগ করে, রসের কাজল চোখে টানিয়া দুনিয়াকে রূপের মানসীতে গড়িয়া তুলে...ওদিকে চক্ষের

সম্মুখে জ্বালা, বিস্ফোটক, মড়ক, রক্তারক্তি, হাহাকার, দুর্ভিক্ষ। আর তাহারা বার্দ্ধক্যে যৌবনকে ডাকিয়া আনন্দের মূল্যে দুর্ভিক্ষে দান করে। শীর্ণ বিশীর্ণ কঙ্কালসার নরনারী ও মানবশিশুর ক্ষুধা-বিদ্যুতের রোস্‌নিতে ভাজিয়া বিশ্বহিতের চূড়ান্ত দাবী করে··· ধিক্‌!...তাহাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই!...সত্য যদি নির্ভীক চিত্তে বল তবে তাহা তাদের নিকটে অসভ্য ও ঢিল ছোঁড়ার মত হইবে। তাহারা বলে ছেলেরা যেমন ঢিল ছুঁড়ে, হাঁসকে মারিবার জন্য তাড়া করে, তেমনি কাব্য-সাগর-জলে রাজহংসের মত ছেলেদের ঢিলের ঠ্যালায় মাথা ডুবাইয়া পালাইতে হয়। একবার করিয়া মাথা তুলি ছেলেরা ঢিল ছোঁড়ে, আবার জলের মধ্যে মাথাটা ডুবাই। মাথা বাঁচাইবার আর উপায় নাই। হারে স্ত্রী-ভাবাপন্ন স্ত্রৈণ দেশ, নির্ব্বোধ মেষের দল! ধিক্‌! ধিক্‌!...মানুষ চায় জীবন! আমি চাই জীবন। পুরুষোচিত কণ্ঠে আবাহন! না পারি ছলনা করিব না।...ছলনা করিয়ো না!!

চিত্র ও ভাস্কর্য্য দেখিয়া হাসিয়া মরিতাম...কোথায় বা সাদৃশ্য কোথায় বা বর্ণভঙ্গিমা আর বর্ণিকাভঙ্গ...কোথায়ই বা ভাব আর কোথায়ই বা সাধনা। বরাহমিহির ও শুক্রনীতির পুরাণ ছন্দ তাল লইয়া চাপাইতে চায় এই যুগে। বহু কেমন করিয়া এক হইলেন, রূপে কেমন করিয়া ভেদ আসিল, আরাম কেদারায় বিদ্যুতের পাখার হাওয়ায়, আনারসের সরবতের সঙ্গে এ সব বেশ জানা যায়। তাহারা ত জীবনের সঙ্গে মিলাইবার কোন কারণ দেখে না, বুঝে না যে যুগে যুগে মাপকাঠি মানুষ রচনা করিয়া লয়, তার প্রয়োজন মত। উপনিষদ, বরাহ ও শুক্রের এ কাল নয়, 'বৃক্ষইব স্তব্ধো' বলিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে চলে না। ভাঙ্গা-ভাঙ্গি শুধু ওই অজান্তার আভঙ্গ ও ত্রিভঙ্গ মুরারীর বাঁকা নয়নে নয়, প্রাণের ভাঙ্গা-গড়া আর এক রকম! ইহা তাদের বিকৃত শিল্পী-মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না...তাহারা একদিকে শাস্ত্রের বোঝা ঘাড়ে করিয়া চাপে

চেপ্‌টা হইয়া যায়, পাশ্চাত্য শিল্পের কত খাদ তাই কষ্টিপাথরে দাগ টানিয়া দর কষিতে বসে। এক অচলায়তন ভাঙ্গিয়া, আর এক বিচল-আয়তন করিতেছে, সেখানে বোধ হয় পুরুষ মানুষ কেহ নাই। সেখানে মনু পরাশরের ছাঁদ মারা গিয়া মোগলাই সংস্কৃত হরফে পেশোয়াজের "বাঁকা ছাঁচে" সত্যং জ্ঞানং অনন্তং গড়িয়া উঠি-তেছে, নয় পূর্ব্ব সমুদ্রের দেড় চক্ষুর মাথা হইতে পায়ের দিকে নামিয়া আসা অপূর্ব্ব ছাঁচে নিজেদের 'ওরিয়েণ্ট্যালিসমের' (প্রাচ্যের) শ্রীছাপ অঙ্কিত করিতেছে। জাপানী সীতা, আর ওই দেড় চক্ষুর অনুকরণে গৌরচন্দ্র—তেড়িকাটা বিশ্বামিত্র! কল্পনা আর পরিকল্পনার জ্বালায় প্রাণ অস্থির করিয়া তুলিয়াছে।...হারে হতভাগ্য বাঙলা দেশ! এক বহু হইব বলিয়াই বহু হয় নাই, নিজের মধ্যে ভাব ও রসে সামঞ্জস্য করিতে গিয়া বহু হইয়াছে। সৃষ্টি অত সহজে হয় নাই যে হাতে-পোঁতা সালের বাগানে বসিয়া উপনিষদের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া সাজিয়া গুজিয়া রং করা কাচের ঘরে ব্রহ্মকে ডাকিলাম, আর আমার থানাবাড়ীর রেয়ত অমনি হাজির হইয়া, 'অসতো মা' আরম্ভ করিল।...শুক্রনীতি শিল্প-পুস্তক নয়, তাহাতে যাওবা আছে তা সেই যুগের জ্ঞানের নিক্তিতে ওজন করিয়া তাহারা রচনা করিয়াছিল, তাহাকে কোন সাধারণ জ্ঞান-বিশিষ্ট মানুষ শাস্ত্র বলিয়া প্রামাণ্য খাড়া করিতে পারে না। সে তাহাদের সেই যুগের, সেই সময়ের—এ যুগ সে সামঞ্জস্যে দাঁড়াইয়া নাই। নিজেকে পূর্ণ করিতে গিয়া অবিরাম ভাব, অপূর্ণ ও পূর্ণতার দ্বন্দ্বের মাঝে সৃষ্টি বহু হইয়া উঠিতেছে। তাই হয়...তোমার আমার প্রাণের ভিতর অপূর্ণ ভাব অভাব, নিজে সৃষ্ট হইয়া তাহাই যখন আবার পূর্ণতা লাভ করে, ভাবে ও আকারে, রূপে সামঞ্জস্য করিয়া ফুটিয়া উঠে, তখনই সৃষ্টি হয়। সেই রকমই মহাবিশ্বের স্রষ্টার বুকে ভাব অভাবের পূর্ণতায় সৃষ্টি চলিয়াছে। আগে তা বুঝি নাই, এখন বুঝিয়াছি।...বাঙ্‌লার শিল্পী ভাবে, ছবির ছয় অঙ্গ দোলাইলেই হইল। তারা ভাবে

পুরুষোচিত বাহু না লতাইলে মাংসপেশিগুলাকে অক্ষম হীনবল না করিলে ভোরপূর হয় কি করিয়া...ভাবের দোলা দেয় কেমনে?... ছবির ছয় অঙ্গের কোনটারই সামঞ্জস্য নাই, আছে কেবল অঙ্গের ব্যঙ্গ। অথচ তাহারা ভাবে যে তাহাদের প্রতিভা আছে বলিয়াই, তাহাদের উপর দুনিয়াটা এমন করিয়া চোখ চাহিয়া থাকে, হিংসায় ফাটিয়া মরে...দুর্ভাগ্য শিল্পী বুঝে না যে, একদেশী অনুকরণ প্রতিভাই জগতের শ্রেষ্ঠত্ব নয়।...সামঞ্জস্যই শ্রেষ্ঠতম, মনুষ্যত্ব। সামঞ্জস্য ছাড়া সৃষ্টি হয় না।...মাটি, মা যাকে বুক পাতিয়া আশ্রয় দিলে না, দেশ যাহাকে আপনার বলিয়া বরণ করে না,...তাহার উপর হিংসা করিবার কিছুই নাই...বিদেশী রসে পুষ্ট পরগাছার আদর মাটির খাঁটী ছেলে করে না। সে জানে, এই বাঙলার ঘাসের বনে এমন মানুষও আছে, যে জগতে কাহাকেও হিংসা করে না, শত শত মণি-রত্ন-খচিত বিদেশের হিরণ কিরীটকে হিংসা করা দূরে থাক, তুচ্ছ ধূলি হইতে ধূলি বলিয়া পদতলে দলিয়া যাইতে পারে; ছার মণি কাঞ্চন, আর বিদেশের রত্নময় ভূষণ! সে

'কত রূপ স্নেহ ক'রে দেশের কুক্কুর ধরে
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া...'

হায় শিল্পী! জড় মাটিতেই ফুল ফোটে, স্বপ্ন-ঘুম-ঘোরে, লাল পরী, নীল পরী ও জরদা পরীর ফরদা উড়াইলে, মাটির উপরের জীব হইতে পারে,...মানুষ নয়।...কেহ চিত্রকলার সহিত কাব্যের মিল দেখায়, কেহ দুমুঠি ডালিম ফুলি আর রঙের ধূলি ছড়াইয়া বলে, বিংশ শতাব্দীর বেদ রচনা হইল। আমি তাহার উদ্গাতা, আরসোলাও বলে আমি চকোরপাখী হইলাম, এইবার চাঁদের চুমা খাইব। কেহ বা আবার নিজেকে হরিণের সঙ্গে মিলাইয়া হরিণের গায়ের কালো দাগের খেলায় বিশ্বকর্ম্মার লীলা বুঝায়! আরে মূর্খ, মানুষ যে হরিণ নয়, এটাও কি বুঝিতে হইবে।

দুর্ব্বল দাসসুলভ প্রবৃত্তির ধারে যে নারীর সম্মান অসম্মান লইয়া

খেলা করিতে আসে, তাহারা আবার শ্লীল অশ্লীলের বিচার করে, হিংসায় জ্বলিয়া ভদ্রগৃহস্থের মেয়েকে রসিকতা করিয়া ঢাক পিটাইয়া যে কাব্য জাহির করে, ভাবে দুনিয়া ত আমারি পদতলে, আমিই সেরা গাইয়ে ও বাজনদার, যত ফিঙে, বাবুই, বুল্‌বুল্‌, হাঁড়িচাঁচা, সবার সুরের ধাঁচাই আমার গলায়, আমি গুঞ্জনের মত কাব্যের নাচন-তাল দিতে পারি। বাঙলা সাহিত্যের আঙ্গিনায় সেও নাকি কবি!...ইহাও ছাপে, মাসিক পত্রের সম্পাদক গৌরব করে, কবির কলমের উত্তরাধিকারী হইয়া কবিতার সপিণ্ডকরণ করে। মনুষ্যত্ব-বর্জ্জিত দাসের রাজ্যে স্ত্রীলোকের উপর রসিকতা না চালাইলে, তর্জ্জমার দেশে পুরুষত্ব লাভ হয় কি করিয়া। ছিঃ...কুব্জ-পৃষ্ঠ নত-দেহ, বাঙলার শিল্পী মাথা তুল, সরল হও, নিজের স্বরূপ জান, আপনাকে আঁক, তবে পূর্ণতা আসিবে।

সাহিত্যের বৈঠকে এইসব রসিক সাহিত্যিক বন্ধুরা যাঁরা চশমার ভিতর দিয়া ত্যাড়ছা চোখে এ্যাড়ছা দৃষ্টিদানে রঙের ধোঁয়ায় জাপানী-ফানুষ সাবানের জলে রচে, বাজারে ঘোলের সরবৎ গলায় ঢালিয়া চান্‌কা মারিয়া তান্‌কা গায়, তাহাদের কথায় বঙ্কিমবাবুর অপক্ক কদলীর কথা মনে পড়িত। কত তর্ক উঠিত, তর্ক করিতাম, তাহারা বলিত আমি অশিক্ষিত, অসভ্য, আমার না বুঝিবার ক্ষমতা অসীম। দেশের জীবন ও সাহিত্যের এই চমৎকার মিল দেখিয়া হাসিয়া মরিতাম। যন্ত্রণা হইত...তাহারাও আমার আপনার হইত না, আমি ত তাহাদের মত মন মুখ দু'রকম করিতে পারিতাম না, পারিও না... বাঙলার এ বহুরূপী সাহিত্যের বাজারে আমার স্থান ছিল না, সেখানেও আমার স্থান মিলিত না। ভাবিতাম কূয়ার ব্যাঙ, সমুদ্রের বিশালতা বুঝিব কি করিয়া। এমনি করিয়া জীবনের ধারা বহিতেছিল...শুধু অতৃপ্তি, অশান্তি, জ্বালা।...

স্থান ছিল শুধু বৈঠকে আর...আর এক জায়গায়...সে জ্বালা নিভাইতে চাই, ডুবাইতে চাই, সে তীব্র পিপাসা মিটে না, সাহিত্যের

রসে ডুবিয়াও শান্তি মিলিত না,...হায়! সে মুমূর্ষুর দাহ কি উপশম হইবার। পঙ্কের ভিতর মুখ গুঁজড়াইয়া বেড়াইতাম। বৈঠকের পর চক্ষু রক্তিম করিয়া সকল দুঃখ ভুলিতে চাহিতাম। তারপর বিলাস ..নেশায় বিভোর হইয়া সুখ-স্বপ্নে ভাসিতাম। হো! হো! সুখের কত জ্বালা! সে কি সুখ? না স্বপ্ন?

প্রভাতে বুঝিতাম দীর্ঘনিশা তম অন্ধকারেই কাটাইয়াছি, ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা লইয়া মাংসাশী জীবের মত, ইন্দ্রিয়-চর্চ্চায় কাটিয়াছে,... ক্ষুধিত পাষাণের মত পাষাণেই ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা হাঁ করিয়া থাকিত। সবই জানিতাম, সবই বুঝিতাম, কিন্তু করিব কি,...রাত্রির শূন্যতা কে পূরণ করিবে...যাহারা শূন্য হইয়া আছে, বুঝি বা তাহারাই! সে শূন্যের মাঝে এক একবার কার রূপের আভা আসিত, চাহিতে নয়ন ঝলসিয়া যাইত, বুঝিয়াও বুঝিতাম না...সে যেন জাগিয়া স্বপ্ন!...একা, একা, বড় একা...এত অর্থ, এত বিলাস, কই ভোগের সুখ কই! তৃপ্তি কই, ভোগই বা কই! ভাবিতাম স্পর্শই সুখ, স্পর্শই প্রণয়, স্পর্শই ইন্দ্রিয়ের শেষ তৃপ্তি, কিন্তু সে রূপকে ত ধরিতে পারিতাম না, তৃপ্তিও মিলিত না, স্পর্শের লালসায় প্রাণ জ্বলিয়া মরিত।

সে দিন নেশার অবসাদের পর, কিছু ভাল লাগিতেছিল না। সারা নিশা পানপাত্রে তুফান উঠিয়াছিল, পাত্র ছাপাইয়া ভাসাইয়া গিয়াছিল...সুখ ঢেউ তুলিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছিল কিন্তু শিরে তার দুঃখের জ্বালাময়ী মুকুট...কাঁটার মুকুট মাথায় পরিয়া সুখ যে ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়ায়...সে দিন উদ্বিগ্ন হৃদয়ে অবসাদ-পীড়িত দেহভার লইয়া কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। মনে হইতেছিল, বড় একা, বড় ফাঁকা, সবটাই খালি। সাদাচোখে বারাঙ্গনার অঙ্গনে সে লীলা খেলিতে কেমন মনে হইল। মর্ম্মহীন ইন্দ্রিয়-জ্বালায় প্রাণ জ্বলিয়া মরিতে লাগিল। কোথায় তাহাদের ইন্দ্রিয়, সেত শুধু আমার মাংসের ক্ষুধা তপ্ত পাষাণে, শুখাইয়া জ্বলিয়া

মরে। সে দুঃখের অপেক্ষাও ভীষণ ভয়াবহ। পথে বাহির হইলাম। পথের পর পথ ঘুরিতে লাগিলাম। জনসঙ্ঘ যেন এক তুলিকার বর্ণবৈচিত্রে রঙিন হইয়া মিলাইয়া আছে। আমিও সেই জনস্রোতের সহিত মিশিয়া গেলাম। অসংখ্য অসংখ্য মুখ, অসংখ্য অসংখ্য ভাব।...

সেই কোলাহলময় সাগরলহরীসম নরমুণ্ড দেখিয়া হৃদয়ে এক অদ্ভুত ভাব জাগিতেছিল...বুঝিতে পারিতেছিলাম না, এ অর্থহীন, উদ্দেশ্যবিহীন, কোলাহলের ভিতরে আমার স্থান কোথায়, আমি ত কেবল দ্রষ্টা,...কোথায় স্রষ্টা? তোমার ঠিকানা ত মিলিল না,...আছ কি? না-না-নাই, বিশ্ব-সৃষ্টিতে কোন শৃঙ্খলাই নাই, নাই! দেখিলাম ফলওয়ালা হাঁকিয়া যাইতেছে, দেখিলাম "শিশি বোতল বিক্রীয়ে" হাঁকিতেছে। দেখিলাম শীর্ণ কোটরগতচক্ষু কেরাণীর দল মুখে বিঁড়ির ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে চলিয়াছে, মস্তকের কেশ সে এক অদ্ভুতভাবে ছাঁটা: সারি সারি কাল সাহেবের দল গুম্ফ-শ্মশ্রু বিবর্জ্জিত ফিরিঙ্গী বেশী, ফিরিঙ্গী বাঙ্‌লা মুখের বুলিতে আওড়াইয়া টাইপিষ্টের দল, যেন পৃথিবীর অভিনব জানোয়ার শ্রেণী, সাবান ঘষিয়া ঘষিয়া মুখে খড়ি উড়িতেছে: দেখিলাম মেছ-হাটার ছারপোকা ওয়ালা উকিলের দল আঁচড়া-আঁচড়ী, কামড়া-কামড়ীর পয়সার জন্য কামড়া-কামড়ি করিতে ছুটিতেছে...দেখিলাম শুভ্রবেশপরিহিত ঘড়ি-চেন ঝুলাইয়া গাঁটকাটা ও পকেটকাটার দল ভালমানুষী মুখে মাখাইয়া এধার ওধার করিয়া রাস্তায় বায়ুসেবন করিতেছে, তাহাদের সেই ভালমানুষীর রঙের আড়ালে যে শত শত তীক্ষ্ণধার ছুরীর খেলা চলিতেছে, তাহা সেই মুখখানা দেখিলেই বুঝা যায়। দেখিলাম স্কুলের ছেলের দল চলিয়াছে, কেহ শীস দিতেছে, কেহ অশ্রাব্য ভাষায় পিতামাতার জ্ঞানের পরিচয় দিতেছে। দেখিলাম গাড়ী, ঘোড়া, ট্রাম, মোটার, চলিয়াছে, সবই জনপূর্ণ। এই জনাকীর্ণ সহরের পথে পথে ঘুরিতে লাগিলাম, মন

উদাস লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যবিহীন শুধু চলিয়াছি—চলিয়াছি। দেখিলাম দুর্ব্বল ক্ষত জ্বালায় জর্জ্জরিত, কঙ্কাল অবশেষ গলিত কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত, কাঁপিতে কাঁপিতে ছিন্ন মলিন চীরখণ্ডজড়ান পা টানিতে টানিতে চলিয়াছে। যাহাকে সম্মুখে পাইতেছে তাহারই পানে যাতনা-পীড়িত কাতর আঁখি তুলিয়া চাহিতেছে—যদি শেষ আশার ভরসা-রেখাও কেহ দান করে...সেই রক্তবর্ণ ঘোলাটে চোখের চাহনি... প্রাণ যেন কেমন করিয়া উঠিল। ভাবিলাম চারিদিকেই ত অভাব, কই, সবই যেন কি এক উদ্দেশ্যে চলিতেছে অথচ সে উদ্দেশ্য কেহ জানে না, জানিতে বুঝি চাহেও না। সমস্ত জগতটাই বুঝি কি এক জ্বালার তৃপ্তির জন্য ছুটিতেছে। হায় কোথায় তবে আনন্দ, কিসের খেলা, এই কি তার ছুটী? কার খেলা কার ছুটী...এম্নি করিয়া চলিয়াছি...কে যেন ডাকিল 'রাণী'...রাণী—রাণী...পরক্ষণেই বহুদিনের পুরাণ একখানা ছবি মনে হইল।

অকস্মাৎ মনে হইল রাণীদের বাড়ী যাই। সে যে আমার ছেলে-বেলার খেলুড়ী। রাণী না হইলে আমার দিন কাটিত না, আমার খাওয়া হইত না, ঘুম হইত না, কত খেলাই সেই শৈশবের কোলে দুইজনে খেলিয়াছি। ছেলেবেলার সকল সুখদুঃখ যেন তাহারই সঙ্গে জড়াইয়া আছে, সে যে তখন ছিল আমার ছেলেবেলার রাণী। তার পর সে আজ কতকাল...তাহার সঙ্গে আমার বিবাহের কথা হইয়া-ছিল, তারপর সে হয় নাই...ভাবিলাম হয় ত চিনিবে নয় ত চিনিতে পারিবেই না। বালিকার সেই আকর্ণবিশ্রুত পদ্মপলাশলোচন চারু-ভ্রমরকৃষ্ণ আঁখির পাতা, আর সেই দুষ্টামির হাসি...কোন্ অজ্ঞাত কারণে যে আমাকে সেখানে আমার মন টানিয়া লইয়া গেল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। মনের মুখে শুধু আমার লাগাম ছিল না। ভাবিলাম কেনই সেখানে যাইতেছি। আবার কেমন মনে হইল, ছুটিয়া দ্রুত সেই পথে চলিলাম। ফটকে দ্বারবান কিছু আশ্চর্য্য হইয়া গেল। রুক্ষকেশ ধূলি-ধূসরিত বেশ। ভাবিল এ আবার কে?

একটি ঘরে গিয়া বসিয়া রহিলাম। ছেলেবেলার ছবিগুলো নয়নের সম্মুখে একের পর এক আসিতে লাগিল। স্মৃতির যবনিকা একের পর এক সরিয়া যাইতে লাগিল। তাহাতে কোন শৃঙ্খলা ছিল না; শুধু ভাঙ্গা ভাঙ্গা ছবি আর তার সঙ্গে আমার ভাঙ্গা হৃদয়-তন্ত্রীতে যেন কি এক বেসুরা বাজিতেছিল.. সে সুর আজীবন মিলাইতে যে পারি নাই কেন, তারই আভাস যেন জানাইয়া দিতেছিল। এমন সময় হঠাৎ রাণী আসিয়া আমায় বলিল—"কি সতীশ, কেমন আছিস, এত দিন পরে, ভাল আছিস, বিলেত থেকে ফিরে এসে কতদিন তোকে আসবার জন্যে বলেছিলুম, এদিকে ত একবার আসিস্‌ওনি।" আমার আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল, তাহার স্বরে দীর্ঘ দিনের সেই সুপ্ত রাগিণী গাহিয়া উঠিল। আমি উত্তর দিতে পারিলাম না: মনে মনে কহিলাম...

"হ্যাঁ বাঁচিয়া ত আছি, তুমিও আছ"

আমি শুধু নিঃশব্দে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। সে কত কথাই বলিতে লাগিল, কত কি জিজ্ঞাসা করিল...প্রথম প্রথম তাহার কথা কিছু যেন কানে প্রবেশ করিতেছিল, তাহার ভাবও যেন বুঝিতেছিলাম, তারপর আর কিছু বুঝিতে পারিলাম না। শুধু শুনিতে লাগিলাম...আমি দেখিতেছিলাম সেই রাণী, পুষ্পকুঞ্জের শৈশবের খেলুড়ী, সেই ফুলের পাপড়ির গাঁথনি রাণী!...আজ সিঁতায় সিন্দুর পায়ে অলক্তক, করে শাঁখা,...চক্ষু ঝলসিয়া গেল...কত রমণীমূর্ত্তি হেরিয়াছি, কই এমনতর ত' দেখি নাই, কত কাম কামনার বিলাসিতায় রূপের গরল আকণ্ঠ পান করিয়াছি, যৌবনের পাত্রে রূপ নিঙড়াইয়া পান করিয়াছি, কই এমন রূপ ত কখন দেখি নাই।... কোথায় সেই শৈশবের বালিকা, কোথায় এই তরুণী কিশোরীর রূপ-ভঙ্গিমা, আর কোথায় এই পীনোন্নত উরস, ব্রীড়াচঞ্চল যৌবন... ছয় ঋতুর সর্ব্ব পুষ্পসম্ভার একাধারে কে যেন সাজাইয়া আপন মনে আপনি নিজের রূপে ভোর হইয়া হাসিতেছে। সন্ধ্যা-সূর্য্যের

রক্তিম আলোক বাতায়নের মধ্য দিয়া ঢলিয়া পড়িল। রাণীর মুখের উপর সেই সন্ধ্যারাগ ঝলকিয়া উঠিল, সর্ব্ব দেহের উপর দিয়া রূপের কি এক তরঙ্গ তুলিয়া গেল। ওঃ প্রাণের মধ্যে এক তুমুল ঝঞ্ঝা গর্জ্জিয়া উঠিল, সব যেন তোলপাড় হইয়া গেল!...রূপ! রূপ!... একি রূপ! চক্ষু রহ! রহ!...ওঃ একবার যদি...নাঃ...আরে পতঙ্গ দীপ দেখিলেই কি ঝাঁপ দিতে হইবে!...তারপর সেখান হইতে ছুটিয়া বাহির হইতে ইচ্ছা হইল, পারিলাম না। কি যেন এক জ্বালা, চারিদিকে আগুনের মত আমায় ঘেরিল...ওঃ জ্বালা! জ্বালা! চক্ষে জল আসিল...আরে প্রাণহীন! পোড়া আঁখি যে তোর বহুদিন শুখাইয়া গেছে!...নিজেকে রোধ করিতে পারিলাম না, মনে হইল, ওঃ একটি বার, ওই নয়ন-মন শীতলকারী, প্রাণ-মন মনোহরা মন্মথের স্বপ্নশয্যায়... উঃ একবার...আমি অন্ধ, জগতে আর কিছু চক্ষে রহিল না...শুধু ওই রূপ...সেই রূপে...হো! হো! পাগলের কি কোন জ্ঞান থাকে, মানুষ-ধর্ম্মও তার কোথায় মুছিয়া গেছে...নয়নে শুধু স্পর্শের লালসা...সে কথা বলিতে লাগিল... তাহার বিবাহের কথা, তাহার ছেলেবেলার ছবির কথা, তাহাদের বাগানে কেমন ভাল গোলাপজামের গাছের কথা...আমি শুধু শুনিয়া যাইতে লাগিলাম, শুনিতে শুনিতে মনে হইতেছিল কোথায় যেন, জাগরণে না স্বপনে...এতদিন যে আগুন লইয়া খেলা করিতেছিলাম, তাহা ধবক্ ধবক্ জ্বলিয়া উঠিল...দুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে বক্ষে ধরিতে গেলাম...তাহার অঙ্গের গন্ধ যেন আমার প্রাণ মাতাইয়া তুলিল...সব স্পর্শের আগ্রহ যেন মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিল...কিন্তু সে সরিয়া গেল, তার আঁখির তারকায় কি বিদ্যুৎ, কি অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, মনে হইল একখানা বজ্রাগ্নির তলোয়ার-ধারে আমার হৃদয়টাকে টুক্‌রা করিয়া ফেলিল। পরক্ষণেই শান্ত নির্ম্মল ছলছল অশ্রু-পীড়িত কাতর আঁখি বলিল—

"সতীশ তুই কি পাগল হয়েছিস্"

নতজানু হইয়া অবনত মস্তকে ক্ষমা ভিক্ষা করিলাম। মনে করিয়ো না যে ভয়ে কাপুরুষতায় নতজানু হইয়াছিলাম। তাহা নয় ...অপরাধের জ্ঞানে পুরুষোচিত দর্পে। রাণী আমার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল,

"সতীশ তুই বুঝি কিছু খাস্‌নি, তোর মুখখানা অমন শুখ্‌নো কেন রে" ? দেখিলাম সেই রাণীমূর্ত্তির গণ্ড বহিয়া জলধারা ঝরিয়া পড়িতেছে।...

আমার শুখ্‌নো মুখের কথা আর ত কেহ কখন জিজ্ঞাসা করে নাই। আমার সুখ দুঃখের কথা ত কেহই ভাবে নাই। আমার জন্য ত কেহ চোখের জল ফেলে নাই ! কার' হৃদয় পাই নাই, কার' হৃদয় ত স্পর্শ করি নাই। দূরে ঘুঘু ডাকিয়া উঠিল।...

তারপর বিশ্বের হাটে বাহির হইয়া পড়িলাম, দেখিলাম রাণী ভিতরে রাণী বাহিরে!!! কিন্তু তবু ওঃ...

ক্লান্ত, বড় ক্লান্ত...সন্ধ্যার, অন্ধকারে জীবন যেন ভার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মনে হইল, দূর হোক্ ছাই, বৈঠকেই যাই, আর কিছু না হউক, মদ ত সেখানে মিলিবে। সেখানে ফিরিলাম, সকলেই আনন্দ করিতেছে...কিন্তু কই ! আমার যে কেবল জ্বালা, ওহো ! হো ! সফেণ পানপাত্রে কত কথা বলিতে লাগিল। খানসামা মদ লইয়া আসিল...আবার শুখ্‌না চোখে জল আসিল, জল নাই...চক্ষু হইতে আগুন বাহির হইয়া গেল।

"নেই মাঙ্‌তা যাও"

বলিয়া পানপাত্র ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলাম। পানপাত্র ভাঙিয়া চূর্ণ হইয়া গেল, বুদ্‌বুদ্‌মুখে তরল সুরা হর্ম্ম্যতলে গড়াইয়া গেল। চূর্ণ পানপাত্রের কণায় বিদ্যুতের মত যেন কার চাহনি ঝলক্ দিতেছিল।...

শ্রীঅপরাজিত।

মায়াবতী পথে

[৫]

সন্ধ্যার কিছু পরে আমরা লমগড়-ডাকবাংলায় পৌঁছিলাম। লমগড় আলমোরা হইতে দশ মাইল দূর এবং সমুদ্র-স্তর হইতে ৬৪৫০ ফিট্ উচ্চ। এখানকার ডাকবাংলাটি পূর্ব্বকার ডাকবাংলাগুলির হিসাবে ক্ষুদ্র, কিন্তু অতিশয় পরিচ্ছন্ন এবং সুগঠিত। কাঠগুদাম হইতে পিউড়া পর্য্যন্ত প্রত্যেক ডাকবাংলায় তিনটি করিয়া, এবং আলমোরার ডাকবাংলা দুটিতে চারখানি করিয়া শুইবার ঘর ছিল। কিন্তু লমগড় এবং তৎপরবর্ত্তী ডাকবাংলাগুলিতে দুইটি করিয়া শুইবার ঘর। আলমোরার পর এ পথে যাত্রীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প বলিয়া এদিকের ডাকবাংলাগুলি বড় করিবার কোন প্রয়োজন হয় নাই।

ডাকবাংলায় পৌঁছিয়া পথশ্রান্তি দূর করিবার পূর্ব্বেই চিকিৎসকের কঠিন কর্ত্তব্য পুনরায় আমাদের স্কন্ধের উপর চাপিয়া বসিল। দেখিলাম চারি পাঁচ জন লোক বড় বড় পাত্রহস্তে আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল তাহারা পীড়িত; ঔষধ লইতে আসিয়াছে। এবার কেবল ডাণ্ডিওয়ালা বা কুলি নহে; রোগীগণের মধ্যে দুই তিন জন স্থানীয় অধিবাসীও ছিল। ইহাদের মধ্যে একজন ছিল স্বয়ং বাংলা-রক্ষকের নিকট আত্মীয়। রোগও এবার এক প্রকার নহে—নানা প্রকার। কাহারও মস্তিষ্কের পীড়া, কাহারও জ্বর, কাহারও বা পেটের পীড়া। চিকিৎসাশাস্ত্রের গভীর এবং অভ্রান্ত জ্ঞান আমাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে বলিয়া এতগুলি লোকের বিশ্বাস দেখিয়া মনের মধ্যে সগর্ব্ব আনন্দ অনুভব করা গেল। কিন্তু এই সহজলব্ধ প্রসার কি প্রকারে বজায় থাকিবে সে

বিষয়েও উৎকণ্ঠা কম ছিল না। বিভিন্ন রোগগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়া লইয়া তিনটি ঔষধ নিরূপণ করা গেল। যাহাদের জ্বর বা জ্বর-ভাব আছে তাহাদিগকে একোনাইট দিতে হইবে; যাহাদের মস্তকের পীড়া এবং মাথাধরা তাহাদিগকে বেলেডোনা দিতে হইবে; এবং যাহাদের পেটের অসুখ তাহাদিগকে পলসাটিলা দিতে হইবে।

ঔষধ অন্বেষণ করিতে গিয়া একমাত্র বেলেডোনা ভিন্ন অপর ঔষধগুলির কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। সমস্ত দিনের পরিশ্রান্তির পর সেই সামগ্রীস্তূপের মধ্য হইতে ঔষধ খুঁজিয়া বাহির করিবার মত কাহারও ধৈর্য্য ছিল না, সামর্থ্যও ছিল না; অথচ রোগীগণের সনির্ব্বন্ধ কাতর অনুরোধ অতিক্রম করিবার কোন উপায় ছিল বলিয়া একেবারেই মনে হইল না। তখন নিরুপায় হইয়া বেলে-ডোনা ঔষধের সর্ব্বরোগহারী অত্যাশ্চর্য্য এবং অদ্ভুত গুণের কথা স্মরণ করিয়া প্রত্যেককেই এক ফোঁটা করিয়া প্রয়োগ করা গেল। হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-তন্ত্রে উদরাময়ে বেলেডোনার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। আমার বিনীত অনুরোধ বিচক্ষণ হোমিওপ্যাথগণ এবিষয়ে একবার ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখি-বেন। আমাদের মনে এ বিষয়ে গভীর সন্দেহের কারণ ঘটিয়াছে। কারণ পরদিন প্রত্যুষে দেখা গেল এক এক ফোঁটা বেলেডোনা সেবন করিয়া দুইটি উদরাময়ের রোগী একেবারে রোগমুক্ত হইয়াছে। অবিশ্বাসী বলিবেন, হোমিওপ্যাথি যে বিশ্বাস ভিন্ন আর কিছুই নহে, এ ঘটনা তাহার অকাট্য প্রমাণ। বিশ্বাসী বলিবেন, "বিশ্বাস হোমিও-প্যাথি নহে। মাতৃক্রোড়ে অস্ফুটবাক্ অজ্ঞান শিশু, রোগ-শয্যায় জ্ঞানশূন্য প্রলাপযুক্ত রোগী, তৃণাহারী গো অশ্বাদি পশুগণ, সকলেই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবনে রোগ হইতে মুক্ত হইতেছে। বেলে-ডোনা খাইয়া উদরাময়ের রোগী আরোগ্য হইল, ইহা সত্য হইলেও ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইল না যে প্রদাহ-জনিত রোগে বেলেডোনা কার্য্যকারী নহে। অতএব বেলেডোনার যে সকল গুণ প্রতিষ্ঠিত

এবং নিরূপিত হইয়াছে তাহার মধ্যে একটি হইতেও এ ঘটনার দ্বারা বেলেডোনা বঞ্চিত হইল না।”

বিশ্বাসী আমাকে ক্ষমা করিবেন; এই সম্পর্কে একটি গল্প মনে পড়িয়া গেল, অবিশ্বাসীর জ্ঞাতার্থে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। ভাগলপুরের কোন অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার একটি রোগীকে পুরিয়া করিয়া ঔষধ দিয়াছিলেন। ঔষধ সেবন করিয়া রোগী আরোগ্য লাভ করে। কিছুদিন পরে উক্ত রোগী পুনরায় সেই রোগে আক্রান্ত হয়। রোগীর আত্মীয় পুনরায় ডাক্তারের নিকট হইতে ঔষধ লইতে আসিল। একবার উপকার হইয়াছিল বলিয়া ডাক্তার দ্বিতীয়বারও সেই একই ঔষধ দিলেন। এবার কিন্তু তেমন উপকার হইল না। রোগীর আত্মীয় আসিয়া কহিল, “গতবারে আপনি লাল ঔষধ দিয়াছিলেন তাহাতে রোগ সারিয়া যায়। এবারে সবুজ ঔষধ দিয়া কোন ফল হইল না। আপনি দয়া করিয়া লাল ঔষধই দিন।” ঔষধের বর্ণ ত খড়ির মত সাদা; ডাক্তার লাল ঔষধ ও সবুজ ঔষধের তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে পারেন না। অনেক চিন্তার পর হঠাৎ মনে হইল যে মোড়কের কাগজের বর্ণের কথা বলিতেছে। প্রথমবার লাল কাগজের মোড়কে ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল, দ্বিতীয়বার সবুজ কাগজের মোড়কে দেওয়া হয়। তখন ডাক্তার সেই একই ঔষধ লাল কাগজের মোড়কে ভরিয়া দিলেন। এবার সেবন করা মাত্র রোগমুক্ত হইল। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছিল তিনবারই মোড়কের কাগজশুদ্ধ বাটিয়া রোগী ঔষধ সেবন করিয়াছিল!

প্রত্যুষে চা-পান করিয়া আমরা ডাকবাংলার সম্মুখে আসিয়া বরফ দেখিতে বসিলাম। তখন নব-সূর্য্যের কিরণে তুষারগিরির কিরীটগুলি সবেমাত্র স্বর্ণমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে—নিম্নের অংশ তখনও স্নিগ্ধ নীলাভ। দেখিতে দেখিতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র তুষার উজ্জ্বল রৌপ্যের মত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। অস্তকালের তুলনায় বরফের উপর উদয়-সূর্য্যের ক্রীড়া অপেক্ষাকৃত ক্ষণস্থায়ী এবং

বৈচিত্রহীন। নীলাভ বর্ণ হইতে উজ্জ্বল বর্ণে রূপান্তরিত হইতে প্রাতঃকালে যে সময় লাগে, সন্ধ্যাকালে উজ্জ্বল বর্ণ হইতে নীলাভ বর্ণে পরিণত হইতে তাহার চতুর্গুণ সময় লাগে।

বরফের উপর প্রভাত-সূর্য্যের এই বিচিত্র লীলা অধিকক্ষণ উপভোগ করা আমাদের ভাগ্যে ছিল না। এজেন্সীর চাপ্‌রাশি আসিয়া সংবাদ দিল যে কয়েকদিন পূর্ব্বে ডেপুটি কমিশনার সাহেব বহুসংখ্যক কুলি লইয়া গিয়াছেন বলিয়া পাটোয়ারী আমাদের জন্য কুলি সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। আবার এ সংবাদও পাওয়া গেল যে সম্ভবতঃ ডেপুটি কমিশনার সেই দিনই সন্ধ্যার সময় সদলবলে লমগড় ডাকবাংলায় পৌঁছিবেন। লমগড় হইতে আমাদের নিষ্ক্রান্ত হইবার উপায় যদি না হইয়া উঠে, এবং ডেপুটি কমিশনার যদি সেদিন সন্ধ্যার সময়ে লমগড়ে আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে রাত্রে আমাদের অবস্থা কি হইবে মনে মনে কল্পনা করিয়া আমরা বিচলিত হইয়া উঠিলাম—বরফ ও সূর্য্যকিরণের সমস্ত কাব্য এক মুহূর্ত্তেই অন্তর্হিত হইল। পাবলিকওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের নিয়মানুযায়ী ডাকবাংলায় সরকারী কর্ম্মচারীর অধিকার সকলের উপরে। সন্ধ্যার সময় ডেপুটি কমিশনার আসিয়া যদি ডাকবাংলা মুক্ত করিয়া দিবার জন্য আমাদিগকে তিন ঘণ্টার নোটিস্ দিয়া বসেন, তাহা হইলে তখন হয় বচসা, নয় তরুতল এই দুইয়ের মধ্যে একটি অবলম্বন করিতে হইবে। ভাবিয়া দেখা গেল ইহার মধ্যে একটিও তৃপ্তিপ্রদ বোধ হইবে না। উভয় পক্ষের ভদ্রতায় যদি মাঝামাঝি একটা রফা হয়—তাহাতেও আমাদের সুবিধা হইবে না, কারণ একটি ঘরে আমাদের সঙ্কুলান হওয়া সম্ভবপর নহে। অতএব কোন প্রকারে সন্ধ্যার সময় পরবর্ত্তী ষ্টেজ মোরনালায় পৌঁছাইতে পারিলেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়। অন্ততঃ তিনচারখানি ডাণ্ডি ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বহন করিবার মত কুলি যাহাতে সংগ্রহ হয় সেজন্য এজেন্সীর চাপ্‌রাশিকে পাটোয়ারীর নিকট পুনরায় পাঠান হইল। বিশেষভাবে

অর্থের লোভ এবং অনর্থের ভয় দেখাইয়া চাপ্‌রাশিকে তৎপর করিবার চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই, কিন্তু দণ্ড বা পুরস্কারের মাত্রা যতই অধিক করা যাক্ না কেন, লোক না থাকিলে লোক সংগ্রহ করা অসাধ্য ব্যাপার।

বেলা ১টার সময় যে কয়েকটি কুলি সংগ্রহ হইল তাহাতে দেখা গেল নিতান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী, অর্থাৎ রাত্রের জন্য আহার এবং শয়নের ব্যবস্থা কোন প্রকারে যাইতে পারে। শাস্ত্রে আছে "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।" আমরা অর্দ্ধেকের অনেক অধিক ত্যাগ করিয়া মোরনালা যাত্রা করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম। লমগড় হইতে মোরনালা সাড়ে আট মাইল পথ। এ পথটুকু হাঁটিয়া যাইতে সকলেই, এমন কি মহিলাগণও প্রস্তুত হইলেন। শুধু যে বাধ্য হইয়া, তাহা নহে; এ বিষয়ে অনেকের বিশেষ উৎসাহ এবং আনন্দ দেখা গেল। আমাদের দলের অন্যতম শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন কয়েক দিন হইতে দুঃখ করিতেছিলেন যে ডাণ্ডিতে পথ অতিক্রম করিয়া, দুইবেলা যথারীতি আহারাদি করিতে করিতে এবং প্রতি রাত্রে ডাকবাংলার আরামপ্রদ কামরায় দীর্ঘ এবং গভীর নিদ্রা উপভোগ করিতে করিতে হিমালয় ভ্রমণ করা মঞ্জুরই নহে। দুই চার দিন যদি তরুতল-বাস এবং দুই তিন বেলা যদি উপবাস করিতে না হইল, এবং সকলের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যদি সম্পূর্ণরূপে অবিকৃত এবং অভগ্ন রহিল তবে হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশে প্রবেশ করিয়া কি এমন পরমার্থ লাভ হইল। আজ একচটি হাঁটিয়া যাওয়া হইবে শুনিয়া শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বিশেষ উৎসাহভরে মশাল প্রস্তুত করাইতে বসিয়া গেলেন। মোরনালা পৌঁছিবার পূর্ব্বে পথে অন্ধকার হইয়া গেলে এগুলি কাজে লাগিবে।

বেলা তিনটার সময়ে আমরা মোরনালা রওয়ানা হইলাম। আমাদের সঙ্গে মাত্র একখানি ডাণ্ডি রহিল—কাহারও বিশেষ প্রয়োজন বোধ হইলে ব্যবহার করা চলিবে। কিন্তু প্রায় অর্দ্ধেক পথ

অতিক্রম করার পরও কাহারও ডাণ্ডি ব্যবহার করিবার মত কোন লক্ষণ বা আগ্রহ প্রকাশ পাইল না। এমন কি আমরা যাঁহাদের জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠিত এবং চিন্তিত হইয়াছিলাম সেই মহিলাগণ প্রায় অর্দ্ধ মাইল আমাদের আগে আগেই চলিয়াছিলেন! সম্মুখে এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত থাকিতে, ইচ্ছা থাকিলেও ডাণ্ডিতে উঠিবার মত কাহারও নিলর্জ্জতা ছিল না। তাহা ছাড়া ক্লান্তি ও বিরক্তির প্রতিষেধকস্বরূপ প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য এবং স্নিগ্ধশীতল সমীরণ ত' ছিলই।

কিন্তু অর্দ্ধপথে পৌঁছিয়া যে সংবাদ পাওয়া গেল তাহাতে আমাদের চক্ষুস্থির হইল। মোরনালার ডাকবাংলা আমাদের জন্য স্থির করিবার জন্য আমাদের রওয়ানা হইবার দুই তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে মোরনালায় লোক পাঠান হইয়াছিল। সে আসিয়া জানাইল, ডাকবাংলা পাওয়া যাইবে না; একটি গোরা সাহেব আসিয়া বাংলা দখল করিয়াছেন, এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁহার সহচর আরও দুই-একজনের আসিবার কথা আছে। সে রাত্রে তাঁহারা সেখানেই থাকিবেন। বাংলা-রক্ষকের পরামর্শ—একদিন পরে যাওয়াই কর্ত্তব্য।

তখন বেলা প্রায় পাঁচটা—সন্ধ্যা হইতে অধিক বিলম্ব নাই। ঘোরতর সমস্যার মধ্যে পড়া গেল। যাহা অধিকার করিতে যাইতেছিলাম তাহা অধিকৃত হইয়া গিয়াছে, এবং যাহার অধিকার ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি তাহা সম্ভবতঃ এতক্ষণে অধিকৃত হইয়া গেল। অগ্রসর হইলেও বিপদ, প্রত্যাবর্ত্তনেরও উপায় নাই। নূতন বন্দোবস্তের পূর্ব্বে পুরাতনকে যাহারা ইস্তফা দিয়া বসে, তাহাদের অবস্থা এমনই হয়! দুইটি প্রাচীন প্রবচন বহুদিন হইতে জানা আছে; রচনার মধ্যে, শিক্ষার ছলে এবং আরও নানাপ্রকারে বহুবার তাহা ব্যবহার এবং প্রয়োগ করা গিয়াছে। কিন্তু একদিন যে সে দুটি পাশাপাশি দৃঢ়বদ্ধ হইয়া আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে এমন নিদারুণ ভাবে প্রযুক্ত হইবে তাহা জানিতাম না। এই কঠিন জীবন-

সংগ্রামের দিনে অবিবেচনার ফলে "ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ" বহুবার হইতে হইয়াছে, এবং এই সংসার-অরণ্যে মাঝে মাঝে এমন অজ্ঞাত এবং অনিরূপেয় স্থলে গিয়া পড়া গিয়াছে, যেখানে কিছুক্ষণের জন্য "ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থা ভোগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু এতাবৎ একদিনও এমন গুরুতর ভাবে ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ হইয়া এমন দীর্ঘকাল ধরিয়া ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা ভোগ করিতে হয় নাই!

ললিতবাবু বলিলেন, "বেশ হয়েছে, তবু একটা দিন একটু এ্যাড্‌ভেঞ্চর্ হ'ল। আগুন জ্বেলে ওভারকোট জড়িয়ে গাছতলায় রাত্রি কাটান যাবে; আর মেয়েদের জন্য গাছের ডাল ভেঙ্গে আর গায়ের কাপড় দিয়ে তাঁবু করে দেওয়া যাবে।"

ললিতবাবু বালক নন; বালকের প্রৌঢ় পিতা। তথাপি তাঁহার কথা অমৃতম্ বালভাষিতম্ মনে করিয়া তাহার মাধুর্য্য গ্রহণ করা গেল, তাহার যুক্তি গ্রহণ করা গেল না। সেই প্রখর শীতের রাত্রে বাঘ ভাল্লুকের দৃষ্টি এবং লিপ্সার বিষয়ীভূত হইয়া সমস্ত রাত্রি গাছতলায় বসিয়া অ্যাড্‌ভেঞ্চর * করিবার ঔৎসুক্য কাহারও প্রকাশ পাইল না। যেখানে আমরা এই দুঃসংবাদ পাইলাম, দৈবযোগে ঠিক সেইখানেই একজন সাহেবের দুইখানি বাড়ী ছিল। কুলিরা বলিল, তন্মধ্যে একটি বাড়ী খালি আছে, রাত্রের মত সেখানি অধিকার করিতে না পারিলে বিপদ। গত্যন্তর নাই দেখিয়া তখন সেই চেষ্টাই করিতে হইল। শ্রীমান্ চিররঞ্জন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন এবং আমরা, সাহেব স্বীকৃত হইয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিতে আসিলে কি বলিয়া আপ্যায়িত করিব, মনে মনে তাহাই আওড়াইতে লাগিলাম। ভারতবর্ষের জল, হাওয়া এবং মাটি বহুসহস্র বৎসর ধরিয়া পুরুষানুক্রমে যাহাদের রক্তমাংস এবং হাড়ের উপর ক্রিয়া করিয়াছে, দেহের সহিত তাহাদের মনও এমন এক বিচিত্র

* অ্যাড্‌ভেঞ্চারের বাঙ্গলা প্রতিশব্দ 'অসমসাহসিক কর্ম্ম'।

ভঙ্গীতে বিকাশ লাভ করিয়াছে যাহার সহিত জগতের অপরাপর অঞ্চলের মনস্তত্ত্ব কোনমতে খাপ খায় না। তাহারা যেমন শীঘ্র বিশ্বাস করে তেমনি সহজে আশ্বাস পায়! অধিকার করার চেয়ে আশ্রয় পাওয়া সহজ এবং সুবিধার, আশ্রয় পাইয়া পাইয়া সে ধারণা তাহাদের বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। আবার অপরপক্ষে অধিকার করিয়া করিয়া তাহাদের মন এমনই কঠোর হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহারা আশ্রয় দেওয়াকে প্রশ্রয় দেওয়া, এবং আশ্রয় চাওয়াকে অপমানিত হওয়া মনে করে। তাই তাহাদের দেশে শীতের রাত্রে দরিদ্র পথিককে গৃহস্থের দরজার সম্মুখেও বরফ চাপা পড়িয়া মরিতে শুনা যায়।

প্রায় মিনিট দশেক অপেক্ষার পর দেখা গেল শ্রীমান চিররঞ্জন আসিতেছেন এবং তাঁহার সহিত একটি বৃদ্ধ শীর্ণদেহ সাহেব আসিতেছেন। মন্থর গতি দেখিয়াই গতিক মন্দ বুঝা গেল। তথাপি সাহেবের পায়ে বাতের বেদনাও থাকিতে পারে মনে করিয়া আশায় নির্ভর করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা গেল।

সাহেব আসিয়া আমাদিগকে অভিবাদন করিলেন এবং এত জিনিসপত্র এবং মহিলাদের লইয়া পূর্ব্বে মোরনালা ডাকবাংলা স্থির না করিয়া অর্দ্ধপথ চলিয়া আসিয়াছি এ অবিমৃষ্যকারিতার জন্য আমাদিগকে স্নেহসূচক মৃদুমধুর ভর্ৎসনা করিলেন।

আমরা কহিলাম, সাহেব যে কথা বলিতেছেন তাহা সত্য। কিন্তু এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্যই সাহেবের নিকট আমাদিগকে উপস্থিত হইতে হইয়াছে। ডাকবাংলা পূর্ব্বাহ্নে অধিকৃত করিয়া রাখিলে এ সকল কথার কোন প্রয়োজন বা সার্থকতা থাকিত না, অতএব দেখা যাইতেছে আমাদের অবিমৃষ্যকারিতা এবং সাহেবের নিকট আশ্রয় চাওয়া এ দুইটা পরস্পর বিরোধী নহে বরং বিশেষভাবে দৃঢ়সম্বন্ধ। সে হিসাবে সাহেব যে কথা বলিতেছেন তাহা সত্য হইলেও অবাস্তর।

উত্তরে সাহেব বলিলেন যে, সে রাত্রে আমাদিগকে অতিথিরূপে লাভ করিতে পারিলে তিনি যৎপরোনাস্তি সুখীই হইতেন। কিন্তু আমাদেরই হিতার্থে সে সুখ হইতে বঞ্চিত হওয়াই তিনি সমীচীন মনে করিতেছেন, কারণ পথের মাঝখানে পরদিন কুলি সংগ্রহ করা কঠিন হইবে; তখন আমরা এক বিপদ সামলাইতে গিয়া আর এক বিপদের মধ্যে পড়িব। তদপেক্ষা বরাবর মোরনালা চলিয়া যাওয়া ভাল। সেখানে ইয়োরোপীয়ান আছেন। মহিলাদের দেখিয়া তাঁহারা নিশ্চয়ই একটা ঘর ছাড়িয়া দিবেন। অতএব রাত্রি হইয়া আসিতেছে, সময় নষ্ট না করিয়া রওয়ানা হওয়াই কর্ত্তব্য।

স্নেহ জিনিসটা সংসারে দুর্লভ, এবং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিও সংসারে প্রচুর পাওয়া যায় না। সেই জন্য অকারণ অতিরিক্ত মাত্রায় কাহাকেও স্নেহশীল এবং হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া উঠিতে দেখিলে মনের মধ্যে খট্‌কা বাধে। এত গভীর ভাবে সাহেব আমাদের হিতাহিত বিবেচনা করিতেছেন দেখিয়া আমাদের মনের মধ্যে গভীর সন্দেহের উদয় হইল। প্রকাশ্যে কহা গেল যে, একবার অবিবেচনার কাজ করিয়াছি বলিয়াই সাহেব যেন মনে না করেন যে হিতাহিত জ্ঞান আমাদের একবারেই নাই। আজ রাত্রে গাছতলায় বাসের সম্ভাবনা এবং কাল প্রাতে যথেষ্ট কুলি না পাওয়ার আশঙ্কা এ দুইটার মধ্যে কোন্‌টা অধিকতর আপত্তিজনক সেটা যে আমরা একেবারে বুঝি না তাহা নহে। আমাদের দ্রব্যাদি বরাবর মোরনালায় চলিয়া যাইতে পারে এবং প্রাতে আমরা পদব্রজে মোরনালায় চলিয়া যাইতে পারি। তাহা হইলে কুলির প্রয়োজনই হইবে না। আমাদের শয্যা প্রভৃতি বহন করিবার মত আমাদের যথেষ্ট ভৃত্য আছে। তাহা ছাড়া সাহেব যেন মনে না করেন কাল প্রাতে আমরা শুধু ধন্যবাদ দিয়া প্রস্থান করিব। এক রাত্রের জন্য যে ভাড়া সাহেব চাহিবেন তাহাও আমরা ধন্যবাদেরই সহিত প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি।

কথামালায় ব্যাঘ্র ও মেষশাবকের গল্পে জানা গিয়াছিল যে দুরাত্মার ছলের অসদ্ভাব নাই। এ ক্ষেত্রেও দেখা গেল যে হিতৈষী ব্যক্তির ভাবনার অন্ত নাই। সাহেব বলিলেন, সেই রাত্রে তাঁহার কয়েকজন বন্ধুর আগমনের সম্ভাবনা আছে। আমাদের আশ্রয় দেওয়ার পর তাহারা আসিয়া পড়িলে আমাদের বিশেষ অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা। অতএব ইত্যাদি।

এ হিতৈষী ব্যক্তির নিকট হইতে মুক্তি পাওয়াই যে পরম লাভ, সে বিষয়ে আমাদের আর অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না। ভদ্র ভাষা ও ভদ্র ভঙ্গীর সাহায্যে যে মানুষ এমন—থাক্ আর সে সকল কথায় কাজ নাই। মনে মনে সাহেবকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মোরনালা অভিমুখে অগ্রসর হওয়া গেল। ডাকবাংলায় সাহেবের সহিত আলাপ্‌টা কিরূপ ভাবে জমিবে তাহা পরখ করিবার জন্য শ্রীমান চিররঞ্জন অশ্বপৃষ্ঠে অগ্রগামী হইলেন। এখানে যে ব্যবহারটা একটু ভিন্ন প্রকৃতির হইতে পারে সে বিষয়ে এই মাত্র ভরসা ছিল যে শুনা গিয়াছিল এ ব্যক্তি সৈনিক কর্ম্মচারী। গোরার আচরণ আর যেরূপই হউক সাধারণতঃ সরল হইয়া থাকে। বুঝিবার এবং বুঝাইবার বিষয়ে সেখানে কোন প্রকার গোল হয় না—যাহা কিছু ঘটে খুব স্পষ্ট স্পষ্ট এবং নিঃসন্দেহরূপেই ঘটিতে দেখা যায়।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যা হইয়া গেল এবং সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ঘন অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেদিন শুক্ল সপ্তমী হইলেও সেই নিবিড় অরণ্য ভেদ করিয়া চন্দ্রকিরণ আসিবার পথ ছিল না; কাজে কাজেই কয়েকটি মশাল জ্বালিতে হইল। মশালের উজ্জ্বল আলোকে চতুর্দ্দিকের অন্ধকার আরও দুর্ভেদ্য এবং ঘন হইয়া উঠিল এবং আলোকদীপ্ত বৃক্ষলতার উপর অতগুলি প্রাণীর দীর্ঘ এবং গতিশীল ছায়া পড়িয়া এক বিচিত্র এবং ভয়াবহ দৃশ্যের সৃষ্টি করিল। মশাল জ্বালিয়া, দল বাঁধিয়া, পদদলিত বৃক্ষপত্রের এক বিচিত্র খস্‌মস্ শব্দ করিতে করিতে যাওয়ার মধ্যে বেশ

একটু অভিনবত্ব এবং আনন্দ পাওয়া যাইতেছিল! মশালের উজ্জ্বল আলোক এবং অরণ্যের নিবিড় অন্ধকার এই দুইটি বিরুদ্ধ রেখার সন্নিপাতে আমাদের দৃশ্যটি এমন একটি অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়াছিল যে মনে হইতেছিল না যে আমাদের অভিযানের একমাত্র উদ্দেশ্য মোরনালা-ডাকবাংলার একখানি ঘর অধিকার করা।

কি কারণে বলা কঠিন, আমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও শ্রবণ এবং দৃষ্টিশক্তি সহসা অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়িয়া উঠিল। তাঁহারা পদে পদে নানাপ্রকার আকৃতি এবং শব্দ দেখিতে এবং শুনিতে লাগিলেন। ললিতবাবুর ঘ্রাণশক্তি এমনই প্রখর হইয়া উঠিল যে, বাঘের গন্ধ তাঁহার নাসিকায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গ্রহণ করিবার উপক্রম করিল। শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ তাঁহার আসামে বাঘ শিকারের অভিজ্ঞতার অধিকারে এমন সকল লক্ষণ দেখাইতে লাগিলেন যে, প্রতিমুহূর্ত্তেই আমাদের মনে হইতে লাগিল যে ভীষণ গর্জ্জন করিয়া একটা বৃহৎ ব্যাঘ্র আমাদের মধ্যে লাফাইয়া পড়ে! নিরস্ত্র হইয়া বাঘকে ভয় করে না এমন দুঃসাহসী আমাদের মধ্যে কেহও ছিলেন না; কিন্তু, কি কারণে তাহা বলিতে পারি না, ললিতবাবু ও সতীন্দ্রনাথ যতই বাঘের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে লাগিলেন, আমাদের মনে ততই ভয়ের অংশ কমিয়া কৌতুকের অংশ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল!

এইরূপে প্রায় দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বন ছাড়িয়া আমরা মুক্ত স্থানে উপনীত হইলাম। এখান হইতে ডাকবাংলা পূরা এক মাইলও বোধ হয় নহে। কিন্তু পথের এই অংশটুকু এত ভয়ানক চড়াই যে লমগড় হইতে এ পর্য্যন্ত আসিতে আমরা যত না পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, এই পথটুকু অতিক্রম করিতে তদপেক্ষা অধিক পরিশ্রম ও কষ্ট হইল। রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় আমরা মোরনালার ডাকবাংলায় পৌঁছিলাম।

ডাকবাংলায় পৌঁছিয়া অবগত হইলাম যে সাহেব মাত্র একজন। আর যাহাদের আসিবার কথা ছিল তাহারা আসে নাই। কিন্তু তাহাতে

বিশেষ কিছু আসে যায় না—লোক যদি ভদ্র হয় তাহা হইলে পাঁচ-জনেও কোন ক্ষতি হয় না; তাহা না হইলে একজনেই যথেষ্ট। সেই জন্য একজন শুনিয়াও আমাদের উৎকণ্ঠা বিশেষ কমে নাই। কিন্তু যাহা দেখিলাম তাহাতে মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত আশঙ্কা এবং সঙ্কোচ অন্তর্হিত হইয়া আমাদের মন শরৎকালের নির্ম্মল আকাশের মত প্রসন্ন হইয়া উঠিল। সেই অল্প সময়ের মধ্যেই চিররঞ্জনের সহিত সাহেব যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং শীতের রাত্রে মহিলা-গণ পদব্রজে আসিতেছেন শুনিয়া নিজ কক্ষে ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালাইয়া ও চায়ের জন্য জল গরম করাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা পৌঁছিবামাত্র সাহেব কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আমাদের সহিত পরিচিত হইলেন, এবং কহিলেন যে আমাদের কোন প্রকারে অসুবিধা হইবে না। দুইটির মধ্যে একটি ঘরে মহিলারা থাকিবেন; অপর ঘরটিতে আমরা পুরুষেরা থাকিব। এমন কি আমরা যদি প্রয়োজন মনে করি, তিনি তাঁহার ঘর একেবারেই ছাড়িয়া দিয়া বারাণ্ডায় থাকিতে পারেন।

সংসারে মনুষ্য-চরিত্রের বৈচিত্র্যের সীমা নাই! একজন যথেষ্ট স্থান থাকা সত্ত্বেও বলে, বন্ধু আসিবে, স্থান হইবে না; আর এক জন নিজেকে বঞ্চিত করিয়া অপরকে স্থান দিতে প্রস্তুত! এই গোরা সাহেবটির নাম লেফ্‌টেনাণ্ট্ জনষ্টন্ পীক্, ইনি আমাদের সহিত যে ব্যবহার করিলেন, একজন ভদ্রলোকের পক্ষে তাহা যে বিশেষ কিছু অদ্ভুত এবং অসাধারণ ব্যাপার তাহা বলি না। কিন্তু এই অভদ্রতা এবং স্বার্থপরতার দিনে সহজ ভদ্রতাই আদর্শ হইয়া উঠিয়াছে। নাকে ঘুসী, এবং প্লীহায় লাথি না মারিলেই আজিকার দিনে ভদ্র। সে হিসাবে লেফ্‌টেনাণ্ট্ পীকের ভদ্রতাকে আদর্শ এবং অসাধারণ ভদ্রতা নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে।

লেফ্‌টেনাণ্ট্ পীকের প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিবার আছে। আমাদের যতটুকু অভিজ্ঞতা তাহাতে সাধারণতঃ ইহাই দেখিয়াছি জানি-

য়াছি এবং শুনিয়াছি যে সিভিল কর্ম্মচারীর হিসাবে ইংরাজ সৈনিক কর্ম্মচারীকে অধিকমাত্রায় এবং অধিক সংখ্যায় ভদ্র এবং উদার হইতে দেখা যায়। ইহার কারণ কি, তাহা ঠিক বলিতে পারি না, এবং সে বিষয়ে আলোচনা করিবারও উপস্থিত ক্ষেত্রে প্রয়োজন নাই। কিন্তু কথাটা যে সত্য, তাহা আমি কেবলমাত্র লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ পীকের উদার ভদ্র এবং সরল ব্যবহারের উপর নির্ভর করিয়াই বলিতেছি না। লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ পীক্‌ এ সত্যের প্রমাণ নহেন, উদাহরণ মাত্র।

লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ পীক্‌ আমাদের সহিত নানা বিষয়ে গল্প আরম্ভ করিলেন, তাহার মধ্যে যুদ্ধই প্রধান। ইঁহাকেও যুদ্ধে যাইবার জন্য আদেশ হইয়াছে। দুই তিন দিন পরে ইঁহাকেও আলমোরা হইতে যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিতে হইবে। যুদ্ধ সম্বন্ধে ইঁহার মত—উপস্থিত সময়ে জার্ম্মাণী প্রবল হইয়া উঠিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু অবশেষে জার্ম্মাণীকে যে হারিতে হইবে তাহাও নিঃসন্দেহ। খবরের কাগজের সংবাদের উপর ইঁহার আস্থা দেখিলাম না।

নানা প্রকার গল্পে ও কথাবার্ত্তায় প্রায় দশটা বাজিয়া গেল। আমাদের আহার্য্যও ততক্ষণে প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল। আহারাদি সমাপন করিয়া আমরা নিজ নিজ স্থানে শয্যা গ্রহণ করিলাম।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

কলঙ্কিণী

সখি, মিছে কর মোরে দোষী;
রাধা রাধা বলে ডেকে ডেকে সদা পাগল হয়েছে বাঁশী;
তোমাদেরি মত রহি গৃহমাঝে
ভুলিয়া থাকিতে শত শত কাজে

মনে করি সখি, তোমাদেরি মত জল লয়ে ফিরে আসি,
পারি না থাকিতে গৃহমাঝে আর সাধিয়া বাজিলে বাঁশী।

সখি, কি জানি মোহিনী আছে;
কুঞ্জ মাঝারে, ফুকারি ফুকারি যখন বাঁশরী বাজে,
কোন মতে আর পাসরিতে নারি
কুল লাজ মান সব ডোর ছিঁড়ি,
আকুলি ব্যাকুলি ছুটে প্রাণ ওলো কোথা সে কাননে আছে,
গৃহ ঘর দ্বার, সরূপ সংসার, মনে হয় সখি মিছে।

সখি তোমরাও যদি শোন,
পরাণ মাতান কি সে বাঁশী-ধ্বনি, হৃদি মন বিমোহন!
কেন কলঙ্কী হয়েছে লো রাধা
তোমরাও সখি বুঝিবে সে কথা
বুঝিবে রাধার নিশিদিন কেন প্রাণ এত উচাটন,
বহি কলঙ্ক-পসরা এমন সকলি ত্যজেছে কেন?

সখি, সকলি বুঝেছি মনে;
তবু হয়ে যাই পাগলিনী-প্রায় মধুর মুরলী তানে;
অনলেও ওলো মিছে অকারণ
কত পতঙ্গ স'পে ত জীবন;
আমিও মজেছি, মরিব সজনি, বাঁশরীর ধ্বনি শুনে,
কি হবে সজনি কুল লাজ মানে, কি কাজ এ ছার প্রাণে!

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা।

নারায়ণ

মাসিক পত্র।
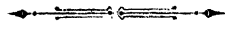
সম্পাদক

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ।

দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা

শ্রাবণ, ১৩২৩ সাল।

সূচী।

নারায়ণ

২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা] [শ্রাবণ, ১৩২৩ সাল

মহাধ্যান

বিরহের মহাধ্যানে আজি গো রয়েছে রাই,
বঁধুর কেমন রূপ কি বা গুণ মনে নাই!
কবে কে আছিল কাছে, কবে কে গিয়েছে দূরে,
কি গান গায়িত বাঁশী, কি নাম ফুটিত সুরে,
কি নাম আছিল কার, কে ভালবাসিত কারে,
ধরার সকল স্মৃতি ডুবিয়াছে একেবারে!
কাহার তনয়া বালা, কেবা ছিল পতি তার,
কাহারে বাসিতে ভাল কলঙ্ক করিল সার,
দেখিল কাহার মুখে বিশ্বের মাধুরী যত,
কাহার চরণ দুটি সেবিল দাসীর মত,
কান্ত-ভাবে কার প্রেমে রস-সিন্ধু উথলিল,
মনে নাহি পড়ে কারে আপনারে সঁপি দিল।
বিশ্ব দৃশ্য গেল টুটি, লুকাইল চিত্ত মন,
স্বামিত্ব-আমিত্ব-লয়ে ধ্যান আজি সমাপন।

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

ধ্যানভঙ্গ

ধ্যান-ভঙ্গে দেখে রাই—বঁধু-রূপ বিশ্ব-রূপ,
ঝলমল করে তাহে নদ নদী সিন্ধু কূপ!
নহে নর, নহে নারী, নহে স্বামী, দাসী নয়,
নর নারী, স্বামী দাসী, সবার ভিতরে রয়।
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে আনন্দ-অমিয়া ঝরে,
সে যে রে পিরীতি সার কি চেতনে কি বা জড়ে।
অণু পরমাণু মাঝে আকর্ষণ রূপে রয়,
জীবের হৃদয় মাঝে সে যে রে কামনা হয়।
পিতা নন্দ, মা যশোদা, সখী বৃন্দা, সখা দাম,
নিজে রাই,—বহু ভাবে একি প্রেম পরিণাম।
যেই কৃষ্ণ সেই রাধা, রাধাকৃষ্ণ কোথা আর?
রন্ধ্র ওষ্ঠ সম্মিলনে বাজে বাঁশী বার বার।
প্রাণ দিয়ে শোনে রাই—বাজিছে পিরীতি-বাঁশী,
গোপ-গোপী শশী রবি, যমুনা যেতেছে ভাসি।

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

বঙ্গদেশীয় মহাকাব্য

ইউরোপের যবন আদিকবি সুপ্রসিদ্ধ হোমার প্রকৃতই বাল্মীকি ব্যাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যরচয়িতাগণের সমকক্ষ, কিন্তু তাঁহার কাব্য-রচনাপ্রণালী যে ভারতবর্ষীয় মহাকবিগণের প্রণালী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ইহা চিন্তাশীল কোন মহাপুরুষই স্বীকার করিবেন না। হোমারের ইলিয়ড্ ও অডিসিতে গুণের ভাগই অধিক, দোষের ভাগ যৎসামান্য; অন্ধ হোমার যে আমাদেরও আরাধ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার অনুকরণে রোমের প্রসিদ্ধ কবি ভার্জিল ইলিয়াড্ রচনা করিয়া অসামান্য কবিযশঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইতালির যশস্বী কবি দান্তে, ইংলণ্ডের মিল্টন, পর্ত্তুগালের ডিকামিরন্ প্রভৃতি ইউরোপের মহাকবিগণ হোমারের প্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করিয়া সাহিত্য-শৃঙ্গের উচ্চ স্তরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই আমাদের প্রণম্য, আমাদের মহাসমাদরের পাত্র। কিন্তু ইউরোপের মহাকাব্যরচনার প্রণালীতে এমন কি সৌন্দর্য্য আছে যে বঙ্গদেশীয় মহাকবিগণ বাল্মীকি প্রদর্শিত প্রণালীর অবহেলা করিয়া বিদেশী প্রণালী গ্রহণ করিবেন। আমাদের অনুকরণ-প্রবৃত্তি অস্বাভাবিক না হইলেও, মাত্রায় বড়ই বেশী। আমরা অনুকরণ করিতে বড়ই ভালবাসি। বস্তুতঃ হোমার, ভার্জিল, দান্তে, মিল্টন প্রভৃতির যশঃসৌরভে উন্মত্তপ্রায় হইয়া বঙ্গদেশীয় মহাকবিগণ অনুকরণ-প্রবৃত্তিকে আদৌ সংযত করিবার চেষ্টা করেন নাই; তাঁহারা বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, ভারবী, মাঘ ও শ্রীহর্ষের প্রদর্শিত আমাদের নিজস্ব পথের উপেক্ষা করিতে সঙ্কুচিত হন নাই।

ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবি লর্ড বাইরণ লিখিয়াছেন—

"Most Epic-poets plunge "in media's res,"
"Horace makes it the heroic turnpike road,

"And these your hero tells, whene'er you please,
"What went before by way of episode,
"While seated after dinner at his ease,
"Besides his mistress in some soft abode
"Palace or garden, paradise or cavern,
"Which serves the happy couple for a tavern,
"This is the usual method, but not mine,
"My way is to begin from the beginning;
"The regularity of my design
"Forbids all wandering as the worst of sinning—
Don Juan, Canto I—6, 7.

লর্ড বাইরণ যাহা লিখিয়াছেন তাহার ভাল-মন্দর বিচার আলঙ্কারিকেরা করিবেন। সাহিত্যে সুরুচি ও কুরুচির বিচার সাধারণ লোকের উপর অর্পণ করিলে সমূহ বিভ্রাটের সম্ভাবনা। অনেক সময়েই কুরুচির অযথা আদর দেখিতে পাওয়া যায়। অশিক্ষিত সমাজে কুরুচির আদরও আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু ইউরোপীয় অলঙ্কারে হোরেসের (Horace) প্রদর্শিত নিয়মাবলীতে নিমজ্জিত হইয়া যাঁহারা বিভোর হইয়া আছেন, তাহাদের সহিত বিচারযুদ্ধে নিযুক্ত হওয়াও সুকঠিন। বর্ত্তমান বিষয়ে ভট্টাচার্য্যমহাশয়গণের বিচারের আসরে বাক্‌যুদ্ধে বা হস্তযুদ্ধে যোগদান করিবার অবকাশ হইবে না; তাহাদের সহিত আমাদের মতের বিভিন্নতার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু হোরেসের মতে অনুপ্রাণিত সাহিত্যিকদিগকে ভয় করি। বিচারের আসরে সত্যাসত্যের বড় একটা জ্ঞান থাকে না, এই ভয় আমাদের গুরুতর। বিশেষতঃ একদিকে ইউরোপীয় সুসভ্যসমাজের রীতি, অপরদিকে প্রতীচ্য ভূভাগের পুরাতন রীতি; সুতরাং বিতণ্ডাও ব্যক্তিগত হইবে না।

হোমারের ইলিয়ড্ ট্রয়যুদ্ধের আরম্ভ হইতে আরম্ভ হয় নাই। সর্গ ও প্রতিসর্গ, মুখ ও প্রতিমুখ, ভারতবর্ষীয় পুরাণাদির ও নাট-

কাব্যির মার্গ; ইউরোপীয় মহাকাব্যের নহে। হোমার ট্রয়যুদ্ধের প্রায় মাঝামাঝির বর্ণনা "ইলিয়ডে" আরম্ভ করিলেন। গ্রীস দেশের পুরাতন ভাষা, হোমারের ভাষা, আমাদের প্রায়ই Greek (গ্রীক) অর্থাৎ দুর্বোধ্য। তজ্জন্য আমরা ইংরাজি অনুবাদ দিতে বাধ্য হইলাম।—

"Of Peleus' son, Achilles, sing, O, Muse,
"The vengeance, deep and deadly; whence to Greece
"Unnumbered ills arose; which many a sad
Of mighty warriors to the viewless shades
Untimely sent;" ইত্যাদি। *Derby*—Book I.

এই সূচনা পাঠ করিয়া মনে হইবে যে মহাকবি একিলেসের ক্রোধের ফলাফল সম্বন্ধে কাব্য লিখিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে। ইলিয়ডে ট্রয়যুদ্ধের আংশিক বিবরণ লিখিত হইতেছে। মহারথীর ক্রোধ ঐ বহুবার্ষিকী যুদ্ধের একটি অঙ্গমাত্র। ইলিয়ডের অনেক অংশেই এই ভীষণ বিরাগের ফল বিবৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু ট্রয়যুদ্ধের ইতিহাস সমস্ত ইলিয়ডে ছড়ান আছে; কষ্টে সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

মহাকবি হোমারের অডিসিও ইউরোপের একখানি প্রধান ও গণ্য কাব্য। ইহাতে ইথেকা দ্বীপের রাজা ইউলিসিসের (অডি-সিয়সের) ট্রয়যুদ্ধের অবসানের পর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে। এই মহাকাব্যেও চতুর্বিংশতি সর্গের নবম সর্গ হইতে উপাখ্যান আরম্ভ এবং উপাখ্যানের অধিকাংশই নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ সর্গে অডিসিয়স স্বমুখে ফিনিসিয়ার রাজা আলকাইনসের মন্দিরে ভোজের পর ভোজের স্থানেই প্রকাশ করেন। ভোজ শেষ হইল, অনেক কথাবার্ত্তা হইল, তাহার পর রাজা আলকাইনস জিজ্ঞাসা করিলেন—

"But come now, tell me this and tell me true—

Where thou hast wandered, to what lands hast gone,
And of the well-built cities fair to view,
And of the tribes of men whom thou hast known."
Worsley's Odyssey—Book VIII, 77.

তখন অডিসিয়স ট্রয় ত্যাগের পর হইতে তাহার সমুদ্রযাত্রার, দেশ দেশান্তরের, বিপত্তির বৃত্তান্ত উপাখ্যান ছলে বলিলেন। বলিতে বলিতে রাত্রি শেষ হইয়া থাকিবে। সত্যসত্যই কবি বাইরণ বলিয়াছেন—

What went before by way of episode,
While seated after dinner at his ease.

ট্রয়ের দ্বাদশবার্ষিক যুদ্ধের অবসান হইলে ও রাজন্যশ্রেষ্ঠ প্রায়ামের রাজ্য ও রাজধানী লয় প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার সুযোগ্য বংশধর ইনিয়াস্ সদলবলে দেশ ত্যাগ করিয়া অর্ণবপোতে ইতালি প্রদেশে আগমনের নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। সাত বৎসরকাল অর্ণববানে বহুবিধ বিপত্তি ও ক্লেশ সহ্য করিয়া রাজপুত্র আফ্রিকার উত্তর প্রদেশে সাগরসনাথ টায়ারদেশীয়দিগের উপনিবেশ কার্থেজে আনীত হইলেন। কার্থেজের রাণী ডাইডো তাঁহার সমুচিত অভ্যর্থনা করিলেন। তথায় রাত্রিকালে যোগ্য ভোজ হইল। বিধিবৎ সুরাপানের ও বিবিধ কথাবার্ত্তার পর রাণী ইনিয়াসকে ট্রয়যুদ্ধের শেষ বৃত্তান্ত ও গ্রীকযবনদিগের শঠতা এবং তাঁহার সপ্তবার্ষিকী জল ও স্থলপথের ভ্রমণের ইতিহাস জিজ্ঞাসা করিলেন। ইনিয়সও সেই সময়ে সুদীর্ঘ ইতিহাসের আবৃত্তি করিলেন। মহাকবি ভার্জিলের ইলিয়ড্ মহাকাব্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্গে এই সুদীর্ঘকালের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে।

এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ইংলণ্ডের মহাকবি মিল্টন তাঁহার "পারাডাইস্ লষ্ট" মহাকাব্যের মধ্যস্থানে দেবদূতদিগের যুদ্ধের বর্ণনা করিয়াছেন এবং আধুনিক বঙ্গের মহাকবি মধুসূদনও ইউরোপীয়

মহাকবিদিগের অনুকরণে লঙ্কায় রামরাবণের যুদ্ধের মধ্যভাগ হইতে—বীরবাহুর পতনকাল হইতে—কাব্যারম্ভ করিয়া পরে পঞ্চবটী ও সীতা-হরণ বৃত্তান্ত ও মহাযুদ্ধের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাসের উপন্যাস অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রকাশ করিয়াছেন। কবিগুরু বাল্মীকির পদাম্বুজে প্রণাম করিয়াও তাঁহার প্রদর্শিত পন্থার—আশিয়াভূভাগের চিরপ্রচলিত পন্থার উপেক্ষা করিয়া ইউরোপীয় রীতি অবলম্বন করিতে মধুসূদন কুণ্ঠিত হন নাই। বস্তুতঃ ইউরোপীয় মহাকাব্যসমূহই মধুসূদনের আদর্শ; হেক্টরবধ প্রণেতার হোমারই আদর্শ হওয়া সম্ভব। মধুসূদন গ্রীস দেশের ভাষার যবন (Ionian) শাখায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন কি না জানি না; মূল ইলিয়ড্ ও অডিসি পড়িয়াছিলেন কি না জানি না। ভার্জিল ও দান্তে লাটিন বা ইতালিয়ানে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন কি না তাহাও আমাদের অজ্ঞাত। কিন্তু ইংরাজী কবি ড্রাইডেন ও পোপের অনুবাদ নিশ্চয়ই তিনি ভাল করিয়া পড়িয়াছিলেন। মিণ্টনে তিনি নিশ্চয়ই বেশ প্রবেশ করিয়াছিলেন। বাল্মীকির রামায়ণে ব্যাসের মহাভারতে কালিদাসের কুমারসম্ভব বা রঘুবংশে তাহার প্রবেশ ছিল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সে সকল অদ্বিতীয় মহাকাব্যের উপর তাহার বিশেষ আদর ছিল না। বেবিলনের মহাকাব্য ইস্তার ও ইজডুভেল তাঁহার সময়ে ভূগর্ভ হইতে প্রকাশিত ও অনুবাদিত হয় নাই। পারস্য-মহাকবি ফারদৌসির সাহানামা তখনও ইংরাজী বা বাঙ্গলায় অনুবাদিত হয় নাই। মধুসূদন বাল্যাবধি ইংরাজী পাঠে নিবিষ্ট ছিলেন; তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষীয় কেন, প্রাচ্য সকল বিষয়েই কৃতবিদ্য যুবকদিগের অনাদর ছিল। সুতরাং ইউরোপীয় মহাকাব্যের রীতি অবলম্বন মধুসূদনের পক্ষে সময়োচিত জ্ঞান হইয়া থাকিবে।

বেবিলনের মহাকাব্যের ইস্তার ও ইজডুভেলের সম্যক গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায় নাই, পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহের বিষয়। সার্ অসটিন হেনরি লেয়ার্ড (Sir Austin Henry Layard) ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে আসিরিয়ার গ্রন্থাগারের আবিষ্কার করেন। তাহার

প্রায় দশ বৎসর পরে সার্ হেনরী রলিনসন্ (Sir Henry Rawlinson) আরও অনেক গ্রন্থ প্রাপ্ত হন। অনন্তর লফটাস (Loftus, জর্জ স্মিথ (George Smith) এবং রসম(Rassam) আরও গ্রন্থের আবিষ্কার করেন। স্মিথ সাহেবই বেবিলনের মহাকাব্যের আবিষ্কারক বলা যাইতে পারে। জোড়তাড় দিয়া হেমিণ্টন সাহেব ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে ইংরাজি পদ্যে "ইস্তার ও ইজডুবার" নাম দিয়া বেবিলনের মহাকাব্য প্রকাশ করিয়াছেন। যতদূর সম্ভব হামিণ্টন সাহেব (Leonidas Le Censi Hamilton M. A.) মূল গ্রন্থের শৃঙ্খলা ও ভাব রক্ষা করিয়াছেন। ইরেক্ আসিরিয়া দেশের একটি প্রধান নগর; ইজ্ডুবার ইহাকে শক্রহস্ত হইতে রক্ষা করিয়া ইহার রাজা হইয়াছিলেন। ইস্তার তথাকার দেবী এবং তিনি ইজ্ডুবারের পাণিগ্রহণাকাঙ্ক্ষী হন। তাহাদের ইতিহাস, স্বর্গগমন ও মিলনই মহাকাব্যের বর্ণিত বিষয়।

ফারদৌসির সাহানামে পারস্যদেশের মহাকাব্য। এককালে এই গ্রন্থের অধ্যয়ন ভারতবর্ষে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। এক হিসাবে ইহা ঐতিহাসিক কাব্য—প্রায় ৩৬০০ বৎসরের পারস্যরাজন্যর ইতিহাস; কিন্তু কবিত্ব ও রচনামাধুর্য্যে ইহা যে একখানি প্রাচ্য মহাকাব্য তাহাতে দ্বিধাভাবের কারণ নাই। রোস্তমের ইতিহাস এই মহাকাব্যের শ্রেষ্ঠাংশ। ইহাকে পারস্যদেশের পুরাণ বলা অসঙ্গত নহে। ইহার ঐতিহাসিক পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে প্রাচ্য; ইউরোপের রীতির কোন চিহ্নই ইহাতে লক্ষিত হয় না। পারস্যদেশের প্রথম রাজা কাইউমার্স হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমান্বয়ে সেকেন্দরের জয় ও মৃত্যু পর্য্যন্ত মহাকাব্যে বর্ণিত আছে।

ভারতবর্ষের মহাকাব্যসমূহের পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। রামায়ণ ও মহাভারত, মূলে না হউক, কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের গ্রন্থে পাঠ করিয়াছেন। কালীদাসের মহাকাব্য "রঘুবংশে" রঘুবংশের রসাত্মক ইতিহাস দিলীপ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে বর্ণিত।

"কুমারসম্ভব" গিরিরাজকন্যা অপর্ণার জন্ম হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় কোন মহাকাব্যেই ইউরোপীয় রীতির আভাস নাই।

অনুকরণ সময়ে সময়ে মন্দ নহে, কিন্তু সুন্দর ও সহজ আদর্শ থাকিতে বিদেশী রীতির অনুকরণ কেন? খাপছাড়া বর্ণনা আমাদিগের তত ভাল লাগে না; কিন্তু যাহারা ইউরোপীয় ভাবে অনুপ্রাণিত তাহারা সেই ভাবেই মোহান্বিত হন।

মধুসূদনের মহাকাব্য "মেঘনাদবধ" আমাদের আদরের জিনিস। তিনি মহাকবি ছিলেন এবং তাহার লেখনী হইতে অমৃতময় কাব্যরস প্রচুর পরিমাণে নিঃসৃত হইয়াছে। তাঁহার কাব্যের জন্য বঙ্গভাষা গৌরবান্বিত; কিন্তু প্রাচ্য রীতির বিপর্য্যয় কেন? এপিকের (Epic) বিশেষ উপকারিতা কি? আমরা মহাকাব্যকে আবার Epic এবং Narrative এই দুইভাগে বিভক্ত করিবার প্রয়োজন দেখি না। মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গ প্রথম হইলে কি ক্ষতি হইত?

"নমি আমি, কবি গুরু, তব পদাম্বুজে,
বাল্মীকি, হে ভারতের শিরঃচুড়ামণি,
তব অনুগামী দাস"

—ইত্যাদি প্রথম সর্গে থাকিলেই শোভন হইত। অশোক কাননে একাকিনী শোকাকুলা রাঘববাঞ্ছার সরমাসুন্দরীর সহিত কথাবার্ত্তায় পুরাতন কথা বিবৃত হইল, কিন্তু রামরাবণের যুদ্ধের অনেকাংশই কবি পূর্ব্বেই পাঠকগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। মধুসূদন ইউরোপীয় কাব্যরসে অনুপ্রাণিত ছিলেন, তাহার পক্ষে হোমার, ভার্জিল প্রভৃতির অনুকরণ বিচিত্র নহে। যৌবনে তিনি ইংরাজীভাষায় ট্রয়যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কাব্য লিখিয়াছিলেন।

নবীনচন্দ্রের "রৈবতকে"ও মহাভারতের ও শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের ঐরূপে বর্ণনা। অর্জ্জুন গল্পচ্ছলে মহাভারতের আদিপর্ব্বের মূল উপাখ্যান ও শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবতের নিজের উপাখ্যান পরস্পরকে জানাইলেন।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র।

অনন্তরূপ

আশ্রম তব অন্তরে মম, অম্বরে তব ধ্যান,
জলদ গরিমা জটাজুট বজ্র তব বিষাণ।
নাচে আনন্দে সিন্ধুসলিল, সন্ধানে ফেরে মত্ত অনিল,
চন্দন মেঘে সন্ধ্যা সুনীল. বন্দনা গাহে গান।
রবিকর তব তেজঃপুঞ্জ ঘোর অটবী আরামকুঞ্জ,
বিশ্বহৃদয় প্রীতিপুঞ্জ অঞ্জলি করে দান।
সপ্তসাগরে তপ্তহৃদয়, কখনো ক্ষুব্ধ কখনো সদয়,
আধেক সৃষ্টি আধেক প্রলয়—বিশ্ব করায় স্নান।
সংহার তব সন্ধ্যা আরতি, মৃত্যু তোমার রথের সারথী,
দুঃখ তোমার ছদ্ম মুরতি, ক্রন্দন শুধু ভান।
চন্দ্র তোমার চারু ললাটিকা, লক্ষ তারকা কণ্ঠমালিকা,
বিশ্ব তোমার পণ্যবীথিকা, পুণ্য তোমার প্রাণ।
সপ্তস্বরা এ সংসার তব, আশা ও নিরাশা সুর নব নব,
ব্যাকুল বাসনা বাঁশরীর রব, মঙ্গল তব জ্ঞান।
জীবন তোমার নিমেষ দৃষ্টি, জন্মমরণ আঁখির সৃষ্টি,
অশ্রু তোমার করুণাবৃষ্টি প্রলয় প্রেমের বান।

শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

[১]

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত এক-দিন তাঁহার পটলডাঙ্গার বাসায় সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমাকে রাজেন্দ্রলালের শেষ জীবন সম্বন্ধে কিছু বলিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"১৮৭৭ সালে সংস্কৃত কলেজ হইতে আমি এম, এ, পাশ করি। মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন তখন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহিত তাঁহার খুব সদ্ভাব ছিল। ন্যায়রত্ন মহাশয় একদিন প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার নিকট আমার উল্লেখ করেন। রাজেন্দ্রলাল আমাকে দেখিতে চান। পণ্ডিতমহাশয় এক-দিবস আসিয়া আমাকে বলিলেন, 'হরপ্রসাদ, রাজেন্দ্রলাল তোমাকে দেখিতে চাহেন, একদিন তাঁহার বাসায় গিয়া সাক্ষাৎ কর।'

রাজেন্দ্রলাল তখন মাণিকতলায় ৮নং বাটীতে থাকিতেন। এই বাটীর এক পার্শ্বে তখন ওয়ার্ড ইন্‌ষ্টিটিউশন্ ছিল, আর এক পার্শ্বে তিনি পুত্রগণকে লইয়া থাকিতেন। আমার বাসা সে সময় আম্‌হার্ষ্ট্ ষ্ট্রীটে ছিল। একদিন রাজেন্দ্রলালের সহিত দেখা করিতে গেলাম। উমেশচন্দ্র বটব্যালের নাম তোমরা সকলেই শুনিয়াছ। তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময় উমেশচন্দ্র রাজেন্দ্রলালের নিকট যাতায়াত করিতেন। মিত্রমহাশয় আমাকে ও উমেশকে একটা কাজের ভার দিলেন।

"এসিয়াটিক্ সোসাইটী হইতে রাজেন্দ্রলালের সম্পাদকতায় উপনিষদ্ বাহির হইবার কথা চলিতেছিল। তিনি উহার কিয়দংশের ইংরাজী অনুবাদের ভার আমাদের উপর দিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'উপনিষদের কোন্ অংশের অনুবাদ করিতে হইবে?' তদুত্তরে তিনি বলিলেন, 'Make your own choice.' ইহার কিছুদিন পরে আমি ও বটব্যাল অনুবাদ লইয়া মিত্রমহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলাম। উপনিষদের যে অংশ আমি অনুবাদ করিয়াছিলাম সে অংশের প্রত্যেক শব্দের টীকা ফুট্‌নোটে দিয়াছিলাম, এবং কে কোন্ অর্থে উহা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও উল্লেখ করিতে ভুলি নাই। রাজেন্দ্রলাল আমার অনুবাদ পড়িয়া বলিলেন—'তোমার কিছুই হয় নাই। কি প্রকারে অনুবাদ করিতে হয় তাহা তুমি জান না। তোমার দ্বারা এ কাজ হইবে না। দেখ ত উমেশ কেমন সুন্দর অনুবাদ করিয়াছে।'

"বটব্যালের লেখা তিনি খুব পছন্দ করিলেন এবং উহার প্রশংসাও করিলেন। ইহার পর কিছুকাল রাজেন্দ্রলালের সহিত আর সাক্ষাৎ করি নাই। একদিন ন্যায়রত্ন মহাশয়কে দিয়া তিনি আবার আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। উমেশচন্দ্র Statutory Civilian হইয়া কলিকাতা হইতে চলিয়া যান। রাজেন্দ্রলালের কাজ করিবার জন্য একজন লোকের আবশ্যক হয়, তাই আমাকে আবার ডাকিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সহিত দেখা করিলাম। তিনি বলিলেন—

'I have been rather too hard upon you. তুমি যে সবে কলেজ হইতে বাহির হইয়াছ তাহা আমার স্মরণ ছিল না। উপনিষদের অনুবাদ করা অতি দুরূহ, তাহার ভার তোমার উপর দিয়া বড় অন্যায় করিয়াছি। যাহাহউক, এইবার তোমাকে একটা সহজ কাজের ভার দিতেছি।'

"নেপাল হইতে যে বৌদ্ধ সংস্কৃত পুঁথিগুলি সোসাইটীতে আসিয়া স্তূপাকার হইয়াছিল মিত্র মহাশয় তাহার একটা 'ক্যাটালগ' প্রস্তুত

করিতেছিলেন। তাঁহার নিযুক্ত পণ্ডিতেরা পুঁথিগুলির summary করিয়া দিত, সেই সকল summary ইংরাজীতে অনুবাদ করিবার ভার পড়িল আমার উপর। আমি কিছুদিন কাজ করিয়া লক্ষ্ণৌ কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক হইয়া যাই। আমার শরীর তখন তেমন ভাল ছিল না, তাই যাইবার সময় রাজেন্দ্রলাল আমাকে বলিয়াছিলেন, 'Try to increase the span of your existence.' লক্ষ্ণৌ কলেজে আমি বেশী দিন থাকি নাই। ১৮৭৮ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৮৭৯ সালের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত তথায় অধ্যাপনা করি, পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসি। লক্ষ্ণৌসহরে থাকিবার সময় আমার সহিত রাজেন্দ্রলালের পত্রবিনিময় চলিত। আমাকে তিনি কত স্নেহ করিতেন তাহা তাঁহার পত্রে বুঝিতে পারিতাম। প্রায়ই তিনি আমাকে কলিকাতায় আসিতে উপদেশ দিতেন। আমার সহিত দেখা করিবার জন্য তিনি কত উৎসুক ছিলেন! তাঁহার ক্যাটালগের প্রুফ্‌গুলি আমার কাছে যাইত, আমি উহা সংশোধন করিয়া ফেরৎ পাঠাইতাম। রাজেন্দ্রলাল আমাকে যে সকল পত্র লিখেন তাহা আর এখন নাই, অধিকাংশই হারাইয়া গিয়াছে। নৈহাটীর বাটীতে সন্ধান করিলে এখনও বোধ হয় দুই-একখানি মিলিতে পারে।

"কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় রাজেন্দ্রলালের কাজ করিতে আরম্ভ করি। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার Nepalese Budhist Literature নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। উহার ভূমিকায় তিনি আমার নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি যে আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিবেন তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। একদিন তিনি ইচ্ছা করিয়া ভূমিকার ঠিক ঐ অংশেরই প্রুফ্ আমাকে দেখিতে দিলেন। সেই জায়গাটা তোমাকে দেখাইতেছি।" শাস্ত্রী মহাশয়ের পণ্ডিত শেল্‌ফ হইতে এক খণ্ড Nepalese Budhist Literature নামাইয়া আমার হাতে দিলেন।

শাস্ত্রী মহাশয় আমার হাত হইতে বহিখানা লইয়া উহার গোড়ার একটা পাতা খুলিয়া আমাকে পড়িতে দিলেন। উহাতে লেখা আছে,—

"During a protracted attack of illness, I felt the want of help, and a friend of mine, Babu Haraprasad Sastri, M. A., offered me his co-operation, and translated the abstracts of 16 of the larger works. * * * * I feel deeply obliged to him for the timely aid he rendered me and tender him my cordial acknowledgments for it. His thorough mastery of the Sanskrit language and knowledge of European literature fully qualified him for the task; and he did his work to my entire satisfaction."

শাস্ত্রী মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "এরূপ প্রশংসা কখনও আশা করি নাই। বাস্তবিক, সেদিন আমার যে আনন্দ হইয়াছিল আজ চৌত্রিশ বৎসর পরে তাহার স্মৃতি আমার মনে আসিতেছে। লক্ষ্ণৌয়ে থাকিবার সময় আমি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম। এই সময় রাজেন্দ্রলাল এক পত্রে আমাকে লিখেন,— 'I wish you every success in your new venture'— কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার পর তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা আরও প্রগাঢ় হইয়াছিল। মিত্র মহাশয়ের ক্যাটালগ তখন বাহির হইয়া গিয়াছে। একদিন তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'হরপ্রসাদ, আমার পুস্তকের জন্য তুমি বিস্তর খাটিয়াছ, তোমাকে কিছু পারিশ্রমিক দিতে চাই।' এই বলিয়া আমার হাতে একখানা ১৪৫৲ টাকার চেক দিলেন; এই অযাচিত দান আমি মাথা পাতিয়া লইয়াছিলাম।

"তাঁহার দৈনিক জীবন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা তোমাকে বলিতেছি। তিনি খুব ভোরে উঠিতেন। তাঁহার একখানা গাড়ী ছিল, তাহাতে

করিয়া হেদোর ধারে আসিতেন। সেখানে কৃষ্ণদাস পাল, মহেশ ন্যায়রত্ন প্রভৃতি অনেকে আসিয়া জুটিতেন। তখন একটি বেশ দল হইত। নানারূপ গল্প করিতে করিতে কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ধরিয়া শ্যামবাজারের দিকে হাঁটিয়া যাইতেন, গাড়ী পিছন পিছন চলিত। বেড়ান সারা হইলে রাজেন্দ্রলাল গাড়ীতে উঠিয়া বাসায় ফিরিতেন। তাঁহার বাটীর উপরতলায় একটা বড় হল্ ছিল, তাহার পূর্ব্ব পার্শ্বের একটি ঘরে তিনি অধ্যয়ন করিতেন। ঠিক যখন আটটা বাজিত, তখন আমরা আসিয়া জুটিতাম। আমি সবদিন যাইতাম না, যেদিন প্রুফ্ দেখার দরকার হইত সেই দিন যাইতাম। প্রুফ্ দেখা শেষ হইলে বেলা সাড়ে নয়টায় রাজেন্দ্রলাল স্নানে যাইতেন। স্নান আহার সারিয়া ১২টা পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিতেন। তাহার পর পড়িতে বসিতেন। নূতন পুস্তক তিনি এক অভিনব প্রণালীতে পড়িতেন। পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠা পড়িলেন, যদি কিছু নোট করিবার থাকিত নোট করিলেন, নীল পেন্সিল দিয়া আবশ্যক অংশ চিহ্নিত করিলেন, তাহার পর পরবর্ত্তী চারি পৃষ্ঠা একেবারে ছাড়িয়া দিলেন। পঞ্চম পৃষ্ঠা পড়া হইলে আবার দশম পৃষ্ঠা পড়িতে আরম্ভ করিতেন। এইরূপ চারি পাতা অন্তর একটি পাতা পড়া তাঁহার অভ্যাস ছিল। একদিন কৌতূহলী হইয়া আমি ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। রাজেন্দ্রলাল তদুত্তরে বলিলেন—গ্রন্থের প্রথম পাতাতেই যদি কোনও মৌলিকতার আভাস পাই, তাহার পরবর্ত্তী পৃষ্ঠা পাঠ করি, তাহা না পাইলে চারিটি পাতা বাদ দিয়া পঞ্চম পাতায় কি আছে দেখি; তাহাতেও যদি লেখকের কোন বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় না পাই বহিখানি বন্ধ করি।'

"এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে মিত্র মহাশয়ের সম্পাদিত পাতঞ্জলির যোগশাস্ত্র ও উহার ইংরাজী অনুবাদ বাহির হয়। ইহার কিছুদিন পরেই (১৮৮২ সালে) কাওয়েল এবং গাফ্ মাধবাচার্য্যের 'সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের' ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। একদিন রাজেন্দ্র-

লালের পড়িবার ঘরে ঢুকিয়া দেখি তাঁহার টেবিলের উপর তাঁহার দুই ভলিয়ুম যোগশাস্ত্র এবং সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের নবপ্রকাশিত ইংরাজী অনুবাদগ্রন্থ সাজান রহিয়াছে। নানা কথাবার্ত্তার পর যখন আমি উঠিয়া আসিতেছি রাজেন্দ্রলাল বলিলেন—এই কয়খানি পুস্তক লইয়া যাও, পড়িয়া দেখিও। কয়েক দিবস পরে তাঁহার বাসায় উপস্থিত হইলে রাজেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হরপ্রসাদ, বহিগুলি পড়িয়াছ ?' আমি বলিলাম—হাঁ পড়িয়াছি। রাজেন্দ্রলাল জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার কোন্ অনুবাদ ভাল লাগিল ? আমি বলিলাম—'কাওয়েল ও গাফের কৃত অনুবাদ মূলানুগত, কিন্তু উহা বুঝিতে হইলে মনে মনে উহার সংস্কৃত তর্জ্জমা করিয়া লইতে হয়। আপনার অনুবাদ সব জায়গায় ঠিক literal না হইলেও we are carried away by your English.' তিনি সম্মতির সুরে বলিলেন—'Exactly so, আমিও তাহাই মনে করি।'

"রাজেন্দ্রলালের সমালোচকের দৃষ্টি খুব ছিল। লেখার ভাল-মন্দ বুঝিতে বা বিচার করিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার একটা বড় মারাত্মক দোষ ছিল। কেহও যদি তাঁহার নিজের লেখার কোনও ভুল দেখাইত, তিনি ক্রোধে আত্মহারা হইতেন। কিন্তু আমিও ছিলাম নাছোড়বান্দা, তাঁহার রাগ বড় একটা গ্রাহ্য করিতাম না। হয় ত পুঁথীতে এক কথা আছে, ভুলিয়া তিনি আর এক লিখিয়া বসিয়াছেন এবং প্রুফ্ দেখিবার সময় আমি তাহা ধরিয়াছি। রাজেন্দ্রলাল ত একেবারে চটিয়া আগুন। আমি আস্তে আস্তে বলিলাম—'রাগিলে তো হইবে না, পুঁথীতে যাহা নাই তাহা লিখিয়াছেন।'

"এই বলিয়া পুঁথীর পাতা খুলিয়া যখন তাঁহাকে দেখাইয়া দিলাম, তখন তিনি মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে বসিয়া গেলেন। খানিক পরে, গম্ভীরভাবে বলিলেন—এখন উপায় ? আমি তখন তাহাকে সংশোধন করিয়া লিখিতে বলিতাম। তখন তাঁহার রাগ

জল হইয়া যাইত, সন্তোষের চিহ্ন দেখা দিত। লেখার দোষ বাহির করিতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন, তাঁহার মত সুন্দর ইংরাজী লিখিতে আর কাহাকেও দেখি নাই। আমি হয় ত একটা ইংরাজী লেখা তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতেছি; উহার যে অংশে দোষ তাহাও বেশ বুঝিতে পারিতেছি; কিন্তু কি হইলে যে ঠিক হয় স্থির করিতে পারিতেছি না। রাজেন্দ্রলাল ঠিক ধরিয়া ফেলিলেন এবং কাটিয়া কুটিয়া ভাষা এমন বদলাইয়া দিলেন যে, আমার আনন্দের আর সীমা থাকিল না।

"ইংরাজী রচনায় তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। আমার বেশ মনে আছে, বাবু কৃষ্ণদাস পালের মৃত্যু হইলে যখন বাবু রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী হিন্দুপেট্রিয়টের সম্পাদক হইলেন, তখন কোনও কোনও দিন দেখিতাম, রাজেন্দ্রলাল বক্তৃতার মত অনর্গল ইংরাজী বলিয়া যাইতেছেন, রাজকুমার বাবু লিখিয়া লইতেছেন এবং তাহাই হিন্দুপেট্রিয়টে পরে ছাপা হইয়া যাইতেছে। সে সময় রাজেন্দ্রলালই উহার প্রকৃত সম্পাদক ছিলেন। এই কাগজে তিনি বিস্তর প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক অধিকাংশ মতামতই এখন নূতন নূতন গবেষণার ফলে অসার বলিয়া প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার রচনাপ্রতিভা এখনও দেশের লোকের আদর্শ হইয়া আছে।"

শ্রীননীগোপাল মজুমদার।

তুফান

শ্রাবণ গগণ ঘন সমাকুল,
হু হু হু হু বায়ু ছুটে প্রতিকুল,
দরিয়ায় আজি তুফান তুমুল,
উঠেছে উন্মত্ত উচ্ছ্বাস ঘোর।

উৎক্ষিপ্ত সফেণ তরঙ্গ বিপুল,
—গর্জ্জিয়া ছুটিয়া ভাঙ্গিতেছে কুল,
কিসের লাগিয়া পাথার অকুল
—এহেন তাণ্ডব নটনে ভোর?

এহেন অশান্ত উন্মাদ ভৈরব,—
কি বেগ উচ্ছ্বাসে ও নৃত্য তাণ্ডব,
কে নেছে কাড়িয়া কি গুপ্ত-বৈভব
ও অতল হ'তে করিয়া জোর?

প্রকৃতি জড় সে ছুটেছে রুষিয়া
কোটী ক্রুদ্ধ সর্প সমান ফুঁসিয়া
যেন সারা বিশ্ব ফেলিতে গ্রাসিয়া
করেছে বদন ব্যাদান ঘোর!

(হায়) কোথা সে সুকান্তি উজ্জ্বল নিলীমা,
বিপুল মহান্ হৃদয় গরিমা,
তরঙ্গে তরঙ্গে সে রঙ্গ ভঙ্গিমা
লিখিল হৃদয় মানস চোর!

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

নিধু গুপ্ত

[২]

ছাপরা জীবন।

নিধুবাবু সঙ্গীতবিদ্যা শিখিবার জন্য শৈশবকাল হইতে যে সুযোগ ও অবসর খুঁজিতেছিলেন, যৌবনে ছাপরায় আসিয়া তাহা পাইলেন। সেখানে চাকরীতে ঢুকিয়া, দুই পয়সা হাতে পাইয়া শুধু স্বস্তি নহে—মনের মধ্যে তাঁহার বেশ একটু স্ফূর্ত্তিও আসিল। সেই সময়ে ভাগ্যক্রমে তাঁহার গান শিখাইবার লোকও জুটিয়া গেল। ছাপরায় তখন জনকতক বিখ্যাত কালোয়াৎ বাস করিতেন। নিধুবাবু তাঁহাদেরই একজনকে মাসিক কিছু দক্ষিণাস্বরূপ দিয়া নিজের জন্য সঙ্গীত-শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন।

চাকরীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সঙ্গীতচর্চ্চা চলিতে লাগিল। কেবল অনুরাগ নহে, এবিষয়ে স্বাভাবিক শক্তিও তাঁহার খুব বেশী ছিল। শুনা যায়, গানের যে সব কাজ-কায়দা গলায় আনিতে গায়ক সাধারণের প্রায় মাসাবধি সময় লাগে, নিধু নাকি তাহা দুই-চারি দিনের মধ্যেই আয়ত্ত করিয়া ফেলিতেন। তাহা ছাড়া, পরিশ্রমেও তিনি বিমুখ ছিলেন না। অর্থ ও অবসর অকাতরে ব্যয় করিয়া গান শিখিতে লাগিলেন। ফলে, অল্পদিনের মধ্যেই সঙ্গীত-বিদ্যায় তাঁহার বেশ একরকম পারদর্শিতা জন্মিল।

তবে যেরূপ ভাবে গান শিখিবার শিক্ষানবিশী তিনি করিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহার সুবিধা হইল না। যে মুসলমান গায়ক তাঁহাকে গান শিখাইতেন, তিনি তেমন উদার হৃদয়ের মানুষ ছিলেন না। শুধু তাঁহাকেই বা দোষ দিই কেন?—তখনকার কোন মুসলমান-গায়কই পছন্দ করিতেন না যে, একজন বাঙ্গালী-গায়ক আসিয়া তাঁহাদের

সব বিদ্যা আত্মসাৎ করিয়া তাঁহাদেরই সমকক্ষ হইয়া উঠেন। নিধুর দ্রুত উন্নতি দেখিয়া তাঁহার ওস্তাদেরও সেই ভয় হইল, পাছে নিধু তাঁহার সমান ওস্তাদ হইয়া যান। সেই ভয়ে গানের পুঁজী বন্ধ করিয়া দিয়া তিনি নিধুকে পূর্ব্বে যাহা কিছু শিখাইয়াছিলেন, তাহারই চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন। নিধুর অবশ্য ইহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি ইহাতে ব্যথিত হইলেন—বিশেষ বিরক্তও হইলেন। গায়ককে একদিন ডাকিয়া এই বলিয়া বিদায় দিলেন যে,—'আমি আমার স্বদেশীয় ভাষায় গান রচিয়া তাহা গাইব—তোমাদের মুসলমানী গান আর শিখিব না।'

গুরুর হৃদয়-হীনতায় শিষ্যের হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছিল সত্য, কিন্তু সে আঘাতের ফল ভাল বৈ মন্দ হয় নাই। গিরিশচন্দ্র যেমন জনকয়েক লেখকের দুর্ব্ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া সাহিত্য-সেবায় প্রবৃত্ত হন, এক্ষেত্রে নিধুরও অনেকটা তাহাই হইল। ওস্তাদের উপর রাগ করিয়া তিনি পশ্চিমের রাগ-রাগিনী তাল-মান অনুসারে বাঙ্গলা গান রচনা করিয়া গাইতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। সেই গান যখন এদেশের রসজ্ঞ সমাজের কাণে পৌঁছিল, তখন তাহাতে মুগ্ধ না হইয়া কেহ থাকিতে পারিল না।

এরূপ মুগ্ধ হইবার বিলক্ষণ কারণও ছিল। তখনকার দিনে বাঙ্গলা গান গাইতে হইলে রামপ্রসাদের শ্যামা-সঙ্গীত এবং বৈষ্ণব কবিগণের বৈষ্ণব-পদাবলী ছাড়া অন্য গান বড় একটা পাওয়া যাইত না। দেওয়ানজী ও অন্যান্য ধনী-সৌখীন বাবুদের বৈঠকে বা মজলিসে পশ্চিমে খেয়াল ও টপ্পা গীত হইত বটে, কিন্তু তাহা শ্রবণেন্দ্রিয়কে সুখ দিতে পারিলেও মনকে তেমন তৃপ্তি দিতে পারিত না।—কাব্যের দিকটা উহার একেবারেই খালি থাকিয়া যাইত। এমন সময় পশ্চিমের খেয়াল ও সুরে রচিত নিধুর বাঙ্গলা গান শুনিয়া বাঙ্গালীর ভারী আনন্দ হইল। তাহা শুধু তাহাদের কাণের সঙ্গে নহে—মনের সঙ্গেও সম্পর্ক পাতাইল।

এই গানের প্রচার ও প্রসিদ্ধি লাভের পক্ষে আর একটা মস্ত সুবিধা ছিল এই যে, নিধুবাবু নিজেই গান রচনা করিতেন এবং নিজেই তাহা গাইতেন। তাঁহার গান যদি গীত না হইয়া কেবল ছাপার অক্ষরেই বাহির হইত, তাহা হইলে সে গানের তখন আদর হইত বলিয়া বিশ্বাস হয় না। কেননা, সাহিত্যে সে সময় কাহারও তেমন অনুরাগ ছিল না। গান-বাজনার উপরেই সকলের তখন সখ। সেই সখের সময় নিধুবাবু যেমনই নূতন সুরে নূতন ঢঙে গান ধরিলেন, অমনি সেই গান লইয়া এক মজলিস হইতে অন্য মজলিসে লোফালুফি চলিতে লাগিল।—সুরের সেই নূতনত্বটুকু বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই তিনটি গানের আস্থায়ী এখানে উদ্ধৃত করিলাম।—

(১)

(সরি মিঞার টপ্পা—সিন্ধু খাম্বাজ)

ও মিঞা বে জানেওয়ালে (তাম্বু)
আল্লা কি কসম ফিরিয়া নয়নুওয়ালে।...

বাঙ্গলা সঙ্গীতে এ সুর ছিল না। নিধুবাবুই ইহার অনুকরণে গান রচনা করিলেন,—

'যে যাতনা যতনে মনে মনে মন জানে
পাছে লোকে হাসে শুনে—লাজে প্রকাশ করিনে।...

(২)

(পশ্চিমে টপ্পা—খাম্বাজ)

দেখো রি এক বালা যোগী, মেরে
দুয়ারমে খাড়া হ্যায়।...

এ সুরও বাঙ্গলায় ছিল না। নিধুবাবু এই সুরে লিখিলেন,—

তোমারই তুলনা তুমি প্রাণ,
এ মহী মণ্ডলে।...

(৩)

(সরি মিঞার টপ্পা—বাঁরোয়া ;

এরি নাদান, গারি দে গেওয়ো ।...

এই সুরও নিধুবাবু তাঁহার বাঙ্গলা গানে আমদানী করিয়া গিয়াছেন। যথা—

'তবে প্রেমে কি সুখ হোতো ।......

এইরূপ সঙ্গীতচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সঙ্গীত রচনার চর্চ্চাও চলিতে লাগিল। সেই সঙ্গীত শুনিয়া যে শুধু তখনকার বাঙ্গালী মজিয়াছিল তাহা নহে।—সুবিখ্যাত মুসলমান-গায়ক স্বর্গীয় রসুল বকস্ বলিতেন,—"বাঙ্গালা দেশে নিধুর টপ্পার তুলনা দেখিতে পাই না। আমি দুই-চারিটা ঐ টপ্পা সময়ে সময়ে গাইয়া থাকি। যেখানে সুরের যে পরিমাণে লয় থাকা উচিত, তাহা ঐসকল গান ছাড়া অন্য বাঙ্গলা গানে দেখি নাই।—গাইবার সময় 'সরির খেয়াল' কি বাঙ্গলা গান ঠিক করিতে পারি না।"—ইহা ছাড়া আরো শুনা যায় যে, রাজা রাজবল্লভের কালোয়াৎ আব্বুরস্ খাঁ সাহেবও নিধুর গানের ভাবে ও সুরে অত্যন্ত মুগ্ধ ছিলেন। তিনি বলিতেন যে, একাধারে এমন গীত রচিবার এবং গীত গাইবার শক্তি দেখা যায় না। নিধুবাবুর উপর ভগবানের অশেষ করুণা!

এইবার একটি বিশেষ কথা বলিবার আছে। কথা এই যে, নিধুর সময়টাকে এদেশের অনেক লেখকই সাহিত্য-সেবার বা সাহিত্য-সৃষ্টির পক্ষে অসময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের উক্তির যুক্তি এই যে, দেশের রাজনৈতিক-আকাশ যখন ঘনঘোর মেঘাচ্ছন্ন, সে সময়ে সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেই পারে না। এই যুক্তির বলে তাঁহারা বাঙ্গালার প্রাচীন কাব্য-সাহিত্য এবং আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের মাঝখানে নিধুর ও কবিওয়ালাদের যে গান, বাঙ্গালার সেই গৌরবের [illegible] বিশাল সঙ্গীত-সাহিত্যকে সৌন্দর্য্যের নিকষে না

করিয়া, তাহার প্রভাব প্রতিপত্তির কথা না ভাবিয়া, উপেক্ষার ফুৎকারে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন।

যতদূর মনে পড়ে, তাহাতে বলিতে পারি, ঐ যুক্তি এদেশে শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ই প্রথম আমদানী করিয়াছিলেন। ১২৮৭ সালের 'বঙ্গদর্শনে' তিনি লিখিয়াছেন,—"বাস্তবিক, তৎকালে ভারতবর্ষে সাহিত্য লোপ হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অনেকে মনে করিতে পারেন বাঙ্গলা সাহিত্যের কথায় ভারতবর্ষের কথা কেন তুলিলেন? বাঙ্গালায় ত তখন সুশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বাঙ্গালা ত তখন ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শান্তি-ভোগ করিতেছিল। এটি লোকের মহাভ্রম, ভারতবর্ষে এরূপ দারুণ গোলযোগ থাকিলে বাঙ্গালীর মনে শান্তি সম্ভবিতে পারে না; বিশেষ, বাঙ্গালা সমাজে তখনও শান্তি হয় নাই।"—কিন্তু কথাগুলা যেন কিছু গায়ের জোরে বলা হইয়াছে। কেননা, ভারতবর্ষের ইতিহাস যাহা আমরা পড়িয়া থাকি, যাহার মধ্যে বাদ্‌শাহের সহিত নবাবদের, ও নবাবের সহিত বিদেশী বণিকদের, ও বণিকদের সহিত দেশী ষড়-যন্ত্রকারীদের খেলার অনেক সত্য মিথ্যা বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা ত কৃষিজীবী বাঙ্গালীর বা বাঙ্গালা সমাজের ইতিহাস নহে। বিশেষতঃ তখনকার বাঙ্গালী ত এখনকার বাবু বাঙ্গালী বা রাজনীতিজ্ঞ বাঙ্গালী ছিল না। 'ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়' বলিলে তাহারা কিছুই বুঝিত না। তাহারা জানিত শুধু তাহাদের সমাজটিকে। সেই সঙ্গে তাহা-দের দেহে তখন বল ছিল, জঠরে অগ্নি ছিল, হৃদয়ে উল্লাস ছিল। অতি সামান্য আয় হইলেই তখন তাহাদের দুইবেলা দুইমুঠা পেটের অন্ন জুটিত। তখন একদিকে নিত্য বিপ্লব থাকিলেও—আবার অন্য দিকে দেবমন্দির ও মসজিদচূড়া মস্তক উত্তোলন করিত, জলদৈন্য দূর করিবার জন্য পুণ্য-প্রয়াসে দীর্ঘ দীর্ঘিকা খনিত হইত। অতএব সে সময়ে সঙ্গীত-চর্চ্চা বা সাহিত্য-সেবা না করিবার হেতু দেখিতে পাই না। আরও একটা মোটা কথা পড়িয়া রহিয়াছে যে, বাঙ্গালী

যদি তখন ধন-প্রাণ লইয়াই ব্যস্ত ছিল, তবে কবির দল পুষ্ট হইল কি প্রকারে?—তাহাদের গান শুনিল কে? প্রাণের ভয়, পেটের জ্বালা থাকিলে কি প্রণয়-সঙ্গীত বাহির হইতে পারে? আমরা এখন কোটি-অভাব-বিজড়িত নাগ-পাশে বদ্ধ দুর্ব্বল জীব! এখন আমাদের কাপড় জামার ভাবনা, দুইমুঠা অন্নের ভাবনা,—অতৃপ্তির ও অশান্তির তুষানল-জ্বালায় ধিকি ধিকি জ্বলিতেছি—পুড়িতেছি। এই ভীষণ ভাবনার মাঝখানে থাকিয়াও যদি আমরা সাহিত্য-সেবা, সাহিত্য-সৃষ্টি করিতে পারি, তবে তখন—যখন বাঙ্গালার সমাজ-শরীর সজীব ছিল, যখন টাকাই সার বুঝিয়া, টাকার মাপকাটিতে এদেশের মনুষ্যত্ব পাণ্ডিত্য প্রভৃতি সর্ব্বস্ব মাপা হইত না, যখন বাঙ্গালা-সমাজের সর্ব্বত্রই ভালবাসার আদান-প্রদান ছিল—কেহ কাহাকেও চাপিয়া-ঠাসিয়া চূর্ণ করিতে চাহিত না,—তখন সাহিত্য-সৃষ্টি কেন না হইবে? সমাজই এদেশের মর্ম্মস্থান। সেই সমাজের সহিত বিদেশী রাজার তখন কোন সম্বন্ধই ছিল না। কাজেই রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইলেও এদেশের মর্ম্মস্থানে তখন কোন আঘাত লাগিত না। আঘাত লাগিত না বলিয়াই নিধু তখন নিঃশঙ্কচিত্তে গলা ছাড়িয়া বাঙ্গালীকে গান শুনাইয়া যাইতে পারিয়াছিলেন কবির দলও তাই তখন পুষ্ট হইবার পক্ষে কোনও ব্যাঘাত পায় নাই। সে সকল গান শুনিলেই বুঝা যায়, তাহা 'বঙ্গীয় সমাজের কোমল প্রকৃতি, নিশ্চেষ্টতা এবং গৃহ-সুখ-নিরতির ফল'। অশান্তির সময় সে সঙ্গীত কিছুতেই রচিত হইতে পারে না।

বঙ্কিম বলেন,—'কাব্য-বৈচিত্র্যের তিনটি কারণ—জাতীয়তা, সাময়িকতা এবং স্বাতন্ত্র্য। অর্থাৎ যিনি কবিতা লিখেন, তিনি, জাতীয় চরিত্রের অধীন; সামাজিক বলের অধীন; এবং আত্ম-স্বভাবের অধীন। তিনটিই তাঁহার কাব্যে ব্যক্ত হইবে।'—নিধুর সময়ে বাঙ্গালীর চরিত্র ও সামাজিক বল কিরূপ ছিল, বলিয়াছি। এবার তাঁহার স্বভাবের কথা বলিব।

তাঁহার স্বভাব সম্বন্ধে স্বর্গীয় কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন,—"নিধুবাবু সহজেই সন্তোষচিত্ত ছিলেন, প্রায় কেহই তাঁহাকে বিষণ্ণ বা বিমর্ষ অথবা উৎকণ্ঠিত দেখিতে পান নাই, সর্ব্বদাই হাস্যপূর্ব্বক আমোদ-প্রমোদে কালক্ষয় করিতেন। উপকার ধর্ম্মকেই পরম ধর্ম্ম মনে করিয়া সাধ্যানুসারে পরোপকারে ত্রুটি করিতেন না, দায়গ্রস্ত ব্যক্তি নিকটস্থ হইলেই যথাসম্ভব দান দ্বারা তাহাকে তুষ্ট করিতেন।"—কথাগুলি অতিভক্তের অতিরঞ্জন বা উচ্ছ্বাসের অত্যুক্তি নহে। নিধুর জীবন-বৃত্তান্ত বিশ্লেষণ করিয়াই ঐ অভিমত সঙ্কলিত হইয়াছে। আমরা তাঁহার জীবন-ঘটনা যতটুকু জানি, তাহা একে একে বিবৃত করিতেছি। তাহা পড়িলে পাঠকগণও বুঝিতে পারিবেন যে, নিধু এখনকার কবিদের মতন শুধু কবিতা লিখিবার সময় কবি হইতেন না,—জীবনেও তিনি বিলক্ষণ কবি ছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের এক কবিতার একস্থানে আছে,—'যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়।' কথাটা একহিসাবে সত্য। ধন, মান, সম্পদ—এজগতে যেসকলকে সুখ বলে, তাহা হৃদয়ের গুনে প্রায়ই অর্জ্জন করা যায় না। যে হৃদয় পরের কাজেই নিজেকে বিলাইয়া দেয়, সে নিজের ভাবনা ভাবিবে কখন? তাই জীবন-যুদ্ধে তাহাকে প্রায় পরের পিছনেই পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। নিধুরও অদৃষ্টে তাহাই ঘটিয়াছিল। চাকরীতে তিনি কোন উন্নতিই করিতে পারেন নাই। দেওয়ান্ রামতনু পালিত সহসা যখন বিষম বায়ুরোগগ্রস্ত হইয়া কর্ম্মের অযোগ্য হইয়া পড়েন, তখন সেই পদ-লাভের সম্ভাবনা নিধুবাবুরই হইয়াছিল; কারণ, তিনি যেমন বুদ্ধি-মান, তেমনি কাজের লোক ছিলেম। তাহা ছাড়া, রামতনুবাবুর সহকারীর কাজও তিনি করিতেন। কিন্তু এমন সময় এই আফিসেরই জগন্মোহন মুখোপাধ্যায় নামে আর একজন কর্ম্মচারী আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া পড়িলেন। বলিলেন,—'এ চাকুরী যদি আমাকে না দিয়া আপনি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ব্রহ্মহত্যা করিবেন।'—জনাইয়ের

মুখোপাধ্যায়-বংশে এই জগন্মোহন বাবুর জন্ম। নিধুবাবু ইঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন! ইঁহার কথায় তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া সহজভাবেই বলিলেন,—'কি করিলে এ চাকরী আপনার হয় বলুন ?' জগন্মোহন বাবু বলিলেন,—'আপনি নিজের জন্য সাহেবকে কিছুত বলিতেই পারিবেন না। তা'ছাড়া আমি যাহাতে ঐ চাকুরী পাই, সেজন্য আপনাকে সাহায্য করিতে হইবে।'—তাহাই হইল। নিধু-বাবুর চেষ্টায় জগন্মোহন বাবু দেওয়ান হইলেন। নিধুবাবু সন্তুষ্ট-চিত্তে পূর্ব্বকাজ করিতে লাগিলেন।

তবে এ দাস্যবৃত্তি তাঁহাকে বেশী দিন পর্য্যন্ত করিতে হয় নাই। যে মনের গুণে তিনি দেওয়ানী পদের মায়া ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই মনের বলেই তাঁহাকে চাকরীও ছাড়িতে হইয়াছিল। অফিসে সে সময় ঘুষ লওয়ার খুব প্রচলন ছিল। সকলেই ঘুষ লইতেন—কেবল নিধুবাবু লইতেন না। পাছে একথা নিধুবাবুর মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে, এই ভয়ে সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ঘুষ লইতে অনুরোধ করেন—দলে টানিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু নিধুবাবু তাহাতে ক্ষুব্ধ হন। কাহাকেও কিছু না বলিয়া একদিন অফিসের সাহেবের নিকট যাইয়া চাকরীতে একেবারে জবাব দেন। ইহাতে তাঁহার বন্ধু দেওয়ান জগন্মোহন বাবুর বিশেষ দুঃখ হয়। তিনি নিধুবাবুকে বলেন,—'আপনি যদি একান্তই চাকরী না করেন, তা'হলে দশ হাজার টাকা আপনাকে দিতেছি। আপনি তাহাই লইয়া দেশে ফিরিয়া যান।'—নিধুবাবু বন্ধুপ্রদত্ত অর্থ আনন্দে গ্রহণ করিলেন। যে দিন তাঁহার কলিকাতায় আসিবার কথা, সেইদিন দেওয়ান জগ-ন্মোহন বাবু তাঁহার বাসায় আসিয়া তাঁহার হাত দুইখানি ধরিয়া বলিয়া গেলেন,—"আপনি যাইতেছেন বটে, কিন্তু আমাদের একে-বারে ভুলিবেন না। প্রতি বৎসর সরস্বতী পূজার সময় একবার করিয়া আপনাকে এখানে আসিতে হইবে। আমার রচিত বাগ্-দেবীর বন্দনাটি গাইতে হইবে। নইলে বিশেষ দুঃখিত হইব।"—

সুখের বিষয়, বন্ধুর এ অনুরোধ উপেক্ষিত হয় নাই। প্রতি বৎসরেই নিধুবাবু ছাপরায় যাইতেন। সরস্বতী পূজার দিন বন্ধুর রচিত গানটি গাহিতেন। সে গানটি এই :—

জয় জয় বাগ্‌বাণী নিখিল প্রদায়িনী।
পদমধ্যে মুখাম্বোজ, বক্ষে কর সরসিজ, পঞ্চাসতো বর্ণময় মানি ॥
সদা-সরসিজোদ্ভব, সরোজাক্ষ সদাশিব প্রভৃতি অমরবন্দিনী।
অক্ষ গুণ আর বিদ্যা, অমৃত ফল সমুদ্রা, দেহি পদ চতুষ্টয় পালি ॥১॥
সদাপীনোন্নতস্তনি, ঈষদাভা ত্রিনয়নি, সর্ব্ব ইন্দু শিরে ধারিনি।
জগন্মোহন দীনে, আশ্রয় স্বকীয় গুণে,
দেহি পদ অম্বুজে ভবানি ॥২॥

গানটি অবশ্য সুরচিত নহে। ঈশ্বর গুপ্ত উহা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, লিখিয়াছিলেন। পাঠকবর্গের কৌতুহল চরিতার্থের জন্য আমরা উহা সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

আর একটি কথা বলিলেই নিধুবাবুর ছাপরা জীবনের কথা বলা শেষ হয়। সেটি অবশ্য তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের নহে—তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের কথা। অল্পবয়স হইতেই তিনি অত্যন্ত ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। ঈশ্বরে তাঁহার অনন্ত বিশ্বাস ছিল। কোথাও ভাল সন্ন্যাসী বা ফকির আসিয়াছে শুনিলেই তিনি তদ্দর্শনে ছুটিতেন। ছাপরা অবস্থিতি কালে তিনি প্রায় প্রতি সপ্তাহে ছাপরা জেলার অন্তর্গত রতনপুরা গ্রামে যাইয়া 'ভিখন্‌রাম' স্বামিজীকে দেখিয়া আসিতেন। ভিখন্‌রাম দক্ষিণাচারী ছিলেন; সকলেই তাঁহাকে সিদ্ধপুরুষ বলিত। নিধুবাবু এই স্বামিজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। স্বমিজী তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। "তুমি সুখী ও যশস্বী হও" বলিয়া তাঁহাকে তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।

নিধুবাবুর জীবন-নাট্যের প্রথম ও এক প্রধান অঙ্ক শেষ হইল। আগামী বারে তাঁহার বাকী জীবনের কথা, অর্থাৎ কলিকাতায় তিনি কেমন ভাবে জীবন কাটাইয়াছিলেন, তাহাই বিবৃত করিব।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

শিবরূপ

১

রজতের গিরি-নিভ—
শুভ্র কলেবর শিব,
ভালে চারু চন্দ্রলেখা,—রতন-উজ্জ্বল—
অঙ্গে অঙ্গে কিবা দ্যুতি,
সুর-নর করে স্তুতি,
পঞ্চ মুখে পঞ্চ তত্ত্ব,—ওঙ্কার মঙ্গল !
নিষ্ঠুরতা করুনার
কে দেখিবে সমাহার,
নৃশংস পরশু করে, নেত্রে কালানল,
বরাভয় হস্তে মৃগ, করুণা-বিহ্বল।

২

নীল কণ্ঠে যায় দেখা—
সিন্ধুর সুনাম লেখা,
তাহারি বিষাণ গর্জ্জ,—ভৈরব হুঙ্কার ;
অমঙ্গল-আশীবিষ
সে ত না উগরে বিষ,
প্রকোষ্ঠে জড়ান তাই, তারি কণ্ঠহার !
সদসৎ লীলা তাঁরি,
লীলায় শ্মশান-চারী,
ব্যাঘ্র-কৃত্তি-কটি-বাস,—অঙ্গে ভস্ম ভার ;
ত্যাগের মহিমা মূর্ত্তি,—ত্যাগ-অবতার !

৩

সেই ত্যাগ-অঙ্কে কিবা
ভস্ম কাম—শোভে শিবা,
হরগৌরী অভেদাঙ্গ—অভেদ মিলন ;
ত্যাগ-ভোগ এক-ঠাঁই,
বিশ্বের বিভূতি তাই,
বিশ্ব সে শিবের রূপ—তারি প্রকটন ;
শোক, তাপ, মৃত্যু, জরা
মঙ্গলের রূপ-ধরা—
বুঝিবে মানব কবে,—দেখিবে কখন,—
বিশ্বের মঙ্গল মূর্ত্তি মেলিয়া নয়ন।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

মধুস্মৃতি ও সুভদ্রা হরণ

'ভারতবর্ষে'র মধুস্মৃতি পাঠ করিয়া আমারও মধুস্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছে। শ্রীমধুসূদনকে যদি দেখিয়া থাকি ত বাল্যেই দেখিয়াছি ; সে কথা মনে নাই। আমার পিতৃদেবের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ্য ছিল, সময়ে সময়ে তাঁহার মুখে মধুপ্রসঙ্গ প্রায়ই শুনিতাম, শুনিতে বড় ভাল লাগিত। মধুসূদনের সহিত প্রথম পরিচয় যেমন অনেকেরই হইয়াছে অর্থাৎ তাঁহার কাব্য নিচয়ের মধ্য দিয়া, আমারও তাই। যে দিন পিতৃদেব হাসিতে হাসিতে 'মেঘনাদবধ' হাতে দিয়া বলিলেন, 'দেখ্ দেখি কেমন বই। পড়তে পারবি বুঝতে পারবি ত?' মনে

আছে, পুস্তকখানি হাতে লইয়া ক্রমাগতই পাতা উল্টাইয়া যাইতে লাগিলাম, দেখিয়া পিতা হাসিয়া বলিলেন—'তবেই হয়েছে'। আমি বলিলাম, "দাঁড়াও না বাবা, আগে দেখি।" দেখিতে দেখিতে দেখিলাম, "ছিনু মোরা কত সুখে পঞ্চবটীবনে"; দেখিলাম "বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে"; দেখিলাম, "দানবনন্দিনী আমি রক্ষকুল-বধূ, আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে।" শেষে দেখিলাম "বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।" তখন স্থির হইয়া গেল, বইখানি ভাল করে পড়তে হবে। কারণ মিলনান্ত পুস্তক আমার ভাল লাগে না। তারপর ক্রমে ক্রমে মধুর সমুদ্রে নির্মজ্জিত হয়ে গেলেম। যখন মধুর মধুর বংশীধ্বনি 'ব্রজাঙ্গনা'কে আহ্বান করলে তখন মনে হলো জগত বুঝি মধুময় হইয়াছে,—"মুছিয়া নয়ন জল চ'লো সই চল্ চল্, শুনিব তমাল তলে বেণুর সুরব, আসিল বসন্ত যদি আসিবে মাধব।"

তারপর, যখন আমি সূতিকা গৃহে, আমার নবজাত শিশুর কনক-কমলোপম আস্যে বিদ্যুদ্বিকাশের মত হাস্য রেখা দেখিতে দেখিতে জগৎ বিস্মৃত হইতেছিলাম, সে আজ বহুবর্ষের কথা; তার পর যুগের পর যুগ চলিয়া গিয়াছে; সে আনন্দবিন্দু, আজ বিষাদসিন্ধুতে পরিণত হইয়াছে! সে মাধুরী হাসি আজ আর জাগতিক কোন পদার্থেই দেখিতে পাই না! এমন সময়ে জড়-বার্ত্তাবহ সংবাদপত্র, ভীষণ বজ্রাঘাত তুল্য 'মধু'র অবসান জ্ঞাপন করিল—কাগজখানি হস্তেই ছিল—ধারার পর ধারা বহিয়া উপাধান সিক্ত হইতে লাগিল, দেখিয়া ধাত্রীদ্বয় ভীতচিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, "কি মা,—কি হয়েছে, কাঁচা পোয়াতি, অমন করে কাঁদচেন কেন?" বলিলাম, কিছু না। কিন্তু কেন জানিনা সে অশ্রু নিবারণ হওয়া দূরে থাক্, আরও প্রবল বেগে বহিতে লাগিল; বাহুতে মুখাবরণ করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। তখন আমার বয়স ষোড়শ বৎসর। শুশ্রুষা-কারিণীরা মনে করিয়াছিল কোনও আত্মীয়বিয়োগ হইয়াছে—কান্না

থামানো উচিত। অতএব আমার শশ্রুঠাকুরাণীকে সম্বাদ দিবার জন্য উঠিল। তখন আমার চমক ভাঙ্গিল; বলিলাম—বসো, কিছু বল্‌তে হবে না। পরে মুখ চোখ মুছিয়া একটু স্থির হইলে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ, মা, কি হয়েছে বলনা, কাগজে কি লেখা আছে?" বলিলাম সে তোমরা বুঝ্‌তে পারবে না। তাদের আগ্রহ বাড়িয়া উঠিল, ছাড়িল না। তখন বলিলাম, রামায়ণ শুনেছিস্, ? উত্তর—"হাঁ"। ইনি তেমনই একজন, অনেক ভাল ভাল পুঁথী লিখেছেন, খুব বিদ্বান ছিলেন, বড়লোকের ছেলে ছিলেন, এখন বড় কষ্টে হাঁসপাতালে মারা গিয়েছেন। বলিতে বলিতে আবার অশ্রু প্রবাহ ছুটিয়া আসিল, আত্মসম্বরণ করিতে পারিলাম না। তারা জিজ্ঞাসা করিল, 'ইনি কি তোমার আপন কেউ'? কি বলিব? বলিলাম —'না'। বোধ হয় বিশ্বাস করিল না। হায়! সে অশ্রু এখন কোথায়? পাষাণের মধ্যেও নির্ঝর প্রবাহিত হয়? মরুভূমেও ওয়েসিস্ আছে! এখন এ কি? নিজেকে দেখিয়া নিজেই চমকিত হই, কোথা হ'তে এ অচল অটল নীরস গম্ভীর নির্ব্বিকার কে এ আমার সেই আমিকে সরাইয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। এ যে কাটিলেও শোণিত নাই, কুটীলেও মাংস নাই! কে এ? এ-প্রেত মূর্ত্তি কার? যে আমি, কৈশোরে সঙ্গিণীর বৈধব্য সমাগত দেখিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলাম—ভগবান্! ওর এ কষ্ট সহ্য কর্ত্তে পারবো না, ওকে এ কষ্ট দিও না, তার চেয়ে বুঝি নিজের হলে সহ্য হবে, সে আমি কই? এ কে নীরস নির্ম্মম নিষ্ঠুর আমার মধ্যে দাঁড়াইয়া ঈষদ্ধাস্যে জগৎকে কৌতুক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছে। আমি ইহাকে ত কখন চাহিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তোমরা কিছু মনে করিও না,—বার্দ্ধক্যের ধর্ম্মই বুঝি এইরূপ, নহিলে প্রসঙ্গান্তরে আসিয়া পড়িব কেন।—যাক্, তার পর, দাইরা নাছোড়বান্দা, ছাড়িল না, বলিল 'মা, দয়া করে আমাদের ওনার রামায়ণ পড়ে বুঝিয়ে দিতে হবে।' বিষম সমস্যা,—আঁতুড়ে ঝাঁদের মেঘনাদ বুঝাইতে হইবে। তখন

তাহাদের বিষম আগ্রহ দেখিয়া মেঘনাদ হইতে মধুর মধুর সমগ্র পদাবলী ছত্রে ছত্রে তাহাদিগকে বুঝাইতে নিযুক্ত হইলাম, তাহারা নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া চিত্রপুত্তলিকা তুল্য মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত! এমন কি তারা যেন ক্ষুধা-তৃষ্ণাও ভুলিয়া গিয়াছিল, মেঘনাদ যখন শেষ হইল তখন তাহারা অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিল। প্রমীলার যুদ্ধ, চিতারোহণাদি সমস্ত সত্য ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করিল, বলিল—"মা, কথকের মুখে রামায়ণ, মহাভারত কত শুনেছি, কিন্তু এমন কথা কখনো শুনিনি"!

এই গ্রন্থাবলী পাঠ কালে একদা চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীতে পাঠ করিলাম,—

"তোমার হরণ গীত গাব বঙ্গাসরে,
নবতানে, ভেবেছিনু সুভদ্রা সুন্দরী,
কিন্তু ভাগ্যদোষে শুভে আশার লহরী
শুকাইল—গ্রীষ্মে যথা জলরাশি সরে,"

পরে,—

"কোনও ভাগ্যবান কবি, পূজি দ্বৈপায়নে,
"লভিবে সুযশ সাঙ্গি এ সঙ্গীত ব্রতে"।

—জানিনা কেন, এই কয়ছত্র পাঠ করিয়া আমার মধ্যে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইতে লাগিল—মনে হইতে লাগিল—আচ্ছা আমি কি সুভদ্রা হরণ ঐখান থেকে লিখে শেষ করতে পারবো না? মনের ভিতর হইতে উত্তর আসিল, নিশ্চয় পারবে। কে যেন ঐ কথা বারম্বার বলিতে লাগিল।

তারপর সূতিকা-গৃহ হইতে উঠিবার বিশ পঁচিশ দিন পরে আমার উপর আত্মার আবেশ হইতে আরম্ভ হইল, আমাদের বহু জনাকীর্ণ একান্নবর্ত্তী সকলেই দেখিল, দেখিয়া স্তম্ভিত হইল; টেবিলের উপর খাতা পেন্সিল রক্ষিত হইল, উক্তাবস্থায় লেখা বাহির হইল,—

“আর কি তা আছে, যেদিন প্রাণেশ মুগ্ধ
অহল্যা রূপেতে সে ত সেদিন গিয়াছে।
সহস্রলোচন হায় তবু অন্ধ আঁখি
হায় নাথ তবু অন্ধ আঁখি কামমোহে,
আমি হেয়ঃ হায় নাথ মানবীর কাছে,
তোমার ত্রিদশ ঈশ্বরী তব ভার্য্যা,
পুলোমনন্দিনী রূপে জগৎ দুর্লভা।”

উক্ত অবস্থান্তে সকলে লেখা লইয়া চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর সহিত মিলাইয়া দেখিলেন, যে স্থান হইতে দেড় না দুই পৃষ্ঠা লিখিয়া শেষ হইয়াছে, সেই স্থানের পর হইতেই লেখারম্ভ হইয়াছে, তাহার পর হইতে কখন কখন উক্তাবস্থায় লেখা হইয়াছে, কখন বা সহজ অবস্থায় লেখা হইত; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, এত তাড়াতাড়ি মনে আসিত যে লিখিয়া উঠিতে পারিতাম না। প্রায় এক সর্গ লেখার পর হঠাৎ একদিন মনে হইল, মধুসূদন সরস্বতী-বন্দনা করিয়া আরম্ভ করিয়াছেন, আমার যে এতটা লেখা হইল, আমার ত বাণী-বন্দনা করা হয় নাই। আশ্চর্য্য এই যে, ইহা মনে উদিত হইবামাত্রই কোন মুখস্থ কবিতা মনে আসার ন্যায় এই সরস্বতী-বন্দনাটি তৎক্ষণাৎ লিখিত হইয়াছিল :—

আমিও জননী ধরি ওপঙ্কজ-পদ
কামদ সদা প্রার্থী রে, সাধপূর্ণ মনে,
মধু বরিষণে মধু, মোহিলা সকল
মহিলা মানবে, গাইব তাঁহার সনে
হাসিবে সবাই কোকিলের সহ হেয়ঃ
বায়সের গীত, কিন্তু কে নিবারিবে মনঃকরী
মত্ত অতি যবে, ডাঙ্গশ অঙ্কুশ বৃথা ;
কহিনু তোমারে, দাও মা কবিতা হার!

পরিব আদরে গলে ভাবে কল্পনার
সিঁথী সুধাময়, গাঁথি পরিব যতনে
সিন্দুর-বিন্দুর সনে, রমণী ললাটে
কিনা সাজে, সাজাইলে তুমি!

বলা আবশ্যক, ইহার পূর্ব্বে আমি বোধ হয় অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখি নাই। যাহা হউক, সমগ্র সুভদ্রাহরণ গ্রন্থখানি ২০৷২২ দিনের মধ্যে শেষ হইয়াছিল, সপ্তম স্বর্গে সমাপ্ত। এখনও হয় ত খুঁজিলে জীর্ণাবস্থায় পাওয়া যায়। ইহা লিখিবার কত পরে অর্থাৎ আমার ২৭৷২৮ বৎসর বয়সের সময় বোধ হয় 'অশ্রুকণা' বাহির হইয়াছে। তাহার পর অন্যান্য গ্রন্থও বাহির হইয়াছে। কিন্তু জানি না এ পর্য্যন্ত 'সুভদ্রা হরণ' কেন বাহির হয় নাই। নারায়ণের কৃপা হইলে সকলই সম্ভব হয়। দেখা যাউক, বাণীর ইচ্ছায় নারায়ণের কৃপা কি আকার ধারণ করে।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

অন্বেষণে

ওরে তাহারে খুঁজিতে যাস্ কোন্ ভিতে
উন্মত্ত সমান ধাও—
এই হৃদয়-মন্দির মাঝারে দাঁড়ায়ে
নিরখিতে ক্ষণ চাও!
সে যে রস অনুভূতি, বিহীন মুরতি!
পাগল করিবে তোরে,
যেন, কুসুমের বাস হৃদয় উল্লাস
জনমান্ধ জনে করে!

ওরে, যদি না আসে দুঃসহ, আকুল বিরহ
তবে মিলন বুঝিবে কেবা?
যেন প্রসূতি বেদনা মায়েরে বুঝায়!
—স্নেহের স্বরূপ কিবা।
সেযে আনন্দ-কন্দরে আনন্দ-নির্ঝর
—অব্যক্ত মাধুরী-ঝারা!
সদা আস্বাদে সে রস প্রেমিক পরাণে
আন জনে খুঁজে সারা।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

"তদুচিত গৌরচন্দ্র"

[৩]

[আষাঢ়ের নারায়ণের ৭৮৫ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি]

"তদুচিত গৌরচন্দ্র"-শীর্ষক প্রথম প্রবন্ধে দেখিয়াছি যে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাকে রাধাকৃষ্ণলীলার অনুবাদরূপে গ্রহণ করিলেই কেবল এ সকল "গৌরচন্দ্রের" একটা সত্য ও সঙ্গত অর্থবোধ সম্ভব হয়। পরে, দ্বিতীয় প্রবন্ধে দেখিয়াছি, গৌরাঙ্গলীলা আপনিই বিধের স্বরূপ, অনুবাদ ব্যতিরেকে ইহার মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করাও অসাধ্য। এই অনুবাদ পাইব কোথায়?

মহাপ্রভু ত প্রত্যক্ষতঃ একই পুরুষ ছিলেন। তাঁর এক দেহ, এক প্রস্থ ইন্দ্রিয়, এক মন, এক বুদ্ধি, এক আত্মা ছিল। আমরা নিজেরা যেমন এক, তিনিও সেইরূপই ছিলেন। অথচ দুই রূ[illegible]

হইলে ত লীলা হয় না। এ সমস্যার মীমাংসা কোথায়? বরঞ্চ আমাদের নিজেদের প্রাকৃত প্রণয়ের অভিজ্ঞতার দ্বারা দ্বৈতাশ্রিতা রাধাকৃষ্ণলীলার মর্ম্ম একটু আধটু বুঝিতেও বা পারি। কিন্তু মহাপ্রভুর প্রত্যক্ষ দ্বৈতাশ্রয়শূন্যা এই অদ্ভুত প্রেমলীলার রহস্য ভেদ করিব কিসে?

আমাদের মধ্যে যে একত্বের মধ্যেই দ্বৈতত্ব বা দ্বৈত আছে, আমরা এক হইয়াও যে বস্তুতঃ দুই, আমাদের নিজেদের ভিতরেই যে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়, ভোক্তা-ভোগ্য, কর্ত্তা-কর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হইয়া, আমাদের জ্ঞান, ভোগ ও কর্ম্মকে সম্ভব ও সফল করিতেছে—এইটি ত অপরোক্ষ-অনুভবের কথা। আর এই অপরোক্ষ-অনুভবকে আশ্রয় করিয়াই, মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব লীলাতত্ত্বটির নিগূঢ় মর্ম্ম উদঘাটন করিতে হয়। ইহার আর অন্য উপায় নাই।

প্রাচীন শ্রুতি—দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদবত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥

এই ঋকে এই নিগূঢ় তত্ত্বটিই প্রকাশিত করিয়াছেন। এই শ্রুতির অর্থ এই যে—

দুই পরস্পর-সংযুক্ত, সখ্যভাবাপন্ন পাখী এক বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন মিষ্ট ফল ভক্ষণ করেন, আর একজন অনশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন।

এই দুই পাখী কারা? এক সময় ভাবিয়াছিলাম, ইহাদের একটি ঈশ্বর আর একটি আমরা। একটি পরমাত্মা আর অপরটি জীবাত্মা। কিন্তু এই আমরা বলিতে কি বুঝিব? এখন আমি বা আমরা বলিতে যাহা বুঝি, তাহাকে এই যুগল পক্ষীর একটি বলিয়া ধরিয়া লইলে ত শ্রুতির অর্থ হয় না। আমির বা আমার সম্বন্ধে ত সযুজা, সখায়া প্রভৃতি বিশেষণ খাটে না। এই আমি যে পরমেশ্বরের সঙ্গে নিত্য-যুক্ত হইয়া আছি, এমন ত জানি না, বুঝি না। এই আমির সঙ্গে তাঁর এই সখ্যও ত সিদ্ধ নহে। সযুজা সখায়া—নিত্যযুক্ত ও

নিত্য-সখ্য অবস্থা জ্ঞানগম্য না হইলে সত্য হয় না। এই যোগের ও সখ্যের জ্ঞানলাভ আবশ্যক। আমার ত এজ্ঞান নাই। অতএব এই যোগ ও ভক্তি আমার সাধ্য হইতে পারে কিন্তু সিদ্ধ হয় নাই। আর যতদিন না এই সিদ্ধিলাভ হইয়াছে, অর্থাৎ যতদিন না আমি জ্ঞানতঃ তাঁর সঙ্গে নিত্যযুক্ত ও নিত্যসখ্যবদ্ধ হইয়াছি, ততদিন আমার এই আমিকে এই শ্রুতিবর্ণিত দুই পাখীর একটি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। অতএব দেখিতেছি যে এই আমি এই পাখী নয়। তবে এই পাখী কে?

সে'ও আমি বটে, কিন্তু আমার অহঙ্কারতত্ত্ব পর্য্যন্ত যে-আমির প্রসার, এই আমি সে আমির উপরে। এই আমি আমার দেহ নহে, আমার ইন্দ্রিয় নহে, আমার মন নহে, আমার বুদ্ধি নহে, আমার অহঙ্কার নহে। কিন্তু যে পরম-চৈতন্যের বা সাক্ষীচৈতন্যের উপরে আমার এসকলের প্রতিষ্ঠা, যাহার জ্ঞানে আমি জ্ঞানী, চৈতন্যে আমি সচেতন, প্রেমে আমি প্রেমিক,—যাহার শক্তিতে আমি কর্ম্মী সাজিয়া বেড়াই, সেই আমিই এই নিত্যবস্তু। তাহাই শ্রুতি-বর্ণিত দুই পাখীর প্রথম পাখী।

অতএব আপাততঃ এই দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ গভীর-তম সাক্ষীচৈতন্য পর্য্যন্ত এই যে জটিল যৌগিক বস্তুকে আমি "আমি, আমি" বলি, তাহা এক নয়, দুইও নয়, কিন্তু তিন। ইংরাজিতে বলিতে গেলে বলিতে হয়, এই আমি unity'ও নয়, duality'ও নয়, কিন্তু একটি অপূর্ব্ব trinity,—ইহাই সত্য ত্রিত্ববাদ।

আমার মধ্যে ব্রহ্ম আছেন, সত্য কথা। আমিই ব্রহ্ম, ইহাও একেবারে মিথ্যা নহে। কিন্তু "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি শ্রুতিতে যে ব্রহ্মাত্মৈকত্ব প্রতিষ্ঠিত করে, তাহার "ত্বং" এই পরিচ্ছিন্ন, উপাধিযুক্ত জীব নহে। আর এই পরিচ্ছিন্ন ও উপাধিযুক্ত জীবই আমাদের অহঙ্কারতত্ত্ব। "তত্ত্বমসি"র "ত্বং" এই অহঙ্কারতত্ত্বের উপরকার বস্তু। তাহা নিত্য,

সত্য, সনাতন ; তাহা অবিকারী, অপরিণামী, তাহা—"সাক্ষী: চেতা: নির্গুণশ্চ।" আমার মধ্যে ভগবান আছেন, সত্য কথা। আমিই এই ভগবান, ইহাও একান্ত মিথ্যা নহে। এই জন্যই প্রচলিত শঙ্করবেদান্ত যে-অর্থে ও যে-ভাবে জীব-ব্রহ্মের একত্ব স্থাপন করেন, তাহা অস্বীকার করিয়াও, বৈষ্ণবেরা পর্য্যন্ত নরকে নারায়ণ বলিয়া প্রণাম করেন। তবে যে-আমি ভগবানের বা নারায়ণের অংশ বা বিম্ব, তাহা আমার এই অহঙ্কারতত্ত্বের উপরকার বস্তু। ভগবান পূর্ণ পুরুষ, তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর। তিনি আপনি আপনার জ্ঞাতা, আপনি আপনার ভোক্তা, আপনি আপনার কর্ম্মের কর্ত্তা ও বিষয়। অর্থাৎ তিনিও এক হইয়াও একান্ত এক নহেন, কিন্তু দুই। তাঁর আপনার মধ্যেই বিষয়-বিষয়ী, জ্ঞাতা-জ্ঞেয়, ভোক্তা-ভোগ্য, কর্ত্তা-কর্ম্ম সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হইয়া তাঁহাকে পরিপূর্ণ ও স্বতন্ত্র ঈশ্বর করিয়াছে। তিনি এই-জন্য দুই'এ এক ও একে দুই। তিনি পুরুষ ও প্রকৃতি, বিষয়ী ও বিষয়, জ্ঞাতাও জ্ঞেয়, ভোক্তা ও ভোগ্য, কর্ত্তা ও কর্ম্ম,—উভয়ই। আর আমার আমিত্বের মধ্যেই, আমার অহঙ্কার-তত্ত্বকে ছাড়াইয়া, আমার জীবনের ও জীবত্বের নিত্য-আশ্রয় ভূমিতে, এই পুরুষ-প্রকৃতির নিত্যলীলার অভিনয় হইতেছে।

এই দেহের মধ্যে, এই দেহের অতীত ও দেহধর্ম্মবিবর্জ্জিত একটা কোনও কিছু আছে, এই বিশ্বাস যাহাদের আছে, তাঁহারাই আস্তিক। এই জন্য "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" বলিয়াও আমাদের সাংখ্যেরা নাস্তিক-আখ্যালাভ করেন নাই। আর এই আস্তিক্য-বুদ্ধি যাঁহাদেরই আছে, তাঁরাই নিজেদের মধ্যে আত্মার বা ব্রহ্মের বা ভগবানের বা নারায়ণের অধিষ্ঠান স্বীকার করিয়া থাকেন। নির্গুণব্রহ্মবাদীগণ নিজেদের ভিতরকার এই পরমতত্ত্বকে নির্গুণ মনে করেন। এই তত্ত্বের মধ্যে কোনও জ্ঞাতা-জ্ঞেয় বা ভোক্তা-ভোগ্যাদি দ্বৈত-সম্বন্ধের জ্ঞান বা চৈতন্য নাই। ইহা নির্ব্বিশেষবস্তু, ইহাশুদ্ধ একত্ব। সুতরাং এই পরমতত্ত্বকে লাভ করিবার জন্য ইঁহারা শূন্যসমাধির অভ্যাস করিয়া

থাকেন। ভাগবতেরা নিজেদের ভিতরকার এই পরমতত্ত্বকে সগুণ-নির্গুণের অতীত মনে করেন। এখানে সগুণ-নির্গুণের সমন্বয় হইয়াছে। এখানে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়, ভোক্তা-ভোগ্য সম্বন্ধের মধ্যেই পরমতত্ত্বের ভেদ ও অভেদ দুই' নিত্যপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; অভেদের মধ্যে ভেদ, ভেদের মধ্যে অভেদ প্রকাশ হইতেছে। এই প্রক্রিয়ার নামই লীলা। নিতাই পরমতত্ত্বের অভেদেতে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়, ভোক্তা-ভোগ্য, পুরুষ-প্রকৃতি এই ভেদ জন্মিতেছে, আবার যুগপৎ এই ভেদের মধ্যেই ইহাদের মিলনে অভেদ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই ভেদাভেদতত্ত্বই ভক্তির উপজীব্য। এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সমন্বিত যে পরমতত্ত্ব তিনিই পরিপূর্ণ ভগবান। এই ভগবান জীবের মধ্যে রহিয়াছেন। জীবের জীবত্ব তাঁহারই উপরে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারই আশ্রয়ে প্রকাশিত। সুতরাং জীবের মধ্যেই, তার নিত্য-চৈতন্যের রঙ্গ-মঞ্চেতে এই নিত্য ভাগবতী লীলার অভিনয় হইতেছে। এই নিত্য জ্ঞানলীলার গুরুশিষ্য-সংবাদের দুই একটি কথার প্রতিধ্বনি মানবের অহঙ্কারের ভূমিতে তার বুদ্ধিতে আসিয়া জাগিতেছে, আর তাহাকে ধরিয়াই মানুষ তার যাবতীয় বিজ্ঞানদর্শনাদির প্রতিষ্ঠা করিতেছে। এই নিত্য রসলীলার দুএক বিন্দু রস মানুষের জীবনে আসিয়া উপচাইয়া পড়িতেছে, আর তাহাতেই তার যাবতীয় দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরাদি সম্বন্ধের আশ্রয়ে নিত্য নব নব রস ফুটিয়া উঠিতেছে। এই রসের আভাসেই তার কাব্য, সঙ্গীত, চিত্র, ভাস্কর্য্য স্থাপত্য, নাট্য ও নৃত্যাদি চৌষট্টি কলার সৃষ্টি হইয়াছে। এই লীলার ছায়াতেই আমাদের লোকহিতৈষা, দেশহিতৈষা প্রভৃতি যাবতীয় লোকশ্রেয়ের প্রতিষ্ঠা হইতেছে। মানুষ বাহিরের সংসারলীলায় মগ্ন হইয়া কেবল এই বহিরঙ্গলীলার অভিনয়ই দেখে, কিন্তু ইহার অন্তরালে যে নিত্যলীলার অভিনয় হইতেছে, তার সাক্ষাৎকার লাভ করে না। এই জন্যই মায়াবদ্ধ হইয়া ক্লেশ পায়।

সাধন বলে, নির্গুণ-ব্রহ্মবাদী যেমন শূন্য-সমাধি অভ্যাস করিয়া,

অদ্বৈত-ব্রহ্মসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন, কেহ কেহ লাভ করিয়া থাকেন; সেইরূপ যথাযোগ্য সাধন বলে ভাগবতপন্থীগণও এই লীলো-পাসনার দ্বারা, আপনার অন্তরের নিগূঢ়তম অনুভূতিতে এই নিত্যলীলার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন। আর এই লীলা যাঁর প্রত্যক্ষ হয়, তিনি কখনও পুরুষের সঙ্গে, কখনও বা প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করিয়া, তাঁহাদের ভাবভাবিত হইয়া, এই নিগূঢ় লীলারস আস্বাদন করেন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একাত্ম হইয়া কখনও তাঁহারা দুর্জ্জয়মানিনী শ্রীরাধিকার সাধ্যসাধনা করেন, আর কখনও বা শ্রীরাধিকার সঙ্গে একাত্ম হইয়া, হা কৃষ্ণ, হা নাথ, বলিয়া ভূমিতলে গড়াগড়ি যান। এই সাধন যাঁহাদের আছে, এই অবস্থা যাঁহাদের লাভ হইয়াছে, তাঁহারাই কেবল গৌরাঙ্গলীলা বস্তুটি সত্য সত্য যে কি, ইহা বুঝেন। নিজেদের অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতা ও অপরোক্ষ অনুভূতির দ্বারা তাঁহারা গৌরাঙ্গাবতারের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়া, গৌরাঙ্গলীলার অনুবাদে রাধাকৃষ্ণলীলার মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিতে পারেন।

যাঁহাদের এই সিদ্ধিলাভ হয় নাই, তাঁহারা ইহার অনুবাদ পাইবেন কোথায়? তাঁহাদিগকে প্রথমে তত্ত্বের অন্বেষণে যাইতে হইবে। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা, তাঁহাদিগকে প্রথমে নিজেদের আত্মতত্ত্বের জ্ঞানলাভ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। বিচার ও অনুভূতিকে আশ্রয় করিয়া, নিজেদের ভিতরে একত্বের মধ্যেই যে দ্বৈত আছে; অনিত্যের মধেই যে নিত্যবস্তু আছে; ইন্দ্রিয়ের অন্তরালে যে ইহাদের নিয়ন্তা একজন আছেন, যিনি হৃষিকেশ; নিজেদের জীবনের জ্ঞান-প্রেম-কর্ম্মের ক্রমবিকাশের অন্তরালে যে জ্ঞান-প্রেম-কর্ম্মের একটা নিত্যসিদ্ধ আদর্শ এবং আশ্রয় আছে; এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের ও সংসারলীলার পশ্চাতে তাহার গতি ও নিয়তিরূপে যে একটা নিত্যসিদ্ধ জীবন-ও-সংসার লীলা রহিয়াছে; এসকল না থাকিলে জীবনের, সংসারের, দাস্যসখ্যাদি সম্বন্ধের ও রসের কোনও অর্থ ও সাফল্য থাকে না;—এই ভাবে নিজের অভিজ্ঞার বিচার ও অনুভূতির

বিশ্লেষণ করিয়া, তাঁহাদিগের পুরুষ-প্রকৃতি-তত্ত্বের মর্ম্মগ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু ইহাতেও সত্যের আভাসমাত্র পাওয়া যাইবে, সত্যের সাক্ষাৎকারলাভ হইবে না। এই আভাস পাইলে ক্রমে আস্তিক্য-বুদ্ধিলাভ হইবে। পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব যে সত্য, নিজেদের জীবনের রঙ্গভূমির অন্তরালে যে এই পুরুষপ্রকৃতির নিত্যলীলার অভিনয় হইতেছে, এই বিশ্বাস জন্মিবে। এই বিশ্বাসকেই শাস্ত্রে শ্রদ্ধা কহেন। এই শ্রদ্ধা জন্মিলে, লীলার অনুশীলনে অধ্যবসায় হইবে। অপরোক্ষ অনুভূতিলাভ না হইলেও, তখন মানসকল্পনাবলে লীলারস-আস্বাদনের সামর্থ্য জন্মিবে। তারপর, ভাগ্য প্রসন্ন হইলে, প্রকৃত সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় পাইলে, শ্রীশ্রীগুরুদেবের সিদ্ধ দেহে ভাগবতীলীলার অভিনয় প্রত্যক্ষ হইবে। তখন প্রত্যক্ষ-শ্রীগুরুলীলাকে অনুবাদ করিয়া, তাহার সাহায্যে শ্রীগৌরাঙ্গলীলার, এবং শ্রীগৌরাঙ্গলীলার অনুবাদে রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলার মর্ম্মগ্রহণ সম্ভব হইবে।

এরূপ সদ্‌গুরুলাভ সহজ নয়। যে গুরু আপনার মধ্যে, আপনার অন্তরঙ্গ অপরোক্ষ অনুভূতিতে—পুরুষপ্রকৃতির নিত্যলীলার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, মহাপ্রভুর মতন দিবানিশি সেই লীলারসে মগ্ন রহিয়াছেন, কেবল তিনিই শ্রীগৌরাঙ্গলীলার ও রাধাকৃষ্ণলীলার সত্য অনুবাদ করিতে পারেন। এমন গুরু লাখে না মিলয়ে এক। যতদিন না এমন সদ্‌গুরু-লাভ হইয়াছে, ততদিন "তদুচিত গৌরচন্দ্রের" মর্ম্মগ্রহণ সম্ভব নহে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

শান্তি

১

ওগো সৌম্য, মৌন শান্তি!
মোর ভাঙ্গি' দাও আজি, কাড়ি' নাও আজি
জীবনের যত ভ্রান্তি।
জীবনের শত ঘাত প্রতিঘাত
সহিবারে নারি আর দিবারাত
মুছাইয়া দাও পরশে তোমার শত জনমের ক্লান্তি,—
ওগো সৌম্য! ওগো মৌন!
ওগো কমনীয় শান্তি!

২

এ জীবন-গহনারণ্যে
শত শত কাজ বেঁধেছে আমায়
শত পাপ শত পুণ্যে।
আজি ভারে তার পরাণ আকুল,
এর পরপারে যাইতে ব্যাকুল
পরাণ আমার; লহ কাড়ি' মোর শতেক বাসনা দৈন্যে —
ওগো সৌম্য, ভরাও আমায়
তোমারি বিপুল পণ্যে।

৩

হৃদয়ের শত ক্রন্দন
ফুকারি' আমায় ঘিরিয়া ঘিরিয়া
বেঁধেছে অযুত বন্ধন।
ক্রন্দন কি গো ফুরাবেনা হায়?
জীবন-প্রবাহ শুকায়ে যে যায়!
বন্ধন মাঝে চিরকাল কিগো করিবে হৃদয় স্পন্দন?
ওগো ও মৌন! মৌন করাও
হৃদয়—বাসনা—ক্রন্দন।

৪

ওগো শান্তি-মন্দাকিনী!
হর্ষ বিষাদ করি' সমাহিত
এস অন্তরে নামি'।
দুখের সুখের ঘাত প্রতিঘাত
উচ্ছ্বাস ক্ষণে ক্ষণে অবসাদ
ডুবাইয়া তব অতল গর্ভে তোমারি মুরতিখানি
রাখ শুধু মোর অন্তর মাঝে
শান্তি-মন্দাকিনী।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

জাতীয় জীবনে ধ্বংসের কারণ

[২]

পূর্ব্ব প্রবন্ধে(১) আমরা দেখাইয়াছি যে ধ্বংসের প্রাক্কালে জাতীয় জীবনে কি কি লক্ষণ সচরাচর প্রকাশ পাইয়া থাকে। যে সকল প্রতিকূল শক্তি জাতীয় জীবনকে ধ্বংসের দিকে লইয়া যায়,—অর্থাৎ যেগুলিকে আমরা ধ্বংসের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি,—বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহাদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

প্রাকৃতিক দ্বন্দ্ব :—বাহ্যপ্রকৃতির সঙ্গে জীবসমূহের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। যে সকল প্রাকৃতিক শক্তি ও জলবায়ুর পরিবেষ্টনীর মধ্যে জীবদেহ গঠিত হইয়া উঠে, তাহাদের প্রভাব উহার উপর বহুল পরিমাণে কার্য্য করিয়া থাকে। ডারুইনের পূর্ব্ববর্ত্তী, বিবর্ত্তন বাদের সূচনাকর্ত্তা ফরাসীপণ্ডিত লামার্ক এপর্য্যন্ত বলেন যে, জৈববিবর্ত্তনের ইহাই একমাত্র ও প্রধান কারণ। প্রাকৃতিক শক্তি ও পরিবেষ্টনীই জীবদেহের উপর কার্য্য করিয়া তাহাকে নানা পরিবর্ত্তন ও বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিতেছে। ডারুইন ও তাঁহার অনুবর্ত্তীগণ এতটা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, প্রাকৃতিক শক্তি ও পরিবেষ্টনী জীবজগতের বিকাশের একমাত্র ও প্রধান কারণ না হইলেও, তাহা যে জীবদেহের গঠনের উপর বহুল প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই (২)।

---

(১) 'নারায়ণ'-মাঘ, ১৩২২ ··· 'জাতীয় জীবনে ধ্বংসের লক্ষণ';

(২) Darwin—The Origin of Species.

মনুষ্য জীবজগতের শ্রেষ্ঠ জীব। এই প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাব তাহার উপরেও সমান পরিমাণে কার্য্য করিতেছে। মানবজাতির উন্নতি ও অবনতি, আচারব্যবহার, রীতিনীতি প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা বহুল পরিমাণে নিয়মিত হইয়া আসিতেছে। বাক্‌ল্‌ তাঁহার 'সভ্যতার ইতিহাস' গ্রন্থে (৩) প্রাকৃতিক শক্তি ও জলবায়ু প্রভৃতিকেই মানব-সভ্যতার একমাত্র নিয়ামক বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। তাঁহার মতে মানুষ সর্ব্বাংশে প্রকৃতির দাস। যে সকল প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে সে ঘটনাক্রমে পতিত হয়, সেগুলিকে সে অতিক্রম করিতে পারে না। তাহার নিজের শক্তি যে কিছুই নাই। অবশ্য বাক্‌লের মতের গোড়ায় একটু গলদ আছে। তিনি নিজের স্বদেশ ইংলণ্ড ও ইউরোপকেই সভ্যতার আদর্শ ধরিয়া লইয়াছেন ও সেই মাপকাটী দিয়া মাপিয়া বিভিন্ন মানব-সভ্যতার মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। আবার মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে তিনি একপ্রকার ছাড়িয়াই দিয়াছেন। কিন্তু মানুষের আত্মশক্তি যে সভ্যতা-গঠনের একটী প্রধান অঙ্গ—তাহা আমরা পরে দেখিতে পাইব।

কিন্তু বাক্‌লের মতকে সর্ব্বাংশে গ্রহণ করিতে না পারিলেও তাহার মধ্যে যে অনেক পরিমাণে সত্য নিহিত আছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অনুকূল জলবায়ু, উর্ব্বরাভূমি, গভীর ও বিশাল প্রবাহিনী, বন্দরোপযোগী সমুদ্রকুল,——এ সকল যে সভ্যতা বিকাশের বিশেষ-রূপে সহায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতা বিকাশের কেন্দ্রস্থলগুলি পর্য্যালোচনা করিলেই এ কথা আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে। প্রাচীনতম আসিরিয়া ও ব্যাবিলনের সভ্যতা ইউ-ফ্রেটিস্‌ ও টাইগ্রিস্‌ নদীর সঙ্গমক্ষেত্র আধুনিক মেসপটেমিয়া দেশেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই নদীমাতৃক উর্ব্বরা দেশ আবার সমুদ্রতীরবর্ত্তী

---

(৩) Buckle's History of Civilisation.

হওয়ায় বাণিজ্যের পক্ষেও বিশেষরূপে অনুকূল হইয়াছিল। প্রাচীন সভ্যতার অন্য এক কেন্দ্রস্থল মিসর দেশ। আর এই মিশর-সভ্যতা বহুশাখাশালিনী নীল নদীর আশ্রয়েই পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য-সভ্যতা একদিকে আর্য্যাবর্ত্তের অনুকূল জলবায়ু, অপরদিকে সিন্ধু গঙ্গা প্রভৃতি বিশাল নদীপ্রবাহদ্বারাই অনেক পরিমাণে নিয়মিত হইয়াছিল। প্রাচীন চৈনিক সভ্যতার কেন্দ্রস্থলও ইয়াংসিকিয়াং ও হোয়াংহো নদীর লীলাস্থল, সমুদ্রতীরবর্ত্তী উর্ব্বরা ভূখণ্ডেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আধুনিক পণ্ডিতদের আবিষ্কারের ফলে জানা গিয়াছে যে, দক্ষিণ-আমেরিকার পেরু ও মধ্য-আমেরিকার মেক্সিকো প্রভৃতি স্থান অতি প্রাচীনকালে একটা বিপুল সভ্যতার কেন্দ্রস্থল ছিল। আর ঐ দুই স্থানই যে প্রকৃতিক অবস্থান হিসাবে দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার শ্রেষ্ঠ স্থান তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন না। প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সভ্যতাও সমুদ্রতীরবর্ত্তী বাণিজ্যের অনুকূল স্থানেই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। আধুনিক কালেও সমুদ্রবেষ্টিত ইংলণ্ড ও জাপান, নদীমাতৃক ফ্রান্স ও জার্ম্মাণী, নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু নদীহ্রদশালিনী আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রভৃতিও প্রকৃতির অনুগ্রহে বঞ্চিত হয় নাই।

অপর পক্ষে প্রতিকূল প্রাকৃতিক শক্তি অনেক জাতি ও সমাজকে যে চাপিয়া রাখিয়াছে—তাহাকে বিকাশ ও উন্নতির পথে যাইতে দেয় নাই—তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি ও সামর্থ্যকে প্রবল বাধার দ্বারা পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে, ইহাও লক্ষ্য করিলে দেখা যাইতে পারে। অসহ্য শীত ও অসহ্য উত্তাপ উভয়ই মানব প্রকৃতিকে পঙ্গু করিয়া ফেলে, তাহার বিকাশের পথে বাধা দেয়। উত্তর মেরুর নিকটবর্ত্তী ল্যাপল্যাণ্ড, গ্রীণল্যাণ্ড ও আইস্‌ল্যাণ্ডের অধিবাসীবৃন্দ ইহার দৃষ্টান্তস্থল। ইহারা যে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন জাতি, ইহা একপ্রকার নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের জাতীয় জীবনের কালপরিমাণ দীর্ঘ হইলেও, তাহারা এযাবৎ বিশেষ কোনই উন্নতি করিতে পারে নাই—সেই

অতি প্রাচীন অসভ্যাবস্থাতেই আছে বলিলেই হয়। ইহাদের প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী এত প্রবলরূপে প্রতিকূল যে ইহারা কিছুতেই তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীবৃন্দ জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য-সম্পদে ক্রমেই সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে; কিন্তু ইহারা সেই প্রাচীন কালের মতই সীল-মৎস্য শিকার করিয়া ও বল্গা-হরিণে চড়িয়াই কোন প্রকারে জীবন কাটাইয়া দিতেছে। অসহ্য উত্তাপের ফলে মরুভূমিবাসী আরব বেদুইন ও মধ্য-আফ্রিকার অসভ্য নিগ্রোজাতিসকল এই বিংশ শতাব্দীতেও সেই অতি আদিম অবস্থাতেই জীবন যাপন করিতেছে। ব্রেজিলের আরণ্য-প্রকৃতি এত ভীষণ যে তৎস্থানবাসী মানবজাতি কিছুতেই তাহাকে অতিক্রম করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে নাই। দুর্গম পর্ব্বতবেষ্টিত ককেসিয়া ও তিব্বতের অধিবাসীগণ এবং নির্জ্জন দ্বীপবাসী পলিনেশিয়ার নানাজাতির দৃষ্টান্তও এস্থলে দেওয়া যাইতে পারে।

জল বায়ু ও প্রাকৃতিক শক্তির পরিবর্ত্তনও অনেক সময় মানব সভ্যতার গতি ফিরাইয়া দেয়। যেরূপ অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে কোন সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, হঠাৎ তাহার পরিবর্ত্তনে জাতীয় উন্নতির গতি রুদ্ধ হইতে পারে। ইহার দৃষ্টান্ত মানব-জাতির ইতিহাসে বিরল নহে। যে স্থানে আসিরিয়া ও ব্যাবিলন সভ্যতার জন্মভূমি, ঐ স্থানে যে বহু প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, 'আব হাওয়া'র দ্রুত পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আর ঐ পরিবর্ত্তন যে প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসের পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে, ইহাও বলিতে পারা যায়। বর্ত্তমান কালে তাতার ও পশ্চিম মঙ্গোলিয়া প্রদেশ নদীহীন মরুভূমি সদৃশ। কিন্তু প্রাচীন কালে ঐ স্থান যে কিয়ৎ পরিমাণে 'সজলা সফলা' ছিল, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। আর ঐ স্থানে যে পূর্ব্বকালে একটা সুবিস্তৃত সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, পাশ্চাত্য পণ্ডিত ষ্টীন, সেভেন হেডেন প্রভৃতির আবিষ্কারের ফলে তাহা এখন সুবিদিত হইয়াছে। ঐ

প্রাচীন মধ্য-অসিয়ার সভ্যতার উপরে ভারতের আর্য্য বৌদ্ধ সভ্যতার কম প্রভাব ছিল না। প্রধানতঃ প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের ফলে সে সভ্যতা এখন কোথায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন সভ্যতার জন্মস্থান সেই দেশ এখন যাযাবর বর্ব্বর জাতিসমূহের বাসস্থান। কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন যে, উত্তর মেরুর সন্নিকটে ইউরোপ ও আসিয়ার সন্ধিস্থলে, আদিম আর্য্য সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। তখন ঐ স্থানের জল বায়ু অনেকটা নাতিশীতোষ্ণ ছিল। কালে হিম যুগের আবির্ভাবে ঐ দেশ লোক-বাসের অনুপযোগী হইয়া উঠিল ও সুপ্রাচীন আর্য্যসঙ্ঘ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। বরফাবৃত সাইবিরিয়ার সমতল প্রান্তর এখন শ্বেতভল্লুক ও রাজদণ্ডে দণ্ডিত রাসিয়ার হতভাগ্য অধিবাসীদের জন্যই প্রধানতঃ নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

আধুনিক কালে বাঙ্গালা দেশেও একটা প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, এইরূপ আমাদের মনে হয়। নদীপ্রাধান্য, জল-প্লাবন-বিধৌত উর্ব্বরা ভূমির নিম্নতা ও সমুদ্র সান্নিধ্যই যে প্রাচীন বাঙ্গালার সভ্যতাবিকাশের মূল, তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র এবং তাহাদের অগণিত শাখাপ্রশাখা একদিকে যেমন বাঙ্গালাকে 'সুজলা সুফলা' ও অন্তর্ব্বাণিজ্যের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিল,—অন্য দিকে তেমনই, এই নদীমালার সাহায্যেই প্রাচীন বঙ্গীয়গণ রণতরীবলে দুর্দ্ধর্ষ ও প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। প্লাবন-বিধৌত সমতলভূমি বাঙ্গালার নীরোগ-গৃহকে ধনধান্যে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। প্রতিবাসী সমুদ্রকেও প্রাচীন বাঙ্গালী কাজে লাগাইতে ভুলে নাই। আজিকার এই সমুদ্রযাত্রাবিমুখ বাঙ্গালীজাতির পূর্ব্বপুরুষেরাই বিশাল মহাসমুদ্র অকুতোভয়ে পার হইয়া দেশদেশান্তরে বানিজ্য বিস্তার করিয়াছিল ও ভারত মহাসাগরের নানাদ্বীপ-পুঞ্জে বাঙ্গালার জয়পতাকা উড়াইয়া দিয়াছিল (৪)।

(৪) History of Indian Shipping and Maritime Activity—by Dr. Radha Kumud Mukerjee. এবং

কিন্তু বাঙ্গালাদেশের এই প্রাকৃতিক সংস্থান চিরকাল একরূপ থাকিতে পারে না। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, প্রায় সমগ্র বাঙ্গালা-দেশটাই গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের বদ্বীপ হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে। উত্তরে শিবালিক গিরিমালা, পূর্ব্বে রাজমহল পাহাড়, পশ্চিমে চট্টগ্রামের মালভূমি ও দক্ষিণে সমুদ্র, বাঙ্গালাদেশের এই অধিকাংশ আয়তনই বদ্বীপজাত সমুদ্রতীরবর্ত্তী নিম্নভূমি। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র ও তাহার শাখাপ্রশাখা, এই সমতট দেশের প্রায় সর্বস্থান দিয়াই বহিয়া চলিয়াছে; বর্ষায় ইহাদের প্লাবনে এই দেশের প্রায় সর্ব্বত্র বিধৌত হইয়া আসিয়াছে। ফলে এক দিকে যেমন দেশ উর্ব্বরা ছিল, অন্য দিকে কোন সংক্রামক বা দেশব্যাপী ব্যাধিও সেখানে বিশেষরূপে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। কিন্তু এই নিম্নভূমি চিরকালই নিম্ন থাকিতে পারে না। প্রাকৃতিক কার্য্যের ফলেই নদীবাহিত পলিপুঞ্জের দ্বারা ও অন্যান্য কারণে ক্রমেই এই দেশ উচ্চ হইয়া উঠিতেছে; নদীগর্ভসকল ক্রমেই অগভীর, শুষ্ক ও ভরাট হইয়া আসিতেছে। ইহার ফলে বর্ষায় নদীর প্লাবন আর তেমন ভাবে দেশের সর্ব্বত্র ধুইয়া লইয়া যাইতে পারে না। অনেক স্থলে প্লাবনের জল বাহির হইবার পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে বর্ষার প্লাবন আসিয়া দেশের সর্ব্বত্র ধৌত ও পরিষ্কার করিয়া দিয়া যাইত; তাহাতে জল সরিয়া গেলে ভূমি শুষ্ক ও ব্যাধিবীজহীন হইত; নদী সকলও গভীর ও জলপূর্ণ থাকিত। কিন্তু এখন ক্রমশঃ ভূমি উচ্চ হওয়াতে প্লাবনের জল আর তেমন ভাবে যথেষ্ট পরিমাণে আসে না, ও যাহা আসে তাহাও বাহির হইতে পারে না; নদী সকলও আর তেমন গভীর ও পরিপূর্ণ থাকে না। ফলে, দেশ আর্দ্র ও স্যাঁতসেঁতে হইয়া উঠিতেছে, নদীর মুখ ভরাট হইয়া দেশে ক্রমেই জলাভাব ঘটিতেছে। প্রাকৃতিক কার্য্য এই ভাবে চলিতে থাকিলে বহুকাল পরে হয়ত নিম্নভূমি বাঙ্গালাদেশ—বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও পাঞ্জাব প্রভৃ-

'সাগরিকা'—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়,—'সাহিত্য', ১৩২০।

তির ন্যায় নদী-বিরল, শুষ্ক, উচ্চভূমি হইয়া উঠিবে। কিন্তু বর্ত্তমান এই মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় দেশ যে এখনকার ন্যায় স্যাঁতসেঁতে ও আর্দ্র থাকিবে ও ক্রমেই সেখানে জলাভাব বেশী পরিমাণে ঘটিতে থাকিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান বাঙ্গালাদেশের অনেক স্থানে রেল-ওয়ে লাইন বিস্তৃত হইয়াছে। ইহার ফলেও দেশের অনেক স্থলে জলনিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়াছে ও সেতুনির্ম্মাণের দ্বারা অনেক নদীর স্রোতের গতি হ্রাস ও মুখ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আর আর্দ্র ও স্যাঁতসেঁতে ভূমি, প্লাবনের অভাব, নদীর অগভীরতা ও মুখরোধ, দেশের নানাস্থানে জলনিকাশের বাধা—এই সকল যে ম্যালেরিয়ার ন্যায় দেশব্যাপী ভয়ঙ্কর রোগের একটা প্রধান কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালাদেশে গত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি ও বিস্তারের আরও অনেক আভ্যন্তরীণ কারণ থাকিতে পারে,—দেশব্যাপী দারিদ্র্য যে এই ভীষণ রোগের বিস্তারের পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন সমূহ যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কারণ, ইহাই আমাদের মনে হয়। ম্যালেরিয়াতত্ত্ববিৎ ডাক্তার বেণ্টলীও ইহার প্রায় সকলগুলিকেই বাঙ্গালার ম্যালেরিয়ার কারণ বলিয়া সম্প্রতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন (৫)। কালে প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে অথবা মানুষের উদ্যমে হয়ত ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধ হইতে পারে। কিন্তু এখন যে এই ভীষণ রোগ বাঙ্গালা জাতিকে ধ্বংসোন্মুখ করিয়া তুলিয়াছে, তাহা বোধ হয় আর বলিতে হইবে না। গত বৎসর এক ম্যালেরিয়াতেই বাঙ্গালাদেশে দশ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছে; বোধ হয় ইউরোপের এই ভীষণ যুদ্ধেও এর চেয়ে বেশী লোক মরিয়াছে কিনা সন্দেহ। আর এই মৃত্যু-সংখ্যা বৎসরের পর বৎসর বাড়িয়াই আসিতেছে! ফলে, দেশে জন্মের হার ত বাড়িতেছেই না,

---

(৫) Dr. Bentley—Lectures on Malaria (University Lectures, 1916).

বরং মৃত্যুর হার উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। শিশু-মৃত্যু সাংঘাতিক রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রসূতি-মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়িয়াছে। কোন্ দিকে যাইয়া যে ইহার শেষ হইবে তাহা ভাবিতেও মন গভীর বিষাদাচ্ছন্ন হইয়া উঠে।

এই প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের ফলে বাঙ্গালাদেশের আরও অনেক অবস্থা পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা। ইহাতে স্বচ্ছন্দমত নৌচালনের পথ বন্ধ হওয়াতে অন্তর্বাণিজ্যের অনেক অসুবিধা ঘটিবে। বন্যার সঙ্গে জমিতে পূর্ব্বের মত পলি না পড়াতে, ভূমির উর্ব্বরাশক্তি কমিয়া যাইবে; ধনধান্যপূর্ণ বাঙ্গলাদেশ হয়ত অনুর্ব্বর হইয়া দাঁড়াইবে। এক কথায়, রোগ দারিদ্র্য প্রভৃতি জাতীয় জীবনের ঘোরতর শত্রু সকল এই পরিবর্ত্তনের ফলে ধীরে ধীরে বাঙ্গালাদেশ অধিকার করিতে থাকিবে ও বাঙ্গালী জাতিকে ক্রমে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবে।

জাতীয়দ্বন্দ্ব:—প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্বের ফলে অনেক জাতি যেমন ধ্বংস হইয়া যায়, জাতিতে জাতিতে দ্বন্দ্বও তেমনই অনেক জাতির ধ্বংসসাধন করে। ফলতঃ এই প্রতিযোগীতা ও দ্বন্দ্ব মানবসমাজে এতই প্রবল ও সর্ব্বব্যাপী যে অন্যান্য জীবের ন্যায় মানুষেরও ইহা সাধারণধর্ম্ম বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রতিযোগীতার সর্ব্বাপেক্ষা প্রকটমূর্ত্তি জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ। পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে প্রাচীনকালে কত জাতি যে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। অসভ্য ও বর্ব্বরাবস্থায় বলিতে গেলে যুদ্ধই মানুষের একমাত্র কার্য্য ছিল। নিজের আহার সংগ্রহ ছাড়া আর যতটুকু সময় বাকী থাকিত, মানুষ তাহা যুদ্ধ করিয়াই কাটাইয়া দিত। অসভ্য লোহিত-ইণ্ডিয়ান্-জাতিরা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যুদ্ধই করিত, আর তাহার ফলে তাহাদের মধ্যে কত শাখাজাতি যে লুপ্ত হইয়া যাইত তাহার ইয়ত্তা নাই (৬)। কাফ্রি, নিগ্রো, পলিনেশিয়ান্ প্রভৃতি জাতিদের মধ্যেও ইহার দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি রহিয়াছে।

(৬) Malthus on Population.

অপেক্ষাকৃত সভ্য অবস্থাতেও মানুষের এই জিগীষা-প্রবৃত্তি সমান প্রবল দেখা যায়। প্রাচীন রোমক ও গ্রীকেরা প্রতিবাসী দুর্ব্বল জাতিদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াই সময় কাটাইত। প্রাচীন হিব্রু জাতি রোমের সঙ্গে যুদ্ধের ফলেই একপ্রকার ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। ভারতবর্ষে প্রাচীন আর্য্যজাতিরা অনার্য্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করাটাই জীবনের একটা প্রধান কার্য্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহাদের অস্ত্রের মুখে কত অনার্য্যজাতি যে ভারতবর্ষ হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহা কে বলিতে পারে। মধ্যযুগের ইউরোপও এক বিপুল সমর-ক্ষেত্র ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না; আর সেই সমরক্ষেত্রে কত দুর্ব্বল জাতি যে প্রবলের সম্মুখে আত্মবলি দিয়াছে তাহার ইতি-হাস পাঠকের অবিদিত নাই। প্রায় সেই সময়েই ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান, পাঠান ও মোগল, শিখ, রাজপুত ও মারহাট্টা জাতিতে মিলিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া রণক্রীড়া করিতেছিল। আধু-নিক কালেও ইউরোপের সভ্যজাতিরা কি নিষ্ঠুরভাবে আমেরিকা ও পালিনেশিয়ার বহু অসভ্য ও বর্ব্বর জাতির তরবারি-মুখে উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিল, তাহা ভাবিতেও হৃদকম্প উপস্থিত হয়। আর এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের লীলাক্ষেত্র ইউরোপ ভূখণ্ডে যে ভীষণ মৃত্যুক্রীড়া চলিতেছে, তাহার পরিণাম যে কোথায় যাইয়া দাঁড়াইবে, তাহা ভাবিয়াও মানবজাতি শিহরিয়া উঠিতেছে।

প্রবল জাতির সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধের ফলে দুর্ব্বল জাতির যে সাক্ষাৎ ধ্বংস ঘটে তাহার দৃষ্টান্ত-বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। কিন্তু সাক্ষাৎ ধ্বংস না ঘটিলেও যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী আনুষঙ্গিক ফলে যুধ্যমান জাতিসকলকে যে অনেক স্থলে ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের পথে লইয়া যায় তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা বিশেষ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব।

যুদ্ধের ফলে মানবজাতির যে কত অনিষ্ট ঘটে তাহা বিবৃত

করিয়া অনেক চিন্তাশীল মহাত্মারা বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনার স্থানাভাব। সুতরাং আমরা সংক্ষেপে কিছু বলিতে চেষ্টা করিব।

১। আর্থিক :—যুদ্ধের ফলে জাতির যে ঘোরতর আর্থিক ক্ষতি হয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। তাহার বহুযত্নসঞ্চিত, বহুবর্ষের পরিশ্রমলব্ধ, বিপুল ধনসম্পত্তি যুদ্ধের ফলে একনিমিষে নষ্ট হইয়া যায়। বাড়ীঘর প্রাসাদহর্ম্ম্য, গ্রামনগর, শিল্প ও বিদ্যামন্দির প্রভৃতি বহুযুগের জাতীয় সাধনার ফলস্বরূপ কত বস্তু যে ভস্মসাৎ হইয়া যায়, তাহার ইয়ত্তা নাই। যুদ্ধের বিপ্লবে শান্তজীবনের অনেক শৃঙ্খলাতেই উলোটপালট ঘটে, বহুশতাব্দীর পরিশ্রমে চালিত অমূল্য শিল্পবাণিজ্যের ধারা লুপ্ত হইয়া যায়। জীবিকার সকল ব্যবস্থা, ধনোৎপাদনের সকলপ্রকার প্রণালীই যুদ্ধদানবের ধ্বংসদণ্ডের স্পর্শে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। দানবের প্রধান সহচর দুর্ভিক্ষ, জাতীয় ঋণের পতাকা হাতে করিয়া বিজয়গর্বে নৃত্য করিতে থাকে, আর করভারে প্রপীড়িত দুর্ভাগ্য নরনারী সেই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া জীবনে হতাশ ও অবসন্ন হইয়া পড়ে।

২। সামাজিক :—জাতির প্রধান সম্পত্তি মানুষ। যুদ্ধে সেই প্রধান সম্পত্তিই বিশেষরূপে ক্ষয় হয়। পূর্ণবয়স্ক ধনবান্ ও সুস্থ ব্যক্তিরাই প্রধানতঃ যুদ্ধ করিতে যায়। বিদ্বান বুদ্ধিমান্, জ্ঞানী ও মনুষ্যত্বযুক্ত ব্যক্তিরাও দেশের বিপদে স্থির থাকিতে পারে না। ফলে দেশের যাহারা শিরোভূষণ, সমাজের যাহারা মেরুদণ্ড, যুদ্ধে তাহাদেরই পতন হইয়া থাকে। আর তাহার ফলে যে জাতির কত ক্ষতি হয় তাহা বলিবার আবশ্যক নাই। অপর পক্ষে, যুদ্ধে পুরুষেরাই প্রধানতঃ যোগ দেয়; সুতরাং যুদ্ধের ফলে পুরুষের সংখ্যাই কমিয়া যায় ও সমাজে পুরুষের অনুপাতে স্ত্রীলোকের অত্যধিক সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। ইহাতে ব্যভিচারের প্রাদুর্ভাব ও সঙ্কর জাতির সৃষ্টি হয় ও জারজের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আর এসকলই জাতীয়

জীবনের পক্ষে বিষস্বরূপ। আবার, যাহারা যুদ্ধ করিতে যায় না, তাহারা প্রায়ই বৃদ্ধ, রুগ্ন, অপরিণত বয়স্ক, ভীরু, কাপুরুষ ও স্বার্থপরের দল। ইহাদের ঔরসে যেসকল সন্তান জন্মে, তাহারা কখনই সুস্থ, বলবান্, মনুষ্যত্বযুক্ত হইতে পারে না; সুতরাং ইহাদের জন্ম জাতির পক্ষে মঙ্গলকর হয় না। যুদ্ধ হইতে যাহারা ফিরিয়া আসে, তাহাদের মধ্যেও অধিকাংশ রুগ্ন, বিকলাঙ্গ ও স্নায়ু-দৌর্ব্বল্যে কাতর হইয়াই আসে। ইহাদের বীজও বিশুদ্ধ হইতে পারে না; কিন্তু সমাজে পুরুষের অল্পতা নিবন্ধন এই সকল ব্যক্তিই বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে ও জাতীয় জীবনে দুর্ব্বলতা ও নানারূপ রোগের প্রসারে সাহায্য করে।

৩। নৈতিক:—পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহাতেই বুঝা যাইবে যে যুদ্ধের পরে সমাজের মধ্যে নানরূপ ব্যভিচার ও দুর্নীতি বাড়িতে থাকে। গার্হস্থ্য বন্ধন ও পারিবারিক পবিত্রতা কমিয়া যায়। দীর্ঘকালব্যাপী অস্বাভাবিক উদ্বেগ ও তীব্র পরিশ্রমের প্রতিক্রিয়া-রূপে কর্ম্মে উৎসাহ ও একাগ্রতা শিথিল হইয়া পড়ে। বিলাসিতা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এদিকে সমাজের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের ক্ষয়ে জাতীয় জীবনে চিন্তাশীলতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের হ্রাস হইতে থাকে লোকে ইন্দ্রিয়-ভোগসুখে মত্ত হইয়া জীবনের উচ্চ আদর্শ ভুলিয়া যায়; আর অন্তর্জ্জগতের যে গভীরতা ও অনন্তোন্মুখী-নতা ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি, সমাজ হইতে তাহা লোপ পাইতে থাকে।

এইরূপে যুদ্ধের আনুষঙ্গিক ফলে, জাতীয় জীবনের যে ক্রমে ক্রমে ধ্বংস হইতে থাকে, ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। অনেক স্থলে একেবারে ধ্বংস না হইলেও জাতি আর পূর্ব্বের উন্নতা-বস্থা ও সভ্যতা ফিরিয়া পায় না; আর ইহাও ধ্বংসেরই নামান্তর। জগজ্জয়ী রোম পৃথিবী জয়ের আকাঙ্ক্ষায় যে বহুবর্ষব্যাপী যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহারই শোচনীয় পরিণাম যে তাহার উত্তরকালীন ধ্বংসের ভিত্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই। যুদ্ধের যতগুলি ভীষণ ফলের

উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে, তাহার প্রায় সকলগুলিই রোমকদের জাতীয় জীবনে দেখা গিয়াছিল; এবং এইরূপে রোম যখন দুর্ব্বলতা ও দুর্নীতিপরায়ণতার মধ্যে হাবুডুবু খাইতেছিল, বর্ব্বর গথেরা তখনই আসিয়া তাহাদিগকে অল্পায়াসেই শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে পারিয়াছিল। গৃহবিবাদ ও আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধই প্রাচীন গ্রীসেরও ধ্বংসের কারণ। দীর্ঘকাল ধরিয়া গ্রীসের বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল ও তাহাকে রোমের দাসত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছিল। আর তাহার পরে গ্রীস পূর্ব্বের ন্যায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। জ্ঞান বিজ্ঞানের যে ঐশ্বর্য্যে সে জগতকে চমকিত করিয়াছিল, তাহার সে ঐশ্বর্য্য ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। স্বাধীনতা-প্রয়াসী ফ্রান্স উৎসাহমদে ক্ষিপ্ত হইয়া প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া ইউরোপের রণক্ষেত্র যে নর-শোণিতে প্লাবিত করিয়াছিল, তাহার ফল হাড়ে হাড়ে সে বুঝিতে পারিয়াছিল। তাহারই শোচনীয় পরিণামে বিগত শতাব্দীতে সে জার্ম্মাণীর হাতে কারাবন্দী হইয়াছিল। তাহার শিল্প-বাণিজ্যের ধ্বংস হইয়াছিল, লোক-সংখ্যা কমিয়া গিয়াছিল, যে অতুল প্রতাপে সে ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় ছিল, তাহার সে অতুল প্রতাপ হ্রাস হইয়া, জগতের সম্মুখে তাহাকে হীন করিয়া দিয়াছিল এখনও তাহার পরিণাম হইতে ফ্রান্স সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি পায় নাই; এখনও লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যায় তাহাকে মাথা ঘামাইতে হইতেছে। তাহার লোক-সংখ্যা যদি অন্যান্য দেশের ন্যায় স্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পাইত, তবে আজ জার্ম্মাণীকে পদানত করিতে তাহার পক্ষে এত দীর্ঘকাল লাগিত না। কুরুক্ষেত্রের ভীষণ যুদ্ধের পর ভারতবর্ষের যে শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐ যুদ্ধের প্রাক্কালে মহাবীর অর্জ্জুন যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, (৭)

(৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—প্রথম অধ্যায়।

আমরা দেখিতে পাই যে পরবর্ত্তী কালে তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল। নিঃক্ষত্রিয় ও নিবীর্য্য ভারতবর্ষে ধর্ম্মরাজ্যের স্থাপন হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু ভারতীয় আর্য্যসভ্যতার মেরুদণ্ড যে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল ও ভারতবর্ষ যে আর তাহার পরে পূর্ব্বের ন্যায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই, পরবর্ত্তী ইতিহাস তাহাই আমাদিগকে সাক্ষ্য দেয়। আবার দশম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষের অন্ধকারময় যুগে যে আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধ ও গৃহ-বিবাদ দেশময় চলিতেছিল, তাহার শোচনীয় পরিণামও ভারতবর্ষ হাতে হাতে ভোগ করিয়াছিল। যে কিছু বীর্য্য ও তেজ ভারতবর্ষের ছিল, এই শতাব্দীর পর-শতাব্দী ব্যাপী আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধই তাহা নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। আর তাহার ফলে পাঠানদের ভারতাক্রমণ ও অধিকার অতি সহজ হইয়া উঠিয়াছিল। আধুনিক ইউরোপীয় যুদ্ধেও ইতিমধ্যেই বেলজিয়াম ও সার্ভিয়া প্রভৃতির ন্যায় ক্ষুদ্র রাজ্য সকলের যে সমূহ ক্ষতি হইয়াছে, তাহাত সকলেই দেখিতে পাইতেছেন। এইসকল জাতি যুদ্ধের পর আর পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া পাইবে কিনা, ও পাইলেও কতকাল ধরিয়া যে তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

পূর্ব্বরাগ

লালসা

১

[নায়িকা পক্ষে]

যে দিন হইতে, দেখেছি তাহারে,
পড়েছি বিষম ফাঁদে।
আর কোন কিছু, দেখে না কি আঁখি,
(সুধু) "ওই, ওই," বলি কাঁদে॥
জাগিয়া দিবসে, দেখি ওই রূপ
দেখি যে স্বপন মাঝে।
পরাণভিতরে, কিবা সে বাহিরে,
বুঝি না কোথা বা রাজে॥

কণ্ঠের সে বাণী শ্রবণে পশিয়া
মরমে বিন্ধিয়া গেছে।
তবধরি কাণ, নাহি শোনে আন
(কেবল) ছুটিছে তাহারি পিছে॥
মলয়নিঃস্বনে, মধুপ-গুঞ্জনে,
তটিনীর কলনাদে।
বিহগের গানে, ঘন-বরষণে
কেবলি সে বাণী বাজে॥

অনুকূল বাতে, একটি নিঃশ্বাসে
পাইনু অঙ্গের গন্ধ।

সে বাসে বিভোর, জানে না এ নাসা,
আর কোন ভালমন্দ ॥
সারাবিশ্ব মাঝে, তাই সুধু খোঁজে
যেমন পাগল-পারা।
কোন্ ফুলবাসে, মজাইছে তারে,
ঢুঁড়িয়া হইছে সারা ॥
প্রতি অঙ্গ মোর, দারুণ তিয়াসে
পুড়িছে তাহারি লাগি।
মিলিবে কি তারে, মিটিবে এ সাধ,
হবে কি এমন ভাগি ॥

২

[নায়ক পক্ষে]

মিছে কেন পুছ মোরে রূপের বাখান।
আমি সুধু এই জানি, হেরি তার মুখখানি,
ছুটে ভাব, টুটে ভাষা, স্তবধ পরাণ ॥

যখনি দেখিতে তারে পেয়েছে এ আঁখি
একই অঙ্গে বান্ধা পড়ি, করিয়াছে জড়াজড়ি,
গতিহীন, শক্তিহীন, তারেই নিরখি ॥

যখনি বরণ দেখি, ভুলি কি গড়ন?
গড়নে নয়ন দিলে, ভুলি যে বরণ!
ভুলে যাই মুখশশি চরণ-কমল দেখি।
ভুলি পয়োধর-শোভা, গ্রীবার বলনী লখি ॥
প্রতি অঙ্গে ডেকে বলে, চেয়ে দেখ মোরে!
কত শোভা, কি বলিব, প্রতি অঙ্গে ঝরে।

কুসুম-কোমল দেহে আঁখি পড়ে যবে,
অনন্ত পরশ কি গো, কেঁপে উঠে ভবে!
অমিয়-সিঞ্চিনী বাণী পশিলে এ শ্রবণে,
শ্রুতি বিনা কিছু আর নাহি রহে ভুবনে!
দাঁড়াইলে, কহে বিশ্ব—স্থিরা ভব ধরণী!
চলে যবে, উঠে নৃত্য বিশ্বমাঝে অমনি!
প্রতি অঙ্গ, প্রতি ভঙ্গী, প্রতি ভাব তার,
পূর্ণ করে ব্রহ্মাণ্ডের অমিয়া ভাণ্ডার॥

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম

[১৪]

জাতক ও অবদান।

মানুষ যখন বুদ্ধ হন, যখন তাঁহার দিব্যজ্ঞান হয়, তখন তাঁহার অনেকগুলি অলৌকিক শক্তির উদয় হয়। তাহার মধ্যে পূর্ব্বনিবাসের অনুস্মৃতি একটী। তিনি তখন দিব্যচক্ষে দেখিতে পান যে, সৃষ্টির প্রথম হইতে তিনি কতবার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কি কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন, এবং সেই সকল কর্ম্ম দ্বারা তিনি বুদ্ধ হইবার পথে কখন কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। আমাদের ভাষায় আমরা বলি তিনি জাতিস্মর হন। যাঁহারা পুনর্জ্জন্ম মানেন না তাঁহাদের মতে জাতিস্মর হওয়ার কথাই উঠিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা মানেন, তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে "কি ছিলাম,

কি করিয়াছিলাম” জানিবার জন্য বড়ই ব্যগ্র হন। তাঁহারা মনে করেন, ধ্যান ধারণা যোগ প্রভৃতি উপায় দ্বারা তাঁহারা পূর্ব্ব জন্মের কথা জানিতে পারেন। কেহ এক জন্ম, কেহ দুই জন্ম, কেহ বা দশ জন্ম বিশ জন্ম পর্য্যন্ত স্মরণ করিতে পারেন। পুণ্য কর্ম্ম, তীর্থ পর্য্যটন, যোগযাগ সৎকর্ম্ম করিলে হিন্দুরা মনে করেন দশজন্মার্জ্জিত পাপক্ষয় হয়, কোটী জন্মার্জ্জিত পাপক্ষয় হয়। তাই যাঁহারা পুনর্জ্জন্ম মানেন তাঁহারা এই সকল সৎকর্ম্ম করার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠেন।

বুদ্ধ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিনই দেখিতে পাইতেন। সুতরাং তিনি আপনার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম যে স্মরণ করিতে পারিতেন, তাহা আশ্চর্য্য নহে। শাক্যসিংহ বুদ্ধ হইয়া অনেক উপদেশ দিয়াছেন; সেই সকল উপদেশ লোকে যাহাতে সহজে বুঝিতে পারে, তাহার জন্য অনেক সময়ে তিনি আপনার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কথা দিয়া সেগুলি ব্যখ্যা করিয়া দিতেন। এই যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কথা, ইহার নাম জাতক।

জাতকের প্রাদুর্ভাব হীনযানে, পালিভাষায়, অত্যন্ত অধিক। পালিভাষার গ্রন্থে ৫৫৫টি জাতক আছে; অর্থাৎ বুদ্ধদেব আপনার ৫৫৫টি পূর্ব্বজন্মের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। এই যে নম্বর ৫৫৫, ইহা কিন্তু সর্ব্ববাদি সম্মত নহে; কেহ বলেন ৫৫০, কেহ বলেন ৫২৫, কেহ বলেন ৫৩৫, কেহ বলেন ৫১৫। ব্রহ্মদেশে ৫১৫ নম্বরই চলিত, তাহার মধ্যে ১০ খানি বড়-আর ৫০৫ খানি ছোট। সংস্কৃতে একখানি জাতকমালা আছে। সেখানি আর্য্য-শূরের প্রণীত; ইহাতে ৩৪টি মাত্র জাতক আছে। এই সংস্কৃত পুস্তক হীনযানের কি মহাযানের বলিতে পারা যায় না। কেন না, হীনযানের লোকেও সংস্কৃতে লিখিত; বসুবন্ধু যখন হীনযান ছিলেন, তখন তিনি অভিধর্ম্ম কোষ নামে একখানি পুস্তক লিখেন, সেখানি সংস্কৃতে। প্রোফেসর কর্ণ অথবা ভট্টবর্ণ সংস্কৃত জাতকমালা ছাপাইয়াছেন। এই সকল জাতকের

মধ্যে কোন্ কোন্‌টি পালির কোন্ কোন্ নম্বরে পাওয়া যায়, তাহাও তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন। ডেনমার্কের প্রোফেসর ফোস্‌বোল পালি-জাতকগুলি ছাপাইয়াছেন। রায় শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ সাহেব এই পালিজাতকগুলি বাঙ্গলা করিতেছেন। বুদ্ধদেব কোন্ সময়ে, কোন্ শিষ্যের কথায়, কি উদ্দেশ্যে, এক একটি জাতক বলিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়া তাহার পর তিনি সেই জাতকটির বাঙ্গলা তর্জ্জমা করিতেছেন।

বুদ্ধদেব যখন নিজে এই গল্পগুলি বলিতেছেন, তখন মনে করিতে হইবে, এই গল্পগুলি তাঁহার পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল। তিনি গল্পগুলি আপনার পূর্ব্বজন্মের গল্প বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং এ গুলি ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন সম্পত্তি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহা হইতে খৃঃ পূঃ ছয় শতকের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের রীতি নীতি, আচার, ব্যবহার, মনের ভাব, ধর্ম্মের ভাব, জানিতে পারা যায়।

মহাযানের লোকের কিন্তু, জাতকের উপর তত আস্থা ছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ, এক জাতকমালা ছাড়িয়া দিলে, উহাদের আর জাতকের বই নাই। এই জাতকমালা আবার যখন মহাযানীরা পড়ে, তখন উহার নাম হয়, বোধিসত্ত্বাবদানমালা। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় জাতকমালার বা বোধিসত্ত্বাবদানমালার যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা দেখিলে বোধ হয় যে আর্য্যশূরের লেখা এই পুঁথীখানি মহাযানীরা সঙ্গীতির ছাঁচে ঢালিয়া লইয়াছেন এবং মঙ্গলা-চরণের পর উহাতে "এবং ময়া শ্রুতমেকাস্মিন্ সময়ে ভগবান্ শ্রাবস্ত্যাং বিজহার" বলিয়া মুখপাত করিয়াছেন; অর্থাৎ আর্য্যশূরের বহিখানিকে উঁহারা বুদ্ধের বচন করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহারা প্রথমতঃ একটি নূতন জাতক দিয়া আর্য্যশূরের ৩৪টি জাতকের স্থানে ৩৫টি করিয়া লইয়াছেন। আর্য্যশূরের বহির নাম জাতকমালা; মহাযানের বহির নাম বোধিসত্ত্বাবদান, বা, বোধিসত্ত্বাবদানমালা। ইহা দেখিলেই বোধ

হইবে যে মহাযানীরা জাতক শব্দটা পছন্দ করিতেন না। উঁহারা জাতকের স্থানে অবদান শব্দ ব্যবহার করিতেন। উঁহাদেরও পূর্ব্ব-বর্ত্তী মহাসাঙ্ঘিকের দল, তাঁহারাও জাতকের পরিবর্ত্তে অবদান বলি-তেন। মহাসাঙ্ঘিক হইতেই যে মহাযানের উৎপত্তি হইয়াছে, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আরও অনেকেরই এই বিশ্বাস। মহাসাঙ্ঘিকের যে একখানিমাত্র পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অনেকগুলি জাতকের গল্প আছে, কিন্তু সেগুলির নামও অবদান। অবদান শব্দে সংস্কৃত ভাষায় মহৎকার্য্য বুঝায়। মহাযানের অবদানে শুধু বুদ্ধদেবের পূর্ব্বজন্মের কথা নয়, আরও অনেক মহাপুরুষেরই পূর্ব্বজন্মের কথা আছে। যেমন, অশোকরাজা পূর্ব্বজন্মে কোন বুদ্ধকে একমুষ্টি ধূলা দিয়া তৃপ্ত করিয়াছেন, তাই আর একজন্মে তিনি চক্রবর্ত্তী রাজা হইয়াছিলেন। সুতরাং অবদান শব্দ যতটা ব্যাপক, জাতক শব্দ ততটা নয়। মহাযানে অবদানের অনেক পুস্তক আছে। আর্য্যশূরের অবদানশতকে এইরূপ ১০০টি অবদান আছে। দিব্যাবদানমালায় ৩৭টি অবদান আছে। ভদ্রকল্পাবদানে ৩৫টি জাতক আছে। অশোকা-বদান দিব্যাবদানমালার একটি অবদান, গদ্যে লেখা; কিন্তু অশোকাব-দান নামে পদ্যে লেখা আরও একটি বৃহৎ অবদান আছে। সুগত-জন্মাবদান নামে আমরা আরও একখানি অবদান পাইয়াছি। অবদানের শেষ এবং উৎকৃষ্ট পুস্তক বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা— এখানি খৃঃ ১১ শতকে কাশ্মীরে ক্ষেমেন্দ্রব্যাসদাস নামে একজন কবির লেখা। তিনি হিন্দু, ব্রাহ্মণ ও একজন উৎকৃষ্ট কবি ছিলেন। তাঁহার একজন সুক্ক নামে বৌদ্ধ বন্ধু ছিলেন। ক্ষেমেন্দ্র যখন রামায়ণ, মহাভারত, বৃহৎকথা প্রভৃতি বড় বড় পুস্তকের বিষয় লইয়া রাময়ণ-মঞ্জরী, ভারতমঞ্জরী, বৃহৎকথামঞ্জরী প্রভৃতি কাব্য লিখিয়া খুব প্রতি-পত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তখন সুক্ক একদিন আসিয়া বলিলেন, আমাদের অবদানগুলি বড় কট্‌মট ভাষায় লেখা, কতক গদ্য, কতক পদ্য, কোনটাই সুবোধ নয়। তুমি যদি তোমার ভাষায় এইগুলি

কাব্যাকারে লিখিয়া দাও, তবে আমাদের ধর্ম্মের বড় উপকার হয়। তাই ক্ষেমেন্দ্র বোধিসত্ত্বাবদান রচনা করেন। ইহাতে ১০৮টি অবদান আছে। ইহার পূরা পুঁথী বড়ই দুষ্প্রাপ্য। এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথীতে ৫১—১০৮ পর্য্যন্ত অবদান আছে; কেম্ব্রিজের পুঁথিতে ৪১—১০৮ অবদান আছে, শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় তিব্বত হইতে একখানি পুঁথী আনাইয়াছেন, তাহাতে ১—৪৯টি অবদান আছে। তিনি পুঁথীখানি ছাপাইতেছেন, ডানপাতে সংস্কৃত বামপাতে ভুটিয়া ভাষায় তাহার তর্জ্জমা। তিনি ইহার বাঙ্গলাও করিতেছেন।

আমরা একটি জাতক ও একটি অবদান পাঠকগণকে উপহার দিতেছি। ১। আর্য্যশূরের জাতকমালার প্রথম ব্যাঘ্রী জাতক। ২। মহাবস্তু অবদানের পুণ্যবন্ত ও তাঁহার বন্ধুদিগের অবদান।

১।

এক সময়ে বুদ্ধদেব কোন ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কল্পসূত্র অনুসারে তাঁহার জাতকর্ম্মাদি সংস্কার হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত মেধাবী, কৌতূহলী ও অনলস ছিলেন। সেই জন্য তিনি অল্পদিনের মধ্যেই অষ্টাদশ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণেরা যে সব কলা শিক্ষা করিতে পারেন, সে সকল কলাতেও তিনি ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার পসার প্রতিপত্তিও খুব ছিল। কিন্তু গার্হস্থ্যে তাঁহার মন উঠিল না। তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন শুনিয়া, যাঁহারা তাঁহাকে ভালবাসিতেন, তাঁহারাও সন্ন্যাসী হইলেন। অজিত তাঁহার প্রধান শিষ্য হইল। তিনি পাহাড়পর্ব্বত, বনজঙ্গলে ভ্রমণ করিতে বড়ই ভাল বাসিতেন; অজিত সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে থাকিত। একদিন তিনি পর্ব্বতের গুহায় এক বাঘিণী দেখিলেন। সে এইমাত্র সন্তান প্রসব করিয়াছে, অত্যন্ত দুর্ব্বল, ক্ষুধায় কাতর, সতৃষ্ণ নয়নে বাচ্ছার দিকে চাহিতেছে।

ব্রাহ্মণপুত্র দেখিলেন বাঘিণী ক্ষুধায় এত কাতর যে, সে বাচ্ছাটিও খাইতে চায়। করুণার সাগর সন্ন্যাসী শিষ্যকে বলিলেন—বাঘিণী দেখিতেছি ক্ষুধায় বাচ্ছাটি খাইয়া ফেলিবে, তুমি অনুসন্ধান করিয়া যদি উহাকে কোন খাবার আনিয়া দাও, তবে বড়ই ভাল হয়। শিষ্য চলিয়া গেলে, সন্ন্যাসী ভাবিলেন,—আমার এ ছার দেহে কি কাজ? আমি ইহার আহার হইনা কেন? এই ভাবিয়া তিনি এক উচা জায়গা হইতে বাঘিণীর সম্মুখে পড়িয়া দেহ ত্যাগ করিলেন। বাঘিণীও আনন্দের সহিত তাঁহার দেহ ভক্ষণ করিতে লাগিল। শিষ্য আসিয়া দেখিল, তাঁহার গুরু বাঘিণীর জন্য দেহত্যাগ করিয়াছেন। সে আর আর শিষ্যদের এই কথা বলিল; সকলেই মনে করিল, ইনি কোন না কোন জন্মে বুদ্ধ হইবেন।

২।

কোন জন্মে ভগবান্ বারাণসীর রাজা অঞ্জনের পুত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল পুণ্যবন্ত। তাঁহার চারিজন বন্ধু ছিল। তাঁহাদের নাম বীর্য্যবন্ত, শিল্পবন্ত, রূপবন্ত, ও প্রজ্ঞাবন্ত। তাঁহাদের কাহার কি গুণ ছিল, তাহা নামেই প্রকাশ। একবার পাঁচ বন্ধুতে মিলিয়া আপনাদের গুণপরীক্ষার জন্য কাম্পিল্ল যাত্রা করিলেন। পথে তাঁহারা দেখিলেন, গঙ্গায় প্রকাণ্ড এক বাহাদুরী কাঠ ভাসিয়া যাইতেছে,—দেখিয়াই বীর্য্যবন্ত জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন ও কাঠ ডাঙ্গায় তুলিলেন। পরীক্ষায় জানিলেন এটা চন্দনের কাঠ—বিক্রয় করিয়া অনেক টাকাকড়ি পাইলেন ও পাঁচজনে টাকা ভাগ করিয়া লইয়া অনেক আমোদ আহ্লাদ করিলেন।

শিল্পবন্ত একদিন এক নগরের প্রান্তে বসিয়া বীণা বাজাইতেছিলেন। বীণায় সাতটি তন্ত্রী ছিল। বীণার ঝঙ্কারে সমস্ত লোক মুগ্ধ হইয়া ঝাঁকিয়া পড়িল। এরূপ বীণা তাহারা আর কখনও শুনে নাই। বাজাইতে বাজাইতে বীণার একটা তার ছিঁড়িয়া গেল।

কিন্তু সে এমনি কলাবৎ, ছয় তারেই সাত তারের মত বাজাইতে লাগিল। ক্রমে আরও একতার ছিঁড়িল। তাহাতেও বাজনার কোন ব্যতিক্রম হইল না। ক্রমে চার তার, তিন তার, দুই তার, শেষে এক তারে দাঁড়াইল। তখনও সপ্ততন্ত্রী বীণার ঝঙ্কার হইতেছে। নগরের লোক তাঁহাকে অনেক টাকা পুরস্কার দিল।

রূপবন্তের রূপ দেখিয়া নগরের এক বেশ্যা মুগ্ধ হইয়া গেল এবং তাঁহার কথায় তাঁহার বন্ধুগণকে অনেক টাকাকড়ী দিল।

এইবার প্রজ্ঞাবন্তের পালা। তিনি একদিন বাজারে গিয়া দেখিলেন, এক শেঠের ছেলে এক বেশ্যার সহিত ঝগড়া করিতেছে। ঝগড়ার বিষয় একলক্ষ টাকা। শেঠের ছেলে বেশ্যাটিকে আগের রাত্রিতে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিল ও একলক্ষ টাকা দিতে স্বীকার হইয়াছিল। বেশ্যার অন্য লোকের বাড়ী যাইবার কড়ার ছিল, সে সে রাত্রিতে যাইতে পারিল না। সে পরদিন সকালে আসিয়া উপস্থিত হইল। শেঠ বলিল তোমায় আমার আর কাজ নাই। রাত্রে স্বপ্নে আমি তোমায় পাইয়াছিলাম, আমার কাজ হইয়া গিয়াছে। সে বলিল যদি স্বপ্নে আমায় পাইয়াছিলে, তবে আমার টাকাটি দাও। এঝগড়ার আর মীমাংসা হয় না। দুই দলেই লোক জুটিয়া গেল। শেষে প্রজ্ঞাবন্ত আসিয়া মধ্যস্থ হইলেন। শেঠকে বলিলেন, তুমি এখনই টাকা লইয়া আইস। সে টাকা আনিয়া সম্মুখে রাখিল। প্রজ্ঞাবন্ত বলিলেন—একখানি বড় আর্শী লইয়া আইস। আর্শী আনিলে, তিনি বেশ্যাকে বলিলেন—"তুমি ঐ আর্শীর ভিতর হইতে টাকা লও। শেঠজী স্বপ্নে তোমার ছায়ামাত্র পাইয়াছিলেন, তুমিও টাকার ছায়া লও, আসল টাকায় তুমি কি করিয়া হাত দিবে?" বেশ্যার মুখ চূণ। মহানন্দে শেঠ সমস্ত টাকা প্রজ্ঞাবন্তকে পুরস্কার দিল, পাঁচ বন্ধুতে টাকা ভাগ করিয়া লইয়া খুব আমোদ-প্রমোদ করিলেন।

পুণ্যবন্ত এক রাজবাড়ীর সমুখে একদিন বসিয়া আছেন। এমন

সময় মন্ত্রিপুত্র সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি পুণ্যবন্তের পুণ্য-জ্যোতিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে রাজবাড়ীর ভিতর লইয়া গেলেন এবং উহারই এক অংশে তাঁহাকে থাকিতে দিলেন। রাত্রিতে পুণ্যবন্ত ঘুমাইয়া আছেন, রাজকন্যা আসিয়া তাঁহার সেবা করিতেছেন। এই ব্যাপার দেখিয়া রক্ষকগণ পুণ্যবন্তকে লইয়া রাজার নিকট উপস্থিত করিল। রাজা অনুসন্ধানে জানিলেন পুণ্যবন্তের কোন দোষই নাই। তিনি কাশীরাজের পুত্র জানিয়া, রাজা মহাশয় তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন ও রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিলেন।

এই পুণ্যবন্তই বুদ্ধদেব, বীর্য্যবন্ত তাঁহার শিষ্য শোনক, শিল্পবন্ত, রাষ্ট্রপাল, রূপবন্ত সুরেন্দ্র ও প্রজ্ঞাবন্ত শারিপুত্র।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

জীবন্মুক্ত

(কথা-নাট্য)

পুষ্পের কজ্জলে লেখা ছিন্ন ভুর্জ্জপাতা
হের মুক্তি লেখা তায় পড়ে হেথা সেথা!

প্রথম দৃশ্য।

[বিজয়নগরের প্রাসাদ মধ্যে কৃষ্ণরায়ের প্রমোদ উদ্যান, সম্মুখে কৃত্রিম হ্রদ, হ্রদতীরে নিকুঞ্জবাটীকা, গুচ্ছ গুচ্ছ কামিনী বকুল নাগকেশর ও স্বর্ণ চম্পকের সুগন্ধে বাতাস মোদিত, দূরে পর্ব্বতশ্রেণী ধূসর, অর্দ্ধনিমজ্জিত সন্ধ্যাসূর্য্যের আরক্ত আভা মিলাইয়া আসিতেছে... বিরাটশীর্ষ শিরীষ বৃক্ষ হইতে ফুল ঝরিয়া পড়িতেছে, হ্রদের স্বচ্ছ

জলে নীল ধূসর পাটলচ্ছবি মেঘ তরঙ্গভঙ্গে দুলিয়া উঠিতেছে... মরালশ্রেণী চঞ্চু হইতে জলধারা ছুঁড়িয়া ছিটাইয়া দিতেছে, আবার ডুবিতেছে, আর যেখানে মেঘচ্ছায়া আরক্ত স্নুবর্ণ অঙ্কিত, জলচ্ছায়ার সেই বর্ণতরঙ্গ তাহাদের জলক্রীড়ায় ভাঙিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে...তীর নিকটে জলাঘাসের উপর শেষ আলোকের রক্তপীতাভা ঝলকিয়া উঠিতেছে, সেই ঘাসের পাতায় বসিয়া প্রজাপতি পাখা নাড়িতেছে, তার সুবর্ণমণ্ডিত পাখার সূক্ষ্ম ধারে সূর্য্যকিরণ ঠিকরিয়া উঠিতেছে...বাতাসভরে হাওয়ার তালে ঘাসের পাতার সঙ্গে সঙ্গে দুলিয়া উঠিতেছে, হ্রদের চারিধারে সবুজ আঙিনা ঢালু, তাহাতে যেন কে ফুল ছিটাইয়া দিয়াছে...পার্শ্বে বহুদূর বিস্তৃত গোলাপ-কানন ..ফুলে মুকুলে ভরিয়া আছে, আর মৃদুল বাতাসে এ পাশে ও পাশে হেলিয়া দুলিয়া কুঁড়ি মুখে করিয়া হাসিতেছে... কৃষ্ণরায়ের ক্রীতদাস রাঙিয়া বৃক্ষমূলে জলসেচন করিতে করিতে একটা গোলাপের গাছের ডালে উর্ণনাভ দুলিয়া দুলিয়া জাল বুনিতেছিল, তাহার অস্ফুট কুঁড়িকে ঘেরিয়া লুতা তাহার জালের সুতার বুনানি টানিতেছিল, রাঙিয়া হাসিতে হাসিতে সেই জাল ছিঁড়িয়া দিল...আপন মনে কি কহিতে লাগিল...আর দূরে শ্যামা গোলাপ গাছের বুকে দুলিতে দুলিতে কি বলিতেছিল...]

রাঙিয়া। গুল গুল পিয়া! পিয়া! ও সখি! ফোট্ ফোট্... গুল গুল গোলাপ! ওই শোন্ শ্যামা কি বলে...পিয়া! পিয়া! গুল গুল! ও সখি ফোট্ ফোট্...এই যে ফোটে-ফোট, ডাক শুনছ আর ধীরে ধীরে পাপ্‌ড়ি মেলছ, আর রূপ ছাপা যাচ্ছে না...বাঃ, বাঃ কিন্তু কার জন্যে? বলি কার জন্যে এ রূপের ঢেউ পাপ্‌ড়িতে রাঙিয়ে তুলছ, আপনি আপনি?...না কার' জন্যে...ব্যথার কাঁটা ফোটাচ্ছ, আর রাঙিয়ে তুলছ...আপ্‌নি আপ্‌নিই...না রাঙিয়া তোমার রঙের ঝোঁকে বুঝি কি বেভুল বকছে...

ওই যে শ্যামা কি বল্‌ছে শুনছ...পিয়া! পিয়া! গুল গুল...ও সখি ফোট্ ফোট্...কিন্তু গোলাপ! ওই সূয্যি ডুব্‌ল আঁধার ত ছেয়ে আস্‌ছে, তারপর? তারপর ভোর না হ'তে হ'তে তোমার ফুলজন্মের ঘোর ত কেটে যাবে, কাল সকালে ত ওই বিলাস কুঞ্জের ফুলের পাত্রে গিয়ে বিরাজ করবে, কার জন্যে, কার' পূজোর জন্যে? হ্যাঁ... রূপের পূজো...না বিলাসের কার? কার?...কেনই এ ফোটা, আর কেনই এ কাঁটা...ওই যে শ্যামা কি বলে না, গুল গুল পিয়া! পিয়া! ও সখি ফোট্ ফোট্... গুল গুল...কেবল ফোটা...কেবলই ফোটা? কে ফুট্‌ছে গুল! তুমি না আমি? না কার' মুখের ছাঁচ্ মাটির ভেতর দিয়ে আপনি আপনিই ফুটে উঠ্‌ছে...ওই যে শ্যামা কি বলে না...বলি এত যে তোমার গোড়ায় এই জল ঢালা আর এই প্রাণ ঢালা, আর এই দিন রাত্তির ধরে তোয়াজ আর খেজমুতি,...কেবলই 'ওই ফোটা...শুধু ফুট্‌ছ, আর ফুট্‌ছি, গুল গুল পিয়া! পিয়া! তুমি ফোট ঝর...শ্যামার বুকে কাঁটা ফুটিয়ে প্রাণ মাতান সুর শোন আর ফোট, ঝর...তায় দুঃখ কি...ফোট ফোট তা বেশ, তা তা বেশ,...এ দুনিয়ায় ত' চাঁদের দাম মেলে না, দাম আছে চাঁদির...তা বেশ...রূপ বেচ, সুর কেন...তা বেশ, তা যত রূপ যত সুর সবই কি ওই সম্রাটের একলার না দুনিয়ার ও ভাগ আছে...আমি যে জন্মটা ধরে রূপের দোরে প্রাণটা বিকলেম, তার কি হোল বল...কিছু না ...হারে দুনিয়াদার!...দুনিয়াদারীটা বেশ...না? দেওয়া আর নেওয়া...এই কি দুনিয়াদারী...না হাতে গড়া প্রাণ তোমা-এই হাতধরা...

৬। সন্ধ্যার ধূসর ছায়া তখন ঘনাইয়া আসিতেছিল, হুদতীরে রাজ-

হংসগণ ডাকিতেছিল, মৃদুল বাতাসে হ্রদের কমল বন থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল...ঊর্দ্ধে আকাশতলে বলাকার পাঁতি শ্রেণীবদ্ধ মালিকার ন্যায় দুলিতে দুলিতে ভাসিয়া যাইতেছিল...কৃষ্ণরায়ের ক্রীত দাসী পিয়ারা বীণা বাজাইতে গান করিতে করিতে সেই স্থানে আসিল...পিয়ারা তন্বী, নীলাম্বরে তাহার যৌবনকে আঁটিয়া রাখিতে পারিতেছে না...পার্শ্বে তিলকফুলের মঞ্জরী হইতে পুষ্পরেণুকণা উড়িয়া তাহার মুখে পড়িতে লাগিল...রাণ্ডিয়া তখন বৃক্ষমূলে জলসেচন করিতেছিল...সে যেন পিয়ারাকে দেখিয়াও দেখিল না। পিয়ারা গাইতেছিল...)

প্রাণ কি কার হাতধরা
যে ধরতে পারে ধরি তারে
আপনি সেধে দিই ধরা!

রাণ্ডিয়া। (স্বগতঃ) ধরা ধরি চলেছে বটে...

(পিয়ারা বীণার তারে সজোরে মূর্চ্ছনা দিয়া তান তুলিল, আবার গাইল...)

যে সোহাগ জানে না
প্রাণের দরদ করে না;
রসের কথা কইতে গেলে, কানে তোলে না—
পোড়া মনত সরে না...
অরসিকের প্রাণ নিয়ে কি চলে কার' ঘর করা
তার লাগলে বাতাস, শুধুই হতাশ,
হয় শেষে দিশেহারা।

রাণ্ডিয়া। (স্বগতঃ) শুধু ঘর আর বার...

(রাণ্ডিয়া একটু হাসিয়া আবার গাছের গোড়ায় জল ঢালিতে লাগিল...একটা পাপিয়া ঝঙ্কার করিয়া উঠিল...পিয়ারা আবার গাইল...

যে সোহাগ জানে না,
প্রাণের দরদ করে না...
পোড়া মনত সরে না...

(পাপিয়া উড়িয়া উড়িয়া সেই সুর শুনিয়া ডাকিতে ডাকিতে এ বৃক্ষ হইতে ও বৃক্ষে গিয়া বসিতে লাগিল, পিয়ারা চুপ করিয়া সেই পাপিয়ার পানে চাহিয়া দেখিতে লাগিল...সন্ধ্যাসূর্য্যের নিভ-নিভ আলোর রেখা তাহার মুখের উপর পড়িয়াছে...পাপিয়া আবার ডাকিয়া উঠিল...রাঙিয়া একবার করিয়া গোলাপ কুঁড়ির পানে চায়, আর একবার পিয়ারার মুখের পানে অলক্ষিতে চায়...

(দূরে গোলাপকুঞ্জে শ্যামা ডাকিয়া উঠিল। গুল্ গুল্ পিয়া পিয়া ও সখি ফোট্ ফোট্)

পিয়ারা। কি রাঙিয়া, রাঙিয়া কি বোলি বোলে পাপিয়া...

(রাঙিয়া যেন তাহা শুনিয়াও শুনিল না...পিয়ারা ঠোঁট ফুলাইয়া সরিয়া একটা গোলাপ কুঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া তাহার পানে চাহিয়া···সুর করিয়া কথা কহিতে লাগিল

চাও চাও, বদন তোল
নয়ন খোল,
কওনা কথা মন খুলে,
ও মানিনী মান রাখ তুলে...
ওগো সরম ভাঙ মরম রাখ
রাঙিয়ে কেন রও ভুলে—
তুমি কওনা কথা মুখ তুলে
আমি অধর ধরে চুমু দেব,
উঠ্‌বি ফুটে সব ভুলে...
বলি কওনা কথা মন খুলে...
ওলো এত গরব তোর
আপন মনে আপনি বিভোল
রূপের নেশায় ভোর—
না ফোটায় যে তোরে

হ'য়ে তার গরবে গরবিনী
মরিস্ গুমরে
ওলো দেখিস্ দেখিস্, সাম্‌লে থাকিস্
ফুটে যখন পড়্‌বি ঝরে…
কিগো! কথা কবেই না মূলে…
শুধু কুঁড়ির ভেতর বন্ধ করে,
গন্ধ রাখ্‌বে সব তুলে,
তুমি চাওনা ফিরে চোখ তুলে…

* * * *

বীণা! বীণা! আর কেন তোর
তারের ঝঙ্কনা
ও গোলাপ কথা কবে না লো কবেনা…

রাঙিয়া। না না—ভুল ভুল…সব ভুল…
ফুলের কুঁড়ি আপনি ফোটে
আপন সুখে আপনি লোটে,…
অ্যাঁ…আ…না-না সব ভুল…কার ফুল, কার ভুল…

পিয়ারা। ভুল ভুলুয়া রে…
এতদিনের ভুলের লেখা
মুছলে কি করে?

রাঙিয়া। জলের ঢেউ জলেই মরে
ফুট্‌লে ফুল আপ্‌নি ঝরে
তায় চিনব কি করে…

পিয়ারা। চিন্‌তে পারলে না, বঁধু চিন্‌তে পার্‌লে না,
ঝেলাম নদী পেরিয়ে এলাম
তবু, সেলাম নিলে না
এখন গেলাম, মলাম, হায়রে গোলাম
প্রাণ যে বাঁচে না

জলের ঢেউ মরে জলে
দাগত মরে না...

রাঙিয়া। উড়িয়ে দিয়ে ধূলো বালি
ঝড়ের তুলি বুলিয়ে যায়
মেঘ সে বলে আঁধার রেখায়
সকল লেখাই মুছে যায়...

পিয়ারা। বটে, কোন গহনের পাতায় পাতায়
রঙিন লেখা জড়িয়ে সেথায়
হেথায় এসে গোলাপ কাঁটায়
ফুট্‌ছে কি ব্যথা!
তাই বেয়োর নাক কথা—
চিন্‌বে কি মোর মাথা,
যদি হৃদয় গহন কর্‌তে গাহন
বুঝতে সে ব্যথা

রাঙিয়া। সেত ছেঁড়া ভূর্জ্জির পাতা
তার ফুলের কাজল মাখিয়ে পাগ
লিখ্‌ছে ভুলের খাতা...
তার নেইক ফুল নেইক মূল
গোড়ায় গলদ তার
আধেক রাতে ছটাক স্বপন
সত্যি হয় সে কার?

পিয়ারা। সত্যি যখন হয়না তখন
তুমি খালাস তা হলে
স্বপোন যত করছি রোপণ
পোড়া মনকে ছলে...
বলি ভাবের ঘরে চুরি কি চলে?...
ফুলের চাষে দিয়েছ মন

ফুলত সে আর নাই
এখন কুল হারিয়ে ভুলের ঘোরে
চিন্‌বে কারে ছাই
তোমার বলিহারি যাই...

রাঙিয়া। হাহা পিয়ারা, পিয়ারা,
তুল্‌ছ কথার ফোয়ারা...
তোমার দোয়ার মেলে না
রসে ধোয়া মনটী তোমার
গাইতেছে সুর নানা—
মুকের মতন দেখে স্বপোন
কেমন বল্‌তে পারি না...
এখন মাটি কাটি, জল ঢালি
দেখ্‌ছ আমার সবই খালি...

পিয়ারা। পোড়া চোখে তোমার পড়ুক বালি
বলি গোলাপ সনে অতেক আলাপ
তায় প্রলাপ কাটে না
কেবল আমার বেলায় হও সে বোবা
কথা জোয়ায় না...
মন যে বোঝে না
নইলে কি আর আনাগোনা,
তুমিত বেশ আছ সুখে
আমি যে বাঁচি না..

রাঙিয়া। মন নিয়ে যে করে ঘর
তার পেছনে কেবল ধর ধর
মনের জালে বেঁধে মন
করছ কেবল ওড়ন পাড়ন
মনের বুনন্ থামে না—

নিজের জালে জড়িয়ে নিজের
মরণ কামনা...
পিয়ারা। মরা ত হয় না
মনত মানে না—
তোমার কি মনে পড়ে না লো
শুধু কি দিন এল, আর গেল
আঙুর গাছের তলায় তলায়
ছেলে বেলায় হেলায় খেলায়
দুহাতে ধরে মু'খানি তুলে
চুমুটী যখন খেয়েছ লো
সে দিন মনে পড়ে না লো...
ভোর না হতে তুলতে ফুল,
এলিয়ে দিতে মাথার চুল,
নির্ঝর ঝর ঝরত ফুল
আমার কাল কেশে,
শুকতারাটা দেখত হেসে ভেসে,
উঠত অরুণ ফুটত ফুল
তোমার ভুল কি আমার ভুল
ঠাউরেছ বেশ শেষে,
দোদুল দুল আঙুর দুলে
কে সে দিত মুখে তুলে—
ঝর্ঝর ঝর শুকনো পাতা
পড়ত আমার কেশে
কথায় কথায় দিন ফুরাত
সকাল হোত বিকাল হোত
সাঁঝ হলে কে লুকিয়ে যেত হেসে
শুকতারা সে ফিরে দেখত হেসে...

দিনের পরে গেছে দিন
রাতের পরে ভোর গো
সোহাগ পাখী গাইত চুপে
আমার বুকে কার গো
এখন কৃষ্ণ রায়ের কাননে এসে
মন মজেছে ফুলের রসে
ফুল বদলে পেয়ে ও ফুল
সকল ভুলে ডুবেছ গো...
এখন মনে পড়বে কেন বল
শুধু মেজে ঘসে সং সাজা মোর হোল...

রাভিয়া। হুঁ...হুঁ...পিয়ারা! পিয়ারা! ও ধারের গাছ গুলো সব আছে বাকী, ও শুধু আঁখি ঠেরে মনকে ফাঁকি,

তোমার এখন সাজের দিন
আমার এখন কাযের দিন

পিয়ারা। কায! কায! কায!
তোমার মাথায় পড়ুক বাজ
জনম ভোর যে ক্রীতদাস
তার আছে শুধু পাঁশ
গলায় জোটে না ফাঁস?
তোমার আবার কিসের কায
প'রে পরের সাজ, নাচ্চ বাঁদর নাচ
আহা কি সাজই সেজেছ—
ভুলে ঝোলাম, বাজাও সেলাম
এখন গোলাম বনেছ
খুঁড়ছ মাটি, ঢালছ জল
ফুট্‌ছে ফুল, ধরছে ফল

তায় তোমার কি হোল
বেল পাকলে কাকের কি বল ?

রাঙিয়া। কিছু না এই ফোটে, ঝরে পাকে পড়ে
বাতাস বয় পাতা নড়ে
সূয্যি ওঠে, সূয্যি ডোবে...

(রাঙিয়া অন্যমনস্ক হইয়া অগ্রসর হইল)

পিয়ারা। বলি শোনই না,
শুনতেও কি মানা...

রাঙিয়া। উঁহু না-না যে কেনা তার সব মানা, তার চোখ না, কান না, হাত না, পা না, তার চেনাও না !...

পিয়ারা। বলি মন যে মানে না...

এ খেলা কি আর ভাঙে না
কেনই এত লুকোচুরি
কেনই এত ধরাধরি ।
প্রাণ যে বাঁচে না
নইলে কে বলে বল না...

(গোলাপকুঞ্জ কাঁপাইয়া শ্যামা তীব্র উচ্চ কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল)
রাঙিয়া ! রাঙিয়া ! কি বোলি বোলে পাপিয়া !

তাও কি জান না...

রাঙিয়া। (হাসিয়া) গুল গুল...পিয়া ! পিয়া ! ও সখি ফোট্ ফোট্...

(রাঙিয়ার প্রস্থান)

(তখন পূর্ব্বদিক আলোকে প্লাবিত করিয়া চন্দ্র উদয় হইল, সেই জ্যোৎস্নালোকে শ্যামা পাপিয়া বুলবুল গাহিয়া উঠিল, ঝির ঝির করিয়া বাতাস বহিতে থাকিতে লাগিল, পিয়ারা সেই মর্ম্মর

প্রস্তর নির্ম্মিত আসনে বসিয়া বীণার ঝঙ্কারে কণ্ঠ খুলিয়া গাহিতে লাগিল...)

কে বেসেছে আমায় ভাল
বলব নাক' তা
কে হেসে কাঁদায়ে গেল
চোখের জলে আঃ...
ফুল সে ফোটে বনে বনে
চেয়ে চেয়ে সেদিন গোপে
ঝরে পড়ে চরণ তলে
কেমন সুখে আঃ
আমি ফুটব ফুটে ঝরব পায়ে
তেমনি সুখে আঃ
হাওয়ায় হেসে ভেসে যাব
কেউ দেখ্‌বে নাক' তা—
আমি বলব নাক' তা...
কেউ জানবে নাক' তা...
কেমন সুখে আঃ...

(পিয়ারার গানে আর পাখীর তানে কানন মুখরিত হইয়া উঠিল, পিয়ারা আবার বীণায় ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, পাপিয়া শ্যামাও তান তুলিতে লাগিল।...

পাখী লো এ জ্যোৎস্না হাসি
সোহাগ বাঁশী কে বাজায়
কে তোরে দেয়লো ভরে,
এমন সুরে, কেবা গায়
যদি তোর মত সোহাগ পাখা পাই
হাওয়ায় হাওয়ায় যাইলো উড়ে
চাঁদের চুমু খাই
মেঘেরে করি কোলে দুলে দুলে
স্বপন আঁকি এ জ্যোৎস্নায়

কার দেখা সে পেয়ে একা ভাই
উধাও উধাও প্রাণ খুলে গাও
শুনে ভেসে যাই
টুটে এ স্বপন-কারা, আপন হারা,
কেমন ধারা সে কোথায়!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অন্তঃপুর রাজোদ্যানমাঝে রাজ্ঞী মধুমালতী, চন্দ্রকরোজ্জ্বল নিশীতে অনন্যমনে বসিয়া,...দূরে তুঙ্গাভদ্রা নদীতে পূর্ণচন্দ্র-করে তরঙ্গশীর্ষ ফেনমুখ ও উজ্জ্বল।...রাজ্ঞী প্রস্তর আসনে বসিয়া চাঁদের পানে চাহিয়া রহিয়াছেন। পিয়ারার গানের দূরশ্রুত অস্পষ্ট সুর তাঁহার কানে ধ্বনিত হইতেছিল।

মধুমালতী। সবইত পদতলে, সবইত আছে...

এ ধরায়—নারী যাহা চায়, বিপুল এ
রত্নরাশি, মণিময়হর্ম্ম্যতল, দাস
দাসী রজত কাঞ্চন, সাগর মথিত
এই দীপ্ত শুক্তিচয়, পুষ্পবাস স্নিগ্ধ
চন্দ্রালোক, অভাব কিছুই নাই, আমি
রাণী, লক্ষ লক্ষ নরনারী উচ্চকণ্ঠে
গায় জয়ধ্বনি, সব সুখ কহে তারা
আমারি সে দান, তাহাদের দুঃখসুখ
লয়ে অবিরাম করি খেলা, ভাঙি গড়ি
পলকে প্রলয়, কপালের লিখা আমা
হতে মুছে যায়, আমা হতে ফুটে, আমি
সে অদৃষ্ট তার, কটাক্ষ ইঙ্গিতে মম

জীবন মরণ যেন নাচে তালে তালে
কিন্তু নিজের এ সুখদুঃখ লয়ে, নিজে
মরি আপন বাঁধনে, অদৃষ্টের লেখা
পারিনা মুছিতে মোর...রাণা আমি...রাণী
পদে পৃথ্বী শিরে চন্দ্রাতপ, লক্ষ্মীরূপা
আমি রাণী বিজয়নগরে—আমি রাণী...
দীনহীন পর্ণাবাসে যে অতুল সুখ
অযত্নে হেলায় পুষ্পসম উঠে ফুটে,
যদি সেটুকুও মিলিত আমার...রাণী
আমি...রাজকন্যা জন্মিলাম রাজপুরী
মাঝে, শিখিলাম, কত বিদ্যা, কত শ্লোক
কত রমণীয় গাথা, কত সুখে গেল
সে শৈশব, তারপর একদিন দুঃখ
দিল দেখা, হইলাম সম্রাট মহিষী...
তখনো সে বুঝি নাই, দুঃখ কিবা, সেই
আলোক উজ্জ্বল নিশিথিনী পুষ্পহারে
সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় সেই পৌরজন
কলকণ্ঠ-ভাষে উন্মাদ নিশির সনে
সুখোন্মাদ প্রাণ, আঁখিভরি হেরেছিল
মুখ, তারপর দিগ্বিজয়, তারপর রাজ
কার্য্য, তারপর শাস্ত্রালাপ, তারপর
ধর্ম্ম আলোচনা, যাগ যজ্ঞ, তারপর
আমি,...যদি কভু মনে পড়ে, তৃষিতা এ
চাতকীর মত সেই স্বাতি নক্ষত্রের
বারি-বিন্দু তরে হায়, রয়েছি উন্মুখ,
শুষ্ক প্রাণ জল বিনা মীনসম মরে,
অদৃষ্ট যে গড়ে এই সে অদৃষ্ট তার...

(কৃষ্ণরায়ের প্রবেশ)

(স্বগতঃ)...সম্মুখে যবন

চমু, ঘিরি ঘিরি পাকে পাকে ফিরে, ওই
তুঙ্গাভদ্রা উছলি উছলি পড়ে, দিন
শুধু কেটে যায়, রোল করি আসে দিন,
রোল করে যায়, এতদিন কেমনে যে
যায়, তাই ভাবি...
ছার এ বিগ্রহ ঝঞ্ঝা জীবন ব্যাপিনী
এই ঘোর রাজ্যলিপ্সা জীবনের ব্যাধি,
কতদিনে হবে মুক্ত—জর্জ্জরিত প্রাণ
ইচ্ছা হয় ভঙি কারা ধাই ধাই কুল নাই যেথা,
ভেসে যাই অকুলের পানে...
কে রাজ্ঞী, এখানে, ব্যস্ত বড় নানা কার্য্যে,
যাই আমি হবে দেখা

মধুমালতী। মহারাজ এখানেও রাজকার্য্য !

কৃষ্ণরায়। তিল-

মাত্র বিশ্রামের নাহি অবসর, যাই...
আমি (স্বগতঃ) ওই ওই যেন আসে সে সঙ্গীত...

মধুমালতী। মহারাজ ! আমি...

কৃষ্ণরায়। তুমি তুমি রাজ্ঞী, কিন্তু কি জানি সে
কেন, ছোটে প্রাণ কোন স্বপ্ন রূপপানে
কোথা সত্যরূপ, পরিপূর্ণ আনন্দের
ধারা কোথা যেন আছে, তাই ধাই, ছুটে
ধাই, নাহি জানি কেন, ওগো তিলমাত্র
বিশ্রাম না মিলে...

(কৃষ্ণরায় চলিয়া গেলেন)

মধুমালতী। নারী এখনও সাধ তোর, আশা
রাখ কিবা আর...ঢাক মুখ ওই অন্ধ-
তিমির গহ্বরে, এ আলোক তোর নহে!
রাজ-চিত্ত বিশ্রাম না চাহে, জাগিয়াছে
সুর, বংশীরবে মুগুধ সারঙ্গ ধায়.
আর তুই...পদতলে সুকোমল তৃণ
ঊর্দ্ধে নীল নভঃ, অগণ্য তারকা রাজে—
মাঝে বায়ু করে হাহা ধ্বনি ওই শোন...!

মেঘ চন্দ্রকে ঢাকিয়া ফেলিল। দু'চারিটা নক্ষত্রও নিভিয়া গেল।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজা কৃষ্ণরায় ভাব-ভারাক্রান্ত মনে উদ্যানের অপর পার্শ্ব দিয়া চলিয়াছেন...ক্রুতব্যস্তভাবে মন্ত্রী তিমীরায় প্রবেশ করিলেন।...তিমী-রায় বৃদ্ধ।

তিমী। মহারাজ, শত্রুসৈন্য তুঙ্গাভদ্রা তীরে
সহস্র কামান লয়ে হতে যায় পার,

কৃষ্ণ। আঃ...যুদ্ধ, যুদ্ধ, জীবন-মরণ-ব্যাপি যুদ্ধ
লয়ে খেলা চিরদিন খেলিয়াছি, চায়
চিত্ত নূতন রাখ রাখ তব
মন্ত্রণা আরাব...

তিমী। কর্ম্মতরে অবসাদ,

কৃষ্ণ। কর্ম্ম...কর্ম্ম...সাধিয়াছি বহু কর্ম্ম, আমি,
অকর্ম্ম কি সুকর্ম্ম কি, ভেদ নাহি বুঝি
যুদ্ধ, যুদ্ধ...রক্তক্ষয়, প্রাণ লয়, মত্ত
যেন কোন মহা প্লাবনের জলে ভেসে
যায়...

তিমী। যুদ্ধ কি অকর্ম্ম,

কৃষ্ণ। অবশ্য অকর্ম্ম।

তিমী। কতদিন এই তমে ডুবিলে রাজন?
শত্রুসৈন্য গৃহদ্বারে, যুদ্ধ সে অকর্ম্ম—

কৃষ্ণ। কেবা শত্রু, যবনেরা?...মন্ত্রী! এ মুকুট
পরিহাস এ জীবনে...সত্য ইথে নাই
চাই সত্য, দিতে পার মন্ত্রণা তাহার
বল, কেবা শত্রু কেবা মিত্র, ভেদ কোথা
তার নাহি পার, তুঙ্গভদ্রা বহি চলে
যায়, জলস্রোতে সব' ভেসে যাবে, তুমি
আমি সব স্বপ্নসম ভেঙে যাবে, যাও
চাই সত্য...যুদ্ধ নাহি চাই... যুদ্ধে নাহি
মিটে তৃষা, জীবন মরণ লয়ে ভাঙা
গড়া খেলা, কোথায় এ শেষ তার, কোথা
সেই অরূপ রহস্য, রূপে যারে পাই
না ধরিতে, চাই তাই, পার দিতে দাও
নহে কহিও না কোন কথা আর...যাও...

[রাজা কৃষ্ণরায় চলিয়া গেলেন; মন্ত্রী তিমীরায় দুই হাত বুকের উপর রাখিয়া নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন]

চতুর্থ দৃশ্য।

দৃশ্য পূর্ব্ববৎ উদ্যানের মাঝে বকুলবীথিকা তলে পিয়ারা... চন্দ্রালোকে সারা কানন পুলকিত।

পিয়ারা। না-না মানুষ না হ'য়ে যদি অম্‌নি ফুল হয়ে ফুটতুম্ যদি ফুল হতাম্ তাহলে আর এ সব ভাব্‌তে হোত না।

আমি প্রাণ বিকায়ে ফুল হব সই
হব গলার হার
ভালবাসার গাঁথা মালা,
থাকব গলে তার

ফুলের মত এমনি ধারা
আপনি হব আপ্‌না হারা
ঢেলে দেব সুবাস ধারা
মাখিয়ে বুকে তার
ভাবে যখন উঠবে ফুলে বুক
মনে মনে হবে কত সুখ
সুখের দুখের নিশাস নিয়ে
দুলব বুকে তার
শুখিয়ে যখন হব বাসি
মুছে যাবে সুখের হাসি
বলবে না কেউ ভালবাসি
তবু আমি তার।

(পিয়ারা ক্লান্ত নয়নে চাঁদের পানে চাহিয়া চাহিয়া নিদ্রাতুর ঢুলু ঢুলু হইয়া বীণা কোলে লইয়া ঢলিয়া পড়িল, বাহু-ফাঁস শিথিল...ধীরে ধীরে চক্ষু মুদিত হইল...রাভিয়া ধীরে ধীরে গাছের আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল...

রাভিয়া। (স্বগতঃ) গোলাপ ফোটে এও ফোটে, এও রূপ ও'ও রূপ...দুনিয়াদার, এ পাপড়িই বা বাঁধ কেন, পাপড়িই বা ভাঙ কেন ?...

(অদূরে ছায়ালোক প্রতিফলিত পথ দিয়া কৃষ্ণরায় আসিতেছিলেন...ক্লান্ত নয়ন ভাবনা যুক্ত...

কৃষ্ণরায়। (স্বগতঃ) কর্ম্মস্রোতে চলেছে জগৎ, কহে লোকে
জন্ম মৃত্যু বিধাতার লেখা, তাই যদি
হবে, নিজকৃত কর্ম্ম তবে কিবা, সবি
যদি তাঁর লেখা তবে এ লিপি বা কার
কোথা মুক্তি মানবের, কোথা মুক্তি তবে,
বাঁধনের উপর বাঁধন, পাকে পাকে রচে
মায়াফাঁস, আনে ঘোর তন্দ্রাচ্ছন্ন মোহ

মৃত্যু জাল, আবরি নয়ন পথ সব
ছেয়ে ফেলে, মুক্তি কোথা, বাঁধা আমি, বাঁধা
এ জগৎ, গ্রহতারা মহাসূর্য্য সোম
ব্যোমকুক্ষীতলে কেন্দ্র পথে সব ঘুরে
মরে, আমিও সে মরি ঘুরে সম্রাটত্ব
করিয়া অর্জ্জন, সিংহাসন মুকুটের
ভার, ফেলে দিয়ে সবহারা হতে, কোথা
মুক্তি পাব, মুক্তি না বন্ধন...

(সহসা সম্মুখে সেই মর্ম্মরপ্রস্তরাসনে নিদ্রিতা পিয়ারার প্রতি চকিতে দৃষ্টি পড়িয়া চমকিত হইলেন, একদৃষ্টে দেখিতে দেখিতে)

...কিন্তু একি
চন্দ্রমা মলিন হেরি ওরূপ মাধুরী
ঢল ঢল শতদল শতেক গোলাপ
জ্যোৎস্না ছানিয়া কেবা মূরতী গড়িল রে
আহা! রূপ! রূপ! ফোটে ফোটে অফুটন্ত
এরূপ কলিকা...কার রূপ, কার হাসি!
ওই অফুটন্ত গোলাপ কোরক আর
এই ফোট ফোট রূপের স্বরূপ, কেবা
সে সুন্দরতর, কার রূপে ফোটে ওই
ফুল কার রূপে মেলে ওই আঁখি, আহা!

পিয়ারা। (ঘুমঘোরে তন্দ্রাবিজড়িত স্বরে আলস্যে) রাণ্ডিয়া... রাণ্ডিয়া...

কৃষ্ণরায়। (দাঁতে দাঁত দিয়া চাপিয়া)

কে! কি? রাণ্ডিয়া! রাণ্ডিয়া!

(পিয়ারা ঘুমঘোরে হাসিয়া উঠিল।...তাহার পরে তাহার হাসি যেন বেদনার ক্রন্দনে মিলাইয়া গেল...পিয়ারা হস্তপ্রসারণ করিল, বীণার তারের উপর হাত পড়িয়া বীণা ঝনঝনিয়া উঠিল। রাণ্ডিয়া

চমকিয়া দেখিল সম্মুখে কৃষ্ণরায়, রাঙিয়া সরিয়া গেল...পিয়ারা আবার হাসিয়া উঠিয়া গ্রীবা ঈষৎ বাঁকাইয়া ঘুমাইতে লাগিল... পূর্ণচন্দ্রের বিমল জ্যোৎস্না তাহার মুখের উপর হাসিতেছিল)

আহা নিদ্রা যাও বালা, ক্লান্ত ও নয়নে
তব মদির স্বপনরাশি ঢেলে দেয়
অমিয়া জ্যোছনা, অথবা রূপের ধ্যানে
হইয়া মগন ফুটাইছ ভাবরাশি
রূপ সৃষ্টি করি, সর্ব্বদেহে যৌবনের
অটুট চাঞ্চল্য রূপে রূপে তুলিতেছ
ভরি, আর আমি কৃষ্ণরায়-মুকুটের
কণ্টকিত ক্ষতে জর্জ্জরিত জ্বালা লয়ে
ফিরি...এই রূপ এও কি বন্ধন...না না—
তবে ব্যর্থ কিবা ইন্দ্রজাল সম সব
মোহিনী কল্পনা-ছবি রচি ফুলহারে
ভুলায় মানব মন ভুলায় জগৎ

(পিয়ারা ঘুমঘোরে কেমন যেন কাঁদিয়া উঠিল, আবার হাসিল)

পিয়ারা! পিয়ারা! হৃদয়ের অন্তঃস্থলে
একি তম ঢালা, বিচিত্র বাসনা কেন
রূপ হেরি জাগে...একি নব জাগরণ
মোর, ঘুমাইল অতীত আমার যেন
নূতন এ সাড়া জীবন আরম্ভ যেন
হ'ল এতদিনে, কিন্তু কেন মনে হয়
ফিরে, আপন মারণ-বীজ ক্রয় করি
রণে, নিজহাতে রোপিয়াছি তায়! হায়!
হায়! পিয়ারা! পিয়ারা!

(পিয়ারা ঘুমঘোরে উঠিয়া বসিয়া আঁখি কচলাইতে লাগিল...

দূরে শ্যামা ডাকিতেছিল...পিয়ারা ঘুমভাঙা আলস্যে চমকিত হইয়া দেখিল সম্রাট)

পিয়ারা। একি !

কৃষ্ণরায়। চাও চাও

ফিরে মেল ও কমল আঁখি, ওই চক্ষু
দীপিকায় বিশ্বের রহস্য উঠে ফুটে,
বুঝিতে কি পার তায় না না যেবা দেয়
আলো, সেকি কভু জানে আপনায়, যেবা
দেখে সেই হয় পুলকিত দিশেহারা,
পতঙ্গ-বৃত্তিতে শুধু ধায় বহ্নিমুখে—
বহ্নি জ্বলে কোন তাপে হ'য়ে আত্মহারা
কেবা জানে, জ্বলে পুড়ে মরে ছাই হ'লে
হয় কিবা সুখ, সে কথা পতঙ্গ জানে
বুঝিতে কি পার তায় কেন আঁখি মোর
উন্মুখ সতৃষ্ণ দিঠি চায় তোমা পানে—

পিয়ারা। বুঝিবার অবসর, কই কিছু ত বুঝি না,
বুঝিবার অবকাশ এ জীবনে পাই
নাই কভু,

কৃষ্ণরায়। পর্ব্বত-বন্ধুর লীলা গড়া
তব প্রাণ, তাই...

পিয়ারা। পর্ব্বতসঙ্কুল দেশে
তিমির গহ্বরে জন্ম মম শুনিয়াছি
বটে, প্রস্তরে গঠিত দেহ, হ'তেওবা
পারে...

কৃষ্ণরায়। নহে দেহ, প্রাণ তব,

পিয়ারা। রহে মণি

লুকায়িত তিমির বিবরে, আভা তার
প্রকাশে আপন বিভা, প্রাণ দীপ্তি তার,
সেই দীপ জ্ঞানে কি অজ্ঞানে,—নাহি জানি—
তারি হাতে থাকে, যে বিরাট বক্ষ ভেদি
স্বচ্ছ স্ফাটীকের মত এসেছে ঝেলাম,
সেই সে বিরাট শীলা জনক আমার

কৃষ্ণরায়। হারে মায়াবিনী রূপক রচিছ কত,
যারি রূপ আছে সেই কি করে এ খেলা
এত ছল কে শিখালে তোমা? নানা ছল
বুঝি রমণীর সৌন্দর্য্যের ভাষা, তাই
ছলে রচ ঐরূপ কর তাই কহ—তাই
কহ এ জীবনে অবকাশ পাও নাই
কভু...লোকে...

পিয়ারা। লোকে কহে ছল শুধু বল
রমণীর, কহে বটে, শুনি সে ছলনা
নারীর ভূষণ, কিন্তু হায় না ফুটিতে
কলিকা কিশোর, যে জানিল ফোটা তারে
মানা, যে জানিল পর-পরিচ্ছদ-সম
তোর সাজা এ জীবন, তার কিবা আছে
বলিবার...

কৃষ্ণরায়। কিছু নাই তবে এ জীবন
পর-পরিচ্ছদ-সম, আশৈশব তাই
পালিতেছি পরিচ্ছদ মত?

পিয়ারা। জীবনে যে
পায় নাই নিজের ভূষণ, পরমুখ
পানে চেয়ে কাটাতে সে জনম যাহার

তার কথা কেন ফিরে, সেজে-থাকা নহে
কি তাহার !

কৃষ্ণরায়। সেজে থাকে ? হের ওই ফোট
ফোট আরক্ত ও রূপ, কি সুন্দর কহ
কি হেরিছ, 'ও' ও কি আছে সেজে, কহ
'ও' ও পরিচ্ছদ...

পিয়ারা। কই ? ওই সে গোলাপ
ফুল...কার সাজে কেবা সাজে বুঝি

কৃষ্ণরায়। কহ কিবা কহে, ওই রক্ত অধরের
ফাঁকে কি সুধা মধুর রসে ভরা
'ও'ও পরিচ্ছদ সম, সেজে বসে আছে ?
নাহি কি জীবনে কিছু বলিবার তার

পিয়ারা। ফুলজন্ম পাই নাই প্রভু, ফুল হ'লে
বুঝিতাম ফুলের ও ভাষা, আমি তায়
কব সে কেমনে,

কৃষ্ণরায়। দেখ ভাল করে দেখ
কি হেরিছ কহ,

পিয়ারা। সেই ত' আরক্ত ফুল
গোলাপ কহে সে যারে, কাশ্মীরের বনে
বনে গিরিকটীতটে অজস্র সে ফোটে—
কেন ফোটে সেই জানে...

কৃষ্ণরায়। শুধু সে গোলাপ
আর কেহ নাই আশে পাশে,

পিয়ারা। আর কেহ ?
কই, ও ভ্রমর...

কৃষ্ণরায়। জান না কি প্রেমভরা
পুষ্পরাণী মোর কি কহে ভ্রমর ওই

অধরের পানে চেয়ে...জান নাকি মধু-
লোভে লুব্ধ অলি আশে, আশা পথ চেয়ে
ফুল দুলে দুলে ফুটে, আপন প্রাণের
ভাষা সৌরভের সাথে ঢেলে দেয় তায়।

পিয়ারা। হবে—নাহি জানি ভ্রমরের রীতি, নাহি
জানি ফুলের ও ভাষা, যে ফোটায় সেই
জানে কিবা তার কথা—

কৃষ্ণরায়। চাহ দেখি ফিরে
মোর পানে...উদ্যান-পালক যথা দিন
দিন ধরি, নিত্য করে সে সিঞ্চন ওই
তরুমূলে, ফুটাতে অপূর্ব্ব রূপ, যথা
অলি মুখরিত গুন গুন রবে ধেয়ে
আসে ফুল পাশে করে সে চুম্বন, সেই
মত ঢালিতেছি স্নেহের আশার নিত্য
নিত্য ভ্রমরের রূপ ধরি সদা আছি
চেয়ে, কবে সে ফুটিবে মোর, শত আশা
ভালবাসা-ঢালা পিয়ারা আমার সেই
আশে চেয়ে আছি!

পিয়ারা। একি কথা, প্রভু!

কৃষ্ণরায়। কেবা প্রভু কেবা দাস, কে করে নির্ণয়!
আর নাহি প্রভু, দাস আমি, রাজকার্যে
বিকৃত মস্তিষ্ক মোর, এতদিনে বুঝি
আমি কোন স্বরগের অমিয়ার ধারা
রুদ্ধ আজি আমার এ হৃদি-কুঞ্জবনে,
এত রূপ, এত রূপ ধরণী না ধরে
আর...

পিয়ারা। দাসী ক্রীতদাসী সেই চিরদিন
রূপের এ স্তবগানে, তার অধিকার
রূপ ত ধূলার ফুল লুটাবে ধূলায়
প্রভু! তারে কেন এ নিষ্ঠুর পরিহাস
রূপের কদর করা...জীবন জীবন
নহে যার, আলোক আলোক নয় যার
তারে প্রভু সাজে কি এ!

কৃষ্ণরায়। নহে পরিহাস
কহি সত্য বাণী, সম্রাটে না কহে মিথ্যা,
শক্তির প্রচুর ব্যয়ে করি দিগ্বিজয়
রক্তে রক্তে সিঞ্চিয়া মেদিনী, কিনিয়াছি
মরুভূম, রুক্ষ কঠোর এ তপ্তজ্বাল
উল্কাপিণ্ড কিম্বা নীহারিকা সম এই
আতপ্ত হৃদয়, জ্বলে জ্বলে অহর্নিশি
আপন উদ্বেগে, ধ্বক্ ধ্বক্ কোন স্মৃতি
হেতু....ফিরি যবে যাই ওই ফুলবনে
ওই দূর চন্দ্রমার বিমল সুহাসে,
ফিরি যবে নেহারি ও বদন কমল,
ঢল ঢল লাবণ্যের জলে, কি মধুর
সে ভঙ্গিমা, মনমুগ্ধকরী কি উজ্জ্বল,
ভ্রমর চঞ্চল আঁখি, সলাজ নির্ঘোষ,
মনে হয় বিশ্ব থাক্ একদিকে পড়ে,
থাক্ স্তূপীকৃত দিগ্বিজয়, রাজছত্র
কলঙ্কিত অসি, যাগযজ্ঞ অশ্বমেধ
সাম্রাজ্য বিস্তার, থাক্ পড়ে রত্নাবাস
মুক্তার মালা, থাক যত মিথ্যাখ্যাতি
জনশ্রুতি রাশি, ইতিহাস-পৃষ্ঠাব্যাপী

কলঙ্ক শোণিমা, শুধু তোমাতে আমাতে
আজি জ্যোৎস্না মুখরা রজনী, হোক্ নব
পরিচয়, মুখোমুখি, আঁখি পানে চাহি,
চাহি শুধু কার রূপে ফুটিয়াছ তুমি,
কার রূপে ফুটিয়াছি আমি এ নির্ম্মম
পাষাণ বিকৃতশীলা বন্ধুর শৃঙ্খল
পদে পদে বন্ধনের লোহা...ওঃ পিয়ারা!
চাই শুধু শুনিবারে অপার্থিব স্বর
শুনি শুনি প্রাণ মোর হবে যাহে ভোর
হবে নব নব উন্মেষ আমার, হবে
শান্তি, হবে তৃপ্তি, নরজন্ম হবে মুক্ত
রুদ্ধ ক্লিষ্ট পিঞ্জর আবদ্ধ প্রাণ
আর নাহি পারি...গাও! গাও, আন শান্তি...

(পিয়ারা একটু নীরবে হাসিয়া বীণায় ঝঙ্কার দিয়া তান তুলিল, পিয়ারা গাহিতে লাগিল)

আমারে বল্‌তে মানা,
ও প্রাণ সোনা,
শোন্‌লো বলি
যে স্থানে ফুটেছি কেন
কেনই হেন
ভুলে কেন, আসে অলি।
কাঁটার ঘায়ে ফুটেছি আমি
ফুটেছি গোলাপ ফুল,
রাঙা অধর হেরে আমার
হয় সবে আকুল
আমি ত প্রাণ জানি না,
মান জানি না
কিসের ছলে, পড়ি ঢলি—

প্রাণের মানা বুঝ্‌তে মানা—
কোন ভুলে সে কিবে বলি।
যতেক ব্যথা ফুট্‌ছে কথা
প্রাণের কথা ওই
সরম ভেঙে মরম রেঙে
থম্‌থমিয়ে রই—
ফুট্‌লে পরে অম্‌নি ঝরে
যায় সবে দলি
মানের মানা বুঝতে মানা
প্রাণের ভুলে কিবে বলি ..

কৃষ্ণরায়। জাননা জাননা তুমি রে রাক্ষসী! না না...
ঢাল ঢাল বিষ সুধা, পিয়ে পিয়ে হই
যাহে ভোর, হোক্, ভুল, তবু সেই ভুলে
রব বেঁচে, সেই ভুলে জাগাও আমারে
ডুবুক সাম্রাজ্য মোর বিতস্তা-অতলে,
কর্ম্মকাণ্ড বেদ আস্ফালন মিথ্যা এই
মন্ত্র আবাহন বিসর্জ্জন শুধু, অস্ত্রে
অস্ত্রে ঝনৎকার সমর উল্লাস, ব্যোম
ভেদা সাগর গর্জ্জন সম গৌরবের
গান, মিথ্যা সব, শুধু তুমি সত্য, তুমি...
শুধু প্রাণে জাগে কিসের আভাস, শুধু
যেন চাহি চাহি মিটেনা তিয়াসা, পুনঃ
গাও...

(পিয়ারা আবার গাইতে লাগিল)

আপন মনে ফুটিয়ে কুসুম
আপনি তুলে গাঁথি মালা
আপনি হেরি আপনা হাসি
আপন ভুলে হেসে ফেলা

আপনি হাসি রাঙিয়ে রঙন ফুল
আপনি কাঁদি ফুটিয়ে দিয়ে হুল
ভালবাসি তাই সে এত ভুল
(আবার) ছড়িয়ে নিশি কেশের রাশি
জড়িয়ে পরি তারার মালা
মায়া-জালে ছলে সে বাঁধি
আপনি কেটে আপনি সে কাঁদি
কাঁদিয়ে তারে কেঁদে সে সাধি
কেউ হাসে কেউ ভাসে জলে
ভেসে ভেসে কার খেলা।

কৃষ্ণরায়। পুনঃ কি রূপকছলে কহিছ কাহিনী
একি এ তরল সুরে গম্ভীর আলাপ,
গাও ফিরে, গাও গান, যাহে সুর ঝরে
পড়ে ফুলের মতন, সুরসাথে যেন
ভেসে আসে পরাণের সকল সুবাস

(পিয়ারা পুনর্ব্বার গাইতে লাগিল...

এমন চাঁদিমা জোছনা সজনি
যদিলো রজনী অমনি যায়,
মিছে এত আশা, মিছে ভালবাসা
কি ফল জীবন বিফল হায়।
ভেসে আসে ওই পাপিয়া তান,
শুনি যদি নাহি ভরে এ প্রাণ -
ওই মলয় পরশে শিহরি হরষে,
যদি না বঁধুয়া শিহরি চায়—
চোখে চোখে ভাষা, চোখে চোখে আশা
হিয়ায় হিয়ায় মিটায় পিয়াসা,
সকল পিয়াস হয় তাহে ভোর,
দোঁহা আঁখি শুধু দুহুঁরে চায়।

কৃষ্ণরায়। পিয়ারা! পিয়ারা! সুন্দর! সুন্দর! তুমি ..
আপনি ফুটায়ে ফুল আপনার হাসি
লয়ে, আপনি গাঁথিছ মালা দিবে বলে
আপনার গলে, তবে ফিরে বঁধু পানে
চায় কেন মন, আপনাতে হয় যদি
সব, তবে কেন বঁধু বিনে শিহরে না
মলয় পরশ, সব ভাষা ধায় আঁখি
পানে, আমি যে এ দিন দিন ওই আঁখি
'পরে রাখি প্রাণ, তার তরে কিবা দিবে
বল,...পিয়ারা লো! প্রিয়তমে ..কি সুন্দর
বল বল তুমি ত আমার হবে, আসমুদ্র
হিমাচল পদতলে যার, ক্ষিতিপতি
কৃষ্ণরায় চরণে তোমার, সর্ব্ববিক্ত
হয়ে যাচি, বল প্রিয়ে বল একবার
তুমি ত আমার হবে সুন্দর আমার

পিয়ারা। আমি ত আমার নই প্রভু...জন্মিয়াছি
কাশ্মীরের উপত্যকা মাঝে ঝেলামের
তীরে, ভূর্জ্জবৃক্ষ বনচ্ছায়া-নীড়ে, শুধু
আপনার বুলি গেয়ে ফিরিতাম বনে
বনে মানস-সরসতীরে, বিহস্তার
কোলে, বনে বনে বুন পাখী স্ব-ইচ্ছায়
খোলাকাশে বেড়াতাম উড়ে; আজি কব
বিনিময়ে ক্রীতদাসীরূপে প্রভু! তব
প্রমোদ উদ্যান মাঝে, আওতার তৃণ-
রাশি সম, হরিৎ রঙের আভা নাই
এ দেহেতে, চলি, ফিরি, নাচি, গাই, শুধু

শেখা বুলি পড়ি পাখী সম, শুনে শুনে—
দিবার ত কিছু নাই...

কৃষ্ণরায়। জান তুমি কার
এই পূর্ণ বরাঙ্গ সম্পত্তি কার...জান ?

পিয়ারা। অর্থ
যার দাসী তার...আছে দেহ ক্রয় যেই
করিয়াছে মোরে, তারি তরে—কিন্তু প্রভু
প্রাণ কোথা মোর, কাটি দেহ কর খান
খান, পাবে রক্ত, পাবে মাংস, পাবে মল,
পাবে গন্ধ, শিরা, উপশিরা, সব পাবে,
শুধু মিলিবে না কভু বর্ণহীন সেই,
যা না হলে চলে না এ দেহ, এ সৌন্দর্য্য
নিমিষে মিলায়ে যায় স্বপনের মত
ক্রীত যেই প্রাণ কোথা আর...

কৃষ্ণরায়। বারবার
এক কথা, ক্রীতদাসী, না না শিখায়েছি
সর্ববিদ্যা, ক্রীত যেই তারে কবে কহ
কে শিখায় এতেক যতনে, সুকুমার
সব কল্পকলা, ভুলি আত্মপর ভুলি
নিজ স্বার্থ, ফুটায়ে তুলেছি রূপ ফুটে
যথা গোলাপ কোরক, আজি আমি তব
আশে, ভিখারীর মত মুখপানে আছি
চেয়ে, শান্তি দাও হে সুন্দরী, রাজকার্য্যে
চক্রান্তের ঘোরে, আলোড়িত সব, ঘোরে
যেন ঘূর্ণীবায়ে, আন শান্তি, বিদ্যুল্লতা
আলো করি বেড় মোর হৃদ, কর ভস্ম
নয় বর, দিব্যরূপে করহ বরণ !

পিয়াও ও সুধা তব পিয়ারা সুন্দরী!
নহে রূপ! রূপ! আলোকে আঁধার আন,
ডুবাও তিমিরে, সব স্পর্শ সব জ্ঞান
ঘুচুক্ আমার, নিভে যাক্ ওই রূপ!

পিয়ারা। শ্রান্তিহীন বিরামবিহীন আজ্ঞামত
পালিয়াছি সব, শিখায়েছ যাহা প্রভু
সব শিখিয়াছি, শুধু শিখি নাই তাই
লুকাতে কেমনে হয়; শিখি নাই শুধু
আপনার কথা দিয়ে জানাতে আপনা...
জানা কারে বলে বল, জানাতে কেমনে
হয়; দেব কিবা আছে মোর, দেহ প্রাণ
রূপ মোর এ বর্ণতরঙ্গ লালায়িত
গতি, নরপতি! সবি তব ক্রীত, তবে
স্বাধীনতা কোথা মোর; আমার ত, কিছু
নয় প্রভু হওয়া হায়...দেওয়া দেখি
কিবা আছে মোর, আমি ত আমার নই!

কল্পরায়। ক্রীত, ক্রীত, জানি আমি সব ক্রীত, জানি
আমি কাশ্মীর বিজয়ে, রাঙিয়া, পিয়ারা
মোর ধ্বজাঙ্কিত ক্রীত ক্রীতদাস, তবু
কহি আজ, নাহি চাই তুলিতে সে কথা,
অতীতের লেখা পৃষ্ঠা ফেলিয়াছি ছিঁড়ে
আজি হতে নব স্মৃতি লবে ইতিহাস...
চাই শুধু তোমা প্রিয়তমে, স্বপ্নময়
জীবনের গেহে, তোমারে হেরিব সত্য—
সত্য তুমি, রূপ তুমি, হৃদয়ে হৃদয়ে
তাই করি অনুভব, তোমার পরশ-
সুখ, বল ধনি, প্রাণমণি কমলিনী

মোর, তুমি, তুমি...তুমি ত আমার হবে!

পিয়ারা। একি কথা মগধ সম্রাট, রাজ রাজ-
চক্রবর্ত্তী গৌরব-গরিমা, ডুবাইবে
কালিন্দী অতল জলে মগ্ন ভ্রমশায়
হীন অস্পৃশ্যা সে ক্রীত ক্রীতদাসী তরে!

কৃষ্ণরায়। আজি হতে মুক্ত তুমি, পিঞ্জর-আবদ্ধ
মোর হে বিহগী, খুড়ি বেড়া তোর আজ—
কিন্তু পুনঃ পরাইব প্রাণের শৃঙ্খল, রাখি
হৃদয় পিঞ্জরে জন্ম জন্ম তোরে তোয়
ক্রীতদাসী নহ তুমি আর মুক্ত...মুক্ত...

পিয়ারা। মুক্ত...মুক্ত...মুক্তি...মুক্তি, কহ কিবা
হে সম্রাট, বীর তুমি বিখ্যাত জগতে,
নারীরে না ছলা সাজে প্রভু, একি প্রভু!
নারী কি অরণ্য কাষ্ঠ ইন্ধন কামের?
শুধু নর-হৃদে জ্বালে দাবানল, আর
কিছু নহে সেই? ক্ষম প্রভু—ক্ষম মোরে
বাঁধিয়াছ কত সূত্রে, পুনঃ মিথ্যার এ
স্বপ্ন-জালে কর না রঙিন মোরে আর।

কৃষ্ণরায়। বীর নাহি করে কভু ছল, পুনঃ কহি
সম্রাটে না কহে মিথ্যা কভু, এস সাথে
সাম্রাজ্ঞী আমার, নিজহাতে ছিন্ন করি
মুক্তিপত্র তব, দিব তোমা উপহার
সাম্রাজ্য আমার, সিংহাসন, রাজবংশ-
খ্যাতি, মণিমুক্তা কুবের সম্পদ, দিব
সর্ব্বজনপদ, সসাগরা ধরণীর
হবে অধিশ্বরী, দিব প্রাণ মম, দিব
ধর্ম্ম, দিব অর্থ, দিব মোক্ষ, সর্ব্বকাম

মিটাব তোমার ; কামনায় রচা গেহে
তুমি লো কামিনী মোর, কাম হতে জন্ম
তব, তাই সে কামিনা নাম নরে দেয়
তোমা, এস এস হবে তুমি কামনায়
পূর্ণ-মনরথা, এস মম জীবনের
নিঃসঙ্গ প্রেয়সী, দাবানল জ্বালি
হৃদে দহিছ সে অহঃরহ, অথবা সে
মহাসিন্ধু-বুকে বাড়বাগ্নি, জ্বলে যথা,
তেমনি এ জ্বলে প্রাণ, স্বাক্ষী ওই চাঁদ
স্বাক্ষী বনস্পতি...

পিয়ারা। স্বাক্ষী ওই পূর্ণিমার
চাঁদ, কালি কলা ক্ষয় হবে যার, নিতি
নিতি কমে বাড়ে সেই, তার স্বাক্ষ্য!

কৃষ্ণরায়। স্বাক্ষী
আমি, পরাণ আমার, ওই হের ধ্রুব
তারা, ধ্রুব অংশে জন্ম মম, মিথ্যা নাহি
কহি, আদিবাণী মাতৃনামে করি দিব্য
সাম্রাজ্ঞী তুমি লো আজ, এস সাথে...

পিয়ারা। (স্বগতঃ) মুক্তি—মুক্তি...স্বপ্নে সত্যে কিবা সে প্রভেদ
কিন্তু কেবা চাহে সাম্রাজ্য তোমার ..না না...

(কৃষ্ণরায় অগ্রসর হইয়া, যে গাছের আড়ালে রাঙিয়া দঁড়াইয়াছিল সেই গাছের কাছে আসিতেই তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে পড়িল... কৃষ্ণরায় চমকিয়া উঠিলেন...রাঙিয়াও একটু সাহাস্য মুখে দাঁড়াইয়া নতজানু হইয়া ভূমিষ্ঠ হইল)

কৃষ্ণরায়। কে? রাঙিয়া, তুমি, তুমি হেথা এত রাত্রে?

রাঙিয়া। আজ্ঞে এই রেতের বেলা মাকড়সায় এই ফুলের গাছে
জাল বোনে, তার জন্যে এই ফুলের কুঁড়িগুলো ভাল করে

ফুটতে পায় না, তাই জাল ছিঁড়ে দিতে এসেছি,...জালে জড়িয়ে গেলে ফুল আর ফুটতে পায় না...ওদের ব্যথা লাগে

কৃষ্ণরায়। ফুলের কি ব্যথা পায় তাহা বুঝিবারে...
ব্যথা লাগে এই জ্ঞান কে তোমারে দিল?
কি আশ্চর্য্য! নিরক্ষর জড় সম খাট
দিনরাত, তবু আছে প্রাণ, আর এই
সর্ব্ববিদ্যা শিখালাম যারে, সে কহে যে
প্রাণ কোথা তার...ভাল ভাল, দেখ, শোন
কালি প্রাতে গৃহে মম হইবে উৎসব
হয়নি ধরায় যাহা, তোমা'পরে রল
এই ভার, ফুলসাজে সাজাইবে এরে,
গঠি সর্ব্ব অলঙ্কার মুকুট কাঁচলী
সিঁথা, চারুচন্দ্রহার, রচিবে গোলাপ
মালা, ফোল কাঁটা তার; না হতে প্রভাত
পাই যেন সব, আর পরিবর্ত্তে তার
মিলিবে সে বহু পুরস্কার স্বপনেও
ভাব নাই যাহা...

রাণ্ডিয়া। পুরস্কার...আমার আবার পুরস্কার...কায করতে হয় করি, করি মালীগিরি, তার আবার কারিকুরি, তার আবার আকার, তার পুরস্কার...আর স্বপোনের কথা যে প্রভু আদেশ করছেন...তা বড় দেখিনি...তার কথা ত ভাবিনি...

কৃষ্ণরায়। পাবে মুক্তি...

রাণ্ডিয়া। মুক্তি...মুক্তি...মুক্তি কিসের? আমার ত' কোন বাঁধন নেই—

কৃষ্ণরায়। নাহি চাও—
এই দাসত্বের হীন শৃঙ্খলের ভার
টুটাতে হয় না সাধ ? নাহি কভু মনে
পড়ে, কাশ্মীরের উপত্যকাদেশ, সেই
সে নদীর তীর, সেই ভূর্জ্জবৃক্ষশ্রেণী,
তার কোলে, ফিরে যেতে নাহি হয় সাধ ?

রাঙিয়া। সাধ...সাধ...ওইখানেই আমার সব বাদ, ওসব আর কেন প্রভু...এই মালাগিরিই ত বেশ, কি হবে আমার দেশ, জল ঢালি মাটি কাটি মাটির সঙ্গে হয়ে আছি মাটি... এই দেখুন না তাকে খুঁড়ছি, মাড়াচ্ছি...ছেঁচছি, কুটছি, সে মাটি কথাই কয় না...আমারও তেমনি কেমন সব মনেই হয় না, ও কেবল ফুল ফোটায়, আর আমার মুখের দিকে তাকায়, কিছু বলে না, আমিও অম্‌নি ফুল ফোটাই, আর ওর মুখের দিকে তাকাই, এই গোলাপ বলে আমি ইরাণের এ বলে আমি কাশ্মীরের, মাটি বলে আমি রাজার...আমি সব সয়েই যাই, আমিও তেমনি রাজার ওই মাটির মত সয়েই যাই...মাটি ফাটে গোলাপ ফোটে, আর কত ভোমরা সেথায় এসে জোটে, মাটি চুপমেরে থাকে, গোলাপ হাসে, মাটি চুপ, আমিও চুপ,...তখন আর কিছুই ঠাওর করতে পারিনি, ভাবি এই মাটি ফুঁড়েই এই হাসি দেখা দিলে.. না আমার এই বুকের মধ্যে থেকেই বেরিয়ে এল... ও মুক্তিও জানিনে, বাঁধনও বুঝিনে, এ বেশ সুখেই ত আছি প্রভু ! কাশ্মীরে আর আছে কে, আমার জন্যে মরবে যে... ও সব কথা ধরাবেন না...

কৃষ্ণরায়। বটে, মাটি সাথে হ'য়ে আছ মাটি, জড়
সম অচল নীরব, তাই এ শৃঙ্খল
ভার নাহি লাগে তব...শুধু ফুটাইছ
ফুল, ঢালিতেছ জল, নীরবে চাহিয়া

আছ শুধু মাটি পানে...বুঝনা জীবন
কিবা, এ মনুষ্যজন্ম লভি কত আশা
জাগে নরহৃদে, কত স্বাধীনতা চায়
এ পরাণ, ভাল ভাল...কর কায জড়
সম রহ অচেতন...চাও না সে মুক্তি
তবে

রাঙিয়া। না প্রভু, এই ত আমার বেশ, কাট্‌ছি ঘাস, কর্‌ছি ফুলের চাষ, এর চেয়ে আবার সুখের আশ, না প্রভু এইখানেই খতম, বাস্‌...

কৃষ্ণরায়। এস তবে পিযারা আমার আজি
আমি পূর্ণমনস্কাম, পূর্ণ হতে হব
পূর্ণতম, মিলিয়া তোমাতে, পূর্ণ হবে
এই বিশ্ব, এতদিন যেই আদর্শের
মায়ামৃগ পাছে ছুটিয়াছি পিছে পিছে
আজ তাহা মিলিয়াছে মোর, তোমা সনে
প্রাণের মিলনে, হবে সে দর্শন, মোর—
প্রত্যঙ্গ প্রত্যঙ্গ বন্ধ কাটিবে আমার...

পিয়ারা। (জনান্তিকে—রাঙিয়ার প্রতি চাহিয়া স্বগতঃ)
বাঁধন তোমার থাকবে কেন আর...
যার বাঁধনে পড়্‌বে বাঁধা
সেত নয় তোমার
মরণ বাঁচন আমার কেবল,
তোমার কেবল হাসি
তোমার বেলায় ফুলের ভূষণ
কিন্তু, আমার বেলায় ফাঁসি...

[প্রস্থান।

রাঙিয়া। সবাই পেলে সোণার হরিণ! সবাই ত বেশ ভরে

উঠ্‌ল, তোর ভোরও হয়ে আস্‌ছে, কেমন ফুটছিস্‌ বল্‌, তোর কাল সাজবার পালা, আমার এখন কিসের পালা...আমার কাঁটা, তোর ফোটা, বোঁটা থেকে খস্‌লেই তুইও বাঁচিস্‌ আমিও বাঁচি।...আমি মাটিতে বুক রগ্‌ড়ে রগ্‌ড়ে যাই...তুই সিংহাসন আলো কর, মাটি মাটিই থাক্‌বে তুই যে শুখিয়ে যাবি...(শ্যামা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল) বা: বাঃ...ওই যে শ্যামা কি গায়...কে জানে...তুইও বাঁচলি আমিও বাঁচলুম...কেমন গোলাপ তোকে কাল বলেছিলুম যে তোর ভোর...হাহা...ঠিক্‌...(রাঙিয়া ফুল তুলিতে লাগিল)

ছিঁড়লে ব্যথা বাজে, বাজে না?...বলে তোর ব্যথা কি করে বুঝি হা হা...ঠিক ঘাসগুলো ওই মাড়িয়ে যায় আমার বুকটা কর্‌কর্‌ করে ওঠে...বাজে না—তা বাজুক মায়া রাখিস্‌ নি, লো! মায়া রাখিস্‌ নি...তোরও ফুল জন্মের ঘোর কাটুক...আমারও এ নেশার ভোঁর কাটুক বলে তোর কাঁটা ফেলে—ডাঁটা রাখ্‌তে, কাঁটা ফেলে দিলে যে তোর কদর যায় এ ত তারা বুঝে না...ওই যে শ্যামা কি বলে না...ওই একই কথা...গুল্‌ গুল্‌ পিয়া! পিয়া! ও সখি ফোট্‌ ফোট্‌...

পঞ্চম দৃশ্য।

[কাননের এক প্রান্তে রাঙিয়ার কুটীর...ঝুম্‌কোলতা ও মালতী গাছে কুটীরটি আচ্ছাদিত, থোকা থোকা ঝুম্‌কো ফুল ফুটিয়া দুলিতেছে, শুভ্র তুষারের মত মালতীর দল চন্দ্রালোকে হাসিতেছে...চারিদিকে নীরব, চন্দ্র তখন পশ্চিম দিগ্‌বলয়ের তীরে নামিতেছে, জ্যোৎস্না এখন রক্তরাগে পরিণত, শেষ মাধুর্য্য এখন ক্রন্দনের আভায় ভরিয়া উঠিতেছে...চারিদিক নিস্তব্ধ নিঝুম, শুধু বাতাসের সাড়ায় পাতা

নড়ার শব্দ মাঝে মাঝে উঠিতেছে...কুটীরের মধ্যে ঘর...মাটিতে বসিয়া রাঙিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে শ্বেত রক্ত পীত কত বর্ণের ফুল পাতা, ছড়ান, রাঙিয়া ফুলের অলঙ্কার প্রস্তুত করিতেছে, মুকুট, সিঁতা, বাজুবন্ধ, হার সব হইয়া গেছে, এখন পায়ের নূপুর গড়িতেছে ...কেবল শ্বেত পদ্ম দুটি বসাইতে বাকী...গৃহকোণে একটা দীপ জ্বলিতেছে, একটা প্রজাপতি উড়িয়া উড়িয়া সেই দীপালোকের উপর আসিয়া পড়িতেছে...রাঙিয়া নূপুর গড়িতেছে, আর হাসিতেছে...]

রাঙিয়া। তিনবার...তিন প্রহরে, তিনবার উলুকে হেঁকে গেছে... ঘুমিয়ো না, ঘুমিয়ো না, ঘুমিয়ো না—বুকের ভেতর দোল দিয়েছে।...আমার সব গড়া হয়ে গেছে বাকী শুধু এই ফুলের নূপুর, এ মঞ্জীরে কি সুর বাজবে তাই ভাবছি... এই যে তুই পুড়্‌তে এসেছিস্...পোড়্ পোড়্ পুড়ে মর্... রূপের আগুনে পুড়ে মর্‌বি বৈকি...আগুনে আগুন টানে, তোর প্রাণে আগুন ত আছে...তখন টান পড়্‌বে বৈকি... পোড়্ পোড়্ পুড়ে মর্...দীপ জ্বলে না পতঙ্গ জ্বলে, না আমি জ্বলি, জ্বলে পোড়ে, না পুড়ে জ্বলে...এই যে নূপুর তুমি ত পায়ের পাতায় সাজ নেবে, তুমি তার তাপে জ্বল্‌বে, না সে তোমার তাপে জ্বল্‌বে...বল্‌তে পার... সবাই জ্বলে তুমিও জ্বল, তা তা বেশ...(একটা ফুল লইয়া) এই যে তোমার বড় ব্যথা লেগেছিল না...কি সুন্দরী! তুমি যে কি বল্‌বে বলে থমথমিয়ে রয়েছ...ঠোঁট আল্‌গা কর, তোমার আবার কি গোপন কথা আছে বল, বলে ফেল, বল্‌বে না, তবে বল্‌বে না, তার পায়ের পাতা না ছুঁলে, তোমার বোল বুঝি ফুট্‌বে না, তা তা বেশ, তার পা ছুঁলে আমার বোল ফুট্‌বে, তোমার বোলও ফুট্‌বে, তা তা বেশ...তোমার বলা হলেই তোমার মুক্তি, আমার

বলা হলেই আমার মুক্তি...বাকী—বাকী এই নূপুর...এই মঞ্জীর...তার পর, আয় ঘুম আয়, আয় ঘুম আয়...কিন্তু গোলাপ কই, হেথায় ত আর কেউ নেই, তুই একটিবার মুখ খোল, শুধু আজ রাত্রিটার মত—শুধু তুমি আর আমি—ফোট গোলাপ ফোট, একটি একটি করে তোমার ওই রূপের পাপড়ি আলগা কর, খোল, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার...আমার এই অন্ধকার হৃদয়ের স্মৃতির ঝরখাগুলো এক এক করে খুলে যাক্...সে আজ কতদিন গোলাপ...
.........মনে পড়ে...সেই...আঃ

(দূর হইতে বিলাসভবনের আলোকরশ্মি ও সঙ্গীতের সুরের সঙ্গে পাপিয়ার তান ভাসিয়া আসিতেছিল)

বাজে লো বাজে
ভ্রমরা গুন গুন চরণে মঞ্জীর
ঝনুনু রুনু রুনু বাজে।
পিয়ারা প্রেমভরে আঁখিয়া মিলায়ে যায়
প্রাণ নয়ন কাঁদে আকুল লুটায় পায়
দূরে পাপিয়া বোলে পিয়া পিয়া
কে জানে কোথা দূরে বাঁশরী বাজে
প্রাণ প্রাণে চাহে সে মধুমুখ চুমি
মন মনে গাহে হে বঁধু আমার তুমি,
আমার স্বপন তুমি আমার জীবন তুমি
এস হে বাঞ্ছিত এ হৃদি মাঝে...
যৌবন ফুলবনে তনুমন মধুরাশি
ঢালি দিনু পায় মুখপানে চেয়ে হাসি
হাসির লহর তুলি, আপনি আপনা ভুলি
বিসরি সরম তবু মরমে বাজে!

(রাঙিয়া গান শুনিতে শুনিতে হাসিতেছিল...
ওই যে মরালের ডাক শুনছি, এই শ্বেতপদ্মই ঠিক...পদ্ম না

হলে মরালের কাহিনী ফোটে না...মরাল না হলে সাপের কাহিনীও ফোটে না...পায়ের পাতায় পদ্ম, আগে মরাল তার পরেই সর্প... বাঃ বাঃ...ঠিক্ ঠিক্...মরাল না হলে পদ্মের মুড়ি খায় কে...সাপ না হলে মরালের ডাক বন্ধ করে কে—বাঃ বাঃ ঠিক্...জাগলেই ঘুমুতে হয়, ঘুমুলেই জাগতে হয়...আয় ঘুম আয়...

(নেপথ্যে পিয়ারা গাহিতেছিল...

রেখেছি লুকিয়ে কথা
বল্‌ব তারে কেমন করে
আপন মনে আপনি আছে
শুন্‌লে সে যে পড়্‌বে ঝরে...
কার মানা মান্‌বে না
মুখ ফুটে সে বল্‌তে কভু পার্‌বে না লো...
পার্‌বে না...
তার হৃদয়-ব্যথা, হৃদে গাঁথা রেখেছে সে কত করে...
আমি নয়ন তুলে সকল ভুলে
বল্‌ব তারে কি করে...

(এমন সময় বাহিরে কুটীরদ্বারে...'রাঙিয়া'...'রাঙিয়া' বলিয়া কে ডাকিল...রুদ্ধ দুয়ারে কে আঘাত করিল, রাঙিয়া চমকিয়া উঠিল...তাহার হস্ত হইতে ফুলের মঞ্জীর পড়িয়া গেল রাঙিয়া চমকিয়া উঠিয়া তাহা তুলিয়া চুম্বন করিল...বাহিরে আবার কে ডাকিল)

রাঙিয়া। কে...কে...অ্যাঁ কে...এতরাত্রে মরালের ডাক্ অ্যাঁ...
পদ্মবন ত উজাড় হ'য়ে গেছে তবু মরাল ডাকে কেন...
না না নিশ্চয়ই ভোরের হাওয়ায় কিসের ডাক্ উঠ্‌ছে...

(বাহিরে আবার আঘাত করিল, ডাকিল ..রাঙিয়া...রাঙিয়া...)

কি রকম হোল না...ও হাওয়ার ঝাপ্‌টা...নইলে এত রাত্রে কে...

(পুনর্ব্বার 'রাঙিয়া' 'রাঙিয়া' 'রাঙিয়া' শব্দ হইল)...না না...
একি আমাকে কি...উঁহুঁ (বুকে হাত রাখিয়া)...এ ডাক্

বাইরের না ভেতরের...না আমি কি উন্মাদ হলুম...উঁহুঁ!
বল্‌না...বল্‌না...বল মুখ খোল্‌না—খুল্‌বে না...খুল্‌বে না...
তবু খুল্‌বে না...কিন্তু না ওই আবার...আবার...না না
এ মনে না...মনে...না বনে, না মনে না কানে, না
কানে নয়...এ কি—না এ আমারই বুকের ভেতর থেকেই
ডুকরে উঠেছে, বুকের মধ্যেই ত...বলনা গোলাপ, গোলাপ,
মনের রূপ কি মন থেকে বেরিয়ে তোর মত কথা
কয়। কই তবে আঁসে, কই তোর মত মাটি ফেটে
—বুক ভরে ফুটে ওঠে...কই

(রাঙিয়া একবার করিয়া সেই মঞ্জার বুকে ধরিয়া একবার
করিয়া দ্বারের কাছে গিয়া কান পেতে, আবার ফিরিয়া
আসে, আবার মুখ হাঁ করিয়া চুপ্ করিয়া চাহিয়া থাকে...
বাহিরে আবার 'রাঙিয়া'! 'রাঙিয়া'! 'রাঙিয়া'! বলিয়া
ডাকিল...রাঙিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিল পিয়ারা···পিয়ারা
প্রবেশ করিল...বিবর্ণমুখ পাণ্ডুর, কেবল ভাব সঙ্গোপনের
চেষ্টায় মুখ মাঝে মাঝে আরক্ত হইয়া উঠিতেছে)

পিয়ারা। ভোর না হ'তে নিবতে তারা
সারা নিশি জেগে সারা
দিশেহারা করছ কি সে ছাই...

রাঙিয়া। অ্যাঁ! অ্যাঁ! তাই...তাই...আরো ফুল ত চাই...
পিয়ারা! পিয়ারা! উঁহুঁ না সাম্রাজ্ঞী

পিয়ারা। হা হা হা ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ

বল্‌বে নাক তা
মালীগিরির কারসাজীতে
আর কি আছে মাথা
এখন নিয়ে খোস্তা হাতা

মাটির সঙ্গে হচ্ছে মাটি—
ঠিক ব্যাঙের ছাতা...
জড়ের মত ভূতের মত
আঁখিটি তুলে দেখ্‌ছ কত
মাটি সে যত হচ্ছে মাটি
তোমার বুদ্ধি বাড়্‌ছে তত...
হায়রে ঝেলাম! হায়রে গোলাম.
এই ক'দিনেই এত

রাভিয়া। কত দিনেই কত, এই যে কত ফুল, কত ভুল, তা-তা...
তুমি এখন সাম্রাজ্ঞী...
এ চালে কি চলে ভাগাভাগি
এতে শুধু বুকের দগ্‌দগি
হাজার বছর ধরে শুধু
অনুরাগের ঘা
মলয় শুধু ফিরে ফিরে
জুড়িয়ে দেয় সে গা...
এই দেখনা ফুল কেমন হাসছে, তুমিও হাস্‌ছ আর আমি এই করছি কায—তোমার সাধের ফুলের সাজ, বাকী শুধু এই নূপুরটা...এই মঞ্জীরটা হলেই সব কায ফুরোয়...

পিয়ারা। ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ,
বলছ বঁধু কিসের তরে,
যার, অঙ্গে কখন পড়েনি ছুরি
দাগ দেখে সে হেসেই মরে,
ভাবি, বল্‌ব কি আর ছাই—
কথা শুনে ইচ্ছে করে
ডুবে মরে যাই,

ফুটিয়ে তুলে ফুল,
জড় কর্‌লে হাজার ভুল,
এখন গেঁথে মালা
পরলে ভুলের তাজ,
এখন কি ফুরোয়নিক কায...

রাঙিয়া। কায কি কখন ফুরোয়, না সাধ কখন মেটে

পিয়ারা। সাধ, সাধ কার কার সাধ

রাঙিয়া। যার অভেনি বাঁধ

পিয়ারা। বালির বাঁধে মনকে বেঁধে
বলছ কাযের ঢেউ
একি আর বুঝছে নাক কেউ...

রাঙিয়া। তা তা ..এই সব, এই সব ত পড়েই আছে...তা-তা কার সাধে সাধে বাদ, আমায় এখন দাও বাদ, ও সবই বালির বাঁধ...ও-তা-তা...

পিয়ারা। তা-তা-তা-আর তোমার মাথা...
বলি শুনছ, ওগো! কাল যে আমার মুক্তি
বঁধু, কাল যে আমার মুক্তি
ভোর হলেই সে নতুন হব
হ'ল রাজার সঙ্গে চুক্তি
এখন তোমার যুক্তিটা কি শুনি
না শেষ কর্‌বে রক্তারক্তি
তোমার মতিগতি ত' জানি
একটা কিছু বল শুনি...

রাঙিয়া। তা...তা...তা বটে, মন না মতি, তবে কি জান বাকী কেবল তোমার পায়ের এই মঞ্জীর, সেইটেই আমার মস্ত নজীর...আমার আর যুক্তি মুক্তি, ভুক্তি...যে ব্যক্তিই নয় তার আবার হুঁ...তা-তা বেশত...এই যে গোলাপের

হাসি, তা-তা তুমি হাস্‌বে...হাস্‌বে প্রভু, আমি এখন জবুথবু...হাস্‌বে আকাশ, হাস্‌বে ফুল, ভুলের ওপর জম্‌বে ভুল, হাস্‌বে জগৎ, হাস্‌বে তারা, নতুন প্রেমের এম্‌নি ধারা...

পিয়ারা। আর তুমি কেবল হাসিয়ে সারা
ঢেউ দিয়ে সে দেখ্‌ছ কেবল
তরী ভাসে কেমন ধারা...

রাণ্ডিয়া। তা কেউ ফোটে, কেউ ফোটায়...কেউ লোটে কেউ লোটায়, তার কি আসে যায়, আসে যায় পায় পায়...

পিয়ারা। বটে; কার আর কি আসে যায়
যার যায় তারি যায়...
লোকে হেরে হেসে মরে
থাক্‌লে যৌবন বিকোয় দরে...
দেখ...প্রথম হোল মনে সাধ
বিধি রচ্‌লে ফুল,
তায় ঘট্‌ল পরমাদ
কাঁটায় ভর্‌ল মূল—
আগে অরুণ, পরে তরুণ
জীবন হোল তার
ফুট্‌তে ফুট্‌তে দুল্‌ল ফুল
ভাবলে কি বাহার!
হোল অঘটন মায়ার রচন
যৌবনে দিলে ডাক্,
মন দিয়ে মন বাঁধ্‌লে মনে
সাতটা পাকে পাক্।
পাপড়ি বেঁধে ঢেউ দিয়ে সেই
তুললে রূপের ঢেউ

আকাশ পানে চাইতে ফুল
দেখ্‌লে নেইক কেউ!
গন্ধ নিয়ে এল বয়ে
আনলে চোখের জল
আজ কি সাধে বিষাদে ভাসে
তার প্রেমে এত ছল!
আমি কি ছিলেম, কি হলেম
আর কিবে হই,
এখন সরম রেখে ধরম রেখে
ঝরতে পারি কই!
এখন কি করি কি বলি
রাত যে গেল বয়ে,
এতদিন যে ছিলেম বঁধু
তোমারি ও মুখ চেয়ে
এখন রাঙিয়ে তুল্‌লে হৃদয়-পুরে—
গন্ধে হোল ভুর্ ভুর্
ওই ধেয়ে যে আসে অলি
বল তারেই বা কি বলি...

রাঙিয়া। তা ভোমরার বুলি ত শিখিনি...আমিই বা কি বলি...
আমি ত জড় অচল মাটি
মাটির সঙ্গে হ'য়ে খাঁটী,
শুধুই জল ঢালি—
ফুরিয়েছে সব বলাবলি—

পিয়ারা। ও:...

(পিয়ারার চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। পিয়ারা একবার মুখ তুলিয়া তাকাইয়া আবার আঁখি নত করিয়া চলিয়া গেল)

রাঙিয়া। চল্ রে রাঙিয়া নূপুর বেঁধে দিবি চল্, তোর আর কি কায আছে বল্...ওই যে গোলাপী আলোর ওড়না উড়িয়ে আসছে...

(বৃক্ষে বৃক্ষে পাপিয়া ঝঙ্কার করিয়া উঠিল, প্রভাত আগমনের জাগরণে পাখীর রবে কানন মুখরিত হইয়া উঠিল...রাঙিয়া সেই ফুলের নূপুর বক্ষে ধরিয়া পিয়ারার প্রস্থানের পথে নীরবে তাকাইয়া রহিল)...

ষষ্ঠ দৃশ্য।

[কৃষ্ণরায়ের বিলাসকক্ষ...তখন ভোর হয় নাই, অন্ধকারকে ঠেলিয়া আলোক যেন বাহির হইবার বিরাট যুদ্ধ করিতেছে... অরুণ আসিয়া প্রভাতী তারাকে যেন বুকের ভিতর টানিয়া লইতেছে... বিলাসকক্ষ তখন দীপালোকেও যেন ম্রিয়মাণ—দীপ জ্বলিতেছে কিন্তু তাহার সে দীপ্তি নাই...মর্ম্মের চিত্রিত হর্ম্ম্যতলে স্বর্ণাসনে... সম্মুখে বসিয়া পিয়ারা গাহিতেছিল...পার্শ্বে স্ফাটীক নির্ম্মিত পুষ্পাধার ও স্বর্ণমরকত খচিত পুষ্পপাত্র...প্রভাত অরুণালোক তখনও গৃহমধ্যে প্রবেশ করে নাই...

প্রেম এমনি ধারা
ঝরে নয়ন তারা,
যে জন বাসিবে ভাল হবে সে সারা।
ভাল বাসিনু যারে
সারা জীবন ধরে
সে গুণের পিয়া মোর ফেলি গেল রে—
আজি সকলি হারা
শুধু চোখের ধারা
মুছাতে কেহ ত নাই আঁধার কারা।
আজি মরিতে চাহি
শুধু মরণ নাহি

নিমেষে পিয়ারে যদি পরাণে পাতি
ফুল যেমন করে
বনে ফুটে সে ঝরে
তেমনি ফুটিয়া ভবে হয় সে ঝরা।

(গান থামিল, কৃষ্ণরায় প্রবেশ করিলেন)

কৃষ্ণরায়। ছিন্ন করি দুই হাতে মোহমৃত্যু-ফাঁস
খুলি হৈমদ্বার হের উদে লো ভাস্বর
জগজ্জন মনোহর, আনন্দ কারণ,
কারণ সলিল হতে, তিমির বাঁধনে
যথা রাখিতে না পারে তারে আর, সেই
মত এই তব বন্ধনের ফাঁস, নিজ
রূপে কাটিতেছ নিজে, গুটীকা যেমতি
কাটি প্রকাশয়ে নিজ অপরূপ রূপ,
হিরণ্ময় পাখা মেলি উড়ে মুক্তপ্রাণ
নীলাকাশে সর্ব্ববন্ধ করিয়া মোচন...

পিয়ারা গুটীকা আপন মায়া রচি নিজহাতে
নিজে কাটে আপনার জাল, পরকৃত
এ বন্ধন নিজহাতে কাটিব কেমনে
তায় স্বভাবে অবলা আমি বল শুধু
ওই চেয়ে থাকা, পিঞ্জর-আবদ্ধ পাখী
নীলাকাশ পানে যথা চায় চঞ্চু দিয়া
লোহজালে চায় কাটিবারে, ব্যর্থ হয়ে
ঝরে রক্ত, পক্ষ ঝাপটিয়া ছাড়ে ঘন
দীর্ঘ সজল নিশ্বাস, আর কিবা পারে...

কৃষ্ণরায়। বটে বটে লও, লও, এই তব মুক্তি-
পত্র, ভাঙিয়া পিঞ্জর ছাড়ি দিনু তোরে...
হের, আজি তুমি রাজরাজেশ্বরী, ওকি

ছল ছল ও কমল আঁখি, পিয়ারা লো…
সিংহাসন রাজৈশ্বর্য্য কনক-মুকুট
সব তব পায় করি সমর্পণ, রব
শুধু তোমারি সে ধ্যানে, শুধু রব ওই
মুখপানে চাহি…চাহি চাহি…কথা কও
কথা কও…লাজনতা ম্লান শুকতারা
প্রভাত অরুণে হেরি চমকিত কেন…

পিয়ারা। রাজরাজ ক্ষম এ দাসীরে, ক্ষম মোরে
সাম্রাজ্য চাহে না নারী, মুক্তি বিনিময়ে
সাম্রাজ্য না চায় নারী, বিনিময় লেখা
নয় নারীর পরাণে, আজি যদি পুনঃ
স্বাধীনা সে আমি, শুন তবে এ সম্রাট
ফুল যথা ফুটে উঠে জানায় আপনা
ঢালিয়া সুবাস তার প্রাণের সরম,
মরম জাড়িয়া ঝরে প্রিয়তম পদে,
তেমনি সে নারীজাতি উঠে ফুটে চির
আপন মহিমা লয়ে আপন মরমে,
আঁখি পালটিতে ডারে সে চরণ তলে…
নদী যথা সঙ্গোপনে আনে মণিজাল
অর্পিতে সাগরজলে, চরম তাহার…
সেই তার সার্থকতা, সেই মুক্তি তার—
নহে তব রাজৈশ্বর্য্য যশ খ্যাতি মান
নহে তব বীরত্ব গৌরবগাথা বিশ্ব-
বিজয়িনী, নহে কাম কামানল ভোগ
হব্য-যাগে ঘৃতাহুতি ইন্ধন পুরুষ,
নারী চায় ধর্ম্ম, নহে তাহা রাজধর্ম্ম
তব, প্রাণ ধর্ম্মে ধর্ম্মিণী সে, ভাল যারে

নাহি বাসে, পারে নাক দিতে সে পরাণ

কৃষ্ণরায়। ভালবাসা, ভালবাসা, বল প্রিয়ে ভাল
কি বাসিবে মোরে, হৃদয় উন্মুখ, চিত্ত
পদ্ম কর প্রস্ফুটিত, বল প্রিয়ে বল
আমি ত বেসেছি ভাল, এর চেয়ে কভু
মানুষে কি পারে...পিয়ারা লো! বল তুমি
কারে ভালবাস

পিয়ারা। স্বাধীনা যে জিজ্ঞাসার
অধিকার তারে...নারী ভালবাসে কারে
এ কথা কি বলে কার, বলিতে কি তায়
শুনিয়াছ কভু

(দ্বারের সম্মুখে ধীরে ধীরে পুষ্প অলঙ্কার লইয়া রাজিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, কেহই দেখিল না...)

কৃষ্ণরায়। শুনি নাই, শুনি নাই
তাই চাই শুনিবারে, কহ একবার
কহ বল ভালবাস,

পিয়ারা। ভালবাসিনাক
আমি

কৃষ্ণরায়। আরেরে রাক্ষসী! মায়াবিনী প্রাণ
মনোহরা, ছলে ভুলাইয়ে লহ মুক্তি
আরে নাহি ভালবাস মোরে, আরে...

পিয়ারা। এত
নহে অস্ত্র ঝনৎকার দিগ্বিজয়
প্রমত্ত বারণ সম পর্ব্বতে আঘাত
এযে দরী প্রস্রবণ ক্ষীণ ধারা বয়
পশুতে কি পারে রোধে কি শকতি তার

কৃষ্ণরায়। সত্য কহ কে চাহে রূপক নাহি ক্ষমা
বল ভালবাস কিনা বাস...

পিয়ারা। ভাল নাহি
বাসি...

কৃষ্ণরায়। মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা তব বাণী, আরে...

পিয়ারা। নহে মিথ্যা, ভাল নাহি বাসি, এই লও
মুক্তিপত্র তব, কেবা চাহে, ছার এই
কজ্জল-শোভিত লিপি, শুষ্ক ভূর্জ্জপাতা
অর্থহীন যাহা, একবার কহে মুক্ত
আরবার স্বার্থ আশে রচে মিথ্যা বাণী
প্রলুব্ধ তরক্ষু সম হরে স্বাধীনতা...
ত্রিভুবন সাম্রাজ্য রতন দলি পায়...
...কিন্তু জানি
ভালবাসা বলে কারে, সে আমার আছে
জীবনে, মরণে ধ্যানে শয়নে স্বপনে...
ভালবাসা ভালবাসা, নাম নাই তার
মন্ত্র কভু বলে কহে, হাহা—

কৃষ্ণরায়। তবে তবে বাসিয়েনা ভাল, লহ লহ
চির মুক্তি তবে...
...বুঝিয়াছি বুঝিয়াছি সেই জড় মাটি
হতে মাটি ওই জড় করেছে আশ্রয়

(কৃষ্ণরায় পিয়ারার বক্ষ লক্ষ করিয়া ছুরিকা তুলিলেন, সহসা রাঙিয়া আসিয়া বক্ষ পাতিয়া দিল। কৃষ্ণরায়ের ছুরিকা রাঙিয়ার বক্ষ দীর্ণ করিয়া আমূল বিদ্ধ হইল...রাঙিয়া সেই সমস্ত পুষ্প-অলঙ্কার ও ফুলসম্ভার লইয়া পিয়ারার চরণতলে লুটাইয়া পড়িল... পিয়ারা তাহাকে বাহুবেষ্টনে জড়াইয়া ধরিল...

...আরে আরে জড়মূক
পাষাণ প্রাচীর কি করিলি...

ও দিকে রাজ্ঞী মধুমালতী দ্রুত আসিতেছিলেন—দ্বারের সম্মুখে আসিয়াই চমকিয়া উঠিলেন, কহিলেন

মধুমালতী। রক্ষ, রক্ষ......মহারাজ, এই তব রাজকার্য্য!

রাঙিয়া। হাহা, বোল্ ফুটেছে, জড়েরও প্রাণ আছে, তাই জড় জড়ো করে ঝড় ওঠে...জড় মাটিতেই ফুল ফোটে, ফল ধরে, তাই বোঁটা থেকে আল্‌গা হয়ে ঝরে...ওই যে শ্যামা কি বলে না গুল্ গুল্ পিয়া! পিয়া! ও সখি ফোট্ ফোট্ ...না—না—আয় ঘুম আয়, অনেক দিন ধরে বুকের ভেতর দোলাচ্ছিলি—এই আয় ঘুম আয়...

(রাঙিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল)

কৃষ্ণরায়। রাঙিয়া! রাঙিয়া!...

কি কি? মুহূর্ত্তেকে কিসের এ যবনিকা
ধরা পরে ছায়, ঝাঙ্কৃত ঝিল্লীকা গীতি
নিস্তব্ধ নীরব, সব সুর গেল থেমে—
জীবনের এই পরিণতি,—থেমে গেল
কাল, অনন্ত আরম্ভ হোল, জন্মমৃত্যু
স্বাদ পেলে, তুমি মুক্ত! জন্মমৃত্যু হাতে
যার বাঁধা...

(হঠাৎ একটা জোর বাতাস আসিয়া প্রদীপ নিভাইয়া দিল, দূর কানন-রাজীর বৃক্ষপত্র মধ্য হইতে আরক্ত সূর্য্য উঠিয়া তাকাইল... পিয়ারা নিশ্বাস ফেলিয়া অবশ হইয়া পড়িল...কৃষ্ণরায় দেখিলেন... মঞ্জীরের রক্তমাখা পদ্ম আপ্‌নি আপ্‌নি পাপড়ি মেলিতেছে...)

বাহিরে তখন কামানের ঘোর ঘর্ঘর ধ্বনি গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল... প্রভাতালোকে দেখা গেল বিজয়নগরের দুর্গপ্রাচীরে জ্বলন্ত গোলা আসিয়া পড়িতেছে।...

(যবনিকা পতন।)

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

কিশোর-কিশোরী

সে দিন নাহি গো আর যবে ভালবাসিতাম
শুধু মোর হৃদয়ের ভালবাসারে!
ভালবাসি, ভালবাসি, মনে মনে কহিতাম!
কারে ভালবাসি আমি নিজে নাহি জানিতাম!
হাসিতাম, কাঁদিতাম, শুধু ভালবাসিতাম
আপনারই হৃদয়ের ভালবাসারে!

কল্পনা-গগনালোকে উড়ে উড়ে ভাসিতাম!
সত্য বলে ধরিতাম সেই কল্পনারে—
মেঘের আড়ালে মোর মায়ানীড় বাঁধিতাম,
স্বপন মন্থন করা ফুলে ফুলে সাজাতাম,
কত দীপ জ্বালিতাম, কত গীত গাহিতাম,—
মেঘের আড়ালে মোর সেই মায়া-আগারে!

কেহ ভালবাসে নাই! তবু ভালবাসিতাম,
শুধু মোর হৃদয়ের ভালবাসারে!
ভালবাসা ভালবাসা, বলে শুধু কাঁদিতাম,
কারে কহে ভালবাসা তাও নাহি জানিতাম,
মধুর প্রেমের মূর্ত্তি মনে মনে গড়িতাম—
পূজিতাম দেহহীন সেই দেবতারে!

সেই প্রেম নিরাকার কতদিন থাকে আর ?
সব শূন্য হয়ে গেল জীবন-ভাণ্ডারে !—
নিভিল সে দীপাবলী, ছিঁড়িল সে ফুলহার,
নির্জ্জন পরাণ ভ'রে উঠিল রে হাহাকার !—
সে দিন বহিয়া গেল, যবে ভালবাসিতাম
শুধু মোর হৃদয়ের ভালবাসারে !

———

নারায়ণ

মাসিক পত্র।

সম্পাদক
শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ।

দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা।
ভাদ্র, ১৩২৩ সাল।

সূচী।

নারায়ণ

২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা]　　　　[ভাদ্র, ১৩২৩ সাল

মহাপ্রভু-সার্ব্বভৌম সংবাদ

মাঘ শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস।
ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস॥
চৈত্র রহি কৈল সার্ব্বভৌম বিমোচন।
বৈশাখ প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন॥

চৈ, চ, মধ্যঃ ষষ্ঠ—

ইচ্ছা এক; ঘটনা আর। চৈতন্যদেব দেখিলেন দেশে ধর্ম্মের দুর্ভিক্ষ, নীতির মহামারী, কৃপার অনাবৃষ্টি, সমাজনেতৃগণ অধিকাংশই উৎপথগামী, গৃহস্থেরা সংসারাসক্ত, সন্ন্যাসীগণ মর্কটবৈরাগ্যে অনুরক্ত, সুতরাং জগতের জীবনিবহের দশা অতীব শোচনীয়। অতএব এরূপক্ষেত্রে স্বার্থসঙ্কীর্ণতা-ত্যাগ এবং ধর্ম্মনীতির আদানপ্রদানে উদারতা একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। এই নিমিত্ত তিনি শ্রীনবদ্বীপ মহানগরীতে জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে অযাচিতভাবে শ্রীকরপল্লবহিল্লোলে কলিহতমর্ত্ত্যদলে ডাকিয়া ডাকিয়া শ্রীভগবানের নামপ্রেম বিতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু হইল কি? সম্পূর্ণ বিপরীত। নদীয়ার "ভূদেবগণ" একবারে বিরূপ হইয়া উঠিলেন। বিরূপ হইবেন না কেন? এদিকে যে দেবেন্দ্রগণের নন্দনকাননে

পারিজাত-হরণ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে—তাঁহাদের বড় সাধের প্রমোদ-উদ্যানে যে দুর্দ্দান্ত দানব প্রবেশ করিয়াছে। এখন দ্বিজেন্দ্রদলের যে ইন্দ্রজালের কুহক ভাঙ্গিয়া যায়, নামপ্রেমের প্রবাহে তাহাদের কাঠ-পাথর-মাটির সেতু যে নিঃশেষ ভাসিয়া চলে। তাঁহাদের নদীয়াচলের বারিতদ্বার মন্দির-কন্দরের সুখময় তিমিররাজ্যে যে অকস্মাৎ মধ্য-দিনের মিহির উদয় হইয়া পড়িয়াছে। যাহাই হউক, ব্রাহ্মণগণ অজ্ঞতা এবং স্বার্থান্ধতাবশতঃ চৈতন্যদেবের উদার ধর্ম্ম-নীতির প্রচার কার্য্যের বিশেষ বাধা উৎপাদন করিতে লাগিলেন। সে বাধা শুদ্ধ "ঘটত্ব পটত্ব" বা "স্যাৎ ন স্যাৎ" লইয়া তর্কযুক্তি বাদবিতণ্ডার রণ-যাত্রা নহে, সে এক বিষম ভীষণ ব্যাপার। নবদ্বীপের "ভূদেবগণ" এখন যেন দেব-দেহ মায়াচ্ছন্ন করিয়া ইতর-জীবকলেবর ধারণ-পূর্ব্বক চপেট বিটপী লইয়া প্রাণপণ প্রযত্নে তাঁহাদের সুখের রাজ্য রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বাবাজীরা টোল ছাড়িয়া কাজী সাহেবের দরবার পর্য্যন্ত দৌড়াইলেন! ঘটত্বপটত্বাদি ত্যাগ করিয়া লাঠি লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্কীর্ত্তনের মৃদঙ্গ ভাঙিতে ছুটিলেন! সর্ব্বনাশ! ইচ্ছা এক ঘটনা অন্য।

এইবার মহাপ্রভু স্থির করিলেন, সমাজের নিগড়ে বদ্ধ থাকিয়া, সামাজিকগণের সহিত ব্যবহারিক সম্পর্ক রাখিয়া, কেবলমাত্র নবদ্বীপ-নগরকেন্দ্রে দাঁড়াইয়া প্রচার-কর্ম্ম আর চলিবে না। এখন সন্ন্যাস করিয়া সকল পাশবিমুক্ত মুক্ত-গগনের বিহঙ্গ হইয়া পক্ষ-বিস্তার-পূর্ব্বক অন্তরীক্ষ আলোড়িত করিয়া বেড়াইতে হইবে, নচেৎ কিছু-তেই জগতের হিতসাধন হইবে না। এইজন্যই শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণ।

এইভাবে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মাঘমাসের শুক্লপক্ষে কণ্টকনগরে ভারতীস্বামীপাদের নিকট সন্ন্যাস-মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। মহাপ্রভুর মনের সাধ মিটিল, পাশমুক্ত বিহঙ্গ অসীম আকাশে আশ্রয় গ্রহণ করিল, নদীয়ার দ্বিজগণের পূর্ব্ব-পক্ষ বা পক্ষান্তর আর

সেদিকে চলিল না। তাঁহাদের "চড়চাপড় মুষ্ট্যাঘাতের" দুরভি-সন্ধিময় বীভৎস-যুদ্ধযাত্রা বন্দীর ন্যায় নবদ্বীপ-দ্বীপান্তরেই রহিয়া গেল। মহাপ্রভু সন্ন্যাস লইয়া নীলাচলে উপনীত হইলেন। তখন ফাল্গুন মাস—ভক্তবৃন্দ-পরিবৃত হইয়া আচার-প্রচারে তিনি পুরী-ধামেই রহিয়া গেলেন। চৈত্র মাস হইতে মহাপ্রভুর অভিনব প্রেম-ধর্ম্মের বিচিত্র প্রচার আরম্ভ। এখানে তাঁহার প্রথম সঙ্গ এবং প্রসঙ্গ বাণীবরপুত্র বাসুদেব সার্ব্বভৌমের সহিত।

বাসুদেব অনুদারনীতি অথচ অদ্বৈতবাদী মহিমাময় মহাপণ্ডিত। তাঁহার যশোগৌরব তৎকালে বহুদেশ বিশ্রুত ছিল; ভারত-বিশ্রুত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার মতানুবর্ত্তী। মহাপ্রভুকে তিনি সামান্য সন্ন্যাসী জ্ঞানে সন্ন্যাসভঙ্গের বিবিধ ভয়প্রদর্শন এবং বেদান্ত-শ্রবণাদির বহুবিধ উপদেশ প্রদান-অনন্তর নিজগৃহে শাঙ্কর-ভাষ্য শ্রবণের নিমিত্ত সাগ্রহ আহ্বান জানাইলেন। মহাপ্রভুও আপনার মূর্খতা অযোগ্যতা প্রভৃতি নানাপ্রকার দৈন্যোক্তি প্রকাশের পর সার্ব্বভৌমের নিকট বেদান্ত-শ্রবণে সম্মতিপ্রদান করিয়া তদীয় আহ্বান গ্রহণ-পূর্ব্বক সার্ব্বভৌমের অনুগমন করিলেন। সার্ব্বভৌম শাঙ্কর-ভাষ্য সহিত ব্রহ্মসূত্র শ্রবণ করাইতে আরম্ভ করিলেন। মহাপ্রভুও নীরবে সপ্তাহকাল তথায় শারীরক-ভাষ্য শ্রবণ করিলেন। কিন্তু এক্ষণে সার্ব্বভৌমের মনে সন্দেহ হইল, মহাপ্রভু তাঁহার ব্যাখ্যাত শারীরক-ভাষ্য বুঝিতে পারিতেছেন না। তিনি ভাবিলেন, চৈতন্য প্রথমেই যখন আপনার মূর্খতা এবং অযোগ্যতা সর্ব্বজন সমক্ষে স্বীকার করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই তিনি এ দুরূহ শাঙ্করভাষ্য বুঝিতেছেন না। বুঝিলে এরূপ নীরবে বসিয়া থাকিবেন কেন? বাস্তবিকই মহাপ্রভু প্রেমোচ্ছ্বাসপূর্ণ স্বাভাবিক দৈন্যবশতঃ ইতঃপূর্ব্বে সার্ব্বভৌম সমীপে যে অজ্ঞতা এবং অযোগ্যতা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, সার্ব্বভৌম তাহাই সত্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং এক্ষণে পণ্ডিত-সভায় সহসা একটি বিশেষ কৌতুহলময় চমৎকার ঘটনা সংঘটিত

হইল। সহস্র সহস্র লোক অন্তিকে দূরে বসিয়া দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসী সার্ব্বভৌমের কথোপকথন শ্রবণে নির্ভর-বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া পড়িতে লাগিল। সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে যাহা বলিলেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ চরিতামৃতে তাহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন;—

অষ্টম দিবসে তাঁরে পুছে সার্ব্বভৌম।
সাত দিন কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ॥
ভালমন্দ নাহি কহ রহ মৌন ধরি।
বুঝ কি না বুঝ ইহা জানিতে না পারি॥
প্রভু বলে মূর্খ আমি নাহি অধ্যয়ন।
তোমার আজ্ঞায় মাত্র করি যে শ্রবণ॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম লাগি শ্রবণ মাত্র করি।
তুমি যেই অর্থ কর বুঝিতে না পারি॥
ভট্টাচার্য্য কহে, না বুঝি হেন জ্ঞান যার।
বুঝিবার লাগি সেই পুছে পুনর্ব্বার॥
তুমি শুনি শুনি রহ মৌনমাত্র ধরি।
হৃদয়ে কি আছে তোমার বুঝিতে না পারি॥
প্রভু কহে সূত্রের অর্থ বুঝি যে নির্ম্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয়ত বিকল॥
সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
ভাষ্য কহ তুমি সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া॥
সূত্রের মুখ্য অর্থ না কর ব্যাখ্যান।
কল্পার্থে তুমি তাহা কর আচ্ছাদন॥
উপনিষদ শব্দের যে মুখ্য অর্থ হয়।
সেই অর্থ মুখ্য ব্যাসসূত্রে সব কয়॥
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা।
অভিধাবৃত্তি ছাড়ি শব্দের কর লক্ষণা॥

প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে সেই সে প্রমাণ॥
স্বতঃ-প্রমাণ বেদ সত্য যেই কহে।
লক্ষণা করিলে স্বতঃ-প্রামাণ্য হানি হয়ে॥
ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্য-মেঘে করে আচ্ছাদন॥
বেদ পুরাণে কহে ব্রহ্ম নিরূপণ।
সেই ব্রহ্ম বৃহৎ বস্তু ঈশ্বর লক্ষণ॥
ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে নিরাকার করি করহ প্রমাণ॥
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাঁহার।
হেন ভগবানে তুমি কর নিরাকার॥
স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।
নিঃশক্তি করিয়া তারে করহ নিশ্চয়॥
সৎচিৎ আনন্দময় ঈশ্বর স্বরূপ।
তিন অংশে চিৎশক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥
অন্তরঙ্গ চিচ্ছক্তি—তটস্থা জীবশক্তি।
বহিরঙ্গ মায়া তিনে করে প্রেম ভক্তি॥
প্রণব যে মহাবাক্য ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হইতে সর্ব্ববেদ জগতে উৎপত্তি॥
তত্ত্বমসি জীব হেতু প্রাদেশিক বাক্য।
প্রণব না মানি তারে কহে মহাবাক্য॥
এই মত কল্পনা-ভাষ্যে শত দোষ দিল।
ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বপক্ষ অপার করিল॥

বিতণ্ডা ছল নিগ্রহাদি অনেক উঠাল।
সব খণ্ডি প্রভু নিজমত সে স্থাপিল॥
চৈ, চ, মধ্যঃ ষষ্ঠ।

কবিরাজ-বর্ণিত পয়ার কতিপয়ের স্থূলমর্ম্মে ইহা প্রকাশ পায় যে—বেদের তাৎপর্য্য গ্রহণের গোলযোগে ভীষণ গণ্ডযোগ উপস্থিত হইয়া এই সময় বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর বুদ্ধিবৃত্তি পর্য্যন্ত আমূল কলুষিত করিয়া তুলিয়াছিল। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও সেই মোহ-কূপে পতিত হইয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধগণকে বিমোহিত করিবার উদ্যমে একবারে সমগ্র সমাজকেই অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। যে সময় শঙ্কর স্বকপোল কল্পিত ভাষ্যের প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করেন তখন দেশে প্রায় সকলেই বৌদ্ধভাবাপন্ন, সুতরাং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ-মত মায়াবাদ প্রচারে শঙ্কর সহজেই কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন। আজ সার্ব্বভৌমের সঙ্গে মহাপ্রভুর সেই মায়াবাদ লইয়াই আলাপ।

সার্ব্বভৌম শাঙ্কর-ভাষ্যের সাহায্যে সকলকে বুঝাইলেন,—বেদ ব্রহ্মকে নিরাকার নিরৈশ্বর্য্য অর্থাৎ একবারে দেহবিভূতি প্রভৃতি শূন্য বলিয়াছেন, তিনি চিন্মাত্র নিরীহ। ব্রহ্মের উপরেই এই বহুধা বিচিত্র জগতের ভাণ হইয়াও রাকুম্পর্শ শুক্তিরজত বা মণিবহ্নিবৎ অলীক এবং অপ্রমাণ। ইহা বিবর্ত্তমাত্র, সত্য নহে।

তারপর ভট্টাচার্য্য "তত্ত্বমসি", "সোঽহং" "ব্রহ্মাস্মি" "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" ইত্যাদি কল্পিত জীব ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপাদক বাক্যার্থে সাধারণকে মোহিত করিয়া শঙ্করের প্রচারিত তত্ত্বকে জয়যুক্ত করিয়া তুলিতেছিলেন। যে-সকল স্থলে বেদে ব্রহ্মের জগৎ-কর্ত্তৃত্বাদি বর্ণিত হইয়াছে, পণ্ডিতপ্রবর শঙ্করের ভাষ্যবলে তাহাতেও লক্ষণার কল্পনা করিয়া সকলকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন। সকলের ইহা ভাল লাগিতে পারে, কিন্তু মহাপ্রভুর লাগিবে কেন?

শ্রীমন্মহাপ্রভু মৌনভঙ্গ করিয়া ভট্টাচার্য্যের বাক্যের প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন। মহাপ্রভু যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্মে সকলে

বুঝিল মহাপ্রভু মূর্খ নহেন—জ্ঞানী, বোধ হয় ভাষ্যকর্ত্তা শঙ্কর অপেক্ষাও প্রতিভাসম্পন্ন মহাপুরুষ। সূত্রকর্ত্তা-বেদব্যাসের উদ্দেশ্যের সহিত শারীরক ভাষ্যের তাৎপর্য্যের সামঞ্জস্য নাই। উপনিষদ এবং ব্যাস-সূত্রের লক্ষ্য এবং মর্ম্ম একই, কেবল ভাষ্যের সঙ্গেই তাহার সঙ্গতির অভাব। মহাপ্রভুর বাক্যে সকলে বুদ্ধিস্থ হইতে লাগিল, সত্য সত্যই ব্যাসসূত্র এবং উপনিষদের অর্থের গতি সরল পথে, কিন্তু শঙ্করের ভাষ্যের গতি কুটিল বর্ত্মে। বাস্তবিকই সূত্র যেন প্রোজ্জ্বল সূর্য্যালোকে আলোকিত, পরন্তু শারীরক ভাষ্য নিবিড় ঘনঘটা, সে যেন সেই সূর্য্যালোক আবৃত করিয়া রাখিতে চাহিতেছে। সকলে বুঝিতে পারিল ব্যাসদেব এবং উপনিষদের ঋষিগণের * ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা (false assertion), করণাপাটব দোষ নাই। কিন্তু শঙ্করের পদে পদে প্রতি পঙক্তিতে সম্পূর্ণ বিপ্রলিপ্সা পরিলক্ষিত। বৌদ্ধ-বুদ্ধিবিমোহন শঙ্করের ভাষ্যে বিপ্রলিপ্সার পরিচয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ হইতে সিদ্ধান্ত হইতে লাগিল ;—বেদ-জ্ঞান-বিশ্বজীবের স্বরূপানুভূতি—ব্রহ্মার হৃদয়েতে (Universal mindএ) ইহার প্রকাশ। যাহা অনুভূতি তাহা অনুভাবক এবং অনুভব্যের সহিত যে নিত্যসম্বন্ধে সম্বদ্ধ তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যেহেতু অনুভাবক না থাকিলে অনুভব্যের প্রমাণ নাই, অনুভব্য না থাকিলে অনুভাবকের প্রমাণাভাব। পক্ষান্তরে অনুভূতি থাকিতে গেলে, অনুভব্য

ভ্রম—মানবের অজ্ঞতাদিজনিত একে অন্যথা-বুদ্ধি।

প্রমাদ—বিজ্ঞতাসত্ত্বেও আকস্মিক একান্যথা ভাব।

বিপ্রলিপ্সা—কোন সিদ্ধান্ত বিশেষ প্রতিষ্ঠা-নিমিত্ত ইচ্ছা-ভ্রান্তি।

করণাপাটব দর্শনিবৎ ভ্রম—ইন্দ্রিয়দোষজনিত শঙ্খে পীতবর্ণ করণের অপটুতানিবন্ধন।

এই চতুর্ব্বিধ ভ্রম ব্যতীত মানবের অন্য কোন ভ্রম নাই।

এবং অনুভাবক না থাকিলে চলিতেই পারে না। যেহেতু সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে সে-বেদ সে-জ্ঞান সে-অনুভূতি সে-প্রকাশ নিরাত্মকপ্রায় নিরালম্ব চিন্মাত্র বস্তুবিশেষ নহে। তাহা স্বগত ব্যাজ্য বৃত্তির প্রভাবে অনুভাবক অনুভব্য উভয় কোটির উপর অবাধ-প্রতিষ্ঠিত নিত্যসত্য। এই গেল মহাপ্রভুর বেদ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মতবাদ।

সার্ব্বভৌম শঙ্কর-মত অবলম্বনে "তত্ত্বমসিকে" মহাবাক্য বলিয়া সাধারণকে বুঝাইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, তৎ পদে ব্রহ্ম, ত্বং পদে জীব, অসি পদে অদ্বৈত ভাব-বোধক একক্রিয়ান্বয়। জীবব্রহ্মে আপাত দৃষ্টিতে যাহা ভেদ তাহা অলীক এবং অপ্রমাণ। জীবের সহিত ব্রহ্মের মুখ্য অর্থে একত্ববাদ হইলেও শব্দের লক্ষণা অর্থাৎ গৌণ অর্থে কিছুমাত্র সে বাধার সম্ভাবনা নাই। বৃহৎ স্বার্থ লক্ষণা দ্বারা অভেদত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে। কিন্তু মহাপ্রভু তত্ত্বমসির মহাবাক্যতা অস্বীকার করিলেন।

তিনি বলিলেন, তত্ত্বমসি প্রভৃতি কোনটিই মহাবাক্য নহে,—মহাবাক্য প্রণব—ওঁকার, সেই অনুভব্য-অনুভাবক-অনুভূতিময় নিত্য-পদার্থটি। যাহাতে অচিন্ত্য বক্তৃবোদ্ধব্য-বাক্যের নিত্যসমাবেশ, তাহাই মহাবাক্য, তাহা সর্ব্ববিশ্বধাম ঈশ্বর। বিশ্বসখ্য, বিশ্ব-বাৎসল্য, বিশ্বদাস্য, বিশ্বমাধুর্য্য, বিশ্বশান্ত্যাদি, সেই অনন্ত অসীমে, ভূমা স্বরাট্ পরম পুরুষে শাশ্বৎসম্বন্ধে বর্ত্তমান, সে সখ্যদাস্যবাৎসল্যাদির মহাবাক্যরস ত ভক্ত-হৃদয়ের আস্বাদনের সামগ্রী।

সেই অনিরুক্ত-বক্তৃ-বোদ্ধব্য-বাক্যনিষ্ঠ প্রণব মহাবাক্য মুখে বলিবার বুঝাইবার পদার্থ নহে। "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" বলিয়া লক্ষণার সপ্তকোটি-কুল আহ্বান করিয়া আনিলেও সে ঘোষকে বুঝিতে পারা যায় না। সেটি সেই নন্দ-ঘোষ-পল্লীর, আমার প্রাণধন পরমব্রহ্মের মন্ত্রমুরলীর কোমল-কান্ত-ললিত কল-গীতির মধুর সংঘোষ। তাহাই ত কাম-মণ্ডলের সেই—"বামদৃশাং মনোহরং" কলসঙ্গীত। কলতঃ তত্ত্বমসি

প্রভৃতি মহাবাক্য নহে, প্রণবই মহাবাক্য, ইহাই মহাপ্রভুর উক্তি। মহাপ্রভুর মতে তত্ত্বমসি প্রণবের অনুবাক্—তৎপদে বুঝায় সেই অনুভব্যকে, ত্বং পদে সূচনা করে অনুভাবকের, অসি পদে প্রমাণিত করে উহাদের অচিন্ত্য প্রেমসম্বন্ধটীকে ; সুতরাং অনুবাক্যগুলি মহাবাক্যের অর্থেই অর্থযুক্ত।

অনন্তর মহাপ্রভু বলিলেন ;—মহাবাক্য ওঁকারের অ উ এবং মকার লইয়া যে তান্ত্রিকী ব্যাখ্যা আছে, তাহা ত বিপ্রলিপ্সা বিশেষ। উহার অর্থ অকারে অসীম অনন্ত, অনিরুক্ত, অব্যপদেশ্য ইত্যাদি নঞর্থক অকারাদিক শব্দ বাচ্য ভূমা ; উকারে তদীয় উপলব্ধি ; মকারে উপলব্ধা মনুজনিবহ। ইহা ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না। মহাপ্রভুর মতে মহাবাক্য যাহা স্বপ্রকাশানন্দ-চিন্ময় সমুহালম্বনাত্মক রসস্বরূপ পরমপদার্থ—তাহার সম্বন্ধে মুখ্যবৃত্তি ভিন্ন লক্ষণাবৃত্তির অবসর কোথায় ?

এতক্ষণে সার্ব্বভৌমের সঙ্গে সঙ্গে সভামণ্ডলীও দেখিল, শ্রীগৌরাঙ্গের চমৎকার বেদান্তবাদ, অপূর্ব্ব প্রেমতত্ত্ব, মধুর শাস্ত্রসিদ্ধান্ত অনর্পিত ভক্তিশ্রী আসিয়া আজ নীলাচল আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে। সকলের এতদিনের মূঢ়তার গূঢ় রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। আজ যেন বেদান্তের প্রাণপ্রতিষ্ঠা এবং ব্রহ্মসূত্রের কলঙ্কভঞ্জন হইয়া গেল। আজ ভট্টাচার্য্য দিব্যচক্ষে দেখিলেন—সত্য, সকলই সত্য। ব্রহ্ম সত্য, জীব সত্য, জগৎ সত্য। আজ বুদ্ধের মায়ার স্বপ্ন গৌরাঙ্গ সম্মুখে ভগ্ন করিয়া দিয়াছেন।

চৈতন্যদেব সার্ব্বভৌমের অবস্থা দেখিয়া বুঝিলেন,—ভট্টাচার্য্য আজ প্রকৃতিস্থ। পণ্ডিতপ্রবর এখন শঙ্করের শ্মশান-পথ ছাড়িয়া তাঁহারই নিকুঞ্জ-পথে চলিয়াছেন। দেখিলেন—এখন তিনি মায়াবাদের মিথ্যাত্ব উপলাভ করিয়া জগৎকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এখন চাই তর্কশ্রান্ত ক্লান্ত অতিথির প্রীতিপরিচর্য্যা। চৈতন্যদেব স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইলেন পরমব্রহ্ম ও শ্রীভগবান্ সচ্চিদানন্দস্বরূপ—সন্ধিনী-

সম্বিৎহ্লাদিনী—তাঁহার চিৎশক্তি,—সদংশে সন্ধিনী—চিদংশে সম্বিৎ এবং আনন্দাংশে হ্লাদিনী—এই ত্রিশক্তি মিলিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ প্রেমলীলা ; এবং এই প্রেমলীলারই বিবর্ত্ত বহিরঙ্গ রতিলীলা, ইহাকে সাধারণ বিবর্ত্ত-সংজ্ঞা না দিয়া প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত সংজ্ঞা দেওয়াই সুসঙ্গত। ভট্টাচার্য্য সংস্কৃত হইলেন, বুঝিলেন জীব ভগবানের তটস্থা শক্তি—ভগবানের রসলীলা এবং রতিলীলার কুঞ্জমঞ্জরী—সুনিপুণ অভিনেত্রী, বহিরঙ্গীয় তাহার নেপথ্য বিধি, অন্তরঙ্গীয় তাহার অভিনয়। লীলা দুইটি পৃথক্ নহে, এক রঙ্গেরই অন্তর বাহির বিভাগ মাত্র। দুই' সত্য, দুই' নিত্য। একটি প্রবাহ—একটি পয়োধি। প্রবাহের গতি পয়োধি—পয়োধির গতি প্রবাহ। সার্ব্বভৌম একেবারে বিস্ময়সাগরে ডুবিয়া গেলেন।

তখন—

প্রভু কহে ভট্টাচার্য্য না কর বিস্ময়।
ভগবানে ভক্তি পরমপুরুষার্থ হয়।
আত্মারাম পর্য্যন্ত করে ঈশ্বর ভজন।
ঐছে অচিন্ত্য ভগবানের গুণ।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কাব্যপুরাণতীর্থ।

বংশী-সাধনে

ওরে, বাঁশীস্বর শুনি আসিল হরিণী
এল না এল না শ্যাম।
আমি, নির্জনে বসিয়া বাঁশরী সাধিয়া
একি সিদ্ধি লভিলাম!
এ ধীর সমীরে যমুনার তীরে,
মোরে, মুরলী সঁপিয়া শঠ!—
কোন্ রন্ধ্রে কোথা, বাজে কোন্ ব্যথা,
শুধু, না শিখাবে সে কপট!—
যে রন্ধ্রে চাপিলে তার দেখা মিলে
কোন্ রন্ধ্রপথে আসে।
সে, বঙ্কিম ভঙ্গিম অধর রঙ্গিম
সুশোভিত মৃদুহাসে।
বাঁশীটি অর্পিয়া মোরে ভুলাইয়া পিয়া!
গেছে ত্যজি ব্রজধাম,
ওরে, আমি কি মোহে ভুলিয়ে তারে ছেড়ে দিয়ে
বাঁশী নিয়ে রহিলাম।
স্ফুট বনপ্রান্ত, এসেছে বসন্ত,
সেই যমুনাপুলিন ওই!—
বিহগকূজন -মুখরিত বন,
মোর পুলিনবিহারী কই?
যত কিছু সুর শিখালে মধুর
সবই, সাধিলাম বসে একা,

সমাগত মধু তুমি কোথা বঁধু!—
এখনো না দিলে দেখা।
তবে যাই চলি রাখিয়া মুরলী
লুকি ওই কদম্বের তলে,
যদি অভ্যাসের বশে এসে, নিশিশেষে—
ডাকে, রাধা রাধা বলে।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

সাহিত্য ও সুনীতি *

[প্রতিবাদ]

পরমশ্রদ্ধাস্পদ স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় জ্যৈষ্ঠ মাসের "নারায়ণে" আর্ট ও আধ্যাত্মিকতার সম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন। সাহিত্যের আদর্শ ও ব্যবহার সম্বন্ধে কয়েকমাস ধরিয়া যে বাদপ্রতিবাদ চলিতেছে, অরবিন্দবাবুর লেখাটি তাহার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছে।

সাহিত্যের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া লেখক বলিয়াছেন, "আর্ট দেশকালের অতীত। শিল্পী দেখেন শুধু চিরন্তন সত্য। উদাসীন ভাবে ধ্যান করেন পাপ পুণ্যে, ক্ষুদ্রে বৃহতে,

---

* ভ্রমবশতঃ গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'আর্টের আধ্যাত্মিকতা' প্রবন্ধটি শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের নামে বাহির হইয়াছিল। আমরা পরে জানিলাম যে ঐ প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুত নলিনীকান্ত গুপ্ত।—"নারায়ণ"-সম্পাদক।

অন্তের মধ্যে কল্যের মধ্যে ভগবানের বিচিত্র সত্তা তাহাই তিনি ফলাইয়া লোকের নয়নগোচর করেন।” তাঁহার মতে আর্ট কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠাকল্পে নিয়োজিত হয় না, কোন মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধন-কল্পে আর্ট নিয়োজিত হইলে মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধই থাকিবে, জগতের অনেক রহস্য আবরিত থাকিয়া যাইবে।

ভগবান পূর্ণরসের আধার। মানুষের অধ্যাত্মজীবন, মানুষের উদারতা, মহত্ত্বের মধ্যে যেমন ভগবানের প্রকাশ, সেরূপ মানুষের নীচতা, সঙ্কীর্ণতা ও হীনতার মধ্যেও ভগবান রহিয়াছেন।

অরবিন্দবাবু বলিয়াছেন, সাধু শুধু শুচির মধ্যে, ত্যাগের মধ্যে, সাধুতার মধ্যে ভগবানের খোঁজ করেন, শিল্পীও তাহা করেন, উপ-রন্তু তিনি তাঁহাকে অশুচির মধ্যে, হীনতার মধ্যে ইন্দ্রিয়পরতার মধ্যেও খুঁজিয়া বেড়ান। সাধু ও শিল্পীর এই প্রভেদ-করণ নির-র্থক। অরবিন্দবাবু সাধু অর্থে কি বুঝেন? বুদ্ধদেব কাশীর বার-নারীকে, যীশুখৃষ্ট Woman of Samariaকে, চৈতন্যদেব জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, অশুচির মধ্যে ইন্দ্রিয়তৎপরতার মধ্যে তাঁহারা ভগবানের সত্তার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তাঁহারা পাপের প্রতি অন্ধদৃষ্টি ছিলেন না। পাপের প্রতি উদাসীন অথবা ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি বর্ত্তমান যুগে সাধুতার বৈপরীত্যই প্রমাণ করে।

অরবিন্দবাবু শিল্পীকে ঋষিকল্প, সিদ্ধপুরুষ বলিয়াছেন। শিল্পীও যেমন সাধুও তেমন। উভয়ই সাধক। উভয়েরই পূর্ণ সত্যানুভূতি হয় নাই, উভয়েরই সাধনাবস্থা—সুতরাং উভয়েরই আচার নিয়ম আছে। এই কথাটুকু মানিলে সব গোল চুকিয়া যায়। বিষয় নির্ব্বাচনের প্রয়োজন নাই। ভগবান সুন্দরের সহিত অসুন্দরের সৃষ্টি করিয়াছেন, মহতের সহিত হীনেরও সৃষ্টি করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ সাধু ও শ্রেষ্ঠ শিল্পী শুধু সুন্দর মহতের ভিতর নহে, অসুন্দর হীন নিকৃষ্টের মধ্যেও ভগবানের রসমূর্ত্তিটি ফুটাইয়া তুলেন।

কিন্তু হয় কি অনেক সময়—পাপ, হীনতা, নিকৃষ্টতাকে দেখাইতে

যাইয়া—পূর্ণ রস বা পূর্ণ সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে না—বেশীর ভাগই বিকৃত রস বা বিকৃত ছায়া মাত্র ফুটিয়া উঠে। নগ্ননারীর ছবি আর্টিষ্ট ফুটাইয়া তুলিলেন, কিন্তু নগ্নত্বের মধ্যে যে দেবত্ব আছে তাহার আভাস পাওয়া গেল না, সে নগ্ননারীত্বে ভগবতীর দর্শন-লাভ হইল না। এখানে আমি বলিব, বিকৃত রসের সৃষ্টি হইয়াছে, সত্য রসের ছবি ফুটিয়া উঠে নাই। শুধু রক্তমাংস, বিষয়-সম্ভোগ, ইন্দ্রিয়পরতার ছবি দিলে খণ্ড রসের সৃষ্টি হয়। আর্টের মাপকাঠিতেও তাহার স্থান অতি নীচে। আধুনিক কালে অনেক বাঙালী লেখক ও ঔপন্যাসিক এইরূপ খণ্ডরসের অবতারণা করিতেছেন। আজকাল একটা fashionই দাঁড়াইয়াছে ইউরোপীয়ের অনুকরণে বারনারীর ছবি অঙ্কিত করা। পাপ, হীনতার ছবি আঁকিতে যাইয়া যদি শুধু রক্তমাংস, ইন্দ্রিয়-পরতাকে ফুটাইয়া তুলি তাহা হইলে তাহা বিকৃত রসসৃষ্টি হইবে। তাহা অশুদ্ধ, তাহা অসুন্দর, ও তাহাতে অমঙ্গল। পাপের ছবি আঁকিতে গেলে পাপের ব্যাখ্যা চাই। এজগতে পাপ হঠাৎ একবারে খাপছাড়াভাবে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় নাই। পাপের একটা ক্রমপরি-ণতি—"কেন", "কি", "কোথায়", "কোন দিকে" তাহা বুঝান চাই। তাহা না করিলে অখণ্ড রসসৃষ্টি, প্রকৃত সত্যানুভূতি হইবে না,—প্রকৃত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হইবে না। সাহিত্যে যে রসের সৃষ্টি করে তাহা পূর্ণ অখণ্ড রস। ক্ষণিক, সাময়িক রসসৃষ্টি সাহিত্যের বিকার। পাপ যে রস-সৃষ্টির আধার তাহা অত্যন্ত ক্ষণিক,—তাহাতে শান্তি নাই, তৃপ্তি নাই। একটা অখণ্ড রসবোধের অভাব স্বতঃই জাগরিত হইয়া উঠে। অখণ্ড রসসৃষ্টিতেই পূর্ণ সত্যের প্রকাশ। খণ্ডরস অখণ্ডে পরিণত না হইলে গরলই থাকিয়া যায়। খণ্ডরসের সঙ্গে সঙ্গে যে সত্যের প্রকাশ হয় তাহার মূল্য সার্ব্বজনীন নহে, চিরন্তন নহে।

বড় কবি, বড় সাহিত্যিক পার্থিব জীবনের পঙ্কিল স্রোতের মধ্যেও অখণ্ড রস খুঁজিয়া পাইয়াছেন। পাপ ও হীনতার মধ্যেও

ভগবানের মহিমা ও সৌন্দর্য্য তিনি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, কেননা তাঁহার পূর্ণ জ্ঞান, অখণ্ড রসবোধ হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্রের নির্ব্বাসনে ও খৃষ্টের ক্রুশারোহণে ভগবানেরই ঐশ্বর্য্য পরিস্ফুট করিয়াছেন। বড় সাধুর মত বড় শিল্পী পাপের একটা ব্যাখ্যা দিয়াছেন, সয়তান অথবা রাবণের চিন্তা ও কর্ম্মের একটা ক্রমপরিণতি ও পরিণাম দেখাইয়াছেন। বারনারী উর্ব্বশীর চিত্রকেও একটা পূর্ণজ্ঞান ও অখণ্ড রসবোধের মহিমায় অঙ্কিত করিয়াছেন। তবেই পাপের অন্তর্নিহিত যে সত্য ও সৌন্দর্য্য আছে তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে। তবেই চিরন্তন অনন্ত সত্যের প্রকাশ হইয়াছে, তবেই অখণ্ড পূর্ণ রসের সৃষ্টি হইয়াছে। শিল্পীর পক্ষে এই সত্য-প্রকাশ, এই রস-সৃটি সাধনা-স্যাপেক্ষ, এবং সে সাধনা তাহার পক্ষে Conscious এমন কি Superconscious, সজ্ঞানে এমন কি তুরীয় জ্ঞানে হয়।

এতক্ষণ যে রসের দিক দিয়া সাহিত্যের আলোচনা করিলাম শুধু তাহাই সাহিত্যের উপকরণ নহে। সাহিত্যের উদ্দেশ্য রস-সৃষ্টি—ইহা বলিলে ঠিক বলা হইল না। সাহিত্যের উদ্দেশ্য জীবন-সৃষ্টি—আত্ম-স্ফূর্ত্তি। রস—খণ্ডই হউক বা পূর্ণই হইক—জীবন-সৃষ্টির একটা অঙ্গমাত্র। নানা বিভিন্ন ভাবের পশ্চাতে যেমন একটা ব্যক্তিত্ব আছে—যে ব্যক্তিত্বের মাপকাঠিতে এক একটি বিভিন্ন ভাব নিয়ন্ত্রিত ও বিচারিত হয়, সেইরূপ সাহিত্যের এক একটি রস যে সমগ্র জীবন-স্ফূর্ত্তির উপকরণ যোগাইতেছে তাহা সেই সমগ্র জীবনের আদর্শের দ্বারা বিচার করিতে হইবে। সমগ্র জীবনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে রস কেবল অঙ্গমাত্র, অঙ্গী নহে। আর্ট যতই অঙ্গের স্বাতন্ত্র্যকে নিয়মিত করিয়া সমগ্র জীবনের সামঞ্জস্য-লক্ষ্যের নিকট পৌঁছায় ততই তাহার প্রকৃত চরিতার্থতা। এইজন্য ক্রমশঃ মোহের আবেশ, ক্ষণিক উত্তেজনা, সাময়িক প্রবৃত্তিনিচয়কে সংযত করিয়া আর্ট সজ্ঞানে, উন্মুক্ত ও সত্য দৃষ্টিতে নিজের উপকরণগুলিকে সজ্জিত করে। এইরূপে আর্ট সমগ্রতাকে খুঁজে ও

তাহাকে প্রকাশ করে। ইহাই হইতেছে আর্টের ক্রমপরিণতির স্তরবিভাগ।

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

মহিস্থর-ভ্রমণ

রামেশ্বরম্, মাদুরা, শ্রীরঙ্গম্, তাঞ্জোর, চিদম্বরম্, কাঞ্চী, মহাবলিপুরম্ প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দর্শন করিয়া ও শিল্প ও স্থাপত্যের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া মাদ্রাজ রামকৃষ্ণাশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম,—উদ্দেশ্য মহিস্থর রাজ্যে ভ্রমণ করিয়া চালুক্য ও হৈসনদিগের শিল্পকলার পরিচয় লাভ ও তৎপরে তথা হইতে দাক্ষিণাত্যের সমস্ত হিন্দুরাজত্বগ্রাসী বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষ সন্দর্শন। বিজয়নগরে যাইবার সুবিধার জন্য হস্‌পেটস্থ শিক্ষাবিভাগের অবসরপ্রাপ্ত একজন মারাঠা কর্ম্মচারীর নিকট পরিচয়-পত্র মাদ্রাজমঠের "রামু" বা শ্রীরামস্বামী আয়েঙ্গার মহাশয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন।

"রামু" মাদ্রাজ রামকৃষ্ণাশ্রমের দক্ষিণহস্তস্বরূপ; ইনি একজন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ও রাজকর্ম্মচারী এবং "রামকৃষ্ণ হোমের" সম্পাদক। দরিদ্র বালকদের মাদ্রাজের কলেজে ও স্কুলে অধ্যয়ন করিবার সুবিধার জন্য এই "হোমের" সৃষ্টি হইয়াছে; এখানে ছাত্রেরা বিনাব্যয়ে থাকিতে ও আহার করিতে পায়। ইহার জন্য "রামু" স্বয়ং প্রতিমাসে তিন চারি শত টাকা ভিক্ষা করিয়া সংগ্রহ করেন; এই প্রকারে প্রায় ত্রিশ চল্লিশজন দরিদ্র ছাত্র মাদ্রাজে থাকিয়া

উচ্চ শিক্ষা লাভ করে। "রামু"র অবিচলিত অধ্যবসায় দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়; ইনি সংসারী হইয়াও ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করিতেছেন; ছাত্রেরাই ইঁহার পুত্রস্থানীয় এবং রাত্রে তাঁহাদের সহিত "হোমে"ই থাকেন। তাঁহার মুখমণ্ডল কৃতকর্ম্মতা ও পুণ্য-ভাবের যে দীপ্তিতে উদ্ভাসিত দেখিয়াছি তাহা ভুলিবার নহে। মাদ্রাজে অবস্থানকালে যে কয়দিন আমি মাদ্রাজ মিউজিয়াম-সংরক্ষিত প্রস্তরাবলি হইতে অমরাবতী শিল্পের তথ্য সংগ্রহ করিতে গিয়াছি, প্রত্যহই ইঁহার আত্মীয়ের শকট-সাহায্যে নগরের একান্তেস্থিত মিউ-জিয়ামে যাইবার সুবিধা করিয়া দিতেন। ইনি বেশ বুদ্ধিমান বলিয়া অমরাবতী শিল্প নিজে অধ্যয়ন করিয়া বুঝাইয়া দিতে আমার বেশ আনন্দ হইত। ভিঃ স্মিথ্ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা অমরাবতী শিল্পে গ্রীক্ শিল্পের যে প্রভাবের কথা বলিয়াছেন * আমি তাহা একেবারেই অমূলক বুঝাইয়া দেওয়াতে তিনি বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং এ ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলি কিপ্রকারে পণ্ডিতেরা ও তৎসহ আমাদের স্বদেশীয় উপাসকেরা এতদিন পোষণ করিতেছেন তাহা চিন্তা করিয়া বিস্মিত হইলেন। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে Perspective বা পরিপ্রেক্ষিত বিদ্যার কিরূপ উন্মেষ হইতেছিল তাহা কতকগুলি চিত্র বা relief হইতে বুঝাইয়া দিলাম। এই সকল চিত্রে অঙ্কিত স্তম্ভগুলিতে প্রাচীন আসিরীয় ও পারসিক প্রভাব বর্ত্তমান দেখাইলাম; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণা নদী-তীরস্থ অন্ধ্রশিল্পের মধ্যে আর্য্যাবর্ত্ত সম্রাট্ অশোক ও অধস্তন সময়ের কেমন সুন্দর সামঞ্জস্য রহিয়াছে। এই Pan-Indian বা সমগ্র ভারত-ব্যাপী সাম্য-ব্যাপার কতদিন হইতে সংঘটিত হইতেছিল তাহা কে বলিতে পারে?

---

* A History of Fine Art in India and Ceylon by V. Smith, P. 123.

সমগ্র ভারতের মধ্যে মাদ্রাজ মিউজিয়মেই অমরাবতী শিল্পের যাহা কিছু সংরক্ষিত আছে। কৃষ্ণানদীতীরস্থ বেজওয়াডার মিউজিয়মে যাহা আছে তাহা অতি সামান্য, আমি ইহা কিছুদিন পূর্ব্বে মাদ্রাজ যাইবার পথে দেখিয়া আসিয়াছি; কলিকাতার যাদুঘরে কিছুই নাই বলিলেও চলে। প্রায় সমস্তই বিলাতের ব্রিটিস মিউজিয়মে প্রেরণ করা হইয়াছে। ভারতে থাকিয়া অমরাবতী শিল্প অধ্যয়ন করিতে হইলে মাদ্রাজ মিউজিয়াম ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

"রামু" মিউজিয়ামের Asst. Supdt. মহোদয়ের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। মৎপ্রণীত উড়িষ্যা-স্থাপত্য সম্বন্ধীয় পুস্তক মিউজিয়াম-সংলগ্ন পুস্তকাগারে দেখিলাম। Asst. Supdt. মহাশয় আমার সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করিলেন ও বলিলেন যে তিনি শিলালিপির পাঠোদ্ধার দ্বারা ইতিহাস সঙ্কলন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু শিল্প ও স্থাপত্যের দ্বারাও যে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে তাহা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। রামু মিষ্ট হাস্য করিয়া বলিলেন, "মিঃ গাঙ্গুলি, এগুলি আমাদের নগরে রহিয়াছে, আমরা ইহার কোন সংবাদ রাখি না, আর আপনি সহস্রাধিক মাইল দূর হইতে আসিয়া এগুলি যে এত চিত্তাকর্ষক তাহা বুঝাইয়া দিলেন।" আমি বলিলাম, "আমার যত্ন ও অধ্যবসায় ত নগণ্য, তুচ্ছ। কত সহস্র মাইল দূর হইতে ইউরোপীয় পণ্ডিত মহোদয়েরা আমাদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এত আলোচনা ও গবেষণা করিতেছেন যে তাঁহাদের এ ঋণ আমরা কখনই পরিশোধ করিতে পারিব না। তাঁহাদের আবিষ্কৃত সত্যগুলি যাহাই হউক না, তাঁহাদের পদ্ধতিগুলি অনুশীলনযোগ্য। এই দেখুননা প্রায় শত বর্ষ পূর্ব্বে কর্ণেল মেকেঞ্জি (Col. Mackenzie) যদি অমরাবতী স্তূপগাত্রস্থ চিত্রগুলি না অঙ্কিত করিয়া রাখিতেন, তাহা হইলে অনেক গুলির বিষয় লোকে ত জানিতেই পারিত না, কেননা স্থানীয় কোন জমিদার মহাশয় সেই অমূল্য মার্ব্বল প্রস্তরগুলি পোড়াইয়া চূণ প্রস্তুত করিয়াছেন; অনেক-

গুলি প্রস্তরে তাঁহার গৃহভিত্তিও নির্ম্মিত হইয়াছে।" পূর্ব্বে বলিয়াছি দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ কারণ "রামু" আমার পরিচয়-পত্র সংগ্রহ করিয়া দিয়া অনেক সুবিধা করিয়া দিতেন, কিন্তু দুই একটি ভিন্ন কোনও পরিচয়-পত্র আমি ব্যবহার করি নাই এবং পূর্ব্বোক্ত দুই একটির দ্বারাও কখন কাহারও অতিথি হই নাই; ইহাতে আমার আত্মসম্মানজ্ঞানের মূলে আঘাত পড়িত। সে সব পত্রগুলি এখনও যত্নে রাখিয়া দিয়াছি; রামু মাদ্রাজ হাইকোর্টের জজ, এড্‌ভোকেট জেনারেল প্রভৃতির পত্র সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল; কিন্তু কোনটিই ব্যবহার করি নাই। রামেশ্বরম্ যাইবার সময় রামনদের রাজার উপর পত্র ছিল যাহাতে তাঁহার অতিথি হই; কিন্তু রাজার অফিস বা কাছারী বাটী কোন্ দিকে তাহার সংবাদও লই নাই। বরাবর ধর্ম্মশালায় বা ছত্রে উঠিতাম ও তাহাতে বিশেষ আনন্দ লাভ করিতাম। কত লোকের সহিত মিশিয়া তাহাদের আচার ব্যবহার বুঝিতে চেষ্টা করিতাম; এইখানেই আমাদের বিরাট জাতির আত্মার সন্ধান পাওয়া যাইত; আমার সদাসর্ব্বদা স্বর্গীয়া ভগ্নী নিবেদিতার (Sistor Nivedita)র একটি কথা মনে পড়িত। তিনি বলিতেন, "তোমরা স্বদেশ বুঝিবার জন্য এত লালায়িত, অথচ তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিতে বা দরিদ্রের সহিত মিশিতে লজ্জা বোধ কর। তৃতীয় শ্রেণীতে না ভ্রমণ করিলে নিম্নস্তরবাসী নিজের দেশবাসীর—যাহারা দেশের প্রাণস্বরূপ—তাহাদের বুঝিবে কি প্রকারে?" ধর্ম্মশালায় থাকিবার ইহাও এক কারণ। এখানে একটা কথা বলিয়া রাখি; দাক্ষিণাত্যের ধর্ম্মশালাগুলি বলিলে যেন পাঠকেরা উত্তর ভারতের ধর্ম্মশালার কথা না ভাবেন। এখানকার ধর্ম্মশালা বা ছত্রগুলি বিশেষ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, প্রশস্ত এবং বিশেষ ধনী ব্যক্তিরা পর্য্যন্ত Travellers' Bunglowতে (ডাক বাঙলা এখানে এই নামে চলিত) না গিয়া এইখানে আসেন। ভাঞ্জোর রাজার ধর্ম্মশালার কথা আমি ইহজন্মে ভুলিব না; ইহা এমনই মনোহর।

পরিচয়পত্রগুলি ব্যবহার করিতাম না বলিয়া রামুর বড় অভিমান হইত; এবার মহিসুর-যাত্রাকালে একটু মিষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন যেন মহিসুর হইয়া বিজয়নগর যাইবার পথে হস্পেটস্থ পূর্ব্বোক্ত অবসরপ্রাপ্ত রাজকর্ম্মচারীর আতিথ্য গ্রহণ করি, এবং তাহাতে পাপ নাই।

পূর্ব্বেই ব্যাঙ্গালোরস্থ রামকৃষ্ণমঠে চিঠী লেখা ও তার করা হইয়াছিল। মাদ্রাজমঠাধ্যক্ষ স্বামী সর্ব্বানন্দ আমাকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন ও আজ কাল করিয়া বিলম্ব করিয়া দিতেছেন, বলিতেছেন যে এত ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন, শরীরটা একটু সুস্থ করুন। তাঁহার বিশেষ যত্ন ও আপ্যায়নে এত মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে আমারও যাইতে তত ইচ্ছা হইতেছিল না। তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় যে intellectual pleasure বা সুখ পাইয়াছি তাহা অল্প স্থানেই মিলিয়াছে। সেই কৃশ অথচ সুদৃঢ় চম্পকদাম গৌর মুণ্ডিতমস্তক যুবা সন্ন্যাসীর স্নেহপ্রদীপ্ত অথচ তেজোময় মুখকান্তি কথনই ভুলিব না। আমি যথন বিদায় লইলাম তথন দেখিলাম যে তিনি একটু মায়াভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন; আমাকে স্নেহালিঙ্গন দিলেন, আমি প্রণামাদি করিয়া যাত্রা করিলাম।

আমার সঙ্গে আমার সহচর আমার বিশ্বাসী উড়িয়া ভৃত্য রুশিয়া। মহিসুরের জঙ্গলে বৃষ্টি, রৌদ্র ও ঝঞ্ঝায় ভ্রমণকালে ইহারই সহিত কথাবার্ত্তায় আনন্দ লাভ করিতাম। আমি কলিকাতা হইতে আমার চিত্রাঙ্কন সহকারী বন্ধু জী—বাবুকে আনিয়াছিলাম। উড়িষ্যাবিষয়ক পুস্তক প্রণয়ন করিবার সময় ভ্রমণকালে ও বুদ্ধগয়ার তথ্য সংগ্রহ করণে ইনি আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন; কিন্তু এবার দেখি চিত্রাঙ্কন অপেক্ষা ইহার দেব ও দেশ দর্শন স্পৃহাটা বিশেষ বলবতী; আমার উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি অল্প; কিন্তু আমি ত দেব বা দেশদর্শন, বা প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করিতে আসি নাই। আমি মস্তকে একটা বিশেষ কর্ত্তব্যের বোঝা বহন করিয়া আনিয়াছি; আমার

দৃঢ় সঙ্কল্প, আমাকে দেশের শিল্প স্থাপত্যের ইতিহাস সংগ্রহ করিতেই হইবে। এ প্রতিজ্ঞা আমাকে উন্মত্তের ন্যায় অস্থির করিয়াছিল; আমার স্নায়ুগুলি এই চিন্তায় সর্ব্বদা উত্তেজিত থাকিত। তাহা না হইলে কোন কোন দিন উপবাস সহ্য করিয়াও মহিসুরস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশে গোযানে মাঝে মাঝে সামান্য বিশ্রাম লইয়া ক্রমান্বয়ে প্রায় দুই শত মাইল ভ্রমণ করিতে পারিতাম না। মহিসুর নগর মহিসুর রাজ্যের রাজধানী হইলেও সমস্ত প্রধান প্রধান অফিস, কাছারী ব্যাঙ্গালোরে। এইখানে রেসিডেণ্ট থাকেন। মাদ্রাজ এবং সাদার্‌ন্ মার্হাট্টা রেলওয়ে লাইনে মাদ্রাজ হইতে ব্যাঙ্গালোর যাইতে হয়; ব্যাঙ্গালোর পর্য্যন্ত রেল লাইন ব্রডগেজ, পরে তথা হইতে মহিসুরের দিকে মিটর গেজ। মাদ্রাজ হইতে ব্যাঙ্গালোরের দূরত্ব ২১৯ মাইল। নর্থ আরকট জেলাস্থ গুড়ুপল্লী ষ্টেসনের প্রায় দুই মাইল দূর হইতে মহিসুর রাজ্য আরম্ভ; ইহার দূরত্ব মাদ্রাজ হইতে প্রায় ১৬২ মাইল। ইহার প্রায় ৩০ মাইল দূরে জলারপেট নামক ষ্টেসন হইতেই বেশ শীত অনুভব হয়; সেইজন্য সকলেই জলারপেট ষ্টেসন হইতে উষ্ণ বস্ত্র ব্যবহার করেন। আমি কিছুই করিলাম না, কেননা আমার সঙ্গে শীতবস্ত্র ছিল না; আগষ্ট মাসে যে শৈত্যানুভব করিতে হইবে এ জ্ঞান আমার ছিল না। প্রভাতেই আমরা Bangalor Cantonment (ব্যাঙ্গালোর ক্যাণ্টনমেণ্ট) ষ্টেসন পৌঁছিলাম; এইখানে প্রায় সমস্ত ইংরাজ যাত্রী নামিয়া গেলেন; আমার টিকিট ছিল ব্যাঙ্গালোর-সিটি ষ্টেসনের। ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেসন হইতে আমার মনটা একটু চঞ্চল হইল; নিজামের রাজ্যে পুলিস যেরূপ বিরক্ত করিয়াছে তাহার পুনরাবৃত্তির আশঙ্কায় একটু উৎকণ্ঠিত হইলাম; ষ্টেসনে কিন্তু সেসব কিছুই দেখিলাম না।

ব্যাঙ্গালোর সিটি ষ্টেসন পৌঁছিবার পূর্ব্বে আমি পাঠকদিগকে মহিসুর রাজ্যের একটা সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ইতিবৃত্ত দেওয়া উচিত মনে করি; ইহা হইতে আমার

ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে যে সমস্ত পারিভাষিক সংজ্ঞা ও ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়াছি তাহা বুঝিবার সুবিধা হইবে।

মহিসুর একটি মিত্ররাজ্য এবং সমগ্র ভারতের মধ্যে হায়দ্রাবাদ রাজ্যের পরেই ইহার সম্মান ও প্রাধান্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মহিসুর শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত; এখানকার প্রচলিত কানারী ভাষার মহিষ বাচক "মৈস" শব্দ এবং নগর বা দেশবাচক "উরু" শব্দ হইতে মহিসুর শব্দ উৎপন্ন। ইহার অর্থ মহিষ বা মহিষদেহধারী মহিষাসুরের নগরী। সকলেই অবগত আছেন যে দুর্গা চামুণ্ডা বা মহিষাসুরমর্দ্দিনীরূপে মহিষাসুরকে নিহত করেন। মহিসুর রাজ্যের রাজধানী মহিসুর নগরের উপকণ্ঠস্থিত "চামুণ্ডা" বলিয়া যে পর্ব্বত আছে তাহাতে এখনও মহিসুররাজের গৃহাধিষ্ঠাত্রীরূপে চামুণ্ডা পূজিতা হয়েন।

১১°৩৮′ ও ১৫°২′ অক্ষাংশ এবং ৭৪°১২′ ও ৭৮°৩৬′ দ্রাঘিমাংশের মধ্যে মহিসুর রাজ্য অবস্থিত। ইহার পরিমাণ ২৯,৩০৫ বর্গ মাইল, অর্থাৎ আমাদের বঙ্গদেশস্থ নিম্নলিখিত জেলাগুলি একত্র করিলে মহিসুরের সমান হয়,—নদিয়া, যশোহর, খুলনা, ২৪-পরগণা, মুরসিদাবাদ, বৰ্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, হুগলি, হাওড়া, মেদিনীপুর এবং ঢাকা।

মহিসুর ও সমগ্র ভারতের মানচিত্র পাশাপাশি রাখিয়া তুলনা করিলে আমরা আকৃতির অনেকটা সৌসাদৃশ্য দেখি। উভয়েই দেখিতে অনেকটা ত্রিভুজ বা "ব"এর ন্যায়।

মহিসুর প্রদেশ পর্ব্বতসঙ্কুল; ইহার চারি দিকেই পর্ব্বত; তবে উত্তর দিকে কিছু অল্প; পূর্ব্বে ও পশ্চিমে পূর্ব্ব-ঘাট ও পশ্চিম-ঘাট পর্ব্বতমালা এবং দক্ষিণে এতদুভয়ের যোজক স্বরূপ নীলগিরি পর্ব্বত অবস্থিত। এ প্রদেশের পর্ব্বতগুলি প্রায়শঃই উত্তর হইতে দক্ষিণে বিস্তৃত; মাঝে মাঝে গিরিশৃঙ্গ দৃষ্ট হয়; এগুলিকে স্থানীয় ভাষায় "দ্রুগ্" বলে। মহিসুরের সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গের নাম মুলৈনা

গিরি; ইহা পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার অন্তর্গত এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহার উচ্চতা ৬৩১৭ ফিট। ইহার নিম্নেই "বাবাবুদন গিরি" ইহা উচ্চতায় ৬২১৪ ফিট; ইহাও পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালা হইতে উঠিয়াছে। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হৈসন নরপতি বিষ্ণুবর্দ্ধন কর্তৃক স্থাপিত চেন্নকেশবের মন্দির দেখিবার জন্য যখন বেলুড়ের ডাক-বাঙ্গলায় অবস্থান করিতেছিলাম সেই সময় বাঙ্গলার বারাণ্ডা হইতে বনৈশ্বর্য্য-গর্ব্বিত কুহেলিকাচ্ছন্ন বাবাবুদনগিরি দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতাম।

মহিসুরের পশ্চিমদিকের বন ও পর্ব্বতশোভা চিত্তকে বিশেষ দ্রব করে; ইহার পশ্চিমদিকের যে অংশের নাম "মাল্‌নাড়্" সেখানে প্রকৃতিদেবী যেন বনশোভায় উল্লসিতা; এখানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয় এবং তজ্জন্য ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব বেশী। ইহাকে মহিসুরের "টেরাই" বলা যাইতে পারে।

এখানকার নদীগুলি প্রায়শঃই বঙ্গোপসাগরে প্রবাহিতা; উত্তর পশ্চিমাংশের কয়েকটি নদী আরব সাগরে মিশিয়াছে। নদীগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টিই প্রসিদ্ধ—কৃষ্ণা, কাবেরী, পালার ও পেন্নার। আমি এখানকার কোন নদীতেই নৌকা দেখি নাই।

মোটামুটি বলিতে গেলে মহিসুর প্রদেশে তিনটি ঋতু বর্ত্তমান—বর্ষা, শীত ও গ্রীষ্ম। মে মাসের শেষে বা জুনের প্রারম্ভে বর্ষার আরম্ভ; বর্ষা এই সময় দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে আরম্ভ হয়; মাঝে আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে সামান্য বিরাম হইয়া বর্ষা নবেম্বর মাসের মধ্য পর্য্যন্ত বিরাজ করে; এই শেষ বর্ষা উত্তর-পূর্ব্ব দিক হইতে আরম্ভ হয়। ইহার পরেই শীত; ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ পর্য্যন্ত শীত ঋতু বর্ত্তমান থাকে। গ্রীষ্ম মার্চ্চ হইতে আরম্ভ হইয়া মের শেষ পর্য্যন্ত। আমি ব্যাঙ্গালোরস্থ Meteorological Office এ (আবহ-বিদ্যা সংক্রান্ত অফিসে) যাইয়া যাহা শিখিয়াছি এবং তথা হইতে প্রকাশিত ১৯১৩ অব্দের বার্ষিক বিবরণীতে যাহা পাঠ করিয়াছি

তাহা পাদটীকায় * দেওয়া গেল। তাহার পার্শ্বে গত ২৪শে জুন তারিখের কলিকাতার আবহ-বিবরণ দেখিয়া তুলনায় সমালোচনা করিয়া বিশেষজ্ঞ পাঠকের মহিসুরের ঋতুসম্বন্ধে অনেকটা ধারণা হইবে আশা করি। এস্থলে বলিয়া রাখি যে এই বৎসর ইহারই মধ্যে কলিকাতায় বর্ষা পড়িয়াছিল এবং গতকল্য বৃষ্টি হইয়াছিল; ১৯১৩ সালের ঐ দিনে ব্যাঙ্গালোরে বৃষ্টি হয় নাই এবং আকাশ মেঘাচ্ছন্নও ছিল না।

মহিসুর রাজ্যের বৃষ্টির হারের সাম্য দৃষ্ট হয় না; পশ্চিমাংশে বৎসরে প্রায় ২০০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়; উত্তরাংশের এক স্থানের পরিমাণ ১০ ইঞ্চি মাত্র। মহিসুর জেলার বৃষ্টির হার বৎসরে ৩০ হইতে ৩৬ ইঞ্চি। পাঠকদিগের অবগতির জন্য আমি কলিকাতায় গত পাঁচ বৎসরের বৃষ্টির হারের গড়পড়তা করিয়া দেখিয়াছি যে ইহা কিঞ্চিদধিক ৬০ ইঞ্চি।

মহিসুর রাজ্যের লোকসংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ; দক্ষিণ ভারতের অন্তর্গত বলিয়া এখানে ব্রাহ্মণের অতিশয় সম্মান ও প্রাধান্য। এখানে দ্রাবিড় ব্রাহ্মণের পঞ্চ শাখাই ণ দৃষ্ট হয়; পঞ্চ গৌড়ের মধ্যে কেবলমাত্র কান্যকুব্জ, সারস্বত ও গৌড় শাখান্তর্গত ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয়। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় দ্রাবিড় ব্রাহ্মণদের মধ্যে যে সকল গোত্র প্রচলিত আছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গুলিই প্রধান ও উল্লেখযোগ্য:—ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, শ্রীবৎস, আত্রেয়,

* ব্যাঙ্গালোর ২৩শে জুন—১৯১৩।	কলিকাতা ২৩শে জুন, ১৯১৬।
Barometrie reading—29·699	Barometric reading—29·367
Maximum temp.—85·4.	Maximum temp.—86·00
Minimum temp.—66·8·	Minimnm temp.—78·00
Humidity (mean)—53	Humidity—84

ণ পঞ্চ দ্রাবিড়—কর্ণাটক বা কানাড়া, অন্ধ্র বা তেলেগু, দ্রাবিড় বা তামিল, মহারাষ্ট্র ও গুর্জ্জর।

কৌশিক, হারিত। ঋক্, যজু ও সাম ভেদে তিন শাখারই ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয়; ইহার মধ্যে ঋক্ শাখার অন্তর্গত ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক; তন্নিম্নে যজু ও সাম।

ব্রাহ্মণদের সাধারণ প্রচলিত শাখা তিনটি—স্মার্ত্ত, মাধ্ব ও শ্রীবৈষ্ণব। স্মার্ত্তের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; ইঁহারা বেদান্তবাদী ও শৈব। এবং শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বী। স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণেরা ভালদেশ তিনটি সমান্তরাল চন্দনরেখায় অঙ্কিত করেন; এই তিনটি রেখার মধ্যে রক্তবর্ণের একটি চিহ্ন থাকে। শ্রীমধ্বাচার্য্য হইতে মাধ্ব শাখার উৎপত্তি; ইনি দক্ষিণ কানাড়ায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহারা বিষ্ণু ও শিব উভয়েরই উপাসনা করেন; ইঁহাদের মধ্যে বিষ্ণুপাসকের সংখ্যাই অধিক। ইঁহারা দ্বৈতবাদী ও দুই শাখায় বিভক্ত—ব্যাসকূট ও দাসকূট। ব্যাসকূটেরা আচার্য্যলিখিত সংস্কৃত শাস্ত্রোক্ত মত বিশ্বাস করেন; দাসকূটেরা স্থানীয় ভাষায় লিখিত গাথা ও পুস্তকবর্ণিত মত বিশ্বাস করেন। মাধ্ব ব্রাহ্মণের ভালদেশের মধ্যস্থলে একটি কৃষ্ণবর্ণ লম্বমান রেখা দৃষ্ট হয় ও তন্মধ্যে একটি বিন্দু থাকে। শ্রীবৈষ্ণবেরা বিষ্ণুর উপাসক। ইঁহারা শ্রীদেবীরও উপাসনা করেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য এই শাখার প্রবর্ত্তক; ইনি দ্বাদশ শতাব্দীতে কাঞ্চীর নিকটে জন্মগ্রহণ করেন; এই শাখান্তর্গত লোকেরা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। শ্রীবৈষ্ণবেরা তেঙ্গলে ও ভডগেলে নামক দুই শাখায় বিভক্ত; এবং ইহাদের মধ্যে বিশেষ মনোমালিন্য দৃষ্ট হয়। তেঙ্গলেদিগের গুরুর নাম মনবাড় মহামুনি, ভড্গেলেদিগের গুরুর নাম বেদান্ত দেশিক। ভালদেশস্থ "নাম" চিহ্ন দেখিয়া কোন ব্যক্তি তেঙ্গলে কি ভডগেলে শাখাভুক্ত অনায়াসেই নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। ইংরাজী অক্ষর Uর ন্যায় নামধারিদিগের নাম ভডগেলে এবং Yর ন্যায় নামধারিদিগের নাম তেঙ্গলে।

মহিসুরের প্রাচীন ইতিহাস অন্ধতমসাচ্ছন্ন; রামায়ণোক্ত কিস্কিন্ধ্যার দক্ষিণাংশ মহিসুর বলিয়া বোধ হয়। মহাভারতোক্ত সভাপর্ব্বে

যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর সহদেব কর্ত্তৃক মহিসুর বা মহিষ্মতী বিজয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। জৈন মতানুসারে মৌর্য্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত জৈন ছিলেন এবং জীবনের শেষ দ্বাদশ বৎসর মহিসুরান্তর্গত শ্রবণবেলগোলায় তপশ্চরণে অতিবাহিত করেন। অত্রস্থ চন্দ্রগিরি পর্ব্বতে চন্দ্রগুপ্তের সমাধি নির্দ্দেশক মন্দির দৃষ্ট হয়। আমি এখানে কয়েক দিন বাস করিয়াছিলাম; আমার ধারণা যে মন্দিরটি দশম কি একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত। মহিসুরে আবিষ্কৃত সম্রাট অশোকের শিলালিপি হইতে ঐতিহাসিক পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে মহিসুর প্রদেশ, অন্ততঃ ইহার উত্তরাংশ মৌর্য্য সম্রাট অশোকের বিশাল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। শিলালিপি * পাঠে স্থির হইয়াছে যে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে মহিসুরের উত্তর-পশ্চিমাংশে সাতকর্ণী নামধেয় রাজারা রাজত্ব করিতেন। ইঁহাদের পর কদম্ববংশীয় রাজারা এই অংশের রাজা হয়েন। এই সময় মহিসুরের উত্তরাংশে রাষ্ট্রকূটেরা, পূর্ব্বাংশে পল্লবেরা, মধ্য ও দক্ষিণাংশে গঙ্গাবংশীয়েরা রাজত্ব করিতেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে চালুক্যবংশীয় রাজারা কদম্ব ও রাষ্ট্রকূটদিগকে পরাভূত করিলেন এবং গঙ্গাদিগকর্ত্তৃক বিপর্য্যস্ত পল্লবদিগকে আক্রমণ করেন। নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে রাষ্ট্রকূটেরা চালুক্যদিগকে পরাভূত করেন এবং কিয়দ্দিনের জন্য গঙ্গারাজ্য অধিকার করেন ও পরে প্রত্যর্পণ করেন। দশম শতাব্দীর শেষাংশে চালুক্যেরা রাষ্ট্রকূটদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া মহিসুর রাজ্যে অধিকার বিস্তার করেন। একাদশ শতাব্দীতে কোলরাজারা গঙ্গা ও পল্লবদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিলেন; এদিকে গঙ্গাবংশীয় রাজাদিগের ধ্বংসাবশেষ হইতে আর এক বংশের অভ্যুদয় হইল, ইহার নাম হৈসন বল্লাল বংশ; ইঁহারা কোলদিগকে মহিসুর হইতে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত

* Epigraphic India, Vol. III, p. 140.

করিয়া রাজ্য সংস্থাপন করেন। চালুক্যদিগের সিংহাসনে হৈহয়বংশীয় নরপতিরা অধিষ্ঠিত ছিলেন। হৈসন ও যাদববংশীয়-দিগকর্ত্তৃক হৈহয়েরা পরাভূত হওয়াতে মহিসুর রাজ্যের উত্তরাংশ যাদবদিগের ও দক্ষিণাংশ হৈসনদিগের করতলগত হইল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মুসলমানেরা এই দুই বংশীয় রাজাদিগকে পরাভূত করিয়া মহিসুর জয় করেন। এদিকে হৈসন ও যাদব বংশের ধ্বংস হইয়া বিজয়নগর রাজ্যের অভ্যুদয় হইল; ইহাও কালের কুটিল চক্রে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমানকর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হওয়াতে বিজাপুর রাজ্যের অধীনে আসে; ক্রমশঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে মোগল-দিগকর্ত্তৃক বিজাপুর রাজ্যের পতন হওয়ায় মহিসুর রাজ্যের উত্তর ও পূর্ব্বাংশ মোগলদিগের অধিকারে আইসে। এদিকে মহারাষ্ট্র ও মোগলদিগের চিরশত্রুতার সাহায্যে ধীরে ধীরে দক্ষিণ মহিসুরের উদৈয়ারগণ ও উত্তরাংশের নায়কগণ শ্রীরঙ্গপত্তনের দুর্গ আক্রমণ ও জয় করায় মহিসুরে উদৈয়ার বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ইঁহারাই বর্ত্তমান রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ। এই উদৈয়ারগণ ১৭৬৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সময় চিক্কৃষ্ণ রাজের রাজত্বকালে হায়দর আলি বেদনুর যুদ্ধে মহিসুর জয় করেন; ১৭৯৯ অব্দে তৎপুত্র টিপুসুলতান শ্রীরঙ্গপত্তনম্ অবরোধকালে ইংরাজদিগের হস্তে পরাভূত ও নিহত হয়েন। ইংরাজরাজ পূর্ব্ব হিন্দুরাজ্যের একজন বংশধরকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। রাজ্যে বিশৃঙ্খলা হেতু ১৮৩১ অব্দে শাসনকার্য্য নিজ হস্তে লইয়া দুইজন কমিশনরের সাহায্যে রাজ্য চালাইতে থাকেন; পুনরায় ১৮৮১ অব্দে রাজ্যভার মহারাজ চামরাজেন্দ্র উদৈয়ারের হস্তে প্রত্যার্পিত হয়; ইনিই বর্ত্তমান মহারাজের পিতা।

যখন ব্যাঙ্গালোর সিটি ষ্টেসনে পৌঁছিলাম তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই; ব্যাঙ্গালোর সহর তখন সবেমাত্র সুপ্তি হইতে জাগরিত হইতেছে এবং পথে ঘাটে লোকজন তত চলিতেছে না। আমার গন্তব্য স্থান সহরের একান্তেস্থিত বাসোয়ান্ গুডির অন্তর্গত বুল্-

টেম্পল্ রোডস্থিত রামকৃষ্ণাশ্রম। কানারী ভাষায় বাসোয়া শব্দের অর্থ বৃষ; এখানে একটি বৃষের মন্দির আছে; এই জন্যই এই স্থানের এই প্রকার নামকরণ হইয়াছে। আমি কলিকাতা হইতে ১৪ই জুলাই যাত্রা করিয়া নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া আগষ্ট মাসের শেষে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। বিষুবরেখার সান্নিধ্যেস্থিত বলিয়া আমার ধারণা ছিল দাক্ষিণাত্যে বঙ্গদেশ অপেক্ষা উষ্ণতার আধিক্য; এইজন্যই শীতকালোপযোগী পরিচ্ছদ আনি নাই; পথে বেশ শীত বোধ হইতেছিল। এদিকে শকট-চালক পথ ভুলিয়া অন্য দিকে প্রসিদ্ধ পারসী ব্যবসায়ী টাটা কোম্পানীর রেশম-কারখানার নিকটে আসিয়া উপস্থিত। সে আমার কথা বুঝিতে পারে নাই; আমার বেশ-ভূষায় আমাকে বোম্বাইবাসী স্থির করিয়া আমার গন্তব্য স্থানে টাটাদিগের কারখানা স্থির করিয়াছিল। অত প্রত্যূষে পথে তেমন লোকজন ছিলনা বলিয়া একটু ঘুরিয়া আশ্রমে আসিতে হইল।

আশ্রম বা মঠ দূর হইতে বেশ উচ্চ স্থানে স্থিত বাংলো ধরণের মত বলিয়া বোধ হইতেছিল। মঠে পৌঁছিলে সন্ন্যাসী মহোদয়েরা আমাকে বেশ আদর আপ্যায়নে তৃপ্ত করিলেন। আমি আশ্রমের শোভায় এতদূর মুগ্ধ হইলাম যে তখনই ক্লান্ত দেহে তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ উদ্যান দেখিবার জন্য বাহির হইলাম।

মঠটি একটি ক্রমনিম্ন পার্ব্বত্যস্থানের উপর স্থাপিত; ইহার পিছনে একটি ক্রমনিম্ন পার্ব্বত্যময় স্থান আছে; ইহা গ্রাণাইট (Granite)এর। বাটীটির কার্ণিসের মধ্যস্থলে "ততো হংসঃ-প্রচোদয়াৎ" জ্ঞাপক ছবি আছে, তাহার উপর বৈদ্যুতিক আলো রহিয়াছে।

মঠটি একটি উদ্যানের মধ্যে অবস্থিত; ইহাকে উদ্যান-বাটিকা বলা যাইতে পারে। এই উদ্যানে নানাবিধ বৃক্ষের সমাবেশ আছে; নিম্নলিখিতগুলিই উল্লেখযোগ্য :—আপেল, পিয়ার, বেদানা, আঙ্গুর, পিচ্, লকেট, আম্র (অনেক প্রকারের), পেয়ারা, আতা, কাঁটাল,

বিল্ব, শিশু, কর্পূর, চন্দন, কর্ক, রবার, বাতাপি লেবু, নেভাল অরেঞ্জ ও আরও কত প্রকারের লেবু, সাইপ্রেস (Cypress) প্রভৃতি। নানাবিধ ফুলের গাছও রহিয়াছে,—কত প্রকারের গোলাপ, চামেলী, বেল, জবা, কলিকা, টগর, গন্ধরাজ, চন্দ্রমল্লিকা, লিলি, দোপাটি, কাঞ্চন, হনিসাক্ল্, নানাবিধ সিজন্ ফ্লাওয়ার ইত্যাদি।

উদ্যানটি অতি সুন্দর; দ্বারদেশ হইতে একটি পথ কিয়দ্দূর যাইয়া বিভক্ত হইয়া বৃত্তাভাসে পরিণত হইয়াছে।

এই বৃত্তাভাসের মধ্যে নানাবিধ বৃক্ষশ্রেণী, জলাধার ও সর্ব্বমধ্যে বৈদ্যুতিক আর্কল্যাম্পের স্তম্ভ রহিয়াছে। সদাশয় মহিস্থর গবর্ণমেণ্ট বিনাব্যয়ে উদ্যানটিকে আলোকিত করেন; কিন্তু আশ্রমের জন্য সাধারণের ন্যায় মূল্য দিতে হয়।

স্থানীয় লোকেরা মঠের সম্মুখের প্রকোষ্ঠটিকে টেম্পেল temple নামে অভিহিত করে, কেননা এই ঘরে পরমহংস মহাশয় ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রকাণ্ড প্রতিকৃতি রহিয়াছে; সাধারণ লোকে ঠাকুর ঘরে না যাইয়া এই ঘরেই তাঁহাদের ছবিকে প্রণাম ও দর্শন করে; রবিবার দিন এখানে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতা বা কথোপকথন হয় ও রামনাম কীর্ত্তন হয়। সে অতি সুন্দর ব্যাপার; কয়েকটি শ্লোকের মধ্যে সমস্ত রামচরিত্র সংক্ষেপে নিবদ্ধ করিয়া সপ্তকাণ্ড রামায়ণ বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা দাক্ষিণাত্যের অনেকস্থলে প্রচলিত দেখিয়াছি।

আমি যে সময় যাই তখন মঠে তিনজন সন্ন্যাসী ও একজন ব্রহ্মচারী বাস করিতেছিলেন; তাঁহাদের প্রত্যেকের জন্য বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট; ঘরগুলিতে আড়ম্বর না থাকিলেও স্বচ্ছন্দে থাকিয়া পাঠ ও ধ্যান ধারণা করিবার বিশেষ বন্দোবস্ত। প্রত্যেক ঘরে টেবিল চেয়ার ইলেক্ট্রিক আলো রহিয়াছে; ইঁহারা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মঠের লাইব্রেরিটি সামান্য হইলেও প্রধান প্রধান অবশ্য পঠিতব্য পুস্তকগুলি আছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থকার-

গুলির পুস্তকই উল্লেখযোগ্য :—হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, হাক্‌স্‌লি, জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্, ইমার্সন্, কার্লাইল, সেক্‌স্‌পিয়র, ফ্রিমান্, সিলি ইত্যাদি ; আর সংস্কৃত পুস্তকের মধ্যে উপনিষদ্, নিরুক্ত, বেদ, বেদান্ত ধাতুবৃত্তি ইত্যাদি। পুস্তক-গৌরবে মান্দ্রাজ মঠটি ব্যাঙ্গালোর মঠ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর।

মঠের পিছনের দিকের বারাণ্ডায় বসিয়া কফিপান ও কথাবার্ত্তা কহা হয়। এই বারাণ্ডার সম্মুখে যেন গোলাপের মেলা বসিয়াছে ; এমন সুন্দর ও সুবৃহৎ পুষ্প আমি দার্জ্জিলিঙ্গ ভিন্ন অন্য কোথায়ও দেখি নাই।

এখানকার আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী নির্ম্মলানন্দের উদ্যান স্থাপন ও সংরক্ষণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি। ইনি প্রায় সমস্তদিনই নিড়েন, খোন্তা লইয়া পুত্রসদৃশ প্রিয়তম বৃক্ষগুলির তলদেশ খনন করিতেছেন বা কোন না কোন পরিচর্য্যা করিতেছেন। ইহাতে তাঁহার বিশেষ আনন্দ। ইনি প্রায় দশ বার বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারে গিয়াছিলেন ; সেথান হইতে এবিদ্যা শিখিয়া আসিয়াছেন। অনেক সুন্দর সুন্দর কলম প্রস্তুত করিয়াছেন ; শুনিয়াছি এখানকার বোটানিকাল গার্ডেনের অধ্যক্ষেরা পর্য্যন্ত ইঁহার এবিদ্যার প্রশংসা করেন। আমাকে মাঝে মাঝে ধরিয়া লইয়া গিয়া বাডিং (Budding), কাটিং (Cutting), লেয়ারিং (Layering) প্রভৃতি কলম করিবার নানাবিধ পদ্ধতি শিখাইতেন।

আশ্রমের একজন সন্ন্যাসীর প্রতি আমি বিশেষ আকৃষ্ট হইলাম ; দেখিতে ঠিক বৌদ্ধশ্রমণের ন্যায়, কিন্তু মস্তক মুণ্ডিত নহে ; ইঁহার মুখকান্তিও দিব্যজ্যোতিতে প্রদীপ্ত ; তাঁহার হৃদয় যেন মমতায় নির্ম্মিত। ইঁহার নাম স্বামী বিশুদ্ধানন্দ। আমার শীতবস্ত্র নাই দেখিয়া নিজের একমাত্র ফ্লানেলের জামাটি আমায় পরাইয়া দিলেন ; আমেরিক মহিলা দেবমাতা যখন মান্দ্রাজে ছিলেন, তাঁহার জন্য দুটি জামা তৈয়ার করিয়া দিয়াছিলেন ; একটি ইনি পূর্ব্বেই বিতরণ

করিয়া দিয়াছিলেন; আর একটি যাহা নিজের ব্যবহারের জন্ম ছিল আমায় পরিতে দিলেন। এই জামাটি না থাকিলে মহিস্থরের পার্ব্বত্য প্রদেশে উন্মুক্ত আকাশতলে বা খোলা গোযানে প্রায় দুই শত মাইল পথ ভ্রমণ করিতে পারিতাম না। স্বামীজি তাঁহার উক্ত শীতবস্ত্রও আমায় দিলেন। মানুষ এত উচ্চ স্তরে পৌঁছায় দেখিয়া বিশেষ অভিভূত হইলাম; আরও অনেক বিষয়ে আমি ইঁহার নিকট ঋণী; ইঁহার উপদেশ ও সাহায্য না পাইলে মহিস্থরের অনেক স্থল আমার দেখা ঘটিত না।

আশ্রমে আর একটি সন্ন্যাসী ছিলেন; ইনি একজন চিত্রশিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞ। ইনি সুন্দর তৈলচিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন; সঙ্গীত ইনি রীতিমত চর্চ্চা করিয়াছেন; ইঁহার মত সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর আমি অল্পই শুনিয়াছি। ইঁহার পিতা পরমহংস মহাশয়ের বিশেষ ভক্ত ছিলেন, নাম ৺নবগোপাল ঘোষ। ইঁহার শরীর অসুস্থ বলিয়া ব্যাঙ্গালোরে আসিয়াছেন; কিন্তু টেম্পেল্ গৃহে কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া প্রত্যহ প্রাতে তানপুরা সংযোগে সুরদাস প্রভৃতির ভজন-গান করিতেন। আশ্রমের রন্ধন-কার্য্যের জন্য যে ব্রাহ্মণটি রহিয়াছে, সে বড় চমৎকার লোক। আশ্রমের বৎসতরী তাহার এমনই অনুরক্ত যে যত দূরেই থাকুক না কেন তাহার কণ্ঠস্বর শুনিলেই ছুটিয়া আসিবে। এ লোকটির বাটী হিমালয়ের নিকটস্থ চম্বাভেলি—কোথায় চম্বা উপত্যকা আর কোথায় ব্যাঙ্গালোর! চম্বাভেলির রাজা আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী নির্ম্মলানন্দের ভক্ত ও বন্ধু বলিয়া ব্রাহ্মণটি এত দূর হইতে আসিয়াছে। সে প্রত্যহ মধ্যাহ্নে যখন প্রকাণ্ড পাঞ্জাবী উষ্ণীষ পরিধান করিয়া ভ্রমণে বহির্গত হইত তখন তাহার এরিষ্টক্রেটিক বা বড় ঘরের চাল দেখিয়া আমি হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতাম না। তখন সে প্রায়ই আমার ভৃত্যটিকে সঙ্গে লইত না, যদি বা কখন লইত, তাহা হইলে তাহাকে ভৃত্যের ব্যবধানে রাখিত, অন্য সময় কিন্তু তাহারা একসঙ্গে এক ঘরে থাকিত।

আমি কলিকাতা হইতে আসিবার সময় মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত লাট-সাহেবের চিঠী আনিয়াছি; তাহাতে অনুরোধ করা আছে যে সাধারণে যেন আমার সাহায্যের প্রয়োজন হইলে সাহায্য করে। সেখানি লইয়া মহিসুর রাজ্যের রেসিডেণ্ট কর্ণেল ডেলি (The Hon'ble Col. Sir Hugh Daly) সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলাম—উদ্দেশ্য মহিসুর প্রদেশের পার্ব্বত্য ও অরণ্যসঙ্কুল স্থানে ভ্রমণ করিবার সময় রাজসরকারের সাহায্যপ্রাপ্তি। এদেশের লোকের ভাষা কানারী; আমাদের ভাষা বা সংস্কৃতের সহিত বিন্দু-মাত্রও সাদৃশ্য নাই, ইহাদের আচার ব্যবহার আমাদের মত আদৌ নহে; আমার চিন্তা হইতেছিল কি প্রকারে পর্য্যটন-ব্যাপার নিষ্পন্ন করিব।

রেসিডেন্সিতে যাইবার সময় আমার সঙ্গে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ চলিলেন; ইহা এক প্রকাণ্ড উদ্যানের মধ্যে অবস্থিত; "ঝটকা" বা অশ্বযান দ্বারদেশে পৌঁছিলে আমরা পদব্রজে চলিলাম; গৈরিক বস্ত্র পরিহিত বলিয়া স্বামীজির ভিতরে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে-ছিলেন; আমি তাঁহাকে জোর করিয়া উদ্যানের মধ্যে লইয়া গেলাম, বলিলাম, "গৈরিক বস্ত্রের সম্মান মণিমুক্তা বা রাজবেশ অপেক্ষা অনেক অধিক।" রেসিডেন্সির সম্মুখে যে গাড়ী-বারাণ্ডা আছে তথায় উপস্থিত হইলে, শসস্ত্র প্রহরীরা আমাকে বসিবার আসন দিল; একখানি মোটরকার অপেক্ষা করিতেছে; অনুসন্ধানে জানিলাম মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী ক্যাম্বেল সাহেব রেসিডেণ্ট মহা-শয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন; ইনি একজন সিবিলিয়ান; আমি আমার কার্ড পাঠাইয়া দিলাম; ক্যাম্বেল সাহেবেরও কার্য্য শেষ হইয়াছিল; তিনি চলিয়া গেলেন। রেসিডেণ্ট মহাশয় বাহির পর্য্যন্ত আসিয়া আমায় করমর্দ্দন করিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন। তিনি দণ্ডায়মান রহিলেন ও আমায় বসিতে অনুরোধ করিলেন; আমি সৌজন্যের সহিত এ সম্মান প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলাম,

"আপনি অগ্রে বসুন, আমি বসিতেছি।" তিনি বলিলেন, "তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না; আপনি বসুন।" অগত্যা আমায় অগ্রে বসিতে হইল। লোকটি কৃশ ও শ্মশ্রুগুম্ফবিহীন; মস্তকে কেশ নাই বলিয়া পরচুলা ব্যবহার করেন; সহজে ধরিতে পারা যায় না। তাঁহাকে আমার আগমনের কারণ সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিয়া চিফ্ সেক্রেটারী কার্ সাহেবের সহিযুক্ত লাটসাহেবের চিঠীখানি দিলাম; তাহা পাঠ করিয়া বলিলেন, "মিঃ গাঙ্গুলি, মহিস্থর রাজ্য ত ইংরাজের অধীন নহে; আমি আপনার কি সাহায্য করিতে পারি বলুন? আপনি মহিস্থর রাজ্যের প্রধান অমাত্যের (Dewan) সহিত দেখা করুন না।" আমি বলিলাম, "আইনানুসারে আপনাকে ডিঙ্গাইয়া আমি ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি না।" তিনি তৎক্ষণাৎ দেওয়ান মহাশয়কে কি লিখিয়া লাটসাহেবের চিঠীখানি তাহার সঙ্গে দিয়া পত্রখানি বন্ধ করিয়া আমার হস্তে দিলেন। আমি দেখিতে পাইলাম না তিনি কি লিখিলেন? প্রধান অমাত্য মহাশয় সে সময় ব্যাঙ্গালোর নগরে ছিলেন না। আমি বলিলাম, প্রধান অমাত্য মহাশয় যদি শীঘ্র ব্যাঙ্গালোরে ফিরিয়া না আসেন তাহা হইলে আমার ত বিলম্ব হইয়া যাইবে, অতএব এ চিঠীখানি যাহাতে চিফ্ সেক্রেটারী মহোদয় খুলিতে পারেন ও আমার ভ্রমণের বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারেন লিখিয়া দিন; ইনি তৎক্ষণাৎ তাহাই করিয়া দিলেন। উঠিবার সময় তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাইলাম; তিনিও করমর্দ্দন করিলেন। বাস্তবিক রেসিডেণ্ট মহোদয় যেরূপ সৌজন্য-পূর্ণ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার প্রতি আমার বিশেষ ভক্তি হইল। আমার বিশ্বাস সামরিক বিভাগের লোক বলিয়াই এতদূর ভদ্র ব্যবহার করিলেন।

স্বামীজি বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিলেন; তাঁহাকে সমস্ত বলি-লাম; তিনি বিশেষ আনন্দিত হইলেন। সংবাদ পাইলাম যে দেও-য়ান বাহাদুর তখনও ব্যাঙ্গালোরে ফিরেন নাই; অগত্যা সেক্রেটারী-

য়েট আফিসে যাইয়া চিফ্ সেক্রেটারী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি বিশেষ সম্মান করিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন যে যেখানে যেখানে যাইব সেখানে সরকার বাহাদুরের অতিথি হইব, না ডাকবাঙ্গলায় থাকিব? আমি বলিলাম যে আমি নিজব্যয়ে ডাকবাঙ্গলায় থাকিব, শুদ্ধ আমার স্নান ও আহারের যাহাতে অসুবিধা না হয় তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেই হইবে; আমি মূল্য দিতে স্বীকৃত হইলাম। তিনি আমার "প্রোগ্রাম" দেখিতে চাহিলেন, কেননা সেই মত বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। কলিকাতা হইতে আমার এক মাইসোরী বন্ধুর নিকট এক খস্ড়া "প্রোগ্রাম" ঠিক করিয়া আনিয়াছিলাম; তাহা দেখাইলে তিনি মহিসুর রাজ্যের সমস্ত ডেপুটি কমিশনার বা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটদের উপর তৎক্ষণাৎ পরওয়ানা বাহির করাইয়া দিলেন ও সেই দিনই তাহা প্রেরণ করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। চলিয়া আসিবার সময় দুই একটি উপদেশ দিয়া দিলেন, এবং অতদূর হইতে আসিয়া যে মহিসুরের বন পর্ব্বত অরণ্যে বেড়াইতে যাইতেছি চিন্তা করিয়া বেশ আনন্দ অনুভব করিলেন।

সেক্রেটেরীয়েট আফিসটি দেখিতে বেশ সুন্দর; ইহা দৈর্ঘ্যে কলিকাতার রাইটারস্ বিল্ডিং অপেক্ষা কিছু অল্প হইবে। যে ঘরে রাষ্ট্রীয় সভা হয় বা যাহা Council Chamber নামে কথিত তাহা বেশ প্রকাণ্ড ও মনোহর; চিফ্ সেক্রেটারীর ঘরে যাইতে হইলে ইহার ভিতর দিয়া যাইতে হয়। প্রধান অমাত্য বা দেওয়ান মহাশয়ের আফিসও এই বাটীতে। রাষ্ট্রসংক্রান্ত কোন কার্য্যের জন্য তিনি নগরে ছিলেন না বলিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। ইঁহার বিষয় অবগত হইয়া বুঝিলাম যে ইনি একজন অসাধারণ লোক। ইঁহার নাম সার এম্ বিশেশ্বরাইয়া। ইনি পুনা এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে এম্, সি, ই, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বোম্বাই প্রদেশে গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্তবিভাগে কর্ম্ম করিতেন; নিজ প্রতিভাবলে সুপারিন্-

টেগিং এঞ্জিনিয়ার পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। লর্ড কার্জ্জন তাঁহার প্রতিভার বিষয় অবগত হইয়া যখন সিমলায় পূর্ত্তবিভাগের সভা আহ্বান করেন, তখন তাঁহাকে সভ্য মনোনীত করিয়াছিলেন। ইনি বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া ইউরোপ গমন করেন। সেই স্থান হইতে তারযোগে সংবাদ পান যে মহিসুর গবর্ণমেণ্টের চিফ্ এঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হইয়াছেন; পরে দুই তিন বৎসর হইল মহিসুর রাজ্যের দেওয়ান বা প্রধান অমাত্য নিযুক্ত হন। লোকটি যেন প্রতিভার অবতার; ইনি প্রত্যেক বিষয় তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করেন এবং অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ও কর্ম্মঠ। ১৮৮১ খৃঃ অব্দের পর মহিসুর রাজ্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বর্ত্তমান রাজবংশকে প্রত্য-র্পিত হইলে সার শেষাদ্রি আয়ার মহাশয়কে দেওয়ান নিযুক্ত করা হয়; ইনি কূটনীতি-বিশারদ ছিলেন বলিয়া বিশেষ খ্যাতি আছে। সার বিশেশ্বরাইয়া মহাশয় এরূপ নহেন; ইনি কড়াক্রান্তির হিসাব রাখেন এবং প্রকৃত এঞ্জিনিয়ারের ন্যায় রাজ্যের সামান্য সামান্য অতি তুচ্ছ তথ্যগুলিও তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতে পারে না।

ভ্রমণের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া আমরা ব্যাঙ্গালোর মিউজিয়াম দেখিতে যাইলাম। মিউজিয়াম বাটীটি দেখিতে ক্ষুদ্র ও সুন্দর; ইহাতে দর্শনযোগ্য বিশেষ কিছুই নাই; তবে মহিসুর রাজ্যের খনিজ ও ভূতত্ত্ব সম্বন্ধীয় স্পেসিমেন (Specimen) গুলি দেখিবার জিনিস। আমার ভূতত্ত্ব ও খনিজতত্ত্ব পড়া ছিল বলিয়া স্বামীজিকে সব বুঝাইতে পারিলাম; তিনিও বিশেষ আনন্দিত হইলেন। এখান হইতে সার শেষাদ্রি আয়ার মেমোরিয়াল লাইব্রেরীর পার্শ্ব দিয়া আমরা চলিলাম, গন্তব্য—টাটার সায়ান্স ইন্‌ষ্টিটিউট্। বোম্বাই প্রদেশের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী স্বনামধন্য সার জেমসেৎজি টাটা মহাশয় ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য ত্রিশ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে এই বিজ্ঞানাগার সৃষ্টি হইয়াছে। ব্যাঙ্গা-

লোরের জলবায়ু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার অনুকূল বলিয়া বিলাত হইতে র‍্যাম্‌সেপ্রমুখ যে সকল বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি আসিয়াছিলেন তাঁহারা ভারতের মধ্যে এস্থানই পরীক্ষাগারের উপযোগী স্থির করিয়াছিলেন। এখানে ভারতের নানাস্থান হইতে উপাধিধারী ছাত্রেরা আসিয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেন; ইহার বর্ত্তমান অবস্থা শোচনীয়। আমি যে প্রতিপত্তি শুনিয়াছিলাম, দেখিয়া বিশেষ নিরাশ হইলাম। এখানে সবেমাত্র দশবারটি ছাত্র রহিয়াছেন। তাঁহারা কেহই বিশেষ উচ্চ-শিক্ষিত বোধ হইল না; সবেমাত্র বি, এ, বা বি, এস, সি, উপাধিধারী।

ল্যাবরেটরীগুলির বিশেষত্ব কিছুই দেখিলাম না। আমাদের কলিকাতাস্থ প্রেসিডেন্সি কলেজের বা শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পরীক্ষাগারগুলি ইহা অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। এখানে ফিজিক্স্ (Physics) বা ভূততত্ত্বের কোন পরীক্ষাগার নাই; শুদ্ধ রসায়ন ও তড়িৎবিষয়ক এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার চর্চ্চা হয়। আমি শিবপুর কলেজের পরীক্ষাগারে যেরূপ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট তুলাযন্ত্র বা ব্যালান্স্ দেখিয়াছি এখানে তেমন কিছু দেখিলাম না। এখানকার বৈদ্যুতিক পরীক্ষাগারও মোটামুটি ধরণের। এখানে গবেষণার জন্য কোন বাঙ্গালী ছাত্রকে দেখিলাম না; তাহাতে দুঃখের কোন কারণও নাই, কেননা বঙ্গদেশে থাকিয়া বিজ্ঞানচর্চ্চা করিবার এখান হইতে অনেক বেশী সুবিধা আছে। সমস্ত ইন্‌ষ্টিটিউটের মধ্যে বৈদ্যুতিক পরীক্ষাগারটিই আমার মন আকৃষ্ট করিল; ষ্টোরেজ্ ব্যাটারির ঘরটিও বেশ। শিবপুরে আমরা যাহা দেখিয়াছি তাহা অপেক্ষা বেশী কিছুই দেখিলাম না। একজন পারসী ছাত্র আমাদের বৈদ্যুতিক পরীক্ষাগার সমস্ত দেখাইল এবং একজন সিন্ধুদেশবাসী ছাত্র রাসায়নিক পরীক্ষাগার সমূহ আমাদের দেখাইতে লাগিল।

এখানকার ইকনমিক্ বিভাগে দেখিলাম একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক সাবান সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন। ইনি ফ্রান্স দেশে রসায়ন শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার নাম মিঃ চক্রবর্ত্তী, পুরা নাম

স্মরণ নাই। ইনি মহিসুর গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক এখানে সাবান সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতে প্রেরিত হইয়াছেন; ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্র হিসাবে আসেন নাই। মহিসুর গবর্ণমেন্ট দেখিতেছেন যে এখানে দেশী সাবান প্রস্তুত করিয়া চালাইতে পারা যায় কিনা। আমি একখণ্ড সাবান ক্রয় করিলাম; আমার স্বদেশবাসী বাঙ্গালীর উদ্যমের ফল বলিয়া। তিনি সাবান প্রস্তুত প্রণালী বেশ যত্নের সহিত বুঝাইয়া দিলেন। উচ্চ মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া তিনি প্রকাণ্ড কটাহে সাবান জ্বাল দিতেছেন, এবং তুলিয়া এক একবার দেখিতেছেন। যে ডিগ্রী উত্তাপে জ্বাল দেওয়া উচিত, তাপমান যন্ত্রসাহায্যে তাহা ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। আমি যে সাবানটি কিনিলাম তাহা নর্থ-ওয়েষ্ট কোম্পানীর সাবানের মত উত্তম বোধ হইল না; বেশ নরম। মিঃ চক্রবর্ত্তী আমায় বুঝাইলেন যে ইহা নর্থ-ওয়েষ্ট কোম্পানীর সাবান অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। আমি ইহাকে আমার বাক্সের এক কোণে রাখিয়া দিলাম; দুঃখের বিষয় ইহা নরম হইয়া ঈষৎ গলিয়া আমার অনেকগুলি পরিধেয় বস্ত্র নষ্ট করিয়া দিয়াছিল।

ইকনমিক্ ল্যাবরেটরীর এক অংশে পেন্সিল প্রস্তুত করিবার পরীক্ষা চলিতেছে। কপিইং পেন্সিলও পরীক্ষা হইতেছে। পেন্সিলগুলি তত ভাল বোধ হইল না। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্বদেশী দ্রব্য মাত্রই যে ভাল এ মত প্রকাশ করিয়া আমাদের অনেক অনিষ্ট হইয়াছে। আমি উহার আদৌ পক্ষপাতী নহি। পরীক্ষার উপর পরীক্ষা করিয়া আমাদিগকে কৃতকার্য্য হইতে হইবে; মিথ্যা প্রশংসার স্তোকবাক্যে আত্মবিস্মৃত হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। পেন্সিলের উপযোগী কাষ্ঠের জন্য মহিসুর গবর্ণমেণ্টকে বড়ই চিন্তিত হইতে হইয়াছিল; শুনিতেছি যে উপযুক্ত কাষ্ঠ মিলিয়াছে। শুনিয়া সুখী হইলাম মহিসুর গবর্ণমেণ্ট সাবান প্রস্তুতের জন্য মিঃ চক্রবর্ত্তীকে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং ইহার সমস্ত আয়োজন ঠিক হইয়া গিয়াছে; ইহা পরে সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম; কতদূর সত্য

জানি না। ইকনমিক ল্যাবরেটরীর আর একটি প্রকোষ্ঠে চন্দনতৈল প্রস্তুত হইতেছে। ইহা চোয়াইয়া তৈয়ার করা হইতেছে। মহিসুর রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে চন্দন বৃক্ষ জন্মে।

ইন্‌ষ্টিটিউটের একটি জিনিষ উল্লেখযোগ্য। এখানকার লাইব্রেরী বা গ্রন্থশালায় নানা ভাষায় লিখিত অনেক প্রকারের বৈজ্ঞানিক পত্রিকা আছে। এই সব পত্রিকা না পড়িলে বিজ্ঞান-জ্ঞান কথনই সম্পূর্ণ হয় না; কেননা অধিকাংশ গবেষণার ফল এখনও মাসিক বা ত্রৈমাসিক পত্রিকার কলেবর পরিত্যাগ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। জর্ম্মাণ ইউনিভারসিটি হইতে পি, এইচ, ডি, উপাধিপ্রাপ্ত আমার এক দেশীয় বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি যে একজন বাঙ্গালী ছাত্র পি, এইচ, ডি, উপাধির জন্য শিক্ষকের পরামর্শে কয়েক বৎসর ধরিয়া গবেষণা করিয়া একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া পাঠাইলে, বৈজ্ঞানিক পত্রিকার সূচিপৃষ্ঠে দেখা গেল যে, এ বিষয়ের গবেষণা পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে, তিনি ইহা জানিতেন না; কিন্তু তথাপি আর এক বৎসর থাকিয়া অন্য বিষয়ে গবেষণা করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিয়া পি, এইচ, ডি, উপাধি লাভ করিতে হইল।

সম্প্রতি ইন্‌ষ্টিটিউট্-সংলগ্ন প্রকাণ্ড লাইব্রেরী বাটী নির্ম্মিত হইতেছে। ট্রাষ্টিদিগের সহিত কোন বিষয়ে মনোমালিন্য হওয়ায়, ইহার অধ্যক্ষ সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ডক্তার ট্রাভারস্ ইন্‌ষ্টিটিউটের সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে চলিয়া গিয়াছেন। হিসাব লইয়া ইঁহার সম্বন্ধে অনেক অপবাদ শুনিলাম; সে সব কথা যাউক।

ফিরিবার সময় কিছু জলযোগ করিয়া যাইবার জন্য সিন্ধুদেশীয় ছাত্রটি বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন; তিনি কিছুতেই ছাড়িলেন না। ইনি স্বামীজির আবার বন্ধু; ইঁহাদের হোষ্টেলে যাওয়া গেল। হোষ্টেলটি দেখিতে সুন্দর; বাটীটি একতল; টেনিস্‌কোর্ট ইহার সহিত সংলগ্ন। সবে ত দশ বারটি ছাত্র আছে; প্রায় সমস্ত

প্রকোষ্ঠগুলিরই দ্বারবদ্ধ; ভূতের বাটীর মত বোধ হইল। স্থানটি বেশ নির্জ্জন। বাস্তবিক এই প্রকার স্থানই সরস্বতীর উপাসনার জন্য বিশেষ উপযোগী।

আমরা ইঁহাদের প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন ভোজনাগারে (Dining Hall) প্রবেশ করিলাম। টেবিলের উপর সুধাধবল বস্ত্র বিছান; মধ্যে ফুলদানীতে ফুল রহিয়াছে। আমাদের প্লেটে করিয়া হালুয়া, কফি ও দুই একখানি বিস্কুট দিয়া যাইল। মিঃ চক্রবর্ত্তী ও পারসী ভদ্রলোকটিও আমাদের সঙ্গে বসিলেন; বৈজ্ঞানিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় নানা কথাবার্ত্তায় অপরাহ্ণ মধুরভাবে কাটিয়া গেল। সে-দিনকার স্মৃতি চিরকাল থাকিবে।

শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

তীর্থ-ভ্রমণ *

[১]

(খানাকুল হইতে হরিদ্বার। ১৮৫৩ অব্দ।)

খানাকুল কৃষ্ণনগরের সর্ব্বাধিকারী বংশ বাঙ্গালায় বহুদিন অবধি খুব প্রসিদ্ধ,—ইঁহারা জাতিতে কায়স্থ,—ইঁহাদের উপাধি বসু। কায়স্থ কুলীন সমাজে ইঁহাদের স্থান সকলের অপেক্ষা উচ্চ। পাঠানেরা যখন গৌড়ে রাজত্ব করিতেন তখন রাঢ়ের দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চল অনেক সময় উড়িষ্যারাজ্যভুক্ত থাকিত। এখনও

* গ্রন্থকার ৺যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী, ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর পিতা ও শ্রীযুক্ত বাবু দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, সি, আই, ই, মহোদয়ের পিতামহ।

রাঢ়ের কিয়দংশ উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জরাজ্যভুক্ত। এই সময়ে অনেক দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ উড়িষ্যার রাজসরকারে বড় বড় চাকরি করিয়া বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। উড়িষ্যার রাজসরকারের সহিত পুরীর জগন্নাথের মন্দিরের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ এবং ওত-প্রোতভাবে মিলিত। যাঁহারাই উড়িষ্যা রাজসরকারে চাকরি করিতেন তাঁহাদেরই মন্দিরে কিছু কিছু বিশেষ অধিকার থাকিত। সেকালে কুলীনগাঁয়ের বসুরা ডুরী না দিলে কোন বাঙ্গালী মন্দিরে যাইতে পারিত না। নারাণগড়ের পালেরা অনুমতি না দিলে কেহই জগন্নাথে যাইতে পারিত না; কারণ বাঙ্গালা হইতে পুরী যাইতে গেলে ঐ গড়ের মাঝখান দিয়াই পথ। খানাকুলের বসুরা উড়িষ্যার রাজসরকারে চাকরি করিয়া সর্ব্বাধিকারী উপাধি পাইয়াছিলেন, অনেক তালুক মুলুক পাইয়াছিলেন এবং সকল সময়ে রাজসম্মানে জগন্নাথের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার পাইয়াছিলেন। সে উপাধি তাঁহাদের এখনও আছে,—সে তালুক এখনও আছে এবং পুরীর মন্দিরের সে সম্মান তাঁহাদের এখনও আছে। উড়িষ্যায় হিন্দু রাজত্ব গিয়া পাঠানের রাজত্ব হইয়াছিল,—পাঠানের পর মোগল আসিয়াছিল,—মোগলের পর মারাঠা আসিয়াছিল, তাহার পর ইংরাজ রাজত্ব হইয়াছে। রাঢ়েও অনেক রাজপরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে,—সর্ব্বাধিকারীদের সম্মান যায় নাই। তাঁহাদের প্রভাব খর্ব্ব হইয়াছে,—তালুকমুলুক অনেক গিয়াছে। খৃষ্টীয় উনিশ শতের শেষে তাঁহারা খানাকুলের পাঁচ সাত ঘর পাড়াগাঁয়ের জমিদারদের মধ্যে একঘর মাত্র হইয়াছিলেন।

সেই সময়ে আমাদের গ্রন্থকার যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। পাড়াগাঁয়ের জমিদারেরা আপনার ঘরে বসিয়া যে প্রকার শিক্ষা পাইতেন তিনি সে শিক্ষা সকলই পাইয়াছিলেন। আপনার তালুকের বন্দোবস্ত করা, প্রজার খাজানা আদায় করা, তাহার হিসাব রাখা,—এসকল তিনি বেশ বুঝিতেন। বাঙ্গলা লেখা-

পড়াও বেশ শিখিয়াছিলেন। খানাকুল কৃষ্ণনগরে একটি প্রবল ব্রাহ্মণ ও একটি প্রবল কায়স্থ সমাজ ছিল। তাহার উপরে আবার শাক্ত ও বৈষ্ণব দুই সম্প্রদায়ের লোকই ছিল। খানাকুলের কণাদ ভট্টাচার্য্যের বংশ, বাঁড়ুয্যে ঠাকুরের বংশ, বাঙ্গালায় সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ছিল। যদুনাথ কায়স্থসমাজের নেতা ছিলেন এবং পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি পরমভক্তিভাবে রাধাকৃষ্ণের সেবা করিতেন। রাধাকৃষ্ণের প্রসাদ ভিন্ন কিছু ভক্ষণ করিতেন না। তিনি খুব হুঁসিয়ার ও জবরদস্ত লোক ছিলেন। সেই জন্য দেশের লোকে তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিত ও মান্য করিয়া চলিত। তাঁহার দুই বিবাহ ছিল এবং অনেকগুলি সন্তান-সন্ততি ছিল। ইঁহাদের অনেকে বাঙ্গালায় প্রভূত খ্যাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের নাম কে না জানে? ইনি পুরাণ হিন্দুকলেজের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র, গণিত ও ইংরাজীতে অদ্বিতীয় ছিলেন। বহুকাল সংস্কৃত কলেজে প্রিন্সিপালি করিয়া ঐ কলেজে তিনি বি-এ, এবং এম-এ ক্লাস পর্য্যন্ত খুলিয়া গিয়াছিলেন। ইনি গরীব ছাত্রদিগের মা বাপ ছিলেন এবং নিজ ব্যয়ে বহুদিন ধরিয়া খানাকুলে একটি এংলো-সংস্কৃত হাই স্কুল চালাইয়া গিয়াছেন। যদুনাথের দ্বিতীয় পুত্র সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী বহুকাল ধরিয়া কলিকাতার একজন প্রধান ডাক্তার ছিলেন। তৃতীয় পুত্র আনন্দকুমার সর্ব্বাধিকারী সুখ্যাতির সহিত সবজজী করিয়া পেন্সন লইয়াছিলেন। চতুর্থ পুত্র রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন, লক্ষ্ণৌ 'Times' কাগজের এডিটর এবং লক্ষ্ণৌ ব্রিটিস্ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী ছিলেন; পরে কলিকাতায় আসিয়া হিন্দু পেট্রিয়টের এডিটর হন ও ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী হন।

যদুনাথ কিন্তু ছেলেদের রোজগারের উপর একেবারেই নির্ভর করিতেন না। নিজের যা তালুক ও জমিজমা ছিল তাহারই উপর

তিনি নির্ভর করিতেন; কেবল তীর্থযাত্রার সময় প্রসন্নকুমারের নিকট হইতে বত্রিশটি টাকা লইয়াছিলেন এবং তীর্থ ভ্রমণের সময় মাসিক কিছু সাহায্য লইতেন।

তিনি বাঙ্গলা ১২৬০ সালে অর্থাৎ ইংরাজী ১৮৫৩ সালে তীর্থ যাত্রায় বাহির হন এবং পদব্রজে চারি বৎসরকাল নানাতীর্থে ভ্রমণ করিয়া মিউটিনীর পর কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। তীর্থ-করিতে করিতে তিনি বদরিকাশ্রম, কুলুর পাহাড়, পুষ্কর প্রভৃতি দুর্গম স্থানে গমন করিয়াছিলেন। এতদূর ভ্রমণ করিয়া নিত্য দশ পনর মাইল পথ হাঁটিয়া তীর্থাদি দর্শন করিয়া তীর্থের সমস্ত ক্রিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্ব্বাহ করিয়া যদুনাথ যে সময়টুকু পাইতেন তাহাতে তীর্থভ্রমণের রোজনামচা লিখিয়া রাখিতেন। সে রোজনামচা পড়িয়া অনেকেই বিস্মিত হইয়াছেন। তাঁহার বাঙ্গলা—তৎকালে বিষয়ীলোকদের মধ্যে যে বাঙ্গলা চলিত খাঁটী সেই বাঙ্গলা। খৃষ্টীয় উনিশ শতকের আরম্ভে তিন রকম বাঙ্গলা চলিত, (১) ভট্টাচার্য্যদিগের বাঙ্গলা, (২) আদালতের বাঙ্গলা ও (৩) বিষয়ীলোকদের বাঙ্গলা। প্রথমটীতে টোলে যে সকল সংস্কৃত বই পড়া হয় সেই সকল সংস্কৃত বইএর সংস্কৃত শব্দ অনেক থাকিত। দ্বিতীয়টীতে পারসী আরবী ও উর্দ্দু শব্দ বেশী থাকিত। তৃতীয়টীতে সংস্কৃতও থাকিত আরবীও থাকিত পারসীও থাকিত উর্দ্দুও থাকিত, কিন্তু কিছুই অধিক পরিমাণে থাকিত না, কোন কড়া শব্দ থাকিত না, যাহা দেশে প্রচলিত, যাহা সকলে বুঝিতে পারিত, —সেই শব্দই থাকিত। যদুনাথের বাঙ্গলা খাঁটী এই বাঙ্গলা। ইহার পর বাঙ্গলার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে; তিন রকম বাঙ্গলায় মিশিয়া এক রকম অদ্ভুত পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতমহাশয়েরা অনেক অপ্রচলিত সংস্কৃত পুস্তক হইতে খুড়ী খুড়ী চোয়ালভাঙ্গা সংস্কৃত শব্দ আনিয়া চালাইয়া দিয়াছেন; পারসী ও আরবী শব্দ একেবারে উঠাইয়া দেবার চেষ্টা হইয়াছে। সুতরাং

যদুনাথ সর্ব্বাধিকারীর এ বাঙ্গলা বাঙ্গালী মাত্রেরই বিশেষ করিয়া পাঠ করা উচিত। যদুনাথ যে রোজনামচা লিখিয়াছেন তাহা ত আর তিনি রীতিসিদ্ধ করিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া, গ্রন্থকার হইব এই আশায় লেখেন নাই। অবসর মত যাহা দেখিয়াছেন শুনিয়াছেন তাহাই টুকিয়া রাখিয়াছেন, সুতরাং উহাতে মাজাঘষা কিছু নাই। যেমন মনে উদয় হইয়াছে তেমনি তিনি লিখিয়াছেন,—বাঙ্গলায় ভাবিয়াছেন, বাঙ্গলায় লিখিয়াছেন। এখনকার মত ইংরাজীতে ভাবিয়া বাঙ্গলায় তর্জ্জমা করেন নাই। তাই আবার বলিতে চাই, যাঁহারা বাঙ্গলাভাষা শিখিতে চান, তাঁহাদের এ বইখানার বাঙ্গলা যত্ন করিয়া পড়া উচিত। যদুনাথের আর এক বাহাদুরী, তিনি পদ্যে লেখেন নাই। সেকালকার সকলেই পদ্যে লিখিতেন, পয়ারে লিখিতেন,—গদ্য বলিয়া যে একটা জিনিস আছে, চিঠিপত্রে ভিন্ন সেকথা কাহারও মনেই থাকিত না। তাঁহারা জানিতেন লিখিতে হইলেই পয়ারেই লিখিতে হয়।

যদুনাথ সর্ব্বাধিকারীর এই তীর্থ-ভ্রমণে আমাদের একটি বিশেষ উপকার হইবে। এখন রেলপথ হইয়া হাঁটাপথ ও নৌকাপথের কথা আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। যদুনাথ যেবার তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হন, সেই বৎসরেই রেলের সুরু। সুতরাং রেল হইবার ঠিক পূর্ব্বেই কিরূপে দেশের লোক দূরদূরান্তরে গমনাগমন করিত, কোথায় সরাই ছিল, কোথায় চটি ছিল, কোথায় কি খাবার মিলিত, কোথায় কি মিলিত না; কোন্ পথে কেমন করিয়া যাইতে হইত, তাহা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে এই পুস্তকে দেখিতে পাই। ইহাতে আমাদের দেশী ভূগোলের জ্ঞানের মাত্রা একটু বাড়িয়া যাইবে। তাহাতে আবার যদুনাথের নূতন জিনিস দেখিবার ক্ষমতা বেশ একটু ছিল; সুতরাং যেটা যেটা তাঁহার একটু মনে লাগিয়াছে, যেটা যেটা তিনি বাঙ্গলায় সর্ব্বদা দেখেন নাই, তাহা দেখিলেই তিনি টুকিয়া রাখিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার বইএর একটু বেশ কদর বাড়িয়া গিয়াছে।

আর এক জিনিস। যদুনাথের জন্ম খৃষ্টীয় উনিশ শতের গোড়ায়।

সেটা বাঙ্গালায় বড় অশান্তির সময়; চারিদিকে চুরি, ডাকাতি, লুঠ-তরাজ হইত। ইংরাজেরা কেমন করিয়া প্রভূত পরাক্রমে সেই সকল অশান্তি নিবারণ করিয়াছিলেন যদুনাথ তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন এবং তাহাতে ইংরাজরাজের প্রতি ও ইংরাজ জাতির প্রতি তাঁহার একটা অসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধা হইয়াছিল। সেই রাজভক্তির নিদর্শন এই পুস্তকের পাতে পাতেই আছে। তিনি কোন জায়গায়ই ইংরাজের সুখ্যাতি বই অখ্যাতি করেন নাই। এবং যে কেহ ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে তাহারই উপর নিজেও বিরক্তিভাব দেখাইয়াছেন। তিনি যতদূর গিয়াছিলেন, ইংরাজরাজত্বের শান্তি ও সুশৃঙ্খলা দেখিয়া তাঁহার সে রাজভক্তি আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। আসিবার সময় যে সকল দেশে মিউটিনীর খুব উৎপাত হইয়াছিল, তিনি সেই সকল দেশের মধ্য দিয়া আসিয়াছিলেন। মিউটিনীর অনেক ঘটনা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন অথবা যাহারা দেখিয়াছিল তাহাদের মুখে শুনিয়াছিলেন। কিন্তু 'মিউটিনীয়ার'দের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি গোড়া হইতেই বলিয়াছেন, ইহারা অত্যাচার করিয়া দেশ উৎখাত করিবে সত্য, কিন্তু ইংরাজের কিছুই করিতে পারিবে না। ইংরাজের বাহুবল, ইংরাজের যুদ্ধকৌশল, ইংরাজের সুবিবেচনা ও ইংরাজের ধর্ম্মভাবের প্রতি তাঁহার অচলা অটলা ভক্তি ছিল। এবং সে ভক্তি প্রকাশ করিতে তিনি কোথাও ক্রটি করেন নাই। কাশীতে যখন মিউটিনীর বড়ই গোলযোগ, তখন তিনি কাশীতেই ছিলেন। দেহাতের সুরজবংশী ও রঘুবংশীরা একটা মিছা কথায় ক্ষেপিয়া কিরূপে নানা উৎপাত করিয়াছিল এবং কিরূপে ইংরাজ রাজপুরুষগণ কাশীরাজ ঈশ্বরী সিংহের মধ্যস্থতায় অল্প আয়াসে তাহাদের সহিত সমস্ত গোলযোগ মিটাইয়া লইয়াছিলেন, তাহা তিনি বেশ অপক্ষপাতে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পড়িতে পড়িতে অনেক সময় তাঁহার সাহস দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

এখন আমরা রিটার্ণ টিকিটে জগন্নাথ দর্শন করি, রিটার্ণ টিকিটে

গয়ায় পিণ্ড দিই। রবিবার সকালে গয়ায় পৌঁছিয়া দিনের মধ্যে গয়াকৃত্য সারিয়া রাত্রে ফিরিয়া আসিয়া সোমবার আফিস করি। উইক-এণ্ড রিটার্ণে কাশী, প্রয়াগ এমন কি মথুরা বৃন্দাবন পর্য্যন্ত করিতে পারি। ইউরোপীয় সভ্যতা আমাদের মধ্যে একটা তাড়াতাড়ি হুড়াহুড়ি ভাব আনিয়া দিয়াছে। সব কর্ম্মই আমরা শীঘ্র শীঘ্র সারিতে চাই। ষাট বৎসর পূর্ব্বে এভাবটি ছিল না, তখন তীর্থে যাইলে লোকে তীর্থের সব কর্ম্মই করিয়া আসিত। এখন গয়ায় গিয়া তিনটি পিণ্ড দিলেই যথেষ্ট মনে হয়,—বিষ্ণুপদে, ফল্গু-নদীতে ও অক্ষয় বটে। সেকালে একবার গয়ায় গেলে আর কখনও আসিতে পারিব কি না এই ভয়ে এই আশঙ্কায় লোকে 'থাপ্‌রেল' অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ দিন থাকিয়া পঁয়তাল্লিশ পীঠে পিণ্ড দিত। অথবা 'দরপণী' অথবা পঁয়ত্রিশ পীঠে পিণ্ডদান অথবা 'একদৃষ্ট' বা চার পীঠে পিণ্ডদান। এখনকার বাবুরা এ তিনের কিছুই করেন না, একটা বা তিনটা পীঠে পিণ্ড দিয়া তীর্থ শেষ করিয়া আসেন। সকল তীর্থেই প্রায় এইরূপ হইয়াছে। দুই একটি প্রধান দেবতা ভিন্ন অন্য দেবতারা লোপ পাইতে বসিয়াছেন। অনেক ছোট ছোট তীর্থও লোপ পাইতে বসিয়াছে। লোকে যখন হাঁটিয়া যাইত,—আপন বশে যাইত,—দুই এক ক্রোশ এদিক ওদিক করিয়া এই সকল তীর্থ দেখিয়া যাইত। এখন রেলে যায়, পথের পাশে যে তীর্থ থাকে তাহাও দেখিতে পারে না। মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডের পাণ্ডারা এখন হায় হায় করিতেছে। সেখানে আর যাত্রী যায় না। যখন লুপ লাইন ভিন্ন লাইন ছিল না, তখন বরং কেহ কেহ সীতাকুণ্ড দেখিয়া যাইত, কিন্তু কর্ড লাইন ও গ্রাণ্ড কর্ড লাইন খুলায় সীতাকুণ্ড বেপোট হইয়া গিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় হাঁটাপথের একটা তীর্থ-যাত্রার কাহিনীতে আমরা অনেক তীর্থের অনেক খবর পাই। সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের তীর্থ-ভ্রমণে এ লাভটা একটু বেশী পরিমাণে আছে।

তীর্থ হইলেই তাহার একটা মাহাত্ম্য আছে। ভুল সংস্কৃতে লেখা অনুষ্টুপ ছন্দে বার পাতা হইতে পঞ্চাশ পাতা পর্য্যন্ত এক একখানি মাহাত্ম্যের পুঁথি। বড় বড় তীর্থের মাহাত্ম্য ইহা অপেক্ষা আরও বড় হয়। মাহাত্ম্যের পুঁথিতে তীর্থের একটা আদি আছে। সত্যযুগে হউক বা তাহারও আগে হউক অথবা কোন প্রাচীন কল্পের সত্যযুগের কোন ঋষি বা দেবতা কোন একটি ধর্ম্ম-কার্য্য করিয়া বা কঠিন তপস্যা করিয়া কোন একটি স্থানকে তীর্থ করিয়া গিয়াছেন। তাহার পর সে তীর্থে কোন কোন দেবতা বাস করেন, তাঁহাদের কেমন করিয়া পূজা করিতে হয়। মূল পূজা ছাড়া তীর্থযাত্রীকে কোন কোন পূজা করিতে হয় এবং সে সকল ক্রিয়ার ফলই বা কি, এ সকলই মাহাত্ম্যে থাকে। তীর্থও অসংখ্য, মাহাত্ম্যও অসংখ্য। যে তীর্থেই যাও মাহাত্ম্য পাইবেই পাইবে। এখন অনেক স্থানে ছাপান মাহাত্ম্যও পাওয়া যায়। হাতোয়ার পরলোকগত মহারাজা একবার তীর্থ করিতে বাহির হইয়া প্রায় পঞ্চাশখানা মাহাত্ম্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। 'অফ্রেট' সাহেব বলেন যে স্কন্দ নামে একখানা পুরাণ নাই—স্কন্দপুরাণ কেবল অসংখ্য মাহাত্ম্যের সমষ্টি। সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের তীর্থভ্রমণে এই মাহাত্ম্যগুলির মাহাত্ম্য অনেক নষ্ট হইবে। পূজার মন্ত্রতন্ত্র ছাড়া তীর্থসম্বন্ধে হিন্দুর যাহা কিছু জানা আবশ্যক, তিনি সে সমস্তই আপনার পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন। লোকের আর মাহাত্ম্য পড়িয়া সে সব কথা জানিবার দরকার নাই।

সর্ব্বাধিকারী মহাশয় পরম বৈষ্ণব ছিলেন, সুতরাং বৃন্দাবনের বর্ণনাটা তিনি অতি বিস্তৃত ভাবেই করিয়াছেন। তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া বৃন্দাবনে বাস করিবার জন্য তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। এবং বৃন্দাবন হইতেই তিনি পুষ্কর যাত্রা করেন, বৃন্দাবন হইতেই হরিদ্বার যাত্রা করেন, বৃন্দাবন হইতেই কুলুত পাহাড় যান এবং বৃন্দাবন হইতেই তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। একে ত পরম বৈষ্ণব,

তাহার উপর অনেকদিন বৃন্দাবনে বাস, সুতরাং বৃন্দাবনের কথাটা খুব বেশী করিয়াই লেখা আছে। কোথায় কৃষ্ণ বাঁশী বাজাইয়াছিলেন, কোথায় কৃষ্ণ গোচারণের সময় বসিয়াছিলেন, কোথায় রাসলীলা করিয়াছিলেন, কোথায় বেলা দুই প্রহরে বনের ছায়ায় কৃষ্ণ শুইয়া থাকিতেন, কোথায় রাধিকার সহিত নির্জ্জন বিহার করিয়াছিলেন, কোথায় রাধাকে রাজা করিয়া কৃষ্ণ কোটালবেশ ধরিয়া কর লইয়াছিলেন, কোথায় বৃন্দাবনের গরুরা জলপান করিত, কোথায় কৃষ্ণ গোষ্ঠলীলা করিতেন, কোথায় কৃষ্ণ গ্যাঁদখেলা করিতেন, এই সব জায়গায় সর্ব্বাধিকারী মহাশয় দেখাইয়া দিয়াছেন। চৈতন্য-পরিকরেরা বৃন্দাবনে কে কোথায় থাকিতেন, কে কোথায় কি লীলা করিয়াছিলেন, ছয় গোস্বামীর পাট, যমুনার দ্বাদশ ঘাট, চার বট, নিকুঞ্জবন, ধীরসমীরের ঘাট, ব্রজভূমির চারিদেব প্রভৃতি বৃন্দাবনের বৈষ্ণবদিগের জানিবার জিনিস সমস্ত তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বৃন্দাবনে যে সকল মেলা হয়, বৃন্দাবনে যে সকল প্রধান প্রধান কুঞ্জ আছে তাহারও কিছুই সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ছাড়েন নাই।

১২৬১ সালের ৭ই আষাঢ় সর্ব্বাধিকারী মহাশয় আর কয়েকটি লোকের সঙ্গে পুষ্কর যাত্রা করেন। পুষ্কর যাইতে হইলে জয়পুর হইয়া যাইতে হইত। বৃন্দাবন হইতে জয়পুর ও জয়পুর হইতে পুষ্কর, ইহার মধ্যে যত গ্রাম নগর, সরাই পান্থশালা মাঠ, ও গাছতলায় যদুবাবু রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন, বিশ্রাম করিয়াছিলেন, জলযোগ করিয়াছিলেন অথবা রসুই করিয়া খাইয়াছিলেন, তাহা সমস্তই যদুবাবু বিশেষ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত স্থান ঘুরিয়া তিনি আবার ২০শে শ্রাবণ বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। এই সময় হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত সর্ব্বাধিকারী মহাশয় চুপ করিয়া বৃন্দাবনেই ছিলেন তাঁহার রোজনামাচায় বড় কিছু লেখাপড়া দেখা যায় না। ফাল্গুন মাসে হরিদ্বারের কুম্ভমেলার পূর্ব্বে বৃন্দাবনে

যমুনাপুলিনে এক কুম্ভমেলা হইয়া থাকে। হরিদ্বারের কুম্ভমেলা বার বৎসরের পর হয়, এ মেলাও বার বৎসর পরে হয়। প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় বৃন্দাবনের কুম্ভমেলা ভাঙ্গিয়া সন্ন্যাসীরা হরিদ্বারে যায়। তথায় আরও নানাদেশ হইতে সন্ন্যাসীরা আসিয়া উপস্থিত হয়। হরিদ্বারে কুম্ভের মেলায় বহুলক্ষ লোকের সমাগম হয়। যদুবাবু ৫ই চৈত্র বৃন্দাবন হইতে যাত্রা করিয়া মিরাট, মজঃফর নগর, রুড়কী, জোয়ালাপুর হইয়া ১৫ই চৈত্র হরিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হন। এইখানে তিনি হরিদ্বার ও কনখলে কুম্ভমেলার যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। সন্ন্যাসীদের আসন, রাজা-রাজড়ার তাঁবু, ব্যবসাদারের বাজার, ইংরাজ রাজপুরুষের সতর্কতা ও সুব্যবস্থা, লোকের যাহাতে কষ্ট না হয়, যাহাতে সন্ন্যাসীরা মারামারি করিতে না পারে তাহার জন্য পুলিশ ও পল্টন রাখা. সন্ন্যাসীদের এক একদল লইয়া পল্টন ও পুলিশে ঘেরাও করিয়া স্নান করান ও তাহার পর অন্য পথ দিয়া তাহাদের আসনে পৌঁছাইয়া দেওয়া এমনভাবে বর্ণনা করা আছে, পড়িলে সমস্ত জিনিস যেন চোখের উপর ভাসিতে থাকে।

১৫ই চৈত্র হইতে ৮ই বৈশাখ পর্য্যন্ত কেবল কুম্ভমেলারই বর্ণনা। একা মানুষ একদিনে ত আর সব দেখিয়া উঠিতে পারেন না, তাই যেদিন যেখানটা দেখিয়াছেন সেদিন সেখানটা বর্ণনা করিয়াছেন। এই পুস্তকের ১৮৮ পৃষ্ঠা হইতে ২১৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত এক কুম্ভমেলারই বর্ণনা। এবার যাঁহারা হরিদ্বারে কুম্ভমেলা দেখিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা যদি যদুবাবুর তীর্থভ্রমণ পড়িয়া যাইতে পারিতেন নিশ্চয়ই বিশেষ উপকার হইত। এখনকার অবস্থায় ও তখনকার অবস্থায় অনেক তফাৎ। এখন সব লোকই রেলে যায়—সন্ন্যাসীরাও রেলে যায়। সুতরাং যাতায়াতের ক্লেশও অল্প, খরচও অল্প, সময়ও অধিক লাগে না। তখন কিন্তু গমনাগমন পদব্রজে এবং অনেক সময় ধরিয়া হরিদ্বারে অবস্থান করিতে হইত। ছোট

ছোট ঘাসের ঝোপড়া বাঁধিয়া বড় বড় লোককে বাস করিতে হইত, আবার লোক চলিয়া গেলে পুলীশে সেই সব ঘর পোড়াইয়া ফেলিত।

"এই মত মেলার ভঙ্গ হওয়াতে কোম্পানী বাহাদুরের যেসকল কর্ম্মকারক সাহেবগণ এবং পল্টন ছিল সকলে আপন আপন স্থানে গমনোদ্যোগ করিয়া সোহরৎ দিল, 'যে কেহ মেলাতে যাত্রী কি দোকানদার আছে, সকলে এ স্থান হইতে প্রস্থান কর, তবে যদি কেহ থাকিতে ইচ্ছা কর, আপন আপন দ্রব্যাদি সাবধানে রাখিবে, সরকার হইতে চৌকী পাহারা থাকিবে না, ইহাতে কাহার কিছু ক্ষতি হইলে সরকার দায়ী হইবে না।' এই সোহরৎ দিয়া ৬ই বৈশাখ রাত্রি দুইপ্রহর চারিঘণ্টার সময় কুচ্ হইল। যে সমস্ত ঘাসের নূতন ঘরবাড়ী হইয়াছিল, যে যখন যে ঘর হইতে উঠিল তাহার পর সে-ঘর জ্বালাইয়া দিল। এই প্রকারে সকল ঘরে অগ্নি দেওয়াতে অগ্নিময় ক্ষেত্র হইল। ঐ রাত্রি শশব্যস্ত হইয়া থাকিতে হইল। সকালে মেলা ভঙ্গ হইল।

"৭ই বৈশাখ আমাদিগকে হরিদ্বারে থাকিতে হইল। বেলা তৃতীয় প্রহরের পর বৃষ্টি আরম্ভ, অতিশয় জল ও বাতাস হইতে লাগিল, মাঠের মধ্যে গঙ্গার তীরে ঘাসের ঘরে থাকিয়া যত সুখভোগ করা হইল। বস্ত্রাদি শুষ্ক রাখা কঠিন হইল; সকলে এক এক কম্বল ক্রয় করিয়াছিল তাহা আচ্ছাদনে রাত্রি অতিবাহিত হইল।"

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

কাব্য ও তত্ত্ব

একজন প্রসিদ্ধ ফরাসী সাহিত্য-সমালোচক সেক্স্‌পীয়র ও মোলিয়েরের এই দুই জনের নাট্যপ্রতিভা তুলনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, কাব্য-জগতের সর্ব্বত্র, তাহার আদি সৃষ্টিকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত, এস-খিল্ সোফোকল্ ইউরিপিদ হইতে কর্ণেই রাসীন, সকল কবিশ্রেষ্ঠ-দিগের মধ্যে, তাঁহাদের সৃষ্টি যতই মহৎ হউক না কেন, সর্ব্বদাই আমরা একটা দোষের অবশেষ লক্ষ্য করি—তাহা হইতেছে একটা বর্ব্বরতার আভাস। প্রবৃত্তির স্থূল প্রাকৃতজনসুলভ লীলাভঙ্গীটি তাঁহারা অতিমাত্র করিয়া দেখিয়াছেন, সর্ব্বত্রই বলাৎকার, রক্তারক্তি, পাশবিক উপায়ে প্রবৃত্তির খেলা। একমাত্র মোলিয়েরের তাঁহার বিশেষত্ব ও মহত্ত্ব দেখাইয়াছেন এইখানে যে, প্রবৃত্তির খেলা চিত্রিত করিবার জন্য তিনি এই সব স্থূল বাহ্য উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। মানুষকে দেখাইয়াছেন চিন্তা, ভাব, অনুভূতির চিত্র-বিচিত্র-তার মধ্য দিয়া, সকল খেলা চলিয়াছে অন্তরে। উচ্চ কথা না কহিয়া, কোলাহল না করিয়া, লম্ফঝম্প না দিয়াও যে হৃদয়ের কাহিনী যথাযথরূপে, এমন কি গভীরতর ভাবেই, ব্যক্ত করা যায় তাহার দৃষ্টান্ত মোলিয়েরের। মোলিয়ের দেখাইয়াছেন নিছক চরিত্র, নিছক মনস্তত্ত্ব। প্রবৃত্তির যে আবিল আবেগময় স্থূল বিকাশ, তাহার উপর তিনি ততখানি জোর দেওয়া প্রয়োজন বা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই। সমালোচক তাই সেক্স্‌পীয়র সৃষ্ট তাইমন ও মোলি-য়েরের সৃষ্ট আলসেস্ত এই দুইটি চরিত্র উদাহরণস্বরূপ লইয়া বলি-তেছেন, সেক্স্‌পীয়র কি উগ্র বন্যপশুবৎ মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, মোলিয়েরে শরীরগত সে উচ্ছৃঙ্খলতা, ইন্দ্রিয়গত সে উন্মত্ততা নাই; কিন্তু তাইমন অপেক্ষা আলসেস্তেই কি মানববিদ্বেষীর গভীরতর তত্ত্ব-চিত্র ফুটিয়া উঠে নাই?

সেক্স্‌পীয়র ও মোলিয়েরের যে দুইটি চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা তুলনা করিয়া, কাহার স্থান নিম্নে, কাহার স্থান উচ্চে ইহা নির্দ্ধারণ করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের বিচার্য্য সমালোচকের মূল বক্তব্যটি। বর্ত্তমান কালে কাব্যসৃষ্টি সম্বন্ধে এইরূপ একটা ভেদ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা হইতেছে যে তত্ত্ববোধ আর ইন্দ্রিয়জ বিকার এই দুইটি জিনিস সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী। সূত্রস্বরূপ তাই দেওয়া হইতেছে, কবি সৃষ্টি করিবেন তত্ত্ব, ইন্দ্রিয়-উত্তেজনা, স্থূল বিকার কাব্যের বস্তু হইতে পারে না, কাব্যে তাহার আর স্থান নাই। কারণ প্রথমতঃ কবির উদ্দেশ্য মানুষের গভীরতম কথা যাহা, যাহা অন্তরের বস্তু, যাহা আত্মার অনুভূতি, তাহাই প্রকাশিত করা। স্থূল ইন্দ্রিয়ের স্থূল বিক্ষোভ মানুষের অন্তরের, আত্মার কথা নয়। দ্বিতীয়তঃ মানুষ আর পূর্ব্বের মত অতিমাত্র ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যা-নিরত নহে। তাহার মধ্যে উচ্চতর বৃত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, নব নব অভিজ্ঞায় সে পূর্ণতর হইতেছে। কালিদাস, সেক্স্‌পীয়র এ সকলের বার্ত্তা কিছুই জানিতেন না, তাই ইঁহাদের ছায়া তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। মানুষ এখন জগৎকে জীবনকে দেখিতেছে এক নূতন দৃষ্টি দিয়া, সভ্যতা ভাবুকতার জ্ঞানবিজ্ঞানদীপ্ত বুদ্ধি, পরিশুদ্ধ বৃত্তির চক্ষে। এখনকার কবিও তাই সেক্স্‌পীয়র ও কালিদাসের মত ইন্দ্রিয়গত অনুভূতিকে প্রকাশু করিয়া কাব্য সৃষ্টি করিবেন না। তৃতীয়তঃ কাব্যের মহত্ত্বই এইখানে। যে কবি প্রাকৃতজনের অনুভূতি ও ভঙ্গী লইয়া কাব্য রচনা করেন, তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কবি তিনিই যিনি কবি ও মহাপুরুষ একাধারে, যিনি মানুষকে শুধু আনন্দ দিয়াই নিশ্চিন্ত নহেন কিন্তু তাহাকে মহীয়ান দেবতুল্য করিয়া তুলিতে চাহেন।

কাব্যের বিষয় তত্ত্ব, এই কথাটি আমরা সর্ব্বপ্রথমে বুঝিতে চেষ্টা করিব। তত্ত্ব কি? বস্তুর যাহা সনাতন গুণ, যাহা আশ্রয় করিয়া বস্তু বস্তু হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই আদিপ্রাণ, সেই মূল

সত্যই উহার তত্ত্ব। বস্তুর যে স্থূল বিকার তাহা তাহার তত্ত্ব নহে। স্থূল বিকারের কারণ যাহা, যে গুণসমাবেশ হইতে এই ইন্দ্রিয়গত বিক্ষোভ উদ্ভূত তাহাই হইতেছে তত্ত্ব। যেমন প্রেমের তত্ত্ব হইতেছে ভালবাসা। প্রেমের স্থূল বিকার হইতেছে ইন্দ্রিয়জ শরীরজ সেই স্বেদ পুলক ইত্যাদি—স্থূলতমটি আর আমরা উল্লেখ করিলাম না—এ সকল তত্ত্ববস্তু নহে। অতএব বলা হইতেছে যে কবি স্বেদ পুলক ইত্যাদির কথা না বলিয়া দেখাইবেন হৃদয়গত বৃত্তিটির গতি, শুধু ভালবাসার প্রকরণ। শুধু ইহাই নয় প্রেমকে শরীরের দিকে টানিয়া না আনিয়া, উহাকে সমুচ্চে উত্তোলন করিয়া ধরিব, মিলাইব বিশুদ্ধের, অনন্তের ভগবানের সহিত। বিদ্যাপতির মত আর বলিব না—

পীঠ আলিঙ্গনে কত সুখ পাব।
পানিক পিয়াস দুধে কিয়ে যাব॥

এখন বলিব রবীন্দ্রনাথের কথায়—

আমার অতীত তুমি যেথা, সেইখানে
অন্তরাত্মা ধায় নিত্য অনন্তের টানে—

অথবা ব্রাউনিংএর মত শান্ত উদাত্ত তত্ত্বজ্ঞানে পরিপ্লুত হইয়া মানবজাতিকে সান্ত্বনা দিব—

God's in His Heaven
All's well with His world.

কিন্তু সেক্স্‌পীয়রের মত ইন্দ্রিয়-জগতের দাস হইয়া প্রাকৃতজনের ক্ষুব্ধ চিত্ত লইয়া বলিব না—

And in this harsh world draw
thy breath in pain—

তত্ত্ব শুধু তত্ত্ব হিসাবেই বিশুদ্ধ সত্য। ভূতবস্তু, স্থূল বিকাশ, ইন্দ্রিয় বিক্ষোভের মধ্যে উহা পরিস্ফুট নয়। অতএব কাব্যে উভয়ের যুগপৎ স্থান হইতে পারে না। সর্ব্বপ্রথমে আমরা এই সিদ্ধান্তের বিচার করিব। বস্তুর অতিমাত্র যে বাহ্যরূপ, তত্ত্ব তাহার অতীত জিনিস, আত্মা যে দেহকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে এ কথা সকলেই স্বীকার করিবে, আমরাও অস্বীকার করিব না। কিন্তু এই আত্মাকে এই তত্ত্বকে উপলব্ধি করিবার ও প্রকাশিত করিবার নানা ভঙ্গী আছে। মানুষে মানুষে, সাধকে সাধকে, যে পার্থক্য তাহা অনুভূতির মূল বস্তুটি লইয়া নয়, তাহা এই অনুভূতিরই প্রকার লইয়া। কবি ও দার্শনিকে যে প্রভেদ তাহাও এই ভঙ্গীরই বিভিন্নতা। কবিও তত্ত্বকে দেখেন, দার্শনিকও তত্ত্বকে দেখেন—কিন্তু এক দৃষ্টি দিয়া নহে। দার্শনিক তত্ত্বকে দেখেন বিচার বুদ্ধির সাহায্যে, চিন্তার দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া তিনি তত্ত্বকে বোধগম্য করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার কাছে ঘটনা বা স্থূলবস্তুর নিজস্ব মূল্য কিছু নাই, উহার অন্তরালে যে তথ্য লুক্কায়িত তাহাকেই তিনি ধরিয়া দেখান—তিনি চাহেন শুধু চিন্তা-জগতের কথা। বাস্তবিকপক্ষে তত্ত্ব অর্থে আমরা ধরিয়া লইয়াছি এই চিন্তা-জগতের কথা। তত্ত্ব যে উহা অপেক্ষাও গভীরতর জিনিস ইহা ভুলিয়া গিয়াছি। তাই যখন কবিকে বলি যে তিনি বিশ্লেষণমুখী বুদ্ধির সাহায্যে শুধু চিন্তা-জগতের কথা বলিবেন তখন ফলতঃ কবিকে দার্শনিকেরই কার্য্য করিতে বলিতেছি। কবির লক্ষ্য যে তত্ত্ব তাহা দার্শনিক তথ্য নহে, তাহা তর্কবুদ্ধি-প্রসূত নহে। কারণ তাঁহার উদ্দেশ্য তত্ত্বের ব্যাখ্যা দেওয়া নহে, তাঁহার উদ্দেশ্য তত্ত্বের সৃষ্টি। কবি যখন কাব্য রচনা করেন, তখন তিনি একটা কিছু প্রমাণিত করিতে অগ্রসর হন না। তিনি চাহেন শুধু মূর্ত্ত প্রকট করিয়া তুলিতে যাহা তাঁহার অন্তরের দৃষ্টিতে জাগরূক হইয়াছে। কবির দৃষ্টিতে যে বিশ্লেষণ নাই তাহা নয়, কিন্তু উহা তর্কবুদ্ধির বিশ্লেষণ নয়। সাক্ষাৎদৃষ্টির সহচর যে 'বিবেক'

তাহার দ্বারাই বস্তুসমূহের শতমুখী পার্থক্য, বৈচিত্র্যময় লীলা এক সহজ ঐশ্বর্য্যবলে তিনি ফুটাইয়া তুলেন। দার্শনিক সত্যকে দেখেন সঙ্কীর্ণ করিয়া, তাহার একটি মাত্র প্রকরণ, তাহার তাত্ত্বিকরূপ অর্থাৎ চিন্তার ক্ষেত্রে তাহার যেমন বিকাশ। কবি সত্যকে সৃষ্টি করেন একটি সমগ্রতায় পূর্ণ করিয়া। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' রূপক হিসাবেই যতখানি লিখিত হইয়াছে, কবিত্ব হিসাবে তাহার মূল্য তত কম। কারণ আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে তিনি যে স্থূল দেহ দিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছেন, সে স্থূল দেহকে তিনি অবহেলাভরেই দেখিয়াছেন, তাহাকে লইয়াছেন শুধু অবান্তর অলঙ্কাররূপে,—তাই তত্ত্ব ও স্থূল বস্তু একই মহৎ সত্যের মধ্যে একীকৃত হইয়া উঠে নাই, উভয়ের মধ্যে রহিয়াছে এক কৃত্রিমতার সংযোগ। সমস্ত কাব্যেও তাই এই কৃত্রিমতার অসরলতার ছায়া। কিন্তু কালিদাসের কুমারসম্ভব আধ্যাত্মিক না আধিভৌতিক বস্তু লইয়া? উভয়কে বিযুক্ত করিয়া দেখিবে কে?

এইটুকু বিশেষ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে যে কবির চক্ষে স্থূল ও সূক্ষ্মের সমান মূল্য। সূক্ষ্মই আসল জিনিস, স্থূল শুধু সূক্ষ্মের অলঙ্কার, উপমান বা সাঙ্কেতিক চিহ্ন এরূপ নয়। সূক্ষ্ম ও স্থূল একই জিনিসের দুই বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিকাশ মাত্র। বৈদিক ঋষিগণের এ বিষয়ে যে গভীর অনুভূতি ছিল তাহা অতুলনীয়। তাঁহারা জ্ঞানের দেবতার নাম দিয়াছেন সূর্য্য, তপঃশক্তির নাম দিয়াছেন অগ্নি। কেন? ইহা শুধু তুলনা নয়, উদাহরণ বা কোন বিশেষ অর্থহীন সংজ্ঞা মাত্র নয়। শুধুই যদি সংজ্ঞা হইত তবে জ্ঞানের নাম অগ্নি, শক্তির নাম সূর্য্য হইতে কোন বাধা থাকিত না। ঋষিগণ কিন্তু দিব্য কবিদৃষ্টি দিয়া দেখিয়াছেন যে অতীন্দ্রিয়ে, তত্ত্বে যাহা জ্ঞান স্থূলে জাগতিক ক্ষেত্রে তাহাই সূর্য্য—একই বস্তু, উভয়ের আত্মার ধর্ম্ম হইতেছে প্রকাশ। অগ্নির যে গুণ তাপ, মূলতঃ তাহাই তপঃশক্তির ধর্ম্ম। সূর্য্যই জ্ঞান, অগ্নিই শক্তি—ইহা

শুধু রূপক নয়, ইহা ভাববিলাসীর কল্পনা নয়। কবির সহজ প্রেরণাই তাই হইতেছে তত্ত্বকে নিছক তত্ত্বরূপে দেখা নয়, কিন্তু তত্ত্বকে বিষয়ের বস্তুর মধ্যে ধরিয়া শরীরী করিয়া দেখা। সূক্ষ্ম জগতে ভাবের মধ্যে যাহা তত্ত্ব, স্থূলে ইন্দ্রিয়জগতে তাহাই বস্তু তাহাই ঘটনারাজী, তত্ত্বের জীবন্ত বিগ্রহ হইতেছে স্থূল—একটি সৃষ্টি করিতে গিয়া আর একটি সহজেই উহার সহিত সৃষ্ট হইয়া পড়ে। তাই কালিদাসের কুমারসম্ভব তত্ত্বকথারূপে লিখিত না হইলেও, এত সহজেই উহার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হইয়াছে। তাই পরমতত্ত্ববাদী, আধ্যাত্মিকতাপরিপ্লুত বৈদিক ঋষিগণের মুখ হইতে তত্ত্বকথা বলিতে যাইয়া সহজেই বাহির হইয়া পড়ে—

যত্র নারী অপচ্যবং উপচ্যবং চ শিক্ষতে—

তত্ত্ব ও বস্তু, অত্র ও অমুত্রের মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গী সামঞ্জস্য যে নিগূঢ় একাত্মতা কবির অখণ্ড দৃষ্টিতে তাহাই ফুটিয়া বাহির হয়। কবির ইহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তারপর, আমরা বলিয়াছি কবির কার্য্য মুখ্যতঃ বিশ্লেষণ নয়, তাঁহার কার্য্য সংশ্লেষণ অথবা সৃজন। এই সৃষ্টির প্রকৃতিই হইতেছে চলন্ত জীবন্ত রক্তমাংসের প্রতিমা। শুধু যাহা ভাবে, শুধু যাহা চিন্তায় তাহা হিরণ্যগর্ভের কল্পনা মাত্র, বিরাটের মধ্যে স্থূল পর্য্যন্ত যাহা প্রসারিত হয় নাই তাহা সৃষ্টি নয়। ইন্দ্রিয়স্পর্শের দ্বারা তত্ত্বকে শরীরী করিয়া তুলাই সৃষ্টি। ভগবানের সৃষ্টি সম্বন্ধে এ কথা যেমন প্রযোজ্য, কবির সৃষ্টি সম্বন্ধেও তেমনি।

এখন আর একটি কথা বুঝিতে হইবে—তত্ত্ব নানা প্রকার। ধ্যান-জগতের চিন্তা-জগতের যেমন তত্ত্ব আছে, হৃদয়-জগতের, বাসনা-জগতের, ইন্দ্রিয়জগতের, কর্ম্ম-জগতের প্রত্যেক জগতেরই তত্ত্ব আছে। ইহারা বিশেষ বিশেষ জগৎ, প্রত্যেকরই এক একটি ধর্ম্ম, এক একটি বিশেষত্ব আছে। যখন বলা হয় কবি দেখাইবেন কেবল তত্ত্ব, বস্তুতঃ তখন কবিকে আজ্ঞা করা হয়, যে ধ্যান-জগতের চিন্তা-জগতের প্রতীতি দিয়াই তিনি অন্যান্য জগৎকে বোধ করিবেন, বিচারবুদ্ধি,

পরমার্থ অনুভূতির যে ছাঁচ তাহার মধ্যেই আর আর জগতের তত্ত্বকে ঢালিয়া দেখাইতে হইবে। ইহা দার্শনিকের এবং সাধুপুরুষের কার্য্য হইতে পারে কিন্তু ইহা কবির কার্য্য নয়। চিন্তা-জগতের তত্ত্বকে যেমন চিন্তার গতির মধ্য দিয়া তাহার বিশ্লেষণ করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে হয়, ইন্দ্রিয়-জগতের তত্ত্বকে ইন্দ্রিয়ের বিক্ষোভের মধ্য দিয়াই, কর্ম্ম-জগতের তত্ত্বকে কর্ম্মের মধ্য দিয়াই প্রকটিত করা যায়। গীতি কবিতার ভাবোচ্ছ্বাসের সাহায্যেই প্রধানতঃ আমরা তত্ত্বকথা ব্যক্ত করি, নাটকের প্রধান কথা কিন্তু 'নটন', অঙ্গ-সঞ্চালন, কর্ম্মের মধ্য দিয়াই এখানে তত্ত্ব ফুটাইয়া তুলি।

মানুষের কর্ম্মের মধ্যে, ইন্দ্রিয়খেলার মধ্যে একটা সত্য আছে—তাহাও তত্ত্ব। উহা যে মানুষের আত্মার কথা, অন্তরতম কথা নয় এমন নহে। রোমিও-জুলিয়েটে যে যুবজনোচিত প্রেমবহ্নি, আন্তনী ক্লিওপাট্রায় যে তীব্র কামবহ্নি তাহা কি সত্য বস্তু নয়, আত্মার বিচিত্র লীলার অঙ্গীভূত নয়? তাহা কি সনাতন সত্যই নয়? বলা হইয়া থাকে, বর্ত্তমান কালে সভ্যতার যুগে রোমিও-জুলিয়েটে আন্তনী ক্লিওপাট্রার স্থান নাই—তাহাদের ভাবে আর কেহ পরিচালিত হয় না, মার্জ্জিতবৃত্তি মানুষ সে সকলের উচ্চে উঠিয়াছে, তাহারা সনাতন সত্য নহে। প্রথমতঃ এ কথাটি আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। আমরা ত দেখি যুবকযুবতী যে ভাবে চিরকাল প্রেম করিয়া আসিয়াছে, আজও যে ভাবে করিতেছে, সকল বাহ্য সভ্যতা ভব্যতার অন্তরালে রহিয়াছে সেই পরিচিত পুরাতন রোমিও জুলিয়েট। তবে রোমিও জুলিয়েটে সে ভাব যেমন তীব্র, তেমন সুস্পষ্ট যেমন স্থূলস্পর্শী ঠিক তেমন নয়, কিন্তু মূলতঃ উভয় একই জিনিষ। উভয়ের মধ্যে এই পার্থক্যটি বরং থাকিবার কথা। কারণ কবি বাস্তবের নকল করিয়া চিত্র অঙ্কিত করেন না। বাস্তবের মধ্যে যে সত্য অস্ফুট, মৃদুগতি, অলক্ষ্যচারী তাহাকে পূর্ণ, স্পষ্ট, জাজ্বল্যমান করিয়া দেখানই কবিত্ব। প্রকৃতপক্ষে সনাতন অর্থ এরূপ নয় চির-

কাল যাহাকে বাস্তবে পূর্ণ প্রকটিত দেখিতে পাই। সনাতন অর্থ যাহা রহিয়াছে চিরকাল কিন্তু অন্তরালে, বাহিরে তাহার পূর্ণ প্রকাশ কখন হয়, কখন হয় না, কিন্তু প্রায়শঃই তাহার একটা ছায়া প্রসারিত থাকে। কবির, ঋষির প্রয়োজন এই গুহ্যগত গুপ্তকে টানিয়া গোচর করিয়া ধরা। আর এমনও যদি স্বীকার করা যায় যে মানুষ একদিন ইন্দ্রিয়-বিক্ষোভ ছাড়াইয়া উঠিবে, আন্তনী-ক্লিওপাট্রার ছায়াও যে দিন জগতে পড়িবে না, তবুও সেদিন সেক্স্‌পীয়রের মূল্য যে থাকিবে না এমন নয়, তিনি যে তত্ত্ব যে সত্য দেখিয়াছেন তাহা অসত্য হইয়া পড়িবে না। সেক্স্‌পীয়র পড়িয়া সে দিন যে কেহ আনন্দ পাইবে না তাহা নয়। দেবভাবে সিদ্ধ প্রাচীন ঋষিগণ যে কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন আমরা তাহার ত কবিত্বের রস গ্রহণ করিতে পারি, অথচ আমরা দেবজন্ম কিছু পাইয়াছি কি? সেই রকম ইন্দ্রিয়ের আবিলতা হইতে মুক্ত হইয়া আমরা সেই আবিলতা-মূলক কাব্যের রস গ্রহণ করিতে যে পারিব না এমন নহে। বলা যাইতে পারে, বেদ উপনিষদের কবিত্ব যে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি বা তদ্রূপ কিছু সৃষ্টি করিতে পারি, তাহার কারণ বর্ত্তমানের অশুদ্ধ অসিদ্ধ অবস্থাতেও আমাদের মধ্যে এমন একটি বৃত্তি বিকসিত আছে যাহার সাহায্যে সেই দেবলোকের সহিত আমরা সংশ্লিষ্ট। উত্তরে আমরা জিজ্ঞাসা করি, ইন্দ্রিয়-বিক্ষোভের অতীত হইলেই যে ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইয়া পড়িব তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? আর সব বন্ধন ছিন্ন হইলেও অন্ততঃপক্ষে সৌন্দর্য্যবোধ, রসবোধের বন্ধন যে থাকিবে না তাহা কে জোর করিয়া বলিবে?

মানবজাতির ক্রমোন্নতি বলিয়া যে জিনিসটি বর্ত্তমান যুগের কল্পনাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে তাহার অর্থ এরূপ নয় যে মানুষ যতই ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধস্তরে উঠিতে থাকিবে, নিম্নস্তরের বৃত্তিগুলি ততই সে নিঃশেষে ঝাড়িয়া ফেলিবে। মানুষ যদি দেবতা হয় তবে তাহার মধ্যে মানুষভাব এমন কি পশুভাবেরও যে স্থান হইবে না তাহা

নয়। দেবচরিত্র আমরা গঠন করিতে চাই যে ভব্যতা শ্লীলতা ইন্দ্রিয়-বৃত্তির গতিমান্দ্যদ্বারা বাস্তবে তাহা কতদূর পরিণত হইবে আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি না। আমরা মহাপুরুষের যে সংজ্ঞা দিয়াছি যিনি অন্তরে বাহিরে শান্ত ধীর, সকল উগ্রতা তীক্ষ্ণতা বিহীন, ইন্দ্রিয়-খেলার অতীত, তিনিই শুধু মহাপুরুষ আর কেহ নয়—এ কথাও দ্বিধা-শূন্য হইয়া কে বলিতে সাহস করিবে?

কিন্তু সে যাহাই হউক কবিত্ববোধ, কাব্যসৃষ্টির সহিত এ সকলের কোন সম্বন্ধ নাই। মানুষ পশু হউক, দেবতা হউক, জগৎ সেণ্ট ফ্রান্সিসে ভরিয়া যাউক অথবা হুনদিগের আবাসভূমি হউক কবির তহাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। মানুষ নিরক্ষর অসভ্য বর্ব্বর, প্রকৃতি-রই কোলের সন্তান হউক, অথবা সে জ্ঞানে বিজ্ঞানে পাণ্ডিত্যে মহীয়ান হউক, কবি তাহা দেখেন না। সর্ব্বত্র সকলের মধ্যে কি গভীর সনাতন সত্য, কি পরম সৌন্দর্য্য ঐশ্বরিকশক্তিবৎ সকলকে চালাইয়া লইয়াছে তাহাকে পরিস্ফুট করিয়া দেখানই কবির উদ্দেশ্য। কবির মধ্যে বর্ত্তমান যুগে আমরা চাহিতেছি culture অর্থাৎ সম্বুদ্ধ বিচারবুদ্ধি। কিন্তু যে culture শুধু চায় বিদ্যা অথবা পাণ্ডিত্য, ডারুইনের 'তত্ত্ব'টি জানাই যাহার প্রধান অঙ্গ, সে culture ব্যতি-রেকে কবির মহত্ত্ব যে কিছু হীন হইয়া পড়ে তাহা নয়। দর্শন বিজ্ঞানে পারদর্শিতা কবিত্বের উৎস নয়। কাব্যজগতের এ সকল অবান্তর কথা। কবি যে তত্ত্ব দেখাইতে চাহেন সেজন্য এ সকল সাহায্য লইতেও পারেন, নাও পারেন। ভর্জ্জিল গ্রীককর্ত্তৃক ট্রয়নগর অধিকার যে ভাবে বিবৃত করিয়াছেন তাহা হইতে এমন প্রমাণিত হয় না বটে যে তিনি সমরনীতিতে সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু সেই জন্য 'এনিদ' কাব্যের কবিত্বের কিছু অপচয় হইয়াছে কি? দান্তের স্বর্গ নরক এঞ্জেল শয়তান প্রভৃতি সম্বন্ধে কি অদ্ভুত ধারণা ছিল, কিন্তু জ্ঞানালোকদীপ্ত আধুনিক জগতে কয়খানি 'দিভিনা কমেদিয়া' সৃষ্ট হইয়াছে? বস্তুতঃ কি moral value কি intellectual

value দ্বারা কবিত্বের মহত্ব স্থিরীকৃত হয় না। কারণ কাব্যের তত্ত্ব intellectual তত্ত্বও নয়, moral তত্ত্বও নয়। কাব্যের তত্ত্ব হইতেছে বস্তুর গুণ অথবা character, বুদ্ধির সত্য অসত্য, নীতিবোধের ভাল মন্দ অপেক্ষা গভীরতর পদার্থ হইতেছে, বস্তুর প্রকৃতি বা স্বভাব, প্রাণে characterএ যাহা অনুস্যূত হইয়া গিয়াছে। স্থূলে এই স্বভাবজ গুণের যে স্থূল বিক্ষোভ তাহা আত্মারই মূর্ত্ত প্রকাশ। আমরা যাহাকে passion বলিয়া ভ্রুকুঞ্চিত করি তাহা আর কিছুই নয়, তাহা আত্মার গুণের পূর্ণ জাগ্রত জীবন্ত দ্যোতনা। তাই যাহাকে ইন্দ্রিয়গত, এই passion করিয়া তুলিতে না পারি তাহা কাব্যের বিষয় হইতে পারে না। আর যাহাকেই passionএ পরিণত করিতে পারি, তাহাই যথার্থ সৃষ্টি, তাহাই যথার্থ কবিত্ব।

কবির লক্ষ্য সেই তত্ত্ব যাহা শুধু চিন্তাগ্রাহ্য ধ্যানগত নহে কিন্তু যাহা আবার শক্তিপূর্ণ, যাহা বস্তুসৃজনক্ষম—বৈদিক ঋষিগণের ভাষায়, যাহা যুগপৎ সত্য ও ঋত। তত্ত্বকে যখন ঋতময় করিয়া অনুভব করি তখনই কেবল তাহার কবিত্বরসের সন্ধান পাই। বস্তুর মধ্যে স্বভাবৎ সমারূঢ় যে নৈসর্গিক শক্তি, যে মৌলিক প্রেরণা, তাহার বলেই কবি প্রকৃত তত্ত্ব সৃষ্টি করেন, সে তত্ত্ব যেখানেই থাকুক না কেন, ধর্ম্মে অধর্ম্মে, পাপে পুণ্যে, জ্ঞানে অজ্ঞানে। তত্ত্বকে যিনি এইভাবে দেখেন তাঁহাকে আর শুধু দার্শনিকের মত বিশ্লেষণ করিয়া তত্ত্বকে বুঝাইতে হয় না—তত্ত্বের এত স্থূল মূর্ত্তি দিয়া, কর্ম্মজগতে তাহার লীলাভঙ্গী অঙ্কিত করিয়াই তত্ত্বের সকল রহস্য অতি সহজে গোচর করিয়া প্রকটিত করেন। অন্তরের খেলাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখাইতে হইলে বাহিরের খেলাকে যে মৃদুতর করিয়া আনিতেই হইবে এমন বাধ্যবাধকতা নাই। এ বাধ্যবাধকতা তখনই আসে যখন ঋষি কবির ঋতপূর্ণ দৃষ্টির পরিবর্ত্তে দার্শনিকের বিচারবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করি। বালজাকের (Balzac) ন্যায় মনস্তত্ত্ববিৎ কয়জন ঔপন্যাসিক আছে? কিন্তু দেখ তাঁহার Pere Gorist

মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে কি স্থাণু পাষাণে খোদিত বিরাট মূর্ত্তি তিনি গড়িয়া তুলিয়াছেন। শুধু ভাবজগতে মনোবিজ্ঞানের কারু-কার্য্য চাতুর্য্য, চমৎকারিত্বই তাহাতে নাই, কিন্তু একটা বাস্তব, জীবন্ত, রক্তমাংসের শরীরই তিনি সৃজন করিয়াছেন। আর সেক্স্‌পীয়রের হ্যাম্‌লেট্—তাহাতে যে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ রহিয়াছে, বুদ্ধির ভাষায় চুল চুল করিয়া কে তাহা নিঃশেষ করিয়া দেখাইবে? অথচ, কিম্বা সেই জন্যই, কি জ্বলন্ত জীবন্ত তত্ত্ব এই হ্যাম্‌লেট্—তাহার প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গীরই মধ্য দিয়া কি গভীর সত্য, কি তত্ত্ব যেন ফাটিয়া বাহির হইতেছে।

প্রকৃতপক্ষে বর্ত্তমানকালে আমরা ভুলিয়া গিয়াছি যে কবিত্বের প্রধান কথা হইতেছে শক্তি, সত্যের মৌলিক শক্তি, সত্য অনুভূতির সহজ অদম্য প্রেরণা। কবিতা সূক্ষ্ম হইতে পারে, গভীর হইতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে এবং প্রধানতঃই powerful হওয়া প্রয়োজন একথাটি অমরা আর কাহার মুখে বড় শুনিতে পাই নাই। বাল্মীকি হোমরকে আমরা নাম দিয়াছি primitive poets—অর্থাৎ আদিম প্রকৃতির। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা primitive ছিলেন না, তাঁহারা ছিলেন primary, আদিম প্রকৃতির নয়, আদি প্রকৃতির। তাঁহা-দের কবিত্বে উৎস ছিল একটা elemental force যাহার বলে সত্যকে বিদীর্ণ করিয়া তাহার অন্তরের রহস্য মহিমামণ্ডিত করিয়া স্থূলে প্রকটিত করিতে পারিয়াছেন। কবিত্বের এই মূল সত্যশক্তি —বেদ যাহার নাম দিয়াছেন 'কবিক্রতু'—সৃষ্টির ইহাই একমাত্র প্রসূতি। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে আমরা প্রতিষ্ঠা করিতেছি ভাবগত শোভনতা, চিন্তাবৃত্তির কারুকার্য্য। ফলে কাব্যজগতে বর্ত্তমানকালে সর্ব্বত্র নিপুণ কারিকর পাইতেছি, কিন্তু কোথাও সেই ঈশ্বরভাব পরিপ্লুত স্রষ্টার সাক্ষাৎ পাই না।

উপনিষদের কবি নিছক তত্ত্বকথা লইয়াই কাব্যসৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা আধুনিক বিশ্লেষণপরায়ণ মনস্তত্ত্ববিদগণের মত এই

তত্ত্বকথার ব্যাখ্যা দেন নাই। তাঁহারা সেক্স্‌পীয়র অথবা কালিদাসের মতনই 'কবিক্রতু', দৃষ্টির তপঃশক্তি, তীব্র passion এর দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তাই তাঁহাদের সৃষ্টি এত অগ্নিময়, এত স্ফুট, এত বস্তুতন্ত্র। সেক্স্‌পীয়র ও উপনিষদের ঋষিগণের মধ্যে আর যে দিক হইতে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, উভয়ের কবিত্ব-প্রতিভার উৎস এক স্থান হইতে, তাহাদের মধ্যে প্রকৃতিগত বৈষম্য নাই। পার্থক্য যাহা তাহা বিষয়ের, আখ্যানবস্তুর মধ্যে, কিন্তু যে কবিত্বপ্রেরণা উভয়কে পরিচালিত করিয়াছে তাহা একই প্রকার। ঋষিগণ দেখাইয়াছেন আধ্যাত্ম-তত্ত্ব, সেক্স্‌পীয়র দেখাইয়াছেন ইন্দ্রিয়-তত্ত্ব—উভয়ই তত্ত্ব, কিন্তু কোনটিই দার্শনিক তত্ত্ব নয়। তাই সেক্স্‌পীয়র যখন বলিতেছেন

And in this harsh world draw thy breath in pain—

আর উপনিষদ যখন বলিতেছেন

ক্ষুরস্য ধারা ইব নিশিতা দুরত্যয়া

তখন চিন্তাগত না হউক কিন্তু কবিত্বগত একটা গভীর ঐক্যই অনুভব করি।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

সাধ

(১)

আজ্‌কে মোরে নেওগো আবার
তোমার নন্দনে,
তুলবো কুসুম, গাঁথ্‌বো মালা,
বড় সাধ মনে ;
নানান্‌ রংয়ের নানান্‌ ফুল
কদম্ব মালতী বকুল,
আঁচল ভরে তুলবো, তোমায়
ভাব্‌বো আনমনে
আজ্‌কে মোরে নেওগো বঁধু
তোমার নন্দনে।

(২)

কতবার না ডাকলে আমায়,
কতবার না জাগলে হিয়ায়
আমি, কাণ দিনু কি মন দিনু তায়!
অলস ভরে
নিদ্রাঘোরে
উঠলেম না আর
শয্যা ছেড়ে
আমায়, ভাঙ্গা ঘরে, উঁকি মেরে
ফির্‌লে কোন বনে ?
আজ্‌কে মোরে নেওগো সখা
তোমার নন্দনে।

(৩)

আমার, ঘরের কোণে যে ক'টা ফুল
ফুটে ছিল সখা!
জানতে তুমি দেখাওনি তো
জানতে তুমি একা
বাসি ফুলে মালা গেঁথে
দিতে চাই গো তোমার হাতে
তা ও হয় না গাঁথা
ছিঁড়্‌ছে সূতা,
হেলায় অযতনে
আজ্‌কে মোরে নেওগো বঁধু!
তোমার নন্দনে।

(৪)

সেথা, তুলবো কুসুম ভ'রে আঁচল
দেখ্‌তে দেখ্‌তে হব পাগল;
রূপের রাশি
ফুলের হাসি,
মন ভুলানো শুনবো বাঁশী,
লহর পরে লহর তুলে
নাচ্‌বে ফুলের ঢেউ
আমি, একলা বসে গাঁথবো মালা
দেখ্‌বে না তো কেউ;
তুমি, আড়াল হ'তে
জাগবে হেসে
দু'লিয়ে ফুলের বন

আমি, করবো বুকে, মনের সুখে
বুক-জুড়ান ধন !
তোমার, মুখের পানে রব চেয়ে,
পড়বে ধারা চক্ষু বেয়ে ;
আপনা ভুলে ছুটে' লুটে'
পড়বো চরণে
চুমোর পরে আঁকবো চুমো
ও চাঁদ বয়ানে !

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন।

তুমি !

কল্পনা করিতে চাই ধ্যানের মাঝারে,
তোমার মূরতিখানি সদা মনে পড়ে ;
সেই সে প্রফুল্ল মুখ সেই মৃদু হাসি
কেবলি প্রাণের মাঝে উঠিতেছে ভাসি।
আকুল আবেগ ভরে যদি গাহি গান,
তোমারি বন্দনা সে যে গাহে মোর প্রাণ ;
কখন বিরলে বসি ভাবি কিছু যদি ;
মনে পড়ে সেই তব মধুমাখা স্মৃতি।
কহি যদি কোন কথা কাহারে কখন,
সে শুধু তোমারি কথা চিত্ত-বিনোদন।
থাকে যদি কোন দুঃখ বিরহ তোমার,
আর কোন ব্যথা নাই বেদনা আমার।
যদি থাকে জীবনের কোন সুখ আশা,
সে শুধু মিলন তব তব ভালবাসা।

শ্রীকানাই দেবশর্ম্মা।

বিশ্ব-সেবায় বিদ্যুৎ

বিদ্যুতের যথার্থ স্বরূপ কি তাহা বৈজ্ঞানিকেরা অদ্যাবধি অবগত নহেন। তাঁহারা বলেন যে, ইহার শক্তি ও কার্য্য দেখিয়া আমরা ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য। অধিকাংশ আধুনিক বৈজ্ঞানিকের মতে বিদ্যুৎ হচ্চে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী "ঈথার" নামক কাল্পনিক পদার্থবিশেষের কম্পন। আমরা এই সকল কূট-তত্ত্বের ভিতর প্রবেশ করিবার অধিকারী নহি। সুতরাং আমাদের স্থূল দৃষ্টির সমক্ষে বিদ্যুৎ ম্যালেরিয়ার পেটেণ্ট ঔষধের ন্যায় "ফলেন পরিচিয়তে" —"ব্যবহারেণ জ্ঞাতব্যম্।"

আজ পঁয়ত্রিশ বৎসর হইল বিলাতের "পঞ্চ্" নামক ব্যঙ্গ-পত্রে একটি চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। এই চিত্রে দুইজন মুকুটধারী পুরুষ —বাষ্পরাজ (King Steam) ও অঙ্গাররাজ (King Coal)—ঠেলাগাড়ীতে শয়ান "Storage"-মাইপোষ হইতে দুগ্ধপানরত শিশু-বিদ্যুতের প্রতি ভয়চকিতনেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া ইহার ভবিষ্যৎ অতি-বৃদ্ধির আশঙ্কা করিয়া পরস্পরে কাণাকাণি করিতেছে। বর্ত্তমানে এই শিশু যে কি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বিশ্বের কত দিকে কত কাজ করিতেছে তৎসম্বন্ধে নারায়ণের পাঠকদিগের নিকট সংক্ষেপে যৎকিঞ্চিত বিবৃত করাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বৈজ্ঞানিকদিগের সম্মোহন মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া বিদ্যুৎ যে বহুকাল হইতে দেশদেশান্তরে মানবের দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত আছে ইহা আমরা সকলেই জানি। এই বিশ্বদূতের গতিবিধির জন্য এতাবৎ ধাতুময় তারের পথ প্রস্তুত করিয়া দিতে হইত। বোধ হয় এই পথ এখন তাহার নিকট নিতান্ত পুরাতন ও বিরক্তিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া তিনি সম্প্রতি জলস্থলের ধাতব পথ প্রত্যাখ্যান করিয়া নিরালম্ব

ব্যোমপথে উড়িয়া দেশবিদেশে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছেন। মনে হয়, ভবিষ্যতে একদিন তারবিহীন টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়া বায়স্কোপের সহযোগে বিশ্বমানবকে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী করিয়া তুলিবে। তখন মুনিঋষিদিগের যোগবল বিজ্ঞানের অনুকম্পায় সাধারণের সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইবে।

বস্তুতঃ সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতে ব্যোমদেশই চপলার লীলাস্থল। কবি চিরদিন মেঘের ক্রোড়ে সৌদামিনীর ক্রিড়া বর্ণনা করিয়া আসিতেছেন। মেঘের সঙ্গে বিদ্যুতের কি সম্বন্ধ এবং সেখানে কোথা হইতে বিদ্যুৎ আসে, সেই তত্ত্ব নিরূপণ করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা দেখাইয়াছেন যে, ধাতব বা অন্যান্য কঠিন পদার্থের সঙ্গে বাষ্পকণা ও ধূলির সংঘর্ষে বিদ্যুতের উৎপত্তি হয়। ইঞ্জিনের বয়লার হইতে যখন বেগে বাষ্প বাহির হইতে থাকে তখন বিদ্যুতের সৃষ্টি হয়। ঐ বয়লারকে ইন্‌সুলেট্ করিলে, অর্থাৎ তাহা হইতে তড়িতের অদৃশ্য ভাবে অন্তর্দ্ধান নিবারণ করিতে পারিলে, তাহার গাত্র হইতে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ বা ইলেক্‌ট্রিক্ স্পার্ক পাওয়া যায়। ঝড়ের সময় ইজিপ্টের পিরামিডের সহিত বায়ুচালিত ধূলিরাশির সংঘর্ষে বিদ্যুতের সৃষ্টি হইতে দেখা গিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, এতাদৃশ কারণ হইতেই আকাশে মেঘের দেশে বিদ্যুতের উৎপত্তি হয়।

গগনে বজ্রনির্ঘোষাদি বৈদ্যুতিক উপদ্রবের পর বায়ুর অক্সিজেন্ শোধিত ও বায়ুমণ্ডল অপেক্ষাকৃত ধূলিশূন্য হয়, ইহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। শিলাবৃষ্টি, ঘূর্ণিবায়ু ও জলস্তম্ভের সঙ্গে বিদ্যুতের সম্ভবতঃ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া অনেক বিশেষজ্ঞ অনুমান করেন। যে দিন atmospheric electricity বা আকাশ-তড়িতের সকল হদিস্ মানুষের জ্ঞানগোচর হইবে সে দিন ঝড়বৃষ্টির আফিসের গণনা এখনকার অপেক্ষা অনেকটা সঠিক ও অভ্রান্ত হইয়া দাঁড়াইবে, এবং তখন বৈজ্ঞানিকেরা আকাশ-তড়িতের সাহায্যে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি

নিবারণ করিয়া ধরিত্রীকে ধনধান্যে পূর্ণ করিতে সক্ষম হইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

উত্তর দক্ষিণ মেরুপ্রদেশে অরোরা নামে যে সুবর্ণের ঝালরের ন্যায় আকাশে দোদুল্যমান স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোকজাল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা স্থিরা সৌদামিনীর এক বিচিত্র মূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডের উপর নিত্য অতিবেগে আবর্ত্তন করিতেছে বলিয়া বিশ্বব্যাপী তরল বায়ুমণ্ডল বিষুবরেখার নিকটে bulged বা স্ফীত হইয়া পড়িয়াছে; এবং তজ্জন্য উভয় মেরুপ্রদেশের বায়ু বিশেষ rarified বা পাতলা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই পাতলা বায়ুস্তরের ভিতর দিয়া পৃথিবীর বিদ্যুৎ বিচ্ছুরিত হইয়া অরোরার সৃষ্টি করে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে মণ্ডলাকারে সংরক্ষিত কতকগুলি কাচের পাইপের মধ্যে পাতলা বা rarified বায়ু পুরিয়া তাহাদের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চালিত করিলে ক্ষুদ্রাকারে কৃত্রিম অরোরা উৎপাদন করিতে পারা যায়। বন্ধনমুক্ত বিদ্যুৎ স্বাধীনভাবে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া জগতের কত স্থানে কত কাজ করিতেছে, কে তাহার গণনা করিবে?

কিন্তু মানুষ বর্ত্তমান যুগে এই উদ্দাম বিদ্যুদ্দামকে জ্ঞানবিজ্ঞানের বল্গার দ্বারা সংযত করিয়া তাহার দ্বারা অসংখ্য কলকারখানায় কুলি মজুরের কাজ করাইয়া লইতেছে। এখন ময়দার কলে, চট্‌কলে, ছাপাখানায়, এমন কি ধোবীখানায় পর্য্যন্ত চঞ্চলাকে মানুষের দাসীবৃত্তি করিতে হইতেছে। বিধাতাপুরুষ নিশ্চয়ই হতভাগিনীর কপালে তাহার জন্মদিনে লিখিয়া দিয়াছিলেন যে, কলিকালে তাহাকে এই সকল নীচ কাজ করিতে হইবে। কেবল তাহাই নহে; বিদ্যুৎ যে ট্রামকারে যোজিত হইয়া ঘোড়ার কাজ পর্য্যন্ত করিতেছে তাহা আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি। ইলেক্‌ট্রিক রেলওয়ের সঙ্গে ভারতবর্ষে আমাদের এখনও সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নাই। এককালে মনের দুঃখে কবি গাহিয়াছিলেন—"পর দীপমালা নগরে নগরে, তুমি যে

তিমিরে তুমি সে তিমিরে।” বোধ হয় তাঁহার আমলে উজ্জ্বল ইলেক্‌-ট্রিক লাইটের সৃষ্টি হয় নাই; এবং তাঁহার উষ্ণ মস্তিষ্ক শীতল করিবার জন্য তখন বৈদ্যুতিক পাখাও ছিল না।

অদ্যাবধি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ বিদ্যুৎকে বন্দুক কামানের ন্যায় শত্রুনিধনকারী অস্ত্রে পরিণত করিতে পারেন নাই। বোধ হয় মানব-সভ্যতা আরও উচ্চ ডিগ্রীতে উঠিলে ইহাও সম্ভব হইবে। সত্যযুগে স্বর্গের দেবগণ যখন বিদ্যুৎকে বিশ্ববিধ্বংসী কুলিশাস্ত্রে পরিণত করিতে পারিয়াছিলেন, তখন কলিযুগে মর্ত্তের ভূদেবগণ কেন যে তাহা না পারিবেন তাহা বুঝিতে পারি না। বৃত্রাসুর বধের সময় এই বৈদ্যু-তিকাস্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল বটে; কিন্তু তাহা তদবধি আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং আজও তাহা সময়ে সময়ে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া স্থাবর জঙ্গমকে নির্ম্মমভাবে দগ্ধ করিতেছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ ইহার দৌরাত্ম্য নিবারণের জন্য lightning conductor নামে এক প্রকার ধাতুনির্ম্মিত শিক আবিষ্কার করিয়াছেন। কোনও প্রাসা-দের গায়ে এই শিক লাগানো থাকিলে বজ্রপাতের বিদ্যুৎ তাহা ধরিয়া বিনা উপদ্রবে ভূগর্ভে চলিয়া যায়—তাহাতেই প্রাসাদ রক্ষা পায়। সম্ভবতঃ মানুষেও এইরূপ একটি ধাতুর শিক হাতে করিয়া বেড়াইলে বজ্রাঘাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে। এ ব্যবস্থা যে কেবল আমি একা করিতেছি তাহা নহে। শুনিয়াছি অশেষবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া এক রোগী প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার মহেন্দ্র-লাল সরকারের কাছে গিয়াছিল। ডাক্তারবাবু তাহার দেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—“বাপু হে, যত কিছু উৎকট ব্যাধি আছে, তাহা সমস্তই তোমার হইয়াছে; কেবল তোমার মাথায় এখনও বাজ পড়িতে বাকি আছে। অতএব তুমি একটি তামার শিক হাতে করিয়া বেড়াইবে। তোমার জন্য ইহাই আমার প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌।”

তবে বজ্রাঘাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মানুষের পক্ষে আর এক উপায় করিলেও চলে। একটি বাস্তব ঘটনার উল্লেখ করি-

তেছি; তাহা হইতে এই উপায় কি তাহা জানা যাইবে। বিলাতে টাইন্ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসে একটি লোক কাজ করিত। সে কর্ম্ম-স্থল হইতে বাটী আসিবার সময় ঝড়বৃষ্টিতে পড়ে। তাহার উপরে বজ্রপাত হয়। তাহার টুপি ও মোজা ছিঁড়িয়া পুড়িয়া গিয়াছিল। তাহার পকেটে যে সকল ধাতুমুদ্রা ছিল তাহাও গলিয়া জমিয়া গিয়াছিল। তাহার ঘড়ী ও চেইনেরও ঐ দশা হইয়াছিল। তাহাকে হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। কয়েকদিনের চিকিৎসায় লোকটি বাঁচিয়া গেল। ডাক্তারদিগের মতে তাহার ভিজা কাপড়-চোপড়ই তাহাকে বাঁচাইয়া দিয়াছিল। ভিজা কাপড় লাইটনিং কণ্ডাক্-টরের কাজ করে। বজ্রপাতের বিদ্যুৎ এই ভিজা কাপড় বাহিয়া মৃত্তিকাতে প্রবেশ করিয়াছিল—তাহার দেহের কোন মারাত্মক অনিষ্ট করে নাই।

বিদ্যুতের সাহায্যে যাহাতে সত্বর বিনা আয়াসে বড়লোক হওয়া যায়, তাহারও চেষ্টা হইতেছে। কোনও কোনও উল্কাপিণ্ডের ভূপতিত দগ্ধাবশিষ্ট অংশের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরককণা পাওয়া গিয়াছে। তাহা দেখিয়া কোন কোন রসায়নশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত স্থির করেন যে প্রচণ্ড উত্তাপ ও চাপের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে হীরক প্রস্তুত করা যাইতে পারিবে। বহু গবেষণা ও পরীক্ষার ফলে তাঁহারা বিদ্যুতের সাহায্যে ফারণ্‌হীটের ৫০০০ ডিগ্রী উত্তাপের দ্বারা এলুমিনা নামক মৃত্তিকা হইতে রক্তবর্ণ রুবি বা চুণী, এবং অঙ্গার হইতে হীরক প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু এই পরীক্ষা হইতে এ পর্য্যন্ত লাভবান ব্যবসা করিবার উপযোগী ফল পাওয়া যায় নাই; ভবিষ্যতে পাইবার আশা আছে।

এতদ্ব্যতিরেকে সভ্য জগতে বিদ্যুৎকে দিয়া ইদানীং অনেক প্রকার হাল্কা কাজও করাইয়া লওয়া হইতেছে। ইলেক্ট্রিক্ Bell বা ঘণ্টা অনেকেই দেখিয়াছেন। চোর ধরিবার জন্য ঘরের দর-জার সঙ্গে এই ঘণ্টার তারের এরূপ যোগ রাখা হয় যে, চোরে ঐ

দরজা খুলিবামাত্র ঘণ্টা বাজিয়া উঠে। ইহাতে ঘরের লোক জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে। বাগানের hot houseএ থার্ম্মিটারের পারদস্তম্ভের সহিত ইলেক্‌ট্রিক বেল্‌-এর তারের এরূপ যোগ রাখা হয় যে, সেখানে আবশ্যকীয় তাপের উৎপত্তি হইলে ঘণ্টা আপনাআপনি বাজিয়া উঠিয়া মালীকে সতর্ক করিয়া দেয়। সম্প্রতি কলিকাতার সর্ব্বত্র fire-alarm বা অগ্নিদাহের সংবাদ দিবার সাঙ্কেতিক উপায় সংরক্ষিত হইয়াছে। ইহার সাহায্যে কোন স্থানে আগুন লাগিলে সত্বর Fire-Brigadeকে সংবাদ দেওয়া হয়। বিদ্যুতের সাহায্যে একটি ঘড়ীর দ্বারা নানাস্থানের ইলেক্‌ট্রিক ডায়েলের কাঁটা যথাযথ রূপে পরিচালিত করা যায়। ইহাতে একটি ঘড়ীর দ্বারা বহু ঘড়ীর কাজ করা সম্ভব হয়। বিদ্যুতের সাহায্যে এক সেকেণ্ডের পাঁচ হাজার ভাগের এক ভাগকেও মাপিতে পারা যায়। সুতরাং এখন ঝড় বায়ু ও বন্দুকের গুলির গতির বেগ নির্দ্ধারণ করা আর দুরূহ নহে। রেলওয়ের ডিষ্ট্যাণ্ট্‌ সিগ্‌ন্যালের পাখাকে বৈদ্যুতিক উপায়ে বিনা ভুলভ্রান্তিতে উঠানো নামানো হইয়া থাকে। এবং দ্রুতগামী ইঞ্জিনের ড্রাইভারকে বিদ্যুতের সাহায্যে নির্ব্বিঘ্নে "লাইন্‌ ক্লিয়ার" দেওয়া হয়। এরূপ একপ্রকার বৈদ্যুতিক চেয়ার আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহাতে বসিয়া থাকিলে জাহাজে সমুদ্রযাত্রার সময় sea-sickness বা বমনরোগ নিবারিত হয়। এমন বৈদ্যুতিক ল্যাম্প প্রস্তুত হইয়াছে, যাহা লইয়া খনির মধ্যে কাজ করিলে কিছুতেই খনিতে আগুন লাগিবার আশঙ্কা থাকে না। সমুদ্রে ভীষণ তুফানের সময় জাহাজকে টলিতে না দিয়া ঠিক রাখিবার জন্য এক প্রকার আশ্চর্য্য বৈদ্যুতিক উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। জঙ্গলের বড় বড় গাছ কাটিবার জন্য এখন আর কুঠার ও করাতের প্রয়োজন হয় না; ইলেক্‌ট্রিক তারের দ্বারা "কটারাইজ্‌" করিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাঁচা গাছ অতি সহজে কাটা যায়। বিদ্যুৎকে আজকাল কৃষি-কার্য্যেও প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত করা হইয়াছে। ইহার

সাহায্যে বীজ হইতে সহজে অঙ্কুরোদগম হয়, এবং চারা গাছ-গুলি শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হইয়া প্রচুর ফল-শস্য প্রদান করে। বিদ্যুতের অন্যান্য তথ্য ও রোগ চিকিৎসার ব্যাপারে তাহা যে কত কাজ করিতেছে তাহা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বলিবার বাসনা রহিল।

শ্রীহরিদাস হালদার।

বৈষ্ণব

১

মোদের হরি বংশীধারী, মোদের হরি মাখনচোরা
যুগলরূপের উপাসী গো, পিপাসী সে রূপের মোরা।
স্মরণে তার পরশ মধু, নামে ঝরে পীযূষ ধারা,
মুগ্ধ মোদের মানস বধূ পেয়ে তাহার বাঁশীর সাড়া।
কোথায় কুরুক্ষেত্রে কোথা, গভীর 'পাঞ্চজন্য' বাজে,
গাণ্ডীবেরি টঙ্কারেতে, দলে দলে সৈন্য সাজে,
আমরা তাহার ধার ধারিনে, খুঁজি কোথায় তমাল ছায়ে,
মিশেছে রাই কণক লতা কল্পতরু শ্যামের গায়ে।

২

বিজ্ঞান জ্ঞান তোমরা লহ শাস' বরুণ প্রভঞ্জনে
তুচ্ছ কর বিশ্বনাথে দর্পহারী নিরঞ্জনে।
জ্ঞান তাহারে মিলিয়ে দেবে, প্রমাণ তারে আনবে কাছে
এমন দারুণ তুষ্ট আশায় বৈষ্ণবেরি প্রাণ কি বাঁচে?

চাইনে মোরা শক্তি ওগো ভক্তিভরে ডাকবো তারে
প্রণয়ী সে রাখাল-রাজা দূরে কি আর থাক্‌তে পারে ?
মগ্ন র'ব সে রূপ ধ্যানে মনে মনে গাঁথবো মালা
আসবে হৃদয়কুঞ্জে ওগো আসবে মোদের চিকণ কালা।

৩

আমরা ভীরু আমরা ভীত মর্য্যাদাজ্ঞান নাইক মনে
ক্ষুদ্র শুধু চাইগো ধরা ঢাক্‌তে প্রেমের আচ্ছাদনে।
যুদ্ধ করো শত্রু নাশ' কাঁপাও ধরা গর্জ্জনেতে।
আনন্দ পাই আমরা ত্যাগে শান্তি যে পাই বর্জ্জনেতে।
রঙ্‌ মেখে তোমরা নাচ, টলাও ভারে বসুন্ধরা
প্রীতির ফাগ্‌ ও কুঙ্কুমেতে হোলি খেলাই খেল্‌ব মোরা।
দাও দেবে দাও টিট্‌কারী গো নিত্য রটাও নূতন কথা,
নিবিড় মিলন আনন্দেতে ভুল্‌বো মোরা সকল ব্যথা।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

মহারাজা রাজবল্লভের জমিদারীর পরিণাম

১৭২৮ খৃঃ অব্দে সুজাখাঁর বন্দোবস্তকালে আমরা সর্ব্বপ্রথম রাজবল্লভের জমিদারীর সূত্রপাত দেখিতে পাই *। এদিকে কিন্তু ১৭৯৯ খ্রীঃ অব্দেই দেখা যায়, ঐ সম্পত্তির বিলোপ সাধিত হইতে বসিয়াছে। মধ্যবর্ত্তী এই সপ্ততি বৎসর মধ্যেই কিরূপ উজ্জ্বল প্রতিভায় উদ্ভাসিত হইয়া, রাজনগরের রাজশ্রী ধ্বংসের পথে উপনীত হইল তৎপ্রদর্শন করাই এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য।

১৭৬৩ খ্রীঃ অব্দে নবাব মীরকাসেম আলী খাঁ কর্ত্তৃক মহারাজা রাজবল্লভ ও তদীয় দ্বিতীয় পুত্র রাজা কৃষ্ণদাস বাহাদুর নিহত হইলে, মহারাজের তৃতীয় পুত্র রাজা গঙ্গাদাসের উপরে বিষয় সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার পতিত হইল। এই সময়ে ইংরেজ কুঠিয়ালগণ তদীয় জমিদারী বোজের গোউমেদপুর মধ্যে যেরূপ অত্যাচার করিতেছিলেন, তাহার মূলকারণসম্বলিত যে আবেদনপত্র রাজপক্ষ হইতে জনৈক উকীল কর্ত্তৃক গবর্ণমেণ্ট নিকট উপস্থিত করা হয়, উহা সদাশয় বিভারেজ সাহেব তদীয় বাখরগঞ্জের ইতিহাসে সন্নিবেশ করিয়া গিয়াছেন। রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াই গঙ্গাদাসকে এইরূপ অনর্থ ঘটনায় পতিত হইতে হয়। তিনি এই কারণে এত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন যে, ঐ পরগণা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর মনে করেন, কিন্তু জপসাবাসী জ্ঞাতি ভ্রাতা লালা রামপ্রসাদ ও শ্রীনগরবাসী লালা কীর্ত্তিনারায়ণের নানাবিধ প্রবোধ বচনে এই কার্য্য হইতে বিরত থাকিয়া গবর্ণমেণ্ট সমীপে আবেদনপত্র প্রদান

---

* ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পঞ্চম রিপোর্টে, ঢাকা নেয়াবতী দেখ। এই সময়ে রাজনগর পরগণার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়।

করিতে বাধ্য হন।* বলা বাহুল্য তাঁহাদের আবেদনে সুফল ফলিয়াছিল।

এই ঘটনার অল্পকাল পরেই গঙ্গাদাসের মৃত্যু ঘটে। তখন রাজ-সংসারের পরিচালনার ভার, রাজবল্লভের পঞ্চম পুত্র রায় গোপালকৃষ্ণের উপর অর্পিত হয়। রাজবল্লভের যথাক্রমে সাতটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে প্রথম পুত্র দেওয়ান রামদাস ও চতুর্থ পুত্র রায় রতনকৃষ্ণ, পিতা বর্ত্তমানেই অকালে কালকবলিত হন। এই জন্য পঞ্চম পুত্র রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

রায় গোপালকৃষ্ণ অতি তেজস্বী ও বুদ্ধিমান পুরুষ ছিলেন। তিনি কর্ম্মচারীগণের হস্তের ক্রিয়াপুত্তলী ছিলেন না, স্বয়ংই সমুদয় কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। রাজবল্লভ বহু বিষয় সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া যান বটে, কিন্তু তৎসমুদয়ের সুশৃঙ্খলা বিধান করিয়া যাইতে পারেন নাই। তৎসমুদয় উদ্ধারের ভার গোপালকৃষ্ণের উপর পতিত হইল। স্বকীয় প্রতিভাবলে তিনি ঐ সকল বিঘ্ন-বিপত্তি অনায়াসে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন।

---

* এই আবেদন-পত্রের সার মর্ম্ম এই যে কুঠিয়াল সাহেবেরা জমিদারের অনুমতি ব্যতীতই পরগণার নানাস্থানে তাফাল (লবণ প্রস্তুত করার চুল্লী) প্রস্তুত করিত; তজ্জন্য জমিদারের অনুমতি লওয়া দূরে থাকুক, বরং স্থানীয় নায়েব প্রভৃতি কর্ম্মচারীগণকে পীড়ন করিত। কোন কোন কুঠিয়াল, তাহাদের দ্রব্যাদি চুরি হইয়াছে বলিয়া জমিদারের কাছে ক্ষতিপূরণ চাহিত, না পাইলে পিয়ন পাঠাইয়া কর্ম্মচারীগণকে আটক করিতে চাহিত, এবং পিয়নের খরচ দৈনিক একটাকা হিসাবে আদায় করিয়া লইত। জমিদারের প্রজারা কুঠি-য়ালগণের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, আর খাজনা দেওয়া আবশ্যক মনে করিত না। তাফালে কর্ম্ম করার জন্য, লোক ধরিয়া সুন্দরবনে পাঠাইয়া দিয়া, অর্দ্ধ বেতনে বিদায় করা হইত। এতন্মধ্যে ডবিন নামে একজন কুঠিয়াল সম্বন্ধে আরও নানাবিধ অত্যাচারের কথা শুনা যায়।

(বিভারেজ-কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাস ৯৫ পৃষ্ঠা)

পূর্ব্বে বোজের গোউমেদপুর পরগণা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, কুঠিয়াল সাহেবগণের সহিত কতক প্রজা যোগদান করিয়া খাজনা দেওয়া আবশ্যক মনে করিত না। পরে উহারা এরূপ হইয়া দাঁড়াইল যে জমিদারের প্রতিকূলে অভ্যুত্থান করিয়া কর দেওয়া বন্ধ করে। রাজপক্ষ যখন তাহাদিগকে কোন মতেই স্ববশে আনিতে পারিলেন না তখন কতিপয় পর্টুগীজকে সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, বোজের গোউমেদপুরে সংস্থাপন করেন। এই বিদ্রোহ নিবারিত হইলে পরও ঐ সকল পর্টুগীজেরা সপরিবারে তথায় বাস করিতে থাকে, এই জন্য রাজপক্ষ হইতে তাহাদিগকে প্রচুর ভূবৃত্তি ও তালুক প্রদত্ত হয়—যাহা অত্যাপি তাহাদের বংশীয়েরা পাদ্রীয়ান তালুক নামে ভোগ করিতেছে। উহারা যে স্থানে বাস করে, উহা পাদ্রীশিবপুর নামে প্রসিদ্ধ।

কার্ত্তিকপুর পরগণা রাজসরকারের ক্রয় করা হইলেও তত্রত্য মুন্সী চৌধুরীগণ উহার স্বত্ব-দখল রাজপক্ষকে দিতেছিলেন না। রায় গোপালকৃষ্ণ বহু লাঠিয়াল ও হিন্দুস্থানী সৈন্য প্রেরণ করিয়া, চৌধুরী পক্ষের অস্ত্রধারী জনসঙ্ঘের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ বাধাইয়া দেন; উহাতে উভয় পক্ষে প্রায় সহস্র মানবের শোণিতপাত ও বিনাশের সহিত উক্ত পরগণা রাজপক্ষের হস্তগত হয়। উপরি উক্ত দুইটি ঘটনার ফল দেখিয়া আর কেহই রাজনগরের রাজগণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহসী হন নাই।

তৎকালে নিম্নলিখিত পরগণাগুলি ও বহু তালুক রাজসম্পত্তির অন্তর্গত ছিল। রাজনগর, কার্ত্তিকপুর, বোজের গোউমেদপুর, লক্ষীরূদিয়া ও আমিরাবাদ প্রভৃতি পরগণা। বিক্রমপুর ও জালালপুর মধ্যে বহু তালুক। উত্তর সাহাবাজপুর পরগণার কতকাংশও এই জমিদারীভুক্ত ছিল।

পরগণে সেলিমাবাদের সাড়ে এগার আনা অংশ রাজবল্লভের হস্তগত হয় বটে, কিন্তু উহার মালিকান স্বত্ব তাঁহার ছিল না, কেবল

আদায় তহশীলের ভার তৎপ্রতি অর্পিত হয়, এইজন্য তাঁহাকে জিম্বাদার বলা হইত। কারণ ১৭৫২ খ্রীঃ অব্দে আগাবাখরের মৃত্যু হইলে ঐ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়া রাজবল্লভের হস্তগত হয় *। আগাবাখর বোজের গোউমেদপুরের জমিদার ছিলেন বটে, কিন্তু সেলিমাবাদেরই জিম্বাদার ছিলেন, কাজেই রাজবল্লভও তদ্রূপ ভাবেই উহা প্রাপ্ত হন। সেলিমাবাদের ভূতপূর্ব্ব মালিকগণ এই কারণে, ভূকৈলাশের জমিদারগণের পূর্ব্বপুরুষ গোকুলচাঁদ ঘোষালের সহায়তায় ঐ সম্পত্তির উদ্ধার সাধন করিতে সমর্থ হন।

সমগ্র জমিদারী ও তালুক প্রভৃতির সদর রাজস্ব দিয়া উহার নয় লক্ষ টাকা আয় দাড়াইয়াছিল। যতদিন পর্য্যন্ত রায় গোপালকৃষ্ণ জীবিত ছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত এই নয়লক্ষ জমিদারীর কোনরূপ অপচয় সংঘটিত হয় নাই। কিন্তু উহা নষ্ট হইবার সূত্রপাত তাহা হইতে হইয়াছিল বলিয়াই অনুমিত হয়।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে রাজবল্লভের প্রথম পুত্র রামদাস ও চতুর্থ পুত্র রতনকৃষ্ণ পিতা বর্ত্তমানেই লোকান্তরিত হন। তাঁহারা দুইটি দত্তক পুত্র রাখিয়া যান। গোপালকৃষ্ণ এই দুই দত্তককে সম্পত্তির অংশ প্রদান না করিয়া অপর পাঁচ ভ্রাতার নামে স্বয়ং জমিদারী পরিচালনা করিতে থাকেন। মিঃ টমসন এই জন্য গোপালকৃষ্ণকে রাজসম্পত্তির ম্যানাজার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।†

যেকাল পর্য্যন্ত দুষ্ট সরস্বতীর বশবর্ত্তী না হইয়া, গোপালকৃষ্ণ নিরপেক্ষভাবে জমিদারীর কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন, ততদিন

(*) আগাবাখর সেলিমাবাদেরও ওয়াধাদার ছিলেন। (বিভারেজ-কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাস ১৫৬ পৃঃ)

রাজবল্লভ সেলিমাবাদ পরগণার ওয়াধাদার (জিম্বাদার) ছিলেন। ঐ ইতিহাস ১০৮।৯ পৃষ্ঠা।

(†) বিভারেজ-কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাস ১০০ পৃষ্ঠা।

পর্য্যন্ত কোনরূপ গোলযোগের আবির্ভাব না হইয়া সুশৃঙ্খলার সহিত, জমিদারীর কার্য্য চলিয়া রাজসংসারের উন্নতি সাধিত হইতেছিল। এই সময়ে গোপালকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রাজনগরের সুপ্রসিদ্ধ একুশ রত্ন মন্দিরটি নির্ম্মিত হয়। এভাব কিন্তু আর অধিককাল স্থায়ী থাকিল না, কারণ গোপালকৃষ্ণ পুত্রস্নেহে এইরূপ মুগ্ধ হইলেন যে, হাওলা ও তালুক প্রভৃতি নানাশ্রেণীর প্রবর্ত্তন করিয়া সম্পত্তি হইতে প্রায় অর্দ্ধাংশ ছলনাক্রমে পুত্র পিতাম্বর সেনের নামে পৃথক্ করিয়া লইলেন।

অপর চারি অংশীদারগণ মধ্যে এই সময়ে যাঁহারা জীবিত ছিলেন, তন্মধ্যে রাজা গঙ্গাদাসের পুত্র কালীশঙ্কর সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতেন। তিনি পিতৃব্যের এই আচরণে নিতান্ত ক্ষুন্ন হইয়া, অন্যান্য অংশীগণসহ, এই বিষয়ের মীমাংসা জন্য গোপালকৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হইলেন। গোপালকৃষ্ণ তাহাদের কথা শুনা দূরে থাকুক কোন প্রকার আপ্যায়িত করাও আবশ্যক মনে করিলেন না। তখন তাহারা অনোন্যপায় হইয়া, জমিদারী বণ্টন জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিলেন। গোপালকৃষ্ণ তৎবিরুদ্ধে বহুচেষ্টা করিলেও ১৭৮২ খ্রীঃ অব্দে বাঁটোয়ারার অনুমতি প্রদত্ত হয়। পুনরায় আপিল হইল বটে, কিন্তু ১৭৮৭ খ্রীঃ অব্দে উহা অগ্রাহ্য হইয়া গোপালকৃষ্ণের পরাজয় সাধিত হইল। তবে আর তাঁহাকে এজন্য অধিক ভাবনা ভাবিতে হইল না। সেই বৎসর (বাঙ্গলা ১১৯৪ সনে) গোপালকৃষ্ণ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া সর্ব্ব চিন্তার দায় হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিলেন। তিনি বর্ত্তমান থাকা পর্য্যন্ত, রাজনগরের জমিদারীর কোন অংশই হস্তচ্যুত হইতে পারিয়াছিল না।

১৭৯০ খৃঃ অব্দে জমিদারী বাঁটোয়ারার জন্য টমসন সাহেব অনুমতি প্রাপ্ত হন। ১৭৯১ খৃঃ অব্দে তাহাকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে দেখা যায়। টমসন বাঁটোয়ারা আরম্ভ করিয়া দিতেই,

রাজবল্লভের স্ত্রীগণ ও প্রথম এবং চতুর্থ পুত্রের দত্তক পুত্রদ্বয় মাসহারার দাবীতে এক এক দরখাস্ত উপস্থিত করেন। উহাতে স্থির হয় তিন রাণী প্রত্যেকে এক শত করিয়া তিন শত ও দত্তকদ্বয় এক শত করিয়া দুই শত মোট পাঁচ শত টাকা মাসিক রাজসম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত হইবেন। পাছে জমিদারীর মালিকগণ হইতে এই টাকা পাইতে বেগ পাইতে হয় এজন্য টমসন সাহেব উহা সদর রাজস্বের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বাৎসরিক ছয় সহস্র টাকা, জমিদারগণের প্রতি অতিরিক্ত কর ধার্য্য করিয়া লন। মাসহারা প্রাপকেরা ঐ টাকা গবর্ণমেণ্ট হইতেই বরাবর পাইবেন এই নিয়ম স্থির হয় *। এতদ্ভিন্ন টমসন সাহেব জমিদারীর সদর রাজস্ব বহুপরিমাণে বর্দ্ধিত করেন। উহাতে রাজসন্তান বাদী প্রতিবাদী সকলেই একমত হইয়া টমসনের বিরুদ্ধে অভিমত প্রদান করিতে লাগিলেন। ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে তাহাদের পক্ষ হইতে রাজস্ব বর্দ্ধনজনিত কষ্টের কথা বর্ণনা করিয়া এক দরখাস্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করা হয়। গবর্ণমেণ্ট সার ইলাইজা ইম্পের উপর উহার বিবেচনার ভার অর্পণ করেন। এতৎ সম্বন্ধে, ইম্পে সাহেব যাহা করেন উহাও বিভারেজের ইতিহাসে উল্লেখ আছে; তৎসম্বন্ধীয় চিঠীগুলি আর এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম না। ফলে কর-ভার হইতে তাঁহারা আর অব্যাহতি লাভ করিতে পারিলেন না।

এদিকে বাঁটোয়ারার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াও পরে জলপ্লাবন হেতু জমিদারীর দুর্দ্দশা হওয়ায়, জমিদারগণ একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়েন। ডে সাহেব জলপ্লাবনঘটিত প্রজার দুরাবস্থার কথা গবর্ণমেণ্টকে পরিজ্ঞাত করাতেও কোন ফল ফলিল না। বর্দ্ধিত হারের

* রাণীগণের মৃত্যুর পর তাঁহাদের মাসহারা বাজেয়াপ্ত হয়, কিন্তু অপর দুই জনের বংশধরগণ অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়াও উহা প্রাপ্ত হইতেছে না।

করসহ বাকী টাকার জন্য পরওয়ানা জারী হইল; গবর্ণমেণ্ট দাবী করিলেন কিন্তু জমিদারগণ উহা আদায় করিতে সমর্থ হইলেন না। কাজেই তৎকালের নিয়মানুসারে উহা নিলামে উঠিল।

এইকালে মসিসাহেব ঢাকার কালেক্টর ছিলেন। তিনি তিন দিবস পর্য্যন্ত ঐ মহাল নিলামে উঠাইলেও কোন ক্রেতা উপস্থিত হইল না। তখন গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে মাত্র এক টাকা মূল্যে উহা ক্রয় করিয়া লন। বাকী রাজস্বের জন্য জমিদারীর নীচস্থ বহু তালুক যাহা রাজাদের দখলে ছিল উহা নিলাম করাইয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে খাস করিয়া লওয়া হয়। বর্ত্তমান সময়ে তৎকালীন ধার্য্য করের উপরে বোজের গোউমেদপুরের আয় প্রায় দুই লক্ষের উপর দাঁড়াইয়াছে।

এইরূপে আত্মকলহে লিপ্ত হইয়া তাঁহারা প্রায় সর্ব্বস্বই হারাইলেন এবং ইহা হইতেই মূল অধিকারীগণের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় একেবারে চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া গেল। *

সর্ব্বোপরি আত্মকলহই মহারাজা রাজবল্লভের অতুল সম্পত্তি নাশের কারণ হইয়াছিল; আমরা এতৎ সম্বন্ধে অধিক লিখিতে সক্ষম হইলাম না, তবে যাঁহারা বিশেষ বিবরণ অবগত হইতে বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা মিঃ বিভারেজ-কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাসের অন্তর্গত পরগণে বোজের গোউমেদপুরের বিবরণ পাঠ করিলেই সম্যক পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীআনন্দনাথ রায়।

---

* জমিদারী না থাকিলেও বহু নিম্নস্থ তালুকের আয় দ্বারা তাহাদের একরূপ চলিয়া যাইত।

নিঃশ্রেয়স

[রবার্ট ব্রাউনিং]

ক্ষুদ্র এক মধুচক্রে সারা বসন্তের
শোভাস্মৃতিসুখ ;
সিন্ধুর প্রশান্তি কান্তি স্বচ্ছ মুকুতার
ভরা ক্ষুদ্র বুক ;
খনিগর্ভে ধরে সব গৌরব বিভব
হীরা একটুক ;
শোভা- স্মৃতি, শান্তি কান্তি, বিভব গৌরব,
এ সবার 'পরে—
হীরকের চেয়ে শুভ্র—সত্য সমুজ্জ্বল,
মুকুতার চেয়ে স্বচ্ছ—বিশ্বাস সরল,
পুষ্পমধু চেয়ে মিষ্ট—স্নেহ সুকোমল,
রয়েছে আমার তরে সজ্জিত ও থরে থরে
ক্ষুদ্র বালিকার এক প্রস্ফুট অধরে !

শ্রীসুশীলকুমার দে ।

অপূর্ব্ব দীক্ষা

[গল্প]

এম, এ, পাশ করিবার পর কয়বৎসর নিজের প্রশংসা শুনিতে শুনিতেই কাটিয়া গেল—আর বিশেষ কোনও কাজ হইল না। জমিদারের ছেলে একটি অকাল কুষ্মাণ্ড না হইয়া যে লেখাপড়া ক'রে মানুষ হয়ে চরিত্রবান হয়, এ দৃশ্য আমাদের দেশের লোকের চক্ষে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্য! একে অল্প বয়স, তাহাতে সকলেই অত্যন্ত প্রশংসা করিতেছে, কাজেই আমার মনে মনে যে বেশ একটুকু অহঙ্কার না হইয়াছিল এমন কথা বলিতে পারি না।

এই সময় বরাবর একদিন আমাদের জেলার একজন বড় ব্রাহ্মণ জমিদারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। জমিদার-পুঙ্গব বাল্যে অনেক নিরীহ প্রাইভেট শিক্ষকের নানারূপ লাঞ্ছনা করিয়া যেটুকু বিদ্যা আদায় করিয়া লইয়াছিলেন তাহার বলে তিনি সময়ে এবং অসময়ে ইংরেজী ভাষার শ্রাদ্ধক্রিয়া সুসম্পন্ন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। ইহা ছাড়া তাঁহার ইংরেজী বিদ্যার আরও দু'একটা প্রমাণ ছিল—যথা মনুনিষিদ্ধ পশুপক্ষী ভক্ষণ, পাঁচ ইয়ারে মিলিয়া পরস্পরের স্বাস্থ্যপান ইত্যাদি। এক কথায় নব্যতন্ত্র-সম্মত প্রণালীতে পঞ্চমকার সাধন। তবে তাঁহার ইংরেজী বিদ্যা সত্তেও জমিদারীতে গরীব প্রজার উপর অত্যাচার তাঁহার বাপদাদার আমলেও যেরূপ ছিল তাঁহার আমলেও সেইরূপ চলিয়া আসিতেছিল। জমিদার বাবুকে মহারাজ বলিয়া ডাকিতে হইত। সেদিন এক বন্ধু বলিলেন, মহারাজ সম্প্রতি কুভোজন ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কারণ ডিস্পেপ্‌সিয়া না ডায়াবিটিস্ তাহা তিনি ঠিক বলিতে পারিলেন না। আমি দেখা করিতে গিয়াছিলাম সকাল বেলা। একজন

কর্ম্মচারী বলিল, "মহারাজ এখন আহ্নিক করছেন শীঘ্রই আসিবেন, আপনি একটু বসুন।" শুনিয়া মনে মনে হাসিলাম; মহারাজের এতটা নিষ্ঠা কবে থেকে হ'ল? বৈঠকখানায় দেখিলাম কয়েকটি অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহারাজের অপেক্ষায় কে জানে কতক্ষণ বসিয়া আছেন।

মহারাজ আসিয়াই আমার সহিত সেকহাণ্ড করিয়া কথাবার্ত্তা জুড়িয়া দিলেন, পণ্ডিত মহাশয়গণ কথা বলিবার সুযোগের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। এ-কথা ও-কথার পর বিলাতযাত্রার কথা উঠিল। মহারাজ বলিলেন, "ব্রাহ্মণ যদি বিলাত যায় তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিলেও তাহাকে জাতিচ্যুত হইতে হইবে।"

আমি বলিলাম, "কৈ শাস্ত্রে ত কোথাও সমুদ্রগমনকে এত বড় একটা মহাপাতক বলে লিখ্ছে না যে তার প্রায়শ্চিত্ত হয় না।"

একজন পণ্ডিত মহাশয় টিকি নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ, হাঁ, সমুদ্রগমনটা তত বড় পাপ নয় বটে, কিন্তু যদ্যপি কেহ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করে' জ্ঞাতসারে বহুবার অভক্ষ্য ভক্ষণ করে, তাহ'লে তার আর প্রায়শ্চিত্তের অধিকার থাকে না। ইহাই শাস্ত্রের আদেশ।"

আমি আর থাকিতে পারিলাম না—উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিলাম, "পণ্ডিত মহাশয়, আপনার শাস্ত্রের আদেশ আমরা দেশশুদ্ধ লোক মানিয়া লইতেছি কিন্তু আপনি নিজের বুকে হাত দিয়া বলুন দেখি, যে সকল ব্রাহ্মণ বিলাত না গিয়া এখানেই অভক্ষ্যভক্ষণ করিতেছেন আপনি কি তাঁহাদের জাতিচ্যুত বিবেচনা করেন? আপনি বলবেন তাঁহারা লুকাইয়া খায়, কিন্তু দেখুন নিজের বিবেককে ফাঁকি দিবেন না। তাহারা যে এ সব খায় তাহা আমিও জানি, আপনিও জানেন, আর পাঁচ জনেও জানে। তবে ধনীলোক, আর সময়ে অসময়ে আপনাদের দু'দশ টাকা সাহায্য করেন, কাজেই আপনারা দেখিয়াও দেখেন না।"

আমার বক্তৃতাটি শেষ করিয়া একবার বিজয়ী বীরের ন্যায় পর্যু্যদস্ত পণ্ডিতগণের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাঁহারা মাথা চুলকাইতেছেন। তখন ইহাতে বড় আমোদ হইয়াছিল। এখন কিন্তু মনে হয় কাজটা ভাল করি নাই। দরিদ্র ভদ্রলোক পেটের দায়ে যে সকল অপকর্ম্ম করিতে বাধ্য হন, তাহার জন্য তাহাদের মনে কষ্ট দেওয়া সদয় হৃদয়ের লক্ষণ নয়। কিন্তু সদ্য এম, এ, পাশের গৌরবে তখন আমার মেজাজ অত্যধিক উষ্ণ।

এইখানে আর একটি কথা বলিয়া রাখি। বিলাতযাত্রার উপর মহারাজের খড়্গহস্ত হইবার একটু গূঢ় কারণ ছিল। আমাদের জেলার একটি ব্রাহ্মণ জমিদারের সঙ্গে মহারাজের পুরুষানুক্রমে রেষারিষী ছিল। এখন সেই জমিদারটী ছেলেকে বিলাত পাঠাইয়াছিলেন। এই সূত্রে তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিয়া নিজেকে একচ্ছত্রী সমাজপতিপদে উন্নীত করিবার আশাতেই আমাদের মহারাজ বিলাতযাত্রার বিরুদ্ধে এক আন্দোলনের সূচনা করেন—নহিলে তাঁহার আহার-বিহার দেখিয়ে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি প্রবল নিষ্ঠার পরিচয় সকল সময় পাওয়া যাইত না।

আমার বক্তৃতার আর একটি ফল এই হইল যে, মহারাজের মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "সত্যেন বাবু, আপনি চটেন কেন? পণ্ডিত মহাশয় বলছেন ব্রাহ্মণই জাতে উঠতে পারবে—আপনারা না। বিলাত থেকে এসে প্রায়শ্চিত্ত করলেই জাতে উঠে যাবেন। বুঝেছেন সত্যেন বাবু, ব্রাহ্মণশূদ্রে লাখঝুড়ি তফাৎ।" আমি জাতিতে কায়স্থ।

মহারাজ এইবার আমার হৃদয়ের একটি পুরাতন ক্ষতে লবণ নিক্ষেপ করিলেন। যখনই কোনও উপাদেয় শাস্ত্র পাঠ করিয়া মোহিত হইতাম, তখনই ছ্যাঁৎ করিয়া মনে পড়িত এসকল ব্রাহ্মণের কীর্ত্তি, আর আমি ঘৃণিত পদদলিত শূদ্রের সন্তান। সম্প্রতি কেহ কেহ প্রমাণ করিতেছিলেন বটে যে কায়স্থরা এক শ্রেণীর ক্ষত্রিয়।

রমেশচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন বৈশ্য ; কিন্তু তাহা ত দেশের লোকে মানিতে চায় না। আর মানিলেই বা কি হইল ? ব্রাহ্মণের তুল্য সম্মান ত আর পাওয়া গেল না ? ব্রাহ্মণ ! তোমাকে দেখিয়া বাস্তবিক আমার হিংসা হয়। তুমি কি উচ্চবংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছ ! আমি যদি ব্রাহ্মণ হইতাম !

যাহা হউক, মহারাজের কথাতে আমি একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলাম। বলিলাম, "দেখুন, এই বিংশ শতাব্দীতে সেকেলে বামণাই আর চলে না। আজকালকার ব্রাহ্মণ কায়স্থ আর বৈদ্যের মধ্যে কি প্রভেদ আছে বলুন। তবে ব্রাহ্মণরা অমাদের শূদ্র ব'লে ঘৃণা করবার কে ? সত্ত্বগুণের আধার ব্রাহ্মণ যতদিন স্বীয় ব্রহ্মণ্য পালন করেন, ততদিনই তিনি পূজ্য, সমাজের শীর্ষস্থানীয়, নচেৎ নয়। ইহাই আমাদের বর্ণাশ্রম।" মহারাজ আমার দিকে চাহিয়া একটু মুরুব্বীয়ানার হাসি হাসিলেন ; মুখে বলিলেন, "না, না, ঘৃণা নয়, ঘৃণা নয়। যাক, যাক ওকথা যেতে দিন, সত্যেন বাবু।"

কিছুক্ষণ পরে একটি নামাবলীপরিহিতা ধর্ম্মনিষ্ঠা বৃদ্ধা এক গণ্ডূষ গঙ্গাজল আনিয়া মহারাজের পায়ের নিকট ধরিয়া বলিলেন, "বাবা, একটু চরণামৃত দাও।" তখন এই ঘোর বিষয়ী, কদাচারী জমিদার তাঁহার মাতৃতুল্যা এই ধার্ম্মিকা রমণীর জলগণ্ডূষে আপনার চরণাঙ্গুলী স্পর্শ করিলেন এবং বৃদ্ধা ভক্তিভরে তাহা পান করিলেন —কেননা মহারাজ ব্রাহ্মণ আর বৃদ্ধা শূদ্র।

ইহার পর সেখানে আমি আর এক মুহূর্ত্তও তিষ্ঠিতে পারিলাম না। চলিয়া আসিবার সময় জমিদার বাবুর পণ্ডিতের দলের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। তাঁহাদের ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ সত্ত্বেও আমার মনে হইল ইঁহারা উচ্ছে ফুলে পীত প্রজাপতি ; মহারাজের তিক্ত মধু আহরণের জন্য লালায়িত।

(২)

সেইদিন হইতে আমার চিরপোষিত ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষে নূতন ইন্ধনের

সংযোগ হইল। নানা প্রবন্ধ ও বক্তৃতায় আমি বিধিমতে প্রমাণ করিতে লাগিলাম যে ভারতবর্ষের অধঃপতনের সর্ব্বপ্রধান কারণ সমাজে ব্রাহ্মণের আধিপত্য ও নিম্নজাতিগণের উপর ব্রাহ্মণের অত্যাচার; ব্রাহ্মণ যাহা কিছু শাস্ত্র লিখিয়াছে তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য আপনার চালকলার বন্দোবস্ত সম্পাদন। শেষটা এতদূর দাঁড়াইল যে ব্রাহ্মণ দেখিলেই জ্বলিয়া যাইতাম এবং তাহার সম্মুখে তাহার পূর্ব্বপুরুষগণের সয়তানীর বর্ণনা করিয়া অপার আনন্দ লাভ করিতাম। এখন একথা মনে পড়িলে লজ্জাবোধ হয়, একটু হাসিও আসে, কারণ সম্প্রতি আমার যে মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহারও মূলে ব্রাহ্মণ। হাঁ, আমি একজন প্রকৃত ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছি। এই তপঃপ্রভাবশালী ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎকার লাভ করিবার জন্য আমায় ওঁকারনাথ তীর্থেও যাইতে হয় নাই, গঙ্গোত্রীর পথেও ছুটিতে হয় নাই, হরিদ্বারে, হৃষীকেশেও গঙ্গাজলে ডুব দিতে হয় নাই। ইনি আমারই গ্রামবাসী এবং বাল্যসহচর। ইঁহার না আছে কোনও ভড়ং, না আছে কোনও বুজরুকী —নিতান্ত সাদাসিধে ভদ্রলোক।

শ্রীযুক্ত রামনাথ তর্কালঙ্কারের পিতাও একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন—রামনাথ উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তান। আমার পিতৃদেব রামনাথের পিতৃদেবকে কিছু ব্রহ্মোত্তর দিয়া আমাদের গ্রামে বাস করান। ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটি টোল স্থাপন করিয়া নিজ ব্যয়ে কয়েকটি ছাত্রের ভরণপোষণ ও শিক্ষাদান সম্পন্ন করিতেন। বৃদ্ধবয়সে কৃতবিদ্য পুত্র রামনাথের হস্তে টোল ও সংসারের ভার অর্পণ করিয়া তিনি সস্ত্রীক কাশীবাসী হন।

আমি লেখাপড়ার জন্য কলিকাতাতেই থাকিতাম, কাজেই বহুকাল রামনাথের সহিত আলাপের সুযোগ হয় নাই। বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর আমার ইচ্ছা হইল নিজের গ্রামে বাস করিয়া জমিদারীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন ও প্রজাপালন করিব।

এই সময় হইতে রামনাথের অদ্ভুত বিদ্যা বুদ্ধি ও চরিত্রের পরিচয় লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে আমার ব্রাহ্মণবিদ্বেষ লোপ পাইল।

রামনাথের সহিত আমার কিরূপ আলাপ হইত তাহার একটু নমুনা দিতেছি। প্রতিদিন দুপুর বেলা রামনাথ আমাদের বাড়ী আসিত। আমি তাহার নিকট সংস্কৃত শিখিতাম এবং তাহার পরিবর্ত্তে তাহাকে ইংরেজী শিখাইতাম। যে অল্প সময়ের মধ্যে রামনাথ ইংরেজী কাব্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞানের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তকগুলি আয়ত্ত করিয়া লইল, তাহা দেখিয়া আমি একেবারে বিস্মিত হইয়া গেলাম। ভাবিলাম এই সকল কুশাগ্রবুদ্ধি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যদি সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে ইংরেজী পড়িতেন, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ সম্মানগুলি ব্রাহ্মণের একচেটিয়া হইয়া যাইত, বিশ্ববিদ্যালয় গৌরবান্বিত হইত, সহযোগী ও উপযোগী নূতন শিক্ষার আলোকে দেশ নূতন শ্রী ধারণ করিত।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে রামনাথকে বলিলাম, "হাঁহে, শাস্ত্র ত অনেক পড়লাম, কৈ ধর্ম্মে ত কিছু বিশ্বাস-টিশ্বাস জন্মালি না।"

রামনাথ বলিল, "দেখ, তোমার মত ইংরেজী জানা লোকের একটা মহৎ দোষ দেখতে পাই যে তাঁরা অনেক শাস্ত্র-টাস্ত্র পড়ে ফেলেন, কিন্তু শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে কোনও সন্ধ্যাপূজাদি ক্রিয়া করেন না; সাধনা করেন না; সাধনা নহিলে সিদ্ধি হয় না। এর অবশ্যম্ভাবী ফল এই হয় যে ধর্ম্মের আদর্শে বিশ্বাস জন্মায় না। তোমার ঐ যন্ত্রাগারটীতে নিজের হাতে পরীক্ষা না ক'রে কেবল বৈজ্ঞানিক পুস্তক পড়লে আমার যেরূপ বিজ্ঞানের জ্ঞান হ'ত, ক্রিয়া না ক'রে কেবল শাস্ত্র পড়ে তোমাদেরও তেমনি ধর্ম্মের জ্ঞান হয় আর কি।"

আমি বলিলাম, "আসল কথাটা কি জান? শাস্ত্র যাঁরা লিখেছেন তাঁদের যুক্তিতর্ক আমাদের ইংরেজী রুচিতে আদবে ভাল লাগে না। তাঁদের কা'রও স্বাধীন চিন্তা দেখা যায় না—সবাই আগেকার ঋষিদের দোহাই দিয়ে লিখে যাচ্ছেন।"

আমাকে বাধা দিয়া একটু উত্তেজিত ভাবে রামনাথ বলিল, "দেখ ভাই, একথাগুলি তুমি ভাল করে না ভেবেই বলছ। প্রাচীন দর্শন ও স্মৃতিতে যথেষ্ট স্বাধীন চিন্তা দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তবে হিন্দুর অধঃপতনের পর যে সকল শাস্ত্র লেখা হয়েছে তাতে মৌলিকতা খুব কম বটে—কিন্তু ভেবে দেখ তখন দেশের কি দুরবস্থা; সে সময়-কার লেখকেরা যে নিকৃষ্ট হবেন তাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে? তাঁরা যে কোনো রকমে হিন্দুসমাজকে আর হিন্দুশাস্ত্রকে ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন, তারই জন্য তাঁদের ধন্যবাদ দাও। আর তাঁদের যে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার শক্তি একেবারে ছিল না একথাও স্বীকার করতে পারি না। নৈয়ায়িকগণ সময়ে সময়ে নূতন মত স্থাপন করবার জন্য তর্ক করে যেতেন—ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও বেশ তর্কযুদ্ধ চলিত। আর আজকালকার ইংরেজী-শিক্ষিত লোকে যে স্বাধীন চিন্তার এত বড়াই করেন, আমি ত দেখি তাঁরা ইংরেজ লেখকের বুলি আওড়াইতে থাকেন মাত্র। রাগ করো না, এই তুমিই রুশো, মিল প্রভৃতি প'ড়ে বর্ণাশ্রমের উপর যেরূপ চটা ছিলে, সম্প্রতি নিৎসে, (Nietzsche) গ্যাল্টন প্রভৃতি প'ড়ে সে ভাবটা ছেড়ে দিয়েছ। কিন্তু যথেষ্ট অবসর সত্ত্বেও স্বাধীনভাবে নিজে তুমি কি চিন্তা করেছ?"

তর্কে পরাস্ত হইয়া আমি কথা বদলাইয়া ফেলিলাম। বলি-লাম, "দেখ, তুমি ত মনুসংহিতার অত প্রশংসা কর, আমি ত দেখি, মনু শূদ্রদের অত্যন্ত হীন অবস্থায় রেখে দিতে চান। আর রঘু-নন্দনের মতে ত কায়স্থরা শূদ্র। তাহ'লে বলতে হবে মনু আমা-দের পূর্ব্বপুরুষদের উপর অত্যন্ত অবিচার করেছিলেন।"

উত্তেজিত ভাবে রামনাথ বলিল, "এই শূদ্র কথাটার অর্থ লয়ে মহা অনর্থের সৃষ্টি হয়েছে। মহর্ষি মনুর মতে শূদ্রেরা অনার্য্য ছিল, কিন্তু স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের মতে দেখি যাঁরা ব্রাহ্মণ নন তাঁরাই শূদ্র। আসল কথা হচ্ছে এই যে মনুর বহুকাল পরে কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি

জাতির উৎপত্তি হয়—এঁরা যে মুলতঃ আর্য্য সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নাই।"

শেষে আমি বলিলাম, "একটা কথা জানবার বড় ইচ্ছা হচ্ছে, কিছু মনে করো না। আচ্ছা, তুমি নিজে কোনো প্রমাণ পেয়েছ যে ঈশ্বর আছেন ?

রামনাথ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিল, "আর কেউ একথা জিজ্ঞাসা করলে আমি উত্তর দিতাম না, কিন্তু তুমি আমায় ভালবাস, তোমাকে বলতে পারি। আমি অজ্ঞ ব্রাহ্মণ, ধ্যানধারণার কিছুই জানি না। ঈশ্বর আছেন কি না এ প্রশ্নের উত্তর দিবার স্পর্দ্ধা আমার নাই। তবে আমি সাধ্যমত শাস্ত্রের উপদেশ পালন করিতে চেষ্টা করি, আর তাতে আছি ভাল। আমার শরীর সুস্থ, বুদ্ধি সতেজ, হৃদয়ে মাঝে মাঝে ধর্ম্মভাবের আবির্ভাব হয়। আহ্নিক করবার সময় মাঝে মাঝে মনে হয় যেন জগন্মাতা এ অধম সন্তা-নের প্রতি করুণানয়নে চাইছেন। বলতে পারি না সেটা আমার মনের ভুল কি না। যাই হোক ভাই, দিন দিন আমার এই বিশ্বাস বাড়ছে যে ঋষিরা শাস্ত্রে মিথ্যা কথা লিখে যান নাই।"

রামনাথের নয়নকোণে অশ্রুবিন্দু দেখিয়া আমার আর বাক্যস্ফুর্ত্তি হইল না।

(৩)

কয়েক দিন পরে আমার জেঠা মশায়ের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে খুব ধুমধাম হয়। শ্রাদ্ধে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ, কাশী কাঞ্চী দ্রাবিড় প্রভৃতি বহুস্থান হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া মোটা মোটা বিদায় গ্রহণ করেন। উঠানে কাপড় পাতিয়া লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি সংগ্রহ করা হইল এবং জেঠাইমা সেই অমূল্য বস্ত্রখণ্ডটী সযত্নে তুলিয়া রাখিলেন।

শ্রাদ্ধের কয়দিন আমাকে রাজবাটীতে (জেঠামশাই সরকার

হইতে রাজা খেতাব পাইয়াছিলেন) ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল। বাড়ী আসিয়া একদিন মধ্যাহ্নে ইজি চেয়ারে বসিয়া সিগারেটের ধূম পান করিতেছি, এমন সময় চটীর সেই পরিচিত ফট্‌ফট্ শব্দের সঙ্গে রামনাথের জামাহীন কমনীয় গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল। দেখিবামাত্র আমি বিস্ময়সহকারে বলিয়া উঠিলাম, "হাঁহে, রামনাথ, তোমায় রাজবাড়ীতে শ্রাদ্ধে দেখলাম না কেন? তোমার কি হয়েছিল?"

ঈষৎ হাসিয়া, একখানি চেয়ারে বসিতে বসিতে, রামনাথ বলিল, "সে একটা বিশেষ কারণ বশতঃ আমি গিয়ে উঠতে পারি নাই।" কারণটা যে কি তাহা সে কিছুতেই বলিতে চাহে না। শেষ আমি অভিমান করিয়া বলিলাম, "আমায় বল্‌বে না, বটে? এই বুঝি তুমি আমায় ভালবাস?"

আবার তাহার সেই মনোমোহন হাসি হাসিয়া রামনাথ বলিল, "তবে নিতান্তই শুন্‌বে? বহুদিন হ'তে আমি মনে মনে একটি প্রতিজ্ঞা করেছি যে কাকেও আমি পাদোদক বা পদধূলি দিব না বা কাকেও আমার পা স্পর্শ করতে দিব না। কারণ আমি জানি আমি ব্রাহ্মণ কুলের কলঙ্কস্বরূপ, আমি কিছুতেই লোকের অতটা ভক্তি গ্রহণ করতে পারি না—কর্‌লে আমার আরও অধোগতি হবে। যখনই শুন্‌লাম স্বর্গীয় রাজার শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণের পদধূলি কুড়ান হবে, তখনই আমি স্থির করলাম আমার সেখানে যাওয়া হবে না।"

আমার হাত হইতে সিগারেটটি পড়িয়া গেল, আমি হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিলাম এবং তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলাম, "রামনাথ, আমি কোন ব্রাহ্মণকে প্রণাম করি না, আমি তোমাকেও কখনো প্রণাম করি নাই—কিন্তু আজ থেকে তোমায় প্রণাম করব! আজ থেকে তুমি আমার গুরু! আর কাউকে না দাও তোমায় সত্যেনকে আজ থেকে পদধূলি দিতেই হবে।"

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

দুখের হরি

জানিগো হরি তোমার রীতি
দুঃখে তাই ডরিনা,
ভবের সুখ—তোমার হেলা
তাহারে যেন বরি না।

দলিয়ে তুমি পালন কর'
জ্বলায়ে তুমি কলুষ হর'
ঠেলিয়া তুমি সরা'য়ে দিয়ে বিপদে রাখ বাঁচায়ে
পীড়িয়া তুমি পাড়াও ঘুম,
দংশি' তুমি খাও যে চুম,
বক্ষে চাপি দাও যে দোল, আদর তুলে কাঁপায়ে
বিঁধিয়া তাহে করুণা ঢাল্যো,
ঘরষি চিত জ্বাল গো আলো,
বিদরি বুকে বিতর' জ্ঞান, এরীতি তব ভুবনে
আঘাতে তুমি জাগাও প্রভু
চোখের পাতা টানিয়া কভু,
মারিয়া তুমি বাঁচাও হরি মরণহীন জীবনে।

বুঝেছি হরি তোমার রীতি
তোমার রাগ বিরাগে,
দুখেরে ডরি হারাতে নাহি
চাহি গো তব সোহাগে।

শ্রীকালীদাস রায়।

—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব

[১৫]

[আষাঢ়ের নারায়ণের ৮৪১ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি]

ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা

(১০)

জীব-প্রকৃতি ও ভগবান।

গীতায় ভগবান তাঁর জীবাখ্যা পরাপ্রকৃতির মূল লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে এই জীবপ্রকৃতির দ্বারাই তিনি এই জগত ধারণ করিয়া আছেন। এই জগৎ বলিতে আমরা রূপ-রসাদির সমষ্টি বুঝি। রূপরসাদি আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে আবদ্ধ। চক্ষু বা দর্শন-শক্তি না থাকিলে রূপের জ্ঞান, এবং জ্ঞান না থাকিলে, তার প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয়। সেইরূপ শ্রবণ বা শ্রুতিশক্তি না থাকিলে শব্দের, আঘ্রাণ-শক্তি না থাকিলে গন্ধের,—এই সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তি না থাকিলে, এই বিষয়-রাজ্যের কোনও জ্ঞান, এবং এই জ্ঞান না থাকিলে, ইহার কোনও প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা থাকে না। সুতরাং যে-জীবের দ্বারা ভগবান এই জগৎ ধারণ করিয়া আছেন, আমাদের ইন্দ্রিয়-শক্তির অনুরূপ শক্তি তাহার অবশ্যই আছে; না থাকিলে, তাহার দ্বারা জগৎ-ধারণ কার্য্য কখনই সম্ভব হইতে পারে না। আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়ের মতন ভগবানের এই জীবাখ্যা পরাপ্রকৃতিরও রক্তমাংসের উপাদানে নির্ম্মিত কোনও ইন্দ্রিয় আছে, এমন কথা বলি না। আমাদের এসকল ইন্দ্রিয়ের উপচয় ও অপচয় আছে; বৃদ্ধি ও ক্ষয়, বিকাশ ও পরিণাম আছে। ভগবানের জীবাখ্যা

পরাপ্রকৃতির পক্ষে এই উপচয়-অপচয়-ধর্ম্মশীল, এই বিকাশ ও ক্ষয়ের অধীন কোনও ইন্দ্রিয় থাকা সম্ভব নহে। কারণ, এসকলের দ্বারা পূর্ণ-জ্ঞানলাভ ত হয় না। কারণ, এসকল ইন্দ্রিয়ের পটুতা-অপটুতা আছে। এই অপটুতা নিবন্ধন বিষয়-জ্ঞানের ব্যাঘাত জন্মে। এইরূপ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনও নিত্য বস্তুকে নিত্যকাল ধরিয়া রাখা যায় না। আমাদের ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তাহাদের বিষয়ের যোগ কখন থাকে কখন থাকে না। ভগবানের জীবাখ্যা পরাপ্রকৃতির ইন্দ্রিয়শক্তির সম্বন্ধে ত এরূপ কল্পনা করা সম্ভব নহে। কারণ তাহার এসকল শক্তি যদি হ্রাসবৃদ্ধির, প্রকাশ-অপ্রকাশের অধীন হয়, তাহা হইলে জগতের কোনও স্থায়ীত্ব থাকে না। তাহা হইলে এই জগৎ-প্রবাহের অবিরামত্ব থাকে না। এই প্রবাহ যে পরিণামী হইয়াও নিত্য, এমন কথা ত তখন বলা সম্ভব হয় না। আর এই প্রবাহ যদি নিত্য না হয়, তাহা হইলে কাল এবং আকাশ লয় প্রাপ্ত হয়। কারণ ঘটনা-পারম্পর্য্য ব্যতীত কালের প্রতিষ্ঠা থাকে না। আর এক অখণ্ড ও অবিভাজ্য দেশ ব্যতীত আকাশের জ্ঞান এবং সত্তাও থাকে না। এই দেশকালের আশ্রয়েই জগতের প্রবাহও প্রতিষ্ঠিত। এই অখণ্ড, অবিভাজ্য, অনাদ্যনন্ত দেশ ও কালকে আশ্রয় করিয়াই জগতের প্রবাহ নিয়ত চলিতেছে এবং আপনার এই প্রবাহের তরঙ্গভঙ্গের দ্বারাই এই অখণ্ড, অবিভাজ্য এবং অনন্ত দেশ ও কাল অনন্তভাবে বিভক্ত হইয়া দেখাইতেছে। এই জগৎ-প্রবাহের সঙ্গে অনন্ত দেশ-কালের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। এ সম্বন্ধ নিত্য। এই সম্বন্ধেতেই দেশ এবং কালের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা। এই সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গী বা organic, অনন্ত দেশ ও কালকে ছাড়িয়া জগৎ-প্রবাহের অস্তিত্ব অসম্ভব হয়, আবার এই জগৎ-প্রবাহকে ছাড়িয়া দেশ এবং কালেরও কোনও সত্তা থাকে না। ইহারা ছায়াতপের মতন নিত্যযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। এই জগৎ-প্রবাহই অনন্ত দেশ-কালকে বিবিধ সম্বন্ধেতে আবদ্ধ করিয়া সীমাবদ্ধ করিতেছে;

যাহা প্রকৃতপক্ষে অবিভাজ্য, তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখাইতেছে। অসীম কখনও সীমাবদ্ধ হইতে পারে না, অবিভাজ্য বস্তুকে কখনও ভাগ করা যায় না। অথচ অনন্ত ও অবিভাজ্য দেশকালকে এই জগৎ-প্রবাহের মধ্য দিয়া আমরা নিয়তই সীমাবদ্ধ ও খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিতেছি। যাহাকে আশ্রয় করিয়া এই প্রবাহ চলিতেছে, ভগবানের সেই জীবাখ্যা পরাপ্রকৃতিই তবে এই অঘটন ঘটাইতেছেন। এই অঘটন-ঘটাইবার শক্তিকেই আমাদের প্রাচীন পরিভাষায় মায়া কহিয়াছেন। অতএব ভগবানের জীবাখ্যা পরাপ্রকৃতিতেই এই অঘটন-ঘটনপটীয়সী মায়াশক্তি নিহিত রহিয়াছে। এই মায়া ভগবানের এই পরাপ্রকৃতিরই ধর্ম্ম। ভগবানের জীবাখ্যা পরাপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত এই অঘটন-ঘটনপটীয়সী শক্তিকেই শাস্ত্রে তাঁর বৈষ্ণবী মায়া কহিয়াছেন। ইহা ছাড়া ভগবানের এই বৈষ্ণবী মায়ার আর কোনও বোধগম্য অর্থ হয় না। তারপর, এই জগৎ-প্রবাহ যখন পরিণামী হইয়াও নিত্য, তখন যে-জ্ঞান বা চৈতন্য-বস্তু এই নিত্য প্রবাহকে ধরিয়া আছে, তাহাও নিত্য। এই প্রবাহ যখন অনাদি ও অনন্ত, তখন এই জ্ঞান বা চৈতন্য-বস্তুও অনাদ্যনন্ত। এই প্রবাহ যখন অখণ্ড, তখন যে-চৈতন্যে বা জ্ঞানেতে ইহার প্রতিষ্ঠা, তাহাও অখণ্ড হইবেই হইবে। অর্থাৎ ভগবান তাঁহার যে-জীবাখ্যা পরাপ্রকৃতির দ্বারা এই বিশাল, এই অনাদ্যনন্ত, এই অবিরাম জগৎ-প্রবাহকে ধারণ করিয়া আছেন, সেই জীব-প্রকৃতি এক, অনাদি ও অনন্ত। ভগবান আপনি যেমন এক, এই জীব-প্রকৃতিও সেইরূপ এক। ভগবান আপনি যেমন অনাদি ও অনন্ত, তাঁর এই জীব-প্রকৃতিও সেইরূপ অনাদ্যনন্ত। ভগবান আপনি যেমন নিত্যবুদ্ধ, এই জীব-প্রকৃতিও সেইরূপ নিত্যবুদ্ধ, ইহার জ্ঞানেতে কোনও প্রকারের আচ্ছাদন বা বিক্ষেপ নাই ও সম্ভবে না। কারণ এই জীবের জ্ঞানের বিচ্ছেদে, জগৎ-প্রবাহের অবিরামগতি সম্ভব হয় না। এই জ্ঞান-সূত্র ছিন্ন হইলে, জগৎপ্রবাহ থামিয়া যায়, ব্রহ্মাণ্ড লয়প্রাপ্ত হয়।

অতএব গীতায় ভগবান তাঁর যে-জীবাখ্যা পরাপ্রকৃতির কথা কহিয়াছেন তাহার এই কয়টি লক্ষণ নির্দ্ধারিত হয়—

(১) তাহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের শক্তিসম্পন্ন অথচ এসকল জড়-ইন্দ্রিয়-যন্ত্র-বিহীন।

(২) তাহা নিত্য-বুদ্ধ বা অখণ্ড-চৈতন্য-সম্পন্ন।

(৩) তাহা এক ও সর্ব্বপ্রকারের দ্বৈত-শূন্য।

(৪) তাহা অনাদি ও অনন্ত।

(৫) তাহা অঘটন-ঘটনপটীয়সী মায়াশক্তি-সম্পন্ন।

(৬) তাহা জগদ্বীজরূপী। অর্থাৎ, এই জীব-প্রকৃতি কেবল যে জগৎ ধারণ করিয়া আছে তাহা নহে, কিন্তু জগৎ-প্রবাহকে প্রবর্ত্তিতও করিতেছে।

ভগবান আপনি যেমন সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত হইয়াও সর্ব্বেন্দ্রিয়-গুণাভাস-সম্পন্ন, এই জীবও সেইরূপ। ভগবান যেমন অখণ্ড চৈতন্য-বস্তু, অদ্বৈত-জ্ঞানবস্তু, অনাদি ও অনন্ত, অঘটন-ঘটনপটীয়সী মায়াশক্তির অধীশ্বর, তিনি যেমন এই জগতের সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তাঁর জীবাখ্যা পরাপ্রকৃতিও সেই সকল লক্ষণাক্রান্ত ও সেই কর্ম্মই করিতেছে। প্রশ্ন হয়—তবে এই জীবাখ্যা পরাপ্রকৃতিতে আর ভগবানেতে প্রভেদ কি ও কোথায়?

প্রভেদ এই যে ভগবান স্ব-তন্ত্র, এই জীবপ্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য নাই; ইহা ভগবানের অধীন। এই জন্যই ভগবান বলিতেছেন যে এই জীবাখ্যা পরাপ্রকৃতির দ্বারাই তিনি জগৎ ধারণ করিয়া আছেন।

"যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।"

যাহার দ্বারা—আমা-কর্ত্তৃক—এই জগৎ ধৃত হইয়া রহিয়াছে তাহাই আমার পরাপ্রকৃতি। তারই নাম জীব। আর এখানে "আমা-কর্ত্তৃক"—"ময়া"—এই শব্দের দ্বারা জীবের স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব বারিত হইয়া ভগবানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অর্থাৎ জগৎ-

ধারণ-কার্য্যের কর্ত্তা জীব নহে, কিন্তু ভগবান স্বয়ং, জীব তাঁর এই কার্য্যের সহায়, অবলম্বন বা যন্ত্রমাত্র। কিন্তু যন্ত্র আর যন্ত্রী বলিলেও ভগবানের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বাধা প্রাপ্ত হয়। কারণ আমাদের অভিজ্ঞতাতে যন্ত্র যেমন যন্ত্রীর অধীন, যন্ত্রীও সেইরূপ তাঁর নিজের যন্ত্রের অধীন হইয়া থাকেন; তিনি যেমন যন্ত্রকে চালান, যন্ত্রও সেইরূপ তাঁহার কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করে, ইহা সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই। আমাদের অভিজ্ঞতাতে যন্ত্র যন্ত্রী হইতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র বলিয়াই ইহারা এরূপভাবে পরস্পরকে নিয়ন্ত্রিত করে, অর্থাৎ উভয়ের কেহই সম্পূর্ণ স্ব-তন্ত্র নহেন। কিন্তু জীবেতে আর ভগবানেতে এরূপ স্ব-তন্ত্র-ভেদ কল্পিত হয় নাই। জীব ভগবানের সম্পূর্ণ অধীন, ভগবানের নিজের সত্তার অঙ্গীভূত।. এইজন্যই এই জীবের মধ্যে চৈতন্যাদি ভগবৎ-লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে। জীব আর ভগবানের মধ্যে স্ব-তন্ত্র ভেদ নাই, স্ব-গত ভেদ মাত্র আছে। শক্তি আর শক্তিমানেতে যেমন স্ব-তন্ত্র-ভেদ নাই, শক্তিমানকে ছাড়িয়া, তাঁহা হইতে পৃথকভাবে যেমন কোথাও শক্তির প্রতিষ্ঠা হয় না, অথচ শক্তি এবং শক্তিমান ঠিক এক নহে, ইহাদের মধ্যে একটা ভেদ আছে। জীব-ভগবান সম্বন্ধেও তাহাই। শক্তি আর শক্তিমানেতে স্ব-তন্ত্র-ভেদ নাই, স্ব-গত ভেদ আছে। এইরূপেই ভগবানের সঙ্গে তাঁর জীবাখ্যা পরা-প্রকৃতির অভেদের মধ্যেই যে ভেদ, একত্বের মধ্যেই যে দ্বৈত আছে, ইহা বুঝিতে হইবে। জগৎধারণ-কার্য্যে জীব ভগবানের যন্ত্র বটে, কিন্তু ইহা এমন যন্ত্র যাহা যন্ত্রীর দ্বারা ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও যন্ত্রীকে আপনার অধীন করিতে বা আপনার শক্তি বা প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। কারণ এক্ষেত্রে যন্ত্রী আর যন্ত্রের মধ্যে কোনও স্ব-তন্ত্র ত ভেদ নাই, কেবল স্ব-গত ভেদই আছে।

ভগবান কহিতেছেন যে এই জীবাখ্যা পরাপ্রকৃতির দ্বারাই তিনি জগৎ ধারণ করিয়া আছেন। এই জগৎ-ধারণ ব্যাপারে জীব আর জগতের মধ্যে একটা সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। দেখিয়াছি যে দ্রষ্টা ছাড়া

দৃষ্টবস্তুর বা রূপের প্রামাণ্য নাই। শ্রোতা ছাড়া শ্রুতবস্তুর বা শব্দের প্রামাণ্য নাই। দর্শন-শ্রবণাদি ছাড়া রূপরসগন্ধময় জগতের প্রামাণ্য নাই। জীব দ্রষ্টা শ্রোতা প্রভৃতি, জগৎ তার দৃষ্ট শ্রুত প্রভৃতি। এই ভাবে জীব এবং জগতের মধ্যে একটা অতি ঘনিষ্ঠ, অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হইয়া, ইহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। জীব ছাড়া জগৎ থাকে না, জগৎ ছাড়াও ত জীব থাকে না। জীব ও জগৎ ইহাদের কেহই স্ব-তন্ত্র ও স্বাধীন নহে; ইহারা পরস্পরের অপেক্ষা রাখে। এই দ্বৈত-সম্বন্ধকে ধরিয়া আছে কে? গীতায় ভগবান কহিতেছেন—আমি। আমার দ্বারাই, এই জীবের আশ্রয়ে এই জগৎ ধৃত হইয়া আছে।

ধারণ-কার্য্যেতে একজন ধারয়িতা ও একটা ধৃত বস্তু থাকে। ধারক ও ধৃত এই দুই না হইলে ধারণ সম্ভব হয় না। এই দুইএর মধ্যে একটা সম্বন্ধ বা যোগ স্থাপিত হইয়াই ধারণ সম্ভব হইয়া থাকে। ফলতঃ যেখানেই কোনও কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয়, সেই-খানেই এই সম্বন্ধ বা relation গড়িয়া উঠে। আমার এই লেখাটা একটা কর্ম্ম। এই লেখার বা প্রবন্ধের উপকরণ ভাব ও ভাষা। ভাব ও ভাষার মধ্যে একটা যোগ স্থাপিত হইয়াই এই প্রবন্ধ রচিত হই-তেছে। যোগ বলিলেই একটা যোগসূত্রের প্রয়োজন হয়। আমার প্রবন্ধের ভাব ও ভাষার যোগের যোগ-সূত্র কি? না, আমার মন বা বুদ্ধি। আর যোগ-সূত্রমাত্রেই যে সকল বস্তুকে পরস্পরের সঙ্গ যুক্ত করিয়া থাকে, তাহাদের প্রত্যেকটিকে যুগপৎ অধিকার করে ও অতিক্রম করিয়া যায়। এই প্রবন্ধ-রচনায় আমার মন বা বুদ্ধি, আমার জ্ঞান বা অনুভূতি,—একদিকে ভাব ও অন্যদিকে ভাষাকে অধিকার করিয়া আছে। ভাব আমার মনেতে আছে, আমার জ্ঞানেতে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ভাষাও আমার সেই মনেতে বা জ্ঞানেতেই সঞ্চিত আছে। আমার মন বা জ্ঞান এই দুই বস্তুকে ধরিয়া রাখিয়াছে। ভাবকে ধরিয়া, ভাবকে আবার অতি-

ক্রম করিয়া, ভাষাকে ধরিয়াছে; ভাষাকে ধরিয়া, আবার ভাষাকে ছাড়াইয়া গিয়া, ভাবকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে। আকাশে যেমন আয়তনবিশিষ্ট পদার্থসমূহ বিধৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ আমার মনেতে বা জ্ঞানেতে এই প্রবন্ধের ভাব ও ভাষা উভয়ই বিধৃত হইয়া আছে। আকাশ যেমন প্রত্যেক আয়তনবিশিষ্ট বস্তুকে ধরিয়া, তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, যুগপৎ তাহাকে অতিক্রম করিয়া আছে; আমার মন বা জ্ঞান সেইরূপ এই প্রবন্ধের ভাব ও ভাষাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তদুভয়কে ছাড়াইয়া আছে। যেখানেই একাধিক বস্তুর মধ্যে কোনও সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হয়, সেইখানেই এই সম্বন্ধের একটা যোগসূত্র থাকে। আর প্রত্যেক সম্বন্ধের এই যোগসূত্র সেই সম্বন্ধের প্রত্যেক অঙ্গকে ধরিয়া, প্রত্যেক অঙ্গেতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, যুগপৎ সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গকে ও তাহাদের সমষ্টিকে অতিক্রম করিয়া থাকে। যে-সম্বন্ধের আশ্রয়ে ভগবান এই জগৎ ধারণ করিয়া আছেন, তার একদিকে জীবপ্রকৃতি আর অপরদিকে এই জগৎ রহিয়াছে। জীব ও জগৎ একে অন্যের অপেক্ষা রাখে। ইহারা কেহই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন নহে। আর ভগবান আপনি যোগসূত্র হইয়া এতদুভয়কে ধারণ করিয়া আছেন। জীব এবং জগৎ, এতদুভয়কে অধিকার করিয়া তিনি সর্ব্বদাই আবার ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়া আছেন। জীবের যাহা কিছু জীবত্ব তাহা তাঁর মধ্যে স্থিতি করিতেছে। জগতের যাহা কিছু জগত্ত্ব তাহাও তাঁর মধ্যে স্থিতি করিতেছে। তিনি এতদুভয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া যুগপৎ আবার উভয়কে অতিক্রম করিয়া আছেন। এইজন্য ভগবান জীবও নহেন, জগৎও নহেন; অথচ তিনি ছাড়া জীব ও জগতে আর কোনও কিছুও নাই।

এই জীব ভগবানের পরা-প্রকৃতি। পরা-প্রকৃতি এইজন্য যে ভূমিরাদি অপরা-প্রকৃতি যেমন উপচয়-অপচয়-ধর্ম্মশীল, এই জীব সেরূপ নহে। ভূমিরাদির নিজের জ্ঞাতৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, কর্ত্তৃত্বাদি চৈতন্য-

ধর্ম্ম নাই। ইহারা জ্ঞানের, ভোগের, কর্ম্মের বিষয়মাত্র। আমাদের মন বুদ্ধি এবং অহঙ্কারেরও প্রকৃতপক্ষে নিজেদের মধ্যে জ্ঞান-শক্তি নাই। মন বিষয়-সংযোগ ব্যতীত মনন করিতে পারে না,—বুদ্ধি এবং অহঙ্কারও এই বাহিরের বিষয়-জগতের ও এই সকল ইন্দ্রিয়ের সমবায়েতেই আপন আপন জ্ঞান-কার্য্য সাধন করে। বিষয় ও ইন্দ্রিয় না থাকিলে, মন জড়বৎ অচেতন হইয়া রহে। বিষয়, ইন্দ্রিয় ও মন না থাকিলে, বুদ্ধিও সেইরূপ আপনার ধারণ-কার্য্য সাধন করিতে পারে না। আবার এই যে অহঙ্কার বা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-বোধ, ইহাও বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া বুদ্ধি পর্য্যন্ত আমাদের সংসার-জীবনের যা-কিছু উপাদান ও উপকরণ আছে, তৎসমুদায়ের অধীন। মন বিষয়ের অপেক্ষা রাখে, কিন্তু বিষয়কে সৃষ্টি করে না। বুদ্ধিও এইরূপ কোনও কিছুর সৃষ্টি করে না। অহঙ্কারেরও এই সৃষ্টি-শক্তি নাই। জীব-প্রকৃতিই ভূমিরাদি হইতে আরম্ভ করিয়া অহঙ্কার পর্য্যন্ত এই বিশাল ও জটিল সম্বন্ধ-জালকে ধরিয়া রাখিয়াছে, এই সৃষ্টি-ব্যাপারের সঙ্গে কেবল তাঁহারই সম্বন্ধ আছে। দেখিয়াছি যে এই জীবপ্রকৃতিই জগদ্বীজ। ইহা হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। এই জগৎ-প্রবাহকে ধারণ করিয়া আছে বলিয়াই এই জীবাখ্যা পরাপ্রকৃতি এই প্রবাহের অতীত রহিয়াছে—ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও ইহাকে অতিক্রম করিয়া আছে। এই জগদ্বীজ রূপেই এই জীবপ্রকৃতি সৃষ্টিমূলে আছে। ইহাই জগৎ প্রসব করিতেছে; কিন্তু করিতেছে আপনার শক্তিতে নয়, ভগবানের প্রেরণায়।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।

"আমা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতি এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিতেছে।" কিন্তু সৃষ্টি ত একটা কর্ম্ম। আর কর্ম্ম মাত্রেই কর্ত্তৃ-কর্ম্ম সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করে। এই সম্বন্ধের জন্য এমন কোনও তত্ত্বের বা বস্তুর প্রয়োজন হয়, যাহা কর্ত্তাতেও আছে, আবার তাঁর কর্ম্মেতেও আছে—যাহা কর্ত্তা ও তাঁর কর্ম্ম উভয়কে ধারণ ও একে

অন্যের সঙ্গে যুক্ত করিয়া রাখিয়াছে ও রাখিতেছে। সৃষ্টি-কার্য্যে জীবাখ্যা পরা-প্রকৃতি কর্ত্তা, জগৎ কর্ম্ম; আর যে তত্ত্ব বা বস্তু এই কর্ত্তা ও তার কর্ম্মকে ধারণ করিয়া আছে—সেই তত্ত্ব, সেই বস্তু, সেই "যাহা"—ভগবান স্বয়ং।

প্রশ্ন উঠিতে পারে—অমন ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ভগবানকে এই সৃষ্টি-কার্য্যের সঙ্গে যুক্ত করিবার চেষ্টা কর কেন? সোজাসুজি বলিলেই ত হয়,—ভগবানই জগতের স্রষ্টা। কিন্তু অত সোজাসুজি এ সকল গভীর ও জটিল জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয় না। সৃষ্টি-ব্যাপার একটা কর্ম্ম। কর্ম্ম মাত্রেই কর্ত্তাতে পরিবর্ত্তন বা পরিণাম আনয়ন করে। কর্ম্মের পূর্ব্বে কর্ত্তার যে অবস্থা থাকে, কর্ম্মের পরে তাহার অন্যথা ঘটিবেই ঘটিবে। কিন্তু নিত্য-তত্ত্ব ভগবানেতে এরূপ পরিবর্ত্তন ত ঘটিতে পারে না। এই জন্যই আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র ও সাধনা ভগবান স্বয়ং জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন একথা বলিতে এত কুণ্ঠিত হয়। এই হেতুই এই প্রকৃতি-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ভগবান সৃষ্টি করেন না, প্রকৃতিই তাঁর অধিষ্ঠানেতে এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিতেছে। প্রকৃতি সৃষ্টি-ব্যাপারের কর্ত্তা, সৃষ্টি তারই কার্য্য, আর ভগবান এই কর্ত্তা ও কর্ম্ম উভয়কে ধারণ করিয়া, একই সঙ্গে আবার উভয়কে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন।

ভগবান প্রকৃতি ও তাহার সৃষ্টি—উভয়েরই মধ্যে রহিয়াছেন। এই সৃষ্টি সত্ত্ব রজঃ তম এই তিন গুণের উপাদানে রচিত। এই ত্রিগুণের সংযোজন-বিয়োজন এবং বিমিশ্রণেই এই সৃষ্টির অভিব্যক্তি। এইজন্য এই সৃষ্টিকে ত্রিগুণাত্মিকা বলে। ভগবান এই সৃষ্টিতে পরিব্যাপ্ত, অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন বলিয়া সগুণ—এখানে তিনি এসকল গুণের সঙ্গে, গুণের মধ্যে প্রকাশিত। আবার প্রকৃতি ও তাহার সৃষ্টি এই উভয়ের সম্বন্ধ-সূত্র বা যোগ-সূত্র বলিয়া, ভগবান এই ত্রিগুণাত্মিকা সৃষ্টির অতীতও বটেন। এইজন্য—সৃষ্টির ও সৃষ্টিমূল প্রকৃতির উভয়ের অতীত বলিয়া—তিনি নির্গুণ। যখন তিনি প্রকৃতির

মধ্যে তখনই প্রকৃতির অতীতে, যখন সৃষ্টির মধ্যে তখন আবার সৃষ্টির অতীতে। তিনি একই সঙ্গে সৃষ্টি ও প্রকৃতির মধ্যে ও তদুভয়ের অতীতে আছেন। অতএব তিনি যখন সগুণ তখনই আবার নির্গুণ; যখন নির্গুণ তখনই আবার সগুণ। তিনি সগুণ হইয়া গুণের অতীত, নির্গুণ হইয়াও সর্ব্বগুণসমন্বিত। একদিকে তিনি যেমন সগুণ নহেন, সেইরূপ নির্গুণও নহেন। এক সময়ে বা এক অবস্থাতে সগুণ, অন্য সময়ে বা অন্য অবস্থাতে নির্গুণ—এরূপও নহেন। এরূপ হইলে নির্গুণ, অর্থাৎ সৃষ্টির অতীতে যখন থাকেন, তখন এই সৃষ্টি-প্রবাহকে রক্ষা করে কে? অন্য পক্ষে যদি তিনি সৃষ্টির মধ্যেই আবদ্ধ থাকেন, তাহা হইলে জগতের বিচিত্র ব্যষ্টিত্বের মধ্যে যে সাকল্য, বহুত্বের মধ্যে যে একত্ব অপরিহার্য্য হইয়া আছে, যে সাকল্য এবং একত্ব ব্যতীত এই জগৎ-বৈচিত্র্যের কোনও জ্ঞান সম্ভব হয় না, সেই সম্বন্ধেরই সূত্র থাকে কৈ? আবার তাঁহাকে সগুণ-ও-নির্গুণ—সগুণ+নির্গুণ—এমনও বলিতে পারি না; কারণ এই দ্বন্দ্ব ত একটা সমাস বা সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধের দুইটি অঙ্গ, এক সগুণ অপর নির্গুণ। এই দুই অঙ্গের প্রতিষ্ঠার জন্য ত এক তৃতীয় বস্তুর প্রয়োজন হয়, যে-বস্তু অঙ্গীরূপে ইহাদের ধারণ করিয়া আছে। অতএব সেই বস্তুকে যেমন কোনও অঙ্গ বিশেষ বলিয়া ধরিতে পারি না, সেইরূপ সকল অঙ্গের সমষ্টিও বলিতে ত পারি না। কারণ তাহা যে অদ্বৈত ও অবিভাজ্য। তাহা পরিপূর্ণরূপে প্রত্যেক অঙ্গবিশেষে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আবার প্রত্যেক অঙ্গকে অতিক্রম করিয়া রহে। আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা, আমাদের মধ্যে যে চৈতন্য-বস্তু বা প্রাণ-বস্তু আছে, তাহার উপমায় অতি সহজেই আমরা এই নিগূঢ় রহস্য ভেদ করিতে পারি। আমাদের এই প্রাণ এই দেহের সর্ব্বত্র পরি-ব্যাপ্ত হইয়া আছে, চক্ষুকর্ণাদি প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কে অনুপ্রাণিত করিয়া দর্শনশ্রবণাদি সম্ভব করিতেছে। এই সঙ্গে আমরা রূপের ও গন্ধের অনুভবলাভ করিতেছি। অথচ এই প্রাণশক্তিকে ত খণ্ড খণ্ড করিতে

পারি না। চক্ষের মধ্যে যেমন এই প্রাণ পূর্ণ, কর্ণেতেও সেইরূপ, নাসিকাতে যেমন, সমগ্র দেহে সেইরূপ। অতএব এই প্রাণ আমাদের শরীরের প্রতি অণুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও যুগপৎ তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া আছে। ভগবৎ-সত্তাও সেইরূপ জগতের প্রত্যেক অণুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াই আবার যুগপৎ ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়া আছে। এই জন্য ভগবানকে সগুণ এবং নির্গুণ বা সগুণ+নির্গুণ বলিতে পারা যায় না। ভগবৎ-তত্ত্ব সগুণ ও নির্গুণ উভয় তত্ত্বকে অধিকার করিয়া, উভয়েতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, উভয়কে ধারণ ও সম্ভব করিয়া, উভয়কে ছাড়াইয়া, উভয়ের অতীতে আছে। এই জন্যই ইহা পূর্ণ তত্ত্ব, পরম-তত্ত্ব বা চরম-তত্ত্ব। ইহাতে সকল জিজ্ঞাসার নিঃশেষ নিবৃত্তি হয়। এই পূর্ণতত্ত্বকেই গীতায় পুরুষোত্তম কহিয়াছেন।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

লীলা-চতুর্থী

[ঝুলন, রাস, দোল, রথ]

শৈশবে জীবনে মোর ঝুলন দোলায়
  তুলিয়া ছড়ালে ফুলরাশি,
ভুলায়ে রাখিয়া গেলে খেলায় লীলায়
  প্রাণকুঞ্জে বাজাইয়া বাঁশী।
যৌবনে সে রাসলীলা, রসরাজ নট
  এ জীবনে ফিরিলে চঞ্চল,
হৃদিকুঞ্জে ধরিবারে নারিনু কপট,
  যুগল মুরতি অচপল।
জীবনের অপরাহ্নে ত্রিবঙ্কিম সাজে
  দেখা দিবে সেও মিছে আশা,
দ্বন্দ্ব দ্বিধা সংশয়ের দোললীলা মাঝে
  ফাগে দৃষ্টি হবে ভাসা ভাসা।
তবুও ভরসা আছে একদিন তুমি,
  স্থির হবে জীবনের রথে,
যেদিন ছাড়িতে হবে ভব-ব্রজভূমি,
  অন্তহীন অজানার পথে।
গর্জ্জিবে আষাঢ় বজ্র দ্যুলোকে ভূলোকে
  তমসায় হবে একাকার
আমার জীবন-রথ বিদ্যুৎ আলোকে
  লয়ে তোমা যাবে পরপার।

শ্রীকালীদাস রায়।

নারায়ণ

মাসিক পত্র।

সম্পাদক

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ।

দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা

আশ্বিন, ১৩২৩ সাল।

সূচী।

নারায়ণ

২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা] [আশ্বিন, ১৩২৩ সাল

অবতার-কথা

ইংরাজী শিখিয়া, খৃষ্টীয়ান্ পাদ্রিগণ সচরাচর যে-ভাবে অবতারের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন, তাহা শুনিয়া ও পড়িয়া, অবতারবাদ সম্বন্ধে আমাদের মনে এমন্ একটা ধারণা হইয়াছে যে অবতারের কথা শুনিলেই আমরা যেন একটু শিহরিয়া উঠি। কিন্তু প্রকৃত হিন্দু সাধনা ও সিদ্ধান্তে ঈশ্বরের অবতার এইরূপ একটা অদ্ভুত বা অসম্ভব বা অযৌক্তিক ব্যাপার নহে। হিন্দু প্রায় সকলেই অদ্বৈত-বাদী। কেহ বা বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদী, কেহ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, কেহ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, কেহ বা অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী; কিন্তু ইঁহারা সকলেই আদি ও মূল তত্ত্ব যে এক, দুই নয়, ইহা স্বীকার করেন। এই অদ্বৈতবাদটা হিন্দুর হাড়ে হাড়ে ঢুকিয়া গিয়াছে, অশিক্ষিত অজ্ঞ জনেরাও অজ্ঞাতসারে এইটি বিশ্বাস করিয়া থাকে। তাহাদের নিক-টেও সকলই ঈশ্বর। আর এই অদ্বৈতবাদেতে অবতারবস্তুটিকে অতি সোজা করিয়া তুলিয়াছে। মূলতত্ত্ব ও আদিবস্তু যখন এক, দুই নহে; সেই এক আদি ও মূল তত্ত্ব বা বস্তু হইতেই যখন এই বিচিত্র বহুর উৎপত্তি ও প্রকাশ হইয়াছে; একের এইরূপ বহু হওয়াই যখন সৃষ্টি;—তখন সৃষ্টির আদি হইতেই ত স্রষ্টার অবতার আরম্ভ

হইয়াছে। সেই এক ও অনাদি তত্ত্বই ত এই সৃষ্টিধারাতে বহু রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই ভাবে যে এই জগৎটাকে দেখিবে বা দেখে, সে কখনও ভগবানের অবতার-কথা শুনিয়া একেবারে আঁৎকাইয়া উঠিবে না।

আমরা আঁৎকাইয়া উঠি এই জন্য যে আমরা এই জগতে একটা অসীম ও একটা সসীম; একটা অনন্ত ও একটা সান্ত; একটা চেতন ও একটা জড়,—এইরূপ দুইটা পরস্পর বিরোধী বস্তুর কল্পনা করিয়া থাকি। অসীম আর সসীম, অনন্ত আর সান্ত, চেতন আর অচেতন, ইহারা যে পাশাপাশি থাকিতে পারে না, এই কথাটা আমরা তলাইয়া দেখি না। সান্ত থাকিলেই অনন্তের অনন্তত্ব নষ্ট হয়, সসীম কিছু থাকিলেই অসীমের অসীমত্ব লুপ্ত হয়। সান্তই যে তখন অনন্তকে প্রতিরোধ করিয়া, তার অনন্তত্ব নষ্ট করে। সসীমই যে তখন অসীমকে সীমাবদ্ধ করে। আমি যদি ভগবান হইতে পৃথক্ হই, আমার যদি একটা স্বতন্ত্র সত্তা থাকে, তবে আমার এই স্বাতন্ত্র্যের সীমানায় ঠেকিয়া, তিনি নিজেও যে সসীম হইয়া পড়েন। ভগবান হইতে কোনও কিছু যদি পৃথক্ ও স্বতন্ত্র থাকে, তাহা হইলেই ভগবানের অসীমত্ব ও অনন্তত্ব লোপ পাইয়া যায়। ভগবানকে যখনই অনন্ত ও অসীম বলি, তখনই এই জগতের যাহা-কিছু তৎসমুদায়কে তাঁরই অন্তর্ভুক্ত, তাঁরই অঙ্গীভূত, তাঁরই আপনার বিবিধ প্রকাশ বলিয়া মানিয়া লই। অতএব এই ব্রহ্মাণ্ডে দুই'এর স্থান নাই। অসীম ও সসীম, অনন্ত ও সান্ত—ইহারা পরস্পর বিরোধী নহে। যাহা প্রকৃতপক্ষে অসীম ও অনন্ত, তাহা অসীম ও অনন্ত থাকিয়াই সসীম ও সান্তরূপে এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। এটি না মানিলে অসীম ও অনন্ত পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যান। আর অসীমের সসীমরূপে প্রকাশিত হওয়ারই নাম সৃষ্টি। এই সৃষ্টি ব্যাপারের দ্বারা ত অসীমের অসীমত্ব নষ্ট হয় না, নষ্ট হয় নাই। সৃষ্টির বহুত্বের ও বৈচিত্র্যের দ্বারা ও স্রষ্টার একত্বের কোনও ব্যাঘাত জন্মে

নাই। সৃষ্টির সীমার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান থাকিয়াও ত স্রষ্টা সীমাবদ্ধ হন নাই। জগতের অশেষ প্রকারের ভেদ-বিরোধের মধ্যে আপনাকে প্রকাশিত করিয়াও ত ভগবানের অভেদ একত্বের কোনও ব্যাঘাত হয় নাই। এ সকল কথা যে জানে, বুঝে, কিম্বা একটু তলাইয়া দেখে, সে ভগবানের অবতার-কথা শুনিয়া আঁৎকাইয়া উঠিতে পারে না; এসকল কথা হিন্দুর অস্থিমজ্জাগত বলিয়াই অবতার-কথা শুনিয়া সে একটুও বিস্মৃত হয় না।

কার্য্যকারণ সম্বন্ধ যে ভাল করিয়া বুঝে, সেও অবতার-কথায় বিস্মিত হইতে পারে না। ঈশ্বর বলিতে সকলেই জগতের কারণ-বস্তুকে বুঝিয়া থাকেন। কাল বা প্রকৃতিকে যাঁহারা জগতের কারণ ভাবে, তাঁহারাও ঐ কাল বা প্রকৃতিকেই একরূপ ঈশ্বর বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। জগৎ-ব্যাপারটা যে একটা কার্য্য; এই জগৎ যে জন্য বা উৎপন্ন বস্তু; এই জগৎ একদিন ছিল না, অন্ততঃ এই আকারে ছিল না, ক্রমে প্রকাশিত বা অভিব্যক্ত হইয়াছে;—এসকল কথা সকলেই স্বীকার করেন। আর কার্য্য বলিলেই তার একটা কারণও আছে, ইহা ধরিয়া লওয়া হয়। আস্তিক-নাস্তিক, সেশ্বর-নিরীশ্বর সকল মতবাদেই এই প্রত্যক্ষ কারণবাদ মানিয়াছে। এই কারণের প্রকৃতি বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিস্তর মতবিরোধ আছে; কিন্তু এই বিশ্ব যে একটা কার্য্য আর ইহার যে একটা কারণ আছে, এ সম্বন্ধে কোনও মতভেদ নাই। আর কার্য্য মাত্রেই কারণের পরিণাম, কারণই আপনি কার্য্যরূপে পরিণত বা আকারিত বা অভিব্যক্ত বা পরিবর্ত্তিত হয়, ইহাও অস্বীকার করা অসম্ভব। বলয়কঙ্কনাদির কারণ সুবর্ণ; এই সুবর্ণ বলয়কঙ্কনরূপে পরিণত বা আকারিত হইয়াই বলয়াদির প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা করে। আমার এই নিবন্ধের অন্তর্গত এই সকল পদের ও বাক্যের কারণ আমার মনের চিন্তা বা অন্তরের ভাব। আমার চিন্তা বা ভাবই এই নিবন্ধরূপে পরিণত বা আকারিত হইয়া ইহার রচনা ও অভিব্যক্তি করিতেছে। তবে এসকল কার্য্যের কারণ বস্তুতঃ

দুইটি—একটি নিমিত্ত কারণ, অপরটি উপাদান কারণ। কঙ্কনবলয়াদির নিমিত্ত কারণ স্বর্ণকার, উপাদান কারণ সোনা। স্বর্ণকারের মনের অলঙ্কারবিশেষের ছবিটি, সোনার সাহায্যে, সোনা গালাইয়া বা পিটিয়া, এই নূতন আকারে পরিণত বা আকারিত করিয়া, এসকল কঙ্কনবলয়াদির সৃষ্টি করিয়াছে। আমার এই নিবন্ধের নিমিত্ত কারণ আমার মনোভাব, উপাদান কারণ ভাষা। আমার মনোভাব ভাষাকে লইয়া, নিজের মনোমত করিয়া বিভিন্ন শব্দের, পদের, বাক্যের একটা বিশেষ সমাবেশ করিয়া তাহার মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করিতে যাইয়া, এই নিবন্ধরচনা করিতেছে। সোনারের মনের কঙ্কনবলয়াদির চিত্র বা মানসমূর্ত্তি সোনাকে আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সোনারের মনোভাব ও সোনার তাল—অর্থাৎ কঙ্কনবলয়ের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ দুই'—এই কঙ্কনবলয়ের আকারে পরিণত বা আকারিত হইয়া ইহাদের সৃষ্টি করিয়াছে। আমার অন্তরের চিন্তা ও ভাব বাহিরের ভাষাকে অবলম্বন করিয়া এই নিবন্ধরূপে প্রকাশিত হইতেছে। অর্থাৎ এই নিবন্ধের নিমিত্ত ও উপাদান—দ্বিবিধ কারণই এই নিবন্ধরূপ কার্য্যের মধ্যে, এই কার্য্যরূপে পরিণত বা আকারিত হইতেছে। ইহা কার্য্য-কারণবাদের মূল তত্ত্ব। এই তত্ত্ব সার্ব্বজনীন। যেখানে কারণ ও কার্য্য, সেখানেই এরূপ পরিণাম ঘটে। কার্য্য বলিতেই কারণের পরিণাম বুঝায়। কারণে যাহা নাই কার্য্যেতে তাহা থাকিতে পারে না। কারণে যাহা প্রচ্ছন্ন, কার্য্যে তাহাই কেবল প্রকাশিত হয়। কোনও কার্য্যের মধ্যেই আপনার কারণ ছাড়া, আর কোনও কিছুর প্রকাশ বা প্রতিষ্ঠা হয় না, হইতেই পারে না।

এই বিশ্বের কারণ কি, এসম্বন্ধে নানা মত আছে, নানা মত থাকিতে পারে। কিন্তু সে কারণ একই হউক কিম্বা বহুই হউক, তাহা চেতনই হউক, আর জড়ই হউক,—যাহাই হউক না কেন, সেই কারণই যে বিশ্ব-কার্য্যরূপে প্রকট ও পরিণত হইয়াছে ও হইতেছে, কারণবাদের প্রকৃত তত্ত্ব যে বুঝে সে'ই একথা মানিবে। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বা ভগবান

যদি এই ব্রহ্মাণ্ডের কারণ হয়েন, তাহা হইলে তিনিই যে এই ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত বা আকারিত হইয়াছেন বা হইতেছেন, এই বিশ্বের সমষ্টির ও ব্যষ্টির সকলের কারণ যখন ঈশ্বর, তখন সমষ্টিভাবে এই বিশ্ব ও ব্যষ্টিভাবে ইহার অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ যে তাঁহারই অভিব্যক্তি, তাঁহারই অবতার, একথা না মানিয়া চারা আছে কি? যদি বল ঈশ্বর বিশ্বের নিমিত্ত কারণ মাত্র, উপাদান কারণ নহেন, তাহা হইলেও এই বিশ্বের আকারটা যে তাঁরই মনোভাবের অভিব্যক্তি, তাঁরই চিন্তার প্রকাশ, ইহা মানিতে হইবে। অর্থাৎ তাহা হইলেও এই ব্রহ্মাণ্ড সমষ্টিরূপে ও ব্যষ্টিরূপে ব্রহ্মের বা ঈশ্বরেরই একরূপ অবতার ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সে অবস্থায়, অর্থাৎ অপর উপাদান কারণ আছে বলিয়া, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ডে সম্পূর্ণরূপে পরিণত হইয়াছেন, এমন বলা যাইবে না। কিন্তু তখনও তাঁর আংশিক অবতাররূপে এই ব্রহ্মাণ্ডকে গ্রহণ করিতেই হইবে।

কেহ কেহ ভাবেন ঈশ্বরের শক্তি এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছে—ঈশ্বরই যে নিজে ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত বা প্রকাশিত হইয়াছেন, তাহা নহে। কিন্তু শক্তিমান আর শক্তিতে কোনও প্রভেদ আছে কি? শক্তি যখন কোনও কার্য্য উৎপাদন করে, তখনই কেবল আমরা তাহাকে শক্তিমান হইতে পৃথক্ করিয়া ভাবি। কোনও কার্য্যবিশেষের মধ্যে যতক্ষণ শক্তি প্রকাশিত না হয়, ততক্ষণ তাহাকে আমরা শক্তিমান হইতে পৃথক্ জানি না, জানিতে পারি না, ভাবি না, ভাবিতেও পারি না। আর শক্তি অর্থ কি? শক্তির লক্ষণ কি? প্রামাণ্য কোথায়? শক্তি যতক্ষণ নিষ্ক্রিয় থাকে, ততক্ষণ তাহার প্রামাণ্য থাকে না। যাহার দ্বারা কোনও কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহাকেই ত আমরা শক্তি বলিয়া জানি। তবে শক্তি আর কারণ একই কথা নয় কি? যখন ব্রহ্মকে বা ঈশ্বরকে বা ভগবানকে জগৎকারণরূপে দেখি, তখন তাঁহাকে শক্তিরূপেই দেখিয়া থাকি। আর তখন এই শক্তিকে ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের বা ভগবানের স্বরূপবস্তু, তাঁহার

মূল প্রকৃতির অন্তর্গত বলিয়াই ভাবি। কারণ হইতে যখন কার্য্য প্রকাশিত হয়, তখন যেমন সেই কার্য্যকে সেই কারণেরই বিকার-রূপে দেখি; সেইরূপ জগৎ-কার্য্য দেখিয়াই আবার জগৎকারণকে এই কার্য্যের মধ্যেই দেখিয়া থাকি। এই কার্য্যকে সেই কারণের পরিণাম বলিয়াই জানি। ঈশ্বরের শক্তিই জগতের কারণ। এই শক্তি ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন, তাঁহারই স্বরূপ বস্তু। এই জগৎ সেই স্বরূপ শক্তিরই বিকার, পরিণাম, বা কার্য্য। সেই স্বরূপ শক্তিই এই জগৎকার্য্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এই জগতের যাবতীয় পদার্থ সেই শক্তিরই পরিণাম ও প্রকাশ। ভগবদ্‌শক্তি এই বিশ্বে, এই বিশ্বরূপে, সমষ্টিভাবে ও ব্যষ্টিতাকারে অবতীর্ণ হইয়াছে। এসকল কথা অস্বীকার করা যায় কি?

তার পর, এই ঐশী শক্তি এই বিশ্বসৃষ্টি ব্যাপারে অপর কোনও পদার্থের সাহায্য লইয়াছে কিনা, এই প্রশ্নও উঠে। যদি বল লইয়াছে, তাহা হইলে এই ঐশী শক্তি জগতের একমাত্র কারণ নহে। অর্থাৎ সে-অবস্থায় ঈশ্বরকে বা ভগবানকে বা ব্রহ্মকে বিশ্বের নিমিত্ত কারণই কেবল বলিতে হয়; নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ দুই যে ব্রহ্ম, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু ইহাতেও সকল গোল মিটিল না। নিমিত্ত ও উপাদান এই উভয়বিধ কারণ মিলিয়া যেখানে কোনও কার্য্য উৎপাদন করে, সেখানে ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হয়। সম্বন্ধ ছাড়া এরূপ মিলন হইতে পারে না। আর যেখানেই দুই বস্তুর মধ্যে কোনও সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হয়, সেখানেই একটা সাধারণ সম্বন্ধ-সূত্রেরও প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধের সূত্র সম্বন্ধের অন্তর্গত বস্তুসকলকে ধারণ করিয়া রহে। এই সম্বন্ধ-সূত্র সেই বস্তুসকল অপেক্ষা বড় হওয়া চাই, তাহাদের সকলের মধ্যে এবং যুগপৎ সকলের অতীতে থাকা চাই। মণি-হারের সূত্র যেমন প্রত্যেক স্বতন্ত্র মণিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, তাহাকে ও হারের অপর সকল মণিকে অতিক্রম করিয়া রহে; সেইরূপ কোনও সম্বন্ধের

সম্বন্ধ-সূত্রও সম্বন্ধের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক বস্তু বা তত্ত্বকে অধিকার করিয়া, একই সঙ্গে তাহাদের অতীতে থাকে। সুতরাং ঈশ্বর বা ব্রহ্ম যদি জগতের নিমিত্ত কারণমাত্র হয়েন, আর পরমাণু বা অন্য কিছু যদি ইহার উপাদান কারণ হয়,—স্বর্ণকার যেমন সোনার উপাদানে অলঙ্কার নির্ম্মাণ করে, কিম্বা কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকার উপাদানে ঘটসরাবাদি নির্ম্মাণ করে, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর যদি সেইরূপ কোনও বাহিরের উপাদান লইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডকে গড়িয়া পিটিয়া বর্ত্তমান আকারে পরিণত করিয়াছেন, এরূপ কল্পনা করিতে হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের উপরে আর একটা তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক হইয়া উঠে। কেননা, এইরূপ একটা চরমতত্ত্বেতেই তখন জগৎসৃষ্টিব্যাপারে ব্রহ্ম বা ঈশ্বররূপ নিমিত্ত কারণের ও পরমাণু প্রভৃতি উপাদান কারণের প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক হইয়া উঠে। আর সে-অবস্থায় ঐ চরমতত্ত্বেতে ঈশ্বরের ও জগতের, ব্রহ্মের ও ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহাকেই আদিকারণরূপে গ্রহণ করিতে হয়। তখন ঈশ্বর বা ব্রহ্ম আর পরমাণু বা জগতের উপাদান, উভয়ই সেই আদিকারণের পরিণাম বা বিকার বা প্রকাশ বা অবতার হইয়া যায়।

কারণের মধ্যে যাহা থাকে, তৎসমুদায়, পূর্ণমাত্রায় কার্য্যেতে প্রকাশিত হয় না, হইতেই পারে না ; ইহা সত্য। সুতরাং জগৎকারণ যাহাই হউক না কেন, তাহার সমগ্রতা কখনই জগৎকার্য্যরূপে পরিণত হয় না। সুতরাং এই অর্থে পূর্ণ-অবতার কথাটি সত্য নহে। অবতার যাহা হইতে হয়, তাহাকে আমাদের শাস্ত্রীয় পরিভাষায় অবতারী করিয়াছেন। অবতারী হইতেই অবতারের প্রকাশ হয়। অবতারী অবতারের কারণ। আর কারণ বলিয়া অবতারী আপনার কার্য্যরূপ অবতারকে সর্ব্বদাই অতিক্রম করিয়া রহেন। অর্থাৎ অবতারী কখনওই নিঃশেষে আপনাকে তাঁহার কোনও অবতারের মধ্যে প্রকাশিত করিতে পারেন না। অবতারীর এই অক্ষমতা

বাহিরের নয়, তাঁর ভিতরের; অপরের আরোপিত নহে, তাঁহার আপনার প্রকৃতিরই অন্তর্গত। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া আপনার রূপকেও যে অতিক্রম বা বিপর্য্যস্ত করিতে পারেন, তাহা নহে। তাঁহার সর্ব্বপ্রকার শক্তিমত্তা তাঁর স্বরূপের অন্তর্গত, স্বরূপ-ধর্ম্ম। এই স্বরূপ নষ্ট হইলে তাঁর সর্ব্বশক্তিমত্তার আশ্রয় এবং প্রতিষ্ঠাও ত থাকে না, তখন এই সর্ব্বশক্তিমত্তা পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য, সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া, ঈশ্বর যে আপনার কারণ-স্বরূপকে নষ্ট করিয়া নিঃশেষে আপনাকে কার্য্যরূপে পরিণত বা অভিব্যক্ত করিতে পারেন, এমন কখনই বলা যায় না। এই জন্যই প্রকৃতপক্ষে যে-চরমতত্ত্বকে আমরা জগৎ-কারণরূপে প্রতিষ্ঠিত করি, এই সৃষ্টি-ধারাতে কোথাও তাঁর কোনও নিঃশেষ প্রকাশ বা পূর্ণ অবতার সম্ভবে না। এই জগৎকারণ অব্যক্ত। এই অব্যক্ত-তত্ত্বই সৃষ্টিতে ব্যক্ত হইতেছে। কিন্তু স্বরূপতঃ যাহা অব্যক্ত, তাহার নিঃশেষ অভিব্যক্তি অসম্ভব। এইরূপ অভিব্যক্তিতে তার অব্যক্ত-স্বরূপই যে নষ্ট হইয়া যায়। অবতার অর্থই প্রকাশ বা অভিব্যক্তি। নিঃশেষ অভিব্যক্তি আর পূর্ণাবতার একই কথা। এই জন্যও জগৎকারণের পূর্ণাবতার সম্ভবে না।

তবে কার্য্যের মধ্যে কারণের নিঃশেষ প্রকাশ অসম্ভব হইলেও, কারণতত্ত্ব সর্ব্বদাই অখণ্ড ও পরিপূর্ণরূপে আপনার কার্য্যের অন্তরালে বিদ্যমান থাকেন। প্রকাশেরই তারতম্য ঘটে, সত্তার ইতরবিশেষ থাকে না। স্বর্ণকারের সমগ্রতাই তাহার নির্ম্মিত কঙ্কনবলয়াদির অন্তরালে বিদ্যমান থাকে, কিন্তু তাহার শক্তির ও জ্ঞানের ও কারুকুশলতার সামান্য অংশ মাত্রই এ সকল অলঙ্কারেতে প্রকাশিত হয়। সেইরূপ জগৎকারণ সমগ্রভাবেই জগতের প্রত্যেক কার্য্যের অন্তরালে বিদ্যমান থাকেন, কিন্তু এ সকল কার্য্যে তাঁর অংশ মাত্র প্রকাশ করে। সত্তার দিক্ দিয়া ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বা ভগবান এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র সমভাবে, পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। জড় ও চেতন,

মন্দ ও ভাল, অসাধু ও সাধু, পাপী ও পুণ্যবান—সকলের মধ্যে ভগবান পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। কোথাও কম কোথাও বেশী নহেন। কিন্তু প্রকাশের বা অভিব্যক্তির দিক্ দিয়া বিস্তর ইতর বিশেষ রহিয়াছে। চেতনে তাঁর যতটা প্রকাশ, জড়েতে ততটা নাই। সাধুতে, পুণ্যবানে যতটা প্রকাশ, অসাধু পাপীতে ততটা নাই। এ সকল কথা সর্ব্ববাদীসম্মত। সত্তার দিক্ দিয়া দেখিলে সাধারণ মানুষের মধ্যে তিনি যেমন আপনার পরিপূর্ণ স্বরূপে বিদ্যমান, শ্রেষ্ঠতম অবতারের মধ্যেও সেইরূপই,—পূর্ণতার ত আর কম-বেশ নাই। কিন্তু প্রকাশের দিক্ দিয়া প্রাকৃত মানুষে আর অবতারেতে আকাশ-পাতাল প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। আর এই প্রকাশের দিক্ দিয়া বিচার করিয়াই, যেখানে লোকে ভগবানের অত্যধিক বা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রকাশ দেখিতে পায়, সেখানেই তাঁর পূর্ণ অবতার হইয়াছে—ইহা বলে। প্রকৃতপক্ষে, তত্ত্ববিচারে—সত্যের আলোচনাতে, এরূপ পূর্ণাবতারের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। ভগবদ্গীতা বারম্বার এই কথা বলিয়াছেন। প্রাচীন প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে গীতাতেই প্রথমে পরিস্ফুটরূপে অবতার কথার অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই গীতাই আবার ভগবানের পূর্ণ অবতার একরূপ অস্বীকার করিয়াছেন।

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ

বুদ্ধিহীন লোকে যে-আমি অব্যক্ত সেই আমিই ব্যক্তিত্ব প্রাপ্ত হই, এরূপ মনে করিয়া থাকে। অর্থাৎ সম্যকদর্শী পণ্ডিতেরা এরূপ মনে [illegible]ন না। তাঁহারা ইহা জানেন যে অব্যক্তের পূর্ণ অভিব্যক্তি সম্ভব নহে। যে-ভাগবত পরবর্ত্তীকালে অবতারবাদের পুচ্ছ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছেন, সেই ভাগবত শাস্ত্রে পর্য্যন্ত এই পূর্ণাবতার অস্বীকার করিয়াছেন। ভাগবত-বর্ণিত এই অবতার-তত্ত্বটি অতি অপূর্ব্ব ব[illegible]। ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের চরম সিদ্ধান্তের আশ্রয়েই প্রকাশিত হইয়াছে। ভাগবত প্রথম শ্লোকে সাধ্য-নির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ করিতে যাইয়া জগতের

জন্ম-আদি যে-ব্রহ্ম হইতে হয়, সেই পরম সত্যের ধ্যান করি, এই কথা বলিয়া, আপনাকে প্রস্থানত্রয়ের সঙ্গে অনুস্যূত করিয়াছেন।

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥

অর্থাৎ—সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের ধ্যান করি। তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও স্বপ্রকাশ। যে-বেদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞানিগণও মোহাচ্ছন্ন হয়েন, তিনি আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে সেই বেদ প্রকাশ করিয়াছেন। যেমন মরীচিকা ও কাচাদিতে বারিবুদ্ধি ভ্রমমাত্র, সেইরূপ ভ্রমবশতঃই তাঁহাতে এই সৃষ্টি কল্পিত হইয়া থাকে। তিনি মৃত্তিকা ও স্বর্ণের মতন কারণ-রূপে, আবার ঘট ও কুণ্ডলের মতন কার্য্যরূপে আবির্ভূত হইয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করেন। তিনি আপনার তেজের দ্বারা সমস্ত কুহক নিরস্ত করেন।

এই শ্লোকার্থই ভাগবত-শাস্ত্রের অদ্বৈতপরত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের নবম অধ্যায়ে, ৩২-৩৩-৩৪ শ্লোকে ব্রহ্মা-প্রতি ভগবদ্বাক্যেও ইহাই পরিপূর্ণরূপে সমর্থিত হইয়াছে।

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞান সমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥
যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥

এইরূপে পরম গুহ্য জ্ঞানের কথা বলিতে যাইয়া ভগবান আপনাকে অদ্বৈততত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পরবর্ত্তী ৩৪ শ্লোকে তার প্রমাণ দেখিতে পাই।

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎ পরম।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥

ভাগবতের এই শ্লোকে বৃহদারণ্যকোপনিষদের প্রথম শ্রুতির প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যক-উপনিষদ—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

অর্থাৎ—তাহা (বিশ্বের অব্যক্ত বীজ) পূর্ণবস্তু। ইহা (এই প্রত্যক্ষ জগৎ) পূর্ণ। পূর্ণ হইতে পূর্ণ উৎপন্ন হয়। এই পূর্ণ যখন ঐ পূর্ণেতে প্রত্যাগত হয়, তখন পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে।—এই শ্রুতিতে যে-তত্ত্ববস্তুর উল্লেখ করিয়াছেন, ভাগবত উপরি-উদ্ধৃত শ্লোকে তাহারই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ভাগবত যে ভগবদ্-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা পূর্ণ-তত্ত্ব, তাহা অদ্বৈততত্ত্ব, তাহাই জগতের একমাত্র কারণ, এই ভগবদ্-বস্তুই বিশ্বের নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ দুই। অতএব এই বিশ্ব ভগবানের অখণ্ড ও পূর্ণ সত্তারই প্রকাশ। বিশ্বের সমষ্টি ও ব্যষ্টির মধ্যে ভগবান পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান। তবে সত্তার দিক্ দিয়া তিনি সর্ব্বত্রই পূর্ণ থাকিলেও, প্রকাশের দিক্ দিয়া তারতম্য আছে। ভাগবত কখনও এই কথাটি বিস্মৃত হন নাই।

ভাগবতের সৃষ্টি-প্রকরণ তার প্রমাণ। বারান্তরে ইহার সবিস্তার আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

জাতীয় জীবনে ধ্বংসের কারণ

[২]

<u>পরাধীনতা</u>—প্রবলের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ফলে দুর্ব্বল যে সকল সময়ে যুদ্ধ করিয়া নির্ম্মূল হইয়া যায়, তাহা নহে। দুর্ব্বলকে পরাস্ত করিয়া প্রবল তাহাকে আপনার দাসত্বেও নিযুক্ত করিতে পারে। আর এই যে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলকে নিজের দাসত্বে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা, ইহা জীবজগতের নিম্নস্তরেও দেখিতে পাওয়া যায়। পিপীলিকাদের মধ্যে কোন কোন বলবান্ জাতীয় পিপীলিকারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল জাতীয় পিপীলিকাদিগকে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগকে দাসত্বে নিযুক্ত করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রথমতঃ পরাধীনতা স্বীকার করিতে বিস্তর বাধা দিলেও, পরে এই দাস পিপীলিকারা প্রভুদের তৃপ্তির জন্য সমুদায় পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য করিয়া থাকে ও প্রভুরা তাহাদের সেবায় দিব্য আরামে থাকেন (৮)।

মানুষের মধ্যে এই প্রবৃত্তি অতি আদিমকাল হইতেই দেখা যায়। বোধ হয় মনুষ্যসৃষ্টির প্রথমাবস্থা হইতেই প্রবলেরা দুর্ব্বলকে দাসরূপে খাটাইয়া আসিতেছে। যুদ্ধের বন্দীরাই প্রধানতঃ এইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হইত। প্রায় সমস্ত অসভ্য ও বর্ব্বর জাতির মধ্যেই এই দাসত্ব-প্রথা বিদ্যমান ছিল। ভারতীয় আর্য্য, গ্রীক, রোমক প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যজাতিদিগের মধ্যেও দাসত্ব-প্রথার বহুল প্রচলন ছিল। এমন কি ঐ সকল জাতির প্রবীণ, বুদ্ধিমান্ দার্শনিক ও শাস্ত্রকারেরা ঐ ব্যবস্থা ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট বলিয়াই স্থির করিয়াছিলেন। আরিষ্টটোল ইহাকে অতি স্বাভাবিক ব্যবস্থা বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছেন (৯)। আমাদিগের মনুসংহিতা দাস শূদ্রজাতিকে সৃষ্টিকর্ত্তার

(৮) Darwin—Origin of Species.

(৯) Arristotle—The State.

চরণ হইতে উদ্ভূত ও স্বভাবতঃই পরিচর্য্যাধর্ম্মী বলিয়া বিধান দিয়াছেন (১০)। প্রাচীন ও মধ্যযুগের আরব ইহুদী প্রভৃতি সেমিটিক জাতির মধ্যে এই দাসত্ব-প্রথা অতি নিষ্ঠুর ও ঘৃণ্য আকার ধারণ করিয়াছিল। পালিত পশু ও অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় দাস ক্রয়-বিক্রয়ের প্রথা এই সময়েই বিশেষরূপে বদ্ধমূল হয়। অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় দাসদাসীর দ্বারাও লোকের ধন নির্ণয় করা হইত। দাস-বিপণিসমূহে বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোকেরাই বেশী বিক্রিতা হইত। এই সকল বাঁদীদের যৌবন, সৌন্দর্য্য, কলাকুশলতা প্রভৃতি দ্বারা উহাদের মূল্য নির্ণীত হইত। জীবন হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ইহাদের নিজের বলিতে কিছুই থাকিত না। তিল তিল করিয়া প্রবলের সেবায় জীবন-উৎসর্গ করিয়া ইহারা মানবজন্ম শেষ করিয়া দিত। তারপর মধ্যযুগে যখন ইউরোপীয়েরা আফ্রিকা ও আমেরিকার দুর্ব্বল অসভ্য জাতিদের সন্ধান পাইল, তখন তাহারাও প্রবলভাবে এই দাস ব্যবসায় চালাইতে আরম্ভ করিল। এই সমস্ত নিরীহ নিগ্রো জাতিদের উপর উহারা কিরূপ অমানুষিক অত্যাচার করিত—কিরূপে তাহাদিগকে যথেচ্ছরূপে ক্রয়-বিক্রয় করিত, বোধ হয়, কাহারও তাহা অবিদিত নাই। Uncle Tom's Cabinএর করুণ-কাহিনী তাহা বিশ্ববাসীর মনে চিরদিন জাগ্রত করিয়া রাখিবে। মানবজাতির ইতিহাসে ইহা অপেক্ষা গভীরতম কলঙ্ককালিমা বোধ হয় আর কোথাও দেখা যায় না। এই অকথ্য অত্যাচার শেষে সহিষ্ণুতার শেষ সীমায় উঠিয়া বোধ হয় ভগবানের সিংহাসন পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল; আর তাহারই ফলে বোধ হয় ইংরাজজাতির স্বার্থত্যাগ ও

(১০) মনুসংহিতা।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের দাসব্যবসায়ীরা ও তাঁহাদের সঙ্গী খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকেরাও দাসত্ব-প্রথাকে ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট স্বাভাবিক প্রথা বলিয়া প্রচার করিতেন।—লেখক।

অধ্যবসায়ে পৃথিবী হইতে এই দাসত্ব-প্রথা লুপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু বলিতে গেলে ইহা এখনও লোপ পায় নাই। এখনও Indentured labour system (চুক্তিবদ্ধ-কুলি-প্রথা) প্রভৃতির ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া এই দাসত্ব-প্রথা বিভিন্ন দেশে আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। ফিজি, নিউগিয়ানা, ট্রিনিডাড্, সুরিনাম, জ্যামেকা প্রভৃতি স্থানে দুর্ভাগ্য ভারতবাসীর অবস্থা (১১), এবং আফ্রিকার ও দক্ষিণ আমেরিকার রবারক্ষেত্র প্রভৃতিতে নিগ্রোদের অবস্থা দেখিলে বলিতে হয় যে, দাসত্ব-প্রথা নাম বদলাইয়া এখনও মানবসভ্যতাকে বিদ্রূপ করিতেছে।

এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহাকে প্রধানতঃ ব্যক্তিগত দাসত্ব ও পরাধীনতা বলা যায়। কিন্তু দাসত্ব ও অধীনতার আর এক মূর্ত্তি আছে, যাহার নাম দেওয়া যাইতে পারে জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় দাসত্ব বা অধীনতা। মানব-ইতিহাসে সাম্রাজ্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই ইহার আবির্ভাব দেখা যায়। প্রবলতর রাষ্ট্র বা জাতি, দুর্ব্বলতর রাষ্ট্র বা জাতিকে চিরকালই অধীন করিতে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে ও সফলকাম হইলে তাহাকে নিজের কাজে লাগাইয়াছে। পৃথিবীতে বর্ত্তমানে যে সকল প্রাচীন রাষ্ট্র বা জাতির অস্তিত্ব আছে, তাহাদের অধিকাংশই কোন না কোন সময়ে অন্যের অধীনতা সহ্য করিয়াছে—ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ব্যক্তিগত দাসত্ব-প্রথা পৃথিবী হইতে এক প্রকার লোপ পাইয়াছে। কিন্তু জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় দাসত্ব এখনও প্রবলভাবে কার্য্য করিতেছে ও সভ্যতার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির সঙ্গে, তাহা যে কোন দিন লুপ্ত হইবে, এরূপ আশার কারণ আজও দেখা যাইতেছে না।

স্বাধীনতা স্বাভাবিক, পরাধীনতা অস্বাভাবিক। জীবদেহ আভ্য-

(১১) লর্ড হার্ডিঞ্জের মহত্ত্বে এই প্রথা শীঘ্রই রহিত হইবে এরূপ আশা পাওয়া গিয়াছে।—লেখক।

ন্তরীণ শক্তি হইতে নিজেই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া উঠে। তাহার চরম পরিণতি, তাহার নিজের মধ্যেই নিহিত থাকে,—আর জৈব-বিকাশের গতি স্বাভাবিক ক্রিয়াবলে সেই চরম পরিণতির দিকেই অগ্রসর হইতে থাকে, পারিপার্শ্বিক বাহ্যশক্তি তাহাকে সাহায্য করে বটে,—পারিপার্শ্বিক বাহ্যশক্তিসমূহকে আশ্রয় করিয়া, তাহাদিগকে নিজের কাজে লাগাইয়া, জীবদেহ আপনার বিকাশ সাধন করে বটে; কিন্তু বাহ্যশক্তি ঐ বিকাশের নিয়ামক নহে। বরং যেখানেই বাহ্যশক্তি সহায়ক না হইয়া নিয়ামক হইয়া উঠে, সেখানেই জৈব বিকাশের স্বাভাবিক গতির পথে বাধা উপস্থিত করে; সেখানেই বিকাশ 'স্বাধীন' না হইয়া 'পরাধীন' হইয়া পড়ে। সর্ব্বত্রই দেখা যায়, বাহ্যশক্তির এই বাধা জৈব বিকাশের পক্ষে হিতকর হয় না; জীবদেহের আভ্যন্তরীণ শক্তিকে সে পঙ্গু ও খর্ব্ব করিয়া ফেলে। উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগতে ইহার দৃষ্টান্ত নিত্যই দেখা যায়। অতি সামান্য বাহিরের বাধা জৈব বিকাশের গতিকে বিকৃত ও রুদ্ধ করিয়া দেয়, তাহার প্রমাণের অভাব নাই (১২)।

জীবদেহের পক্ষে যেমন, জাতির পক্ষেও তেমনই একথা সম্পূর্ণরূপে খাটে। প্রত্যেক জাতিই নিজের শক্তিবলে ও পারিপার্শ্বিক শক্তিসমূহকে আশ্রয় করিয়া উন্নতির দিকে—বিকাশের দিকে অগ্রসর হয়। বাহিরের কোন শক্তি যদি এই জাতির ঘাড়ে চাপিয়া বসে, তবে তাহার জাতীয় বিকাশ আর স্বাভাবিকরূপে ঘটে না, সে জাতি পঙ্গু ও দুর্ব্বল হইয়া যায় ও মৃত্যুমুখে অগ্রসর হয়।

এক জাতি আর এক জাতির অধীন হইলে, তাহার জাতীয় জীবনের সর্ব্বদিকেই যে বিকাশের বাধা হয়, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

প্রথমতঃ—ধনোৎপাদন ও বণ্টন বিষয়ে জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক ধারায় অনেক বাধা উপস্থিত হয়। যে জাতি প্রভু হইয়া বসে,

(১২) Darwin—Origin of Species.

সে অধীন জাতির উৎপন্ন ধনাদিতে নিজের ভাগ যথাসাধ্য জোর করিয়া বা কলে-কৌশলে আদায় করিয়া লয়। নিজেদের সুবিধার জন্য এমন সমস্ত নিয়ম ও বিধি নিষেধাদি প্রচলন করিতে থাকে যে, অধীন জাতির পক্ষে সেগুলি হিতকর হইতেই পারে না। অধীন জাতি যদি প্রভুজাতির তুলনায় নিতান্ত অসভ্য ও বর্ব্বর হয়, তবে তাহাকে স্বদেশে দাসরূপে কেবল প্রভুজাতির কার্য্যের জন্যই জীবন ধারণ করিতে হয়। আর যদি অধীন জাতিও কতকটা সভ্য ও উন্নত হয়, তাহা হইলেও প্রভুজাতির শক্তি এবং কৌশলবলে, তাহাকে পরিশ্রমলব্ধ ধনের অনেক অংশ হইতেই বঞ্চিত হইতে হয়। দেশমধ্যে ধনোৎপাদনের যে সকল লাভজনক পন্থা থাকে, প্রভু-জাতিই তাহা হস্তগত করিয়া লয়, এবং অধীন জাতির উন্নতির পথে যত প্রকার বাধা দেওয়া যাইতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে সে ছাড়ে না। কারণ দাসজাতি চিরদিনই তাহার পদানত ও সেবাপরায়ণ হইয়া থাকিবে ইহাই স্বাভাবিক ইচ্ছা; আর যাহাতে ইহার বিপরীত ঘটিতে পারে সেরূপ ব্যবস্থায় সে সহজে প্রশ্রয় দেয় না। ফলে প্রভুজাতি ক্রমে ধনী ও ক্ষমতাশালী, এবং দাসজাতি দরিদ্র ও নিস্তেজ হইয়া পড়িতে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ—দুর্ব্বল ও স্বল্পসভ্য জাতি, প্রবলতর ও সভ্যতর জাতির সংস্পর্শে আসিলে, তাহার সামাজিক জীবনেও মহা অনিষ্ট সংঘটিত হয়। এই সংঘর্ষের ফলে অধীন দুর্ব্বল জাতির জীবনে যে পরিবর্ত্তন উপস্থিত [illegible] তাহার সমাজ-ব্যবস্থায় অনেক সময়ে যে বিপ্লব ঘটে, তাহার ফল জাতীয় জীবনের পক্ষে হিতকর হয় না (১৩)। যে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে অধীন জাতি পূর্ব্বে জীবন নির্ব্বাহ করিতেছিল, তাহাতে ধাক্কা লাগাতে তাহার সমগ্র জীবনপ্রণালীর উপর তীব্র আঘাত লাগে ও সে আঘাত অনেক সময়ে সে সামলাইতে পারে না।

(১৩) Darwin—The Descent of Man.

নূতন নূতন অভ্যাস ও প্রথা তাহার সমাজমধ্যে ঢুকিয়া তাহার বহুদিনের নির্দ্দিষ্ট জাতীয় জীবনের গতি অনেক সময়ে রুদ্ধ ও বিকৃত করিয়া তোলে ও জীবনীশক্তির মূল শিথিল করিয়া দেয়। নূতন সভ্যতা ও প্রবলতর জাতির সংস্পর্শে অনেক নূতন ও সাংঘাতিক ব্যাধিও সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকে (১৪) ও জাতীয় স্বাস্থ্য শোচনীয় হইয়া উঠে। অন্যদিকে প্রবল ও দুর্ব্বল দুই জাতির সংমিশ্রণে সঙ্করবর্ণের সৃষ্টি হইতে থাকে। এই সঙ্কর বা মিশ্রজাতি প্রায়ই দুর্ব্বল, জীবনীশক্তিহীন ও রুগ্ন হইতে দেখা যায়। অনেক স্থলে স্ত্রীলোকদের উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হইয়া যায় ও শিশুমৃত্যু বাড়িতে থাকে। মিশ্রণের ফলে প্রায়ই সমাজে নানারূপ ব্যভিচার ও দুর্নীতিও প্রবেশ করিতে থাকে এবং তাহাতেও জাতির জীবনীশক্তিকে হীন করিয়া ফেলে (১৫)। অষ্ট্রেলিয়ার মেওয়ারী জাতিদের মধ্যে ঠিক এইরূপই দেখা গিয়াছিল, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি (১৬)।

তৃতীয়তঃ—জীবনের সর্ব্ববিভাগে পরাধীন জাতির কার্য্যকরী শক্তির স্ফুর্ত্তি পাইবার সুযোগ প্রায়ই ঘটে না। রাষ্ট্র ও দেশশাসন প্রভৃতি ক্ষমতার কার্য্য ক্বচিৎ তাহাদের হাতে পড়ে। স্বভাবতঃ প্রভুজাতিরাই সকল প্রকার ক্ষমতার কার্য্য, বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন প্রভৃতি নিজেদের হাতে রাখিয়া দেয় ও আপনাদের উদ্দেশ্য অনুসারে অধীন জাতিদিগকে পরিচালিত করে। জাতীয় গৃহস্থালির বন্দোবস্ত অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় আয়ব্যয় প্রভৃতির বন্দোবস্তের ভারও তাহারা নিজের হাতে রাখে। শত্রু হইতে আত্মরক্ষা প্রভৃতি অত্যাবশ্যক বলের কার্য্যও অধীন জাতিরা অভ্যাস করিবার সুযোগ

---

(১৪) Ibid.

(১৫) Ibid.

(১৬) Ibid.

সকল সময়ে পায় না। এইরূপে, শারীরিক, মানসিক—সকল প্রকার বিকাশের পথেই তাহারা পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হইতে থাকে। তাহার ফলে তাহাদের মনুষ্যোচিত শক্তি ও বৃত্তিসমূহ ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়ে; এবং যতই পরাধীনতার কাল দীর্ঘতর হইতে থাকে, ততই তাহারা অধিকতর অকর্ম্মণ্য, অপটু, পরিশ্রমকাতর, উৎসাহহীন ও সর্ব্ব বিষয়ে পঙ্গু হইতে থাকে। যে কোন জাতিই দীর্ঘকাল পরাধীনতা ভোগ করিয়াছে, তাহাদেরই জাতীয় জীবনে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

চতুর্থতঃ—পরাধীন জাতির জীবনে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অনিষ্ট হয়, তাহা হচ্চে আত্মশক্তির উপর বিশ্বাসহীনতা। ক্রমাগত অধীনতার চাপে পিষ্ট হইয়া, দাসজাতি নিজের উপরে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে। অতীত ও বর্ত্তমানে নিজেদের মধ্যে যাহা কিছু ভাল থাকে, তাহা ভুলিয়া তাহারা আপনাদিগকে নিতান্তই অধম ও হেয় মনে করিতে থাকে ও প্রভুজাতির যাহা কিছু দেখিতে পায়, তাহাই উৎকৃষ্ট বলিয়া গ্রহণ করে। তাহাদের নিজের কোন উচ্চ আদর্শ থাকে না; ক্রমাগত বাধা পাইয়া, জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে তাহাদের যে কোন স্থান আছে, ইহা তাহারা ভুলিয়া যায়, ও গতানুগতিক ভাবে, নিতান্তই যন্ত্রচালিতবৎ তাহারা জীবন কাটাইতে থাকে। জ্ঞান বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়েই তাহাদের বুদ্ধি মলিন হইয়া যায়। প্রতিভার মৌলিকতা ও নব নব উন্মেষ তাহাদের মধ্যে বিরল হইয়া উঠে। খাঁচার পাখী যেমন শিখানো বুলিই আবৃত্তি করে, তেমনই পরপদাশ্রিত জাতিরা নিজেদের বিশেষত্ব হারাইয়া, কেবল প্রভু-জাতিরই শিখানো কথা আবৃত্তি করিতে থাকে; তাহারই প্রদর্শিত পন্থা উহাদের একমাত্র গতি হইয়া উঠে। আর এই যে অবস্থা,—জাতীয় জীবনের পক্ষে এর চেয়েও সাংঘাতিক অবস্থা আর কিছু হইতে পারে না। ইহা একপ্রকার মৃত্যুই বলা যাইতে পারে। জীব-ন্মৃতবৎ, জরাগ্রস্ত জাতি নিজের প্রাণশক্তি এইরূপে হারাইয়া, আপ-

নার অজ্ঞাতসারেই শোচনীয় ধ্বংসের পথে নিশ্চিতরূপে অগ্রসর হইতে থাকে।

শিল্পবাণিজ্যের হ্রাস ও দারিদ্র্য—জাতিতে জাতিতে প্রতিযোগিতার একটি বিশেষ মূর্ত্তি শিল্পবাণিজ্যে প্রতিযোগিতা। ধনোৎপাদন ও বণ্টনের উপরে জাতীয় স্থিতি ও উন্নতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সমাজের কতকাংশ কৃষি ও শিল্পের দ্বারা ধনোৎপাদন করে, নানা উপায়ে সেই ধনের বণ্টন হয়, ও বাণিজ্য দ্বারা তাহার বিনিময় ঘটে; এবং এইরূপে সমাজ-শরীরের বিভিন্নাঙ্গ বিভিন্ন প্রয়োজন সাধন করিয়া সমাজকে সুস্থ ও সবল রাখে। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যেক সমাজ নিজের প্রয়োজন নিজেই সাধন করে; ক্বচিৎ বা অন্য সমাজের সঙ্গে আদানপ্রদানের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া অভাব পূরণ করিয়া লয়। কিন্তু যখন কোন দুর্ব্বল ও স্বল্পসভ্যজাতি প্রবলতর বুদ্ধিমান্ জাতির সংস্পর্শে আসে, তখন অনেক সময় এই সকল ব্যবস্থা একেবারে উল্টাইয়া যায়। প্রবলতর বুদ্ধিমান্ জাতি, নিজের উন্নততর বৈজ্ঞানিক প্রণালীর বলে, দুর্ব্বলতর স্বল্পবুদ্ধি জাতির শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে হস্তগত করিয়া লয়; ধনোৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়ের সমস্ত স্বাভাবিক ব্যবস্থা সমাজের নিজের অধিকারচ্যুত হইয়া বৈদেশিক শক্তির করায়ত্ত হইয়া পড়ে। তাহার ফলে দুর্ব্বল জাতি ক্রমে ক্রমে দরিদ্র হইয়া পড়ে, তাহাদের মধ্যে শিল্পবাণিজ্যের হ্রাস হইয়া দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দেখা দেয়; এবং এইরূপে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইয়া দুর্ব্বল দরিদ্র জাতি ধ্বংসের মুখে যাইতে থাকে। আধুনিক কালে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রবলতর জাতিরা নানারূপে অভিনব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিয়া, শিল্পবাণিজ্যের নূতন নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছে ও পৃথিবীময় দুর্ব্বলতর স্বল্পসভ্য জাতিদের শিল্পবাণিজ্য হস্তগত করিয়া লইতেছে। দুর্ব্বলতর স্বল্পবুদ্ধি জাতিরা তাহাদের সঙ্গে প্রতি-যোগিতায় না পারিয়া ক্রমে ক্রমে দরিদ্র ও হতশ্রী হইয়া পড়িতেছে।

সামাজিক প্রথা ও কুসংস্কার—বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির সামঞ্জস্যের চেষ্টাতেই জীবনের লক্ষণ। আর জীবদেহ যতক্ষণ বাহিরের সঙ্গে এই সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে, ততক্ষণই সে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। সমাজের পক্ষেও ঠিক এই কথা বলা যাইতে পারে। যতক্ষণ সমাজ তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত নিজের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলিতে পারে, ততক্ষণই সে জীবন্ত থাকে; আর পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত তাহার সামঞ্জস্যের অভাব ঘটিলেই তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। জীবদেহ যখন বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তখন সে তাহার বাহিরের নানা শক্তিসমূহকে আশ্রয় করিয়া অগ্রসর হয়;—বাহ্য ও আভ্যন্তর নানা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে নানা বিচিত্র সম্বন্ধ স্থাপন করিতে থাকে। এই সম্বন্ধের সফলতার উপরেই জৈব-বিকাশের গতি নির্ভর করে। সমাজও তাহার বিকাশের পথে বাহ্যশক্তিসকলকে আশ্রয় করিয়া অগ্রসর হয়; ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহের বিবিধ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে প্রতিনিয়ত আপনার সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে থাকে। প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তনশীল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের শক্তিই জীবন্ত সমাজের লক্ষণ। সমাজের শৈশবাবস্থায় খাদ্যসংগ্রহ, আত্মরক্ষা, প্রভৃতি কয়েকটি অল্পসংখ্যক সরল সমস্যাকেই সমাজ সম্মুখে করিয়া অগ্রসর হয়। ঐ সকল সমস্যার সমাধানের জন্য তদুপযোগী বিধিব্যবস্থা প্রভৃতিও অবলম্বিত হয়। ক্রমে যতই সমাজ উন্নতি ও বিকাশের দিকে যাইতে থাকে, ততই তাহার সমস্যাগুলি সংখ্যায় বেশী ও জটিলতর হইতে থাকে;—সামাজিক প্রথা ও বিধিব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে তদুপযোগী বিচিত্ররূপে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। কালপ্রবাহ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। এই নিত্য পরিবর্ত্তনশীল কালপ্রবাহের উপর যে সমাজ বিচিত্র গতিতে অগ্রসর হইতে পারে,—তাহার ছন্দের সঙ্গে তাল মিলাইয়া চলিতে পারে,—সেই সমাজই জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকিতে পারে। জীব-বিজ্ঞানেও আমরা ইহার দৃষ্টান্ত পাই। Variation বা পরিবর্ত্তন

জৈব বিকাশের একটা প্রধান লক্ষণ। এই **variation** বা পরিবর্ত্তনের দ্বারা যে সকল জীব বাহ্যশক্তির সঙ্গে আপনাদের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে, তাহারাই জগতে টিকিয়া যায়; যাহারা তাহা পারে না, তাহারা লুপ্ত হইয়া যায় (১৭)। অবশ্য, এই চলা বা গতিও নিরবচ্ছিন্ন নহে; ইহার সঙ্গে স্থিতিও আছে। আর প্রকৃতপক্ষে গতি ও স্থিতি এই উভয়ে মিলিয়াই বিকাশকে গড়িয়া তোলে। স্থিতি দ্বারাই জীবের নিজস্ব বিশিষ্টতা রক্ষিত হয়, আর তাহাকে বজায় রাখিয়াই জীব ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইয়া বাহ্যপ্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া লয়। সামাজিক বিকাশেও স্থিতির কার্য্য আছে। এই স্থিতি দ্বারাই সমাজের বৈশিষ্ট্য বা তাহার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যটুকু রক্ষিত হয়;—প্রাচীন কালের সঙ্গে তাহার যোগাযোগ—তাহার পারম্পর্য্য ইহাতেই বজায় থাকে। আর ইহাকে ভিত্তি করিয়াই সমাজ ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তনশীল পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বাহ্যশক্তির সঙ্গে আপনাকে সুসঙ্গত করিয়া লয়। সুতরাং স্থিতি ও গতি এই উভয়ই সমাজের যথার্থ বিকাশ ও উন্নতির পক্ষে প্রয়োজনীয়; এ দুইয়ের কোনটিকে ছাড়িয়া সমাজ পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে না। যে সমাজ কেবল স্থিতিকেই আঁকড়াইয়া থাকে, বাহ্যশক্তির সঙ্গে মিলাইয়া আপনার বিধিব্যবস্থা, রীতিনীতি, আচার-প্রথা প্রভৃতির পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে পারে না, সে সমাজ পঙ্গু ও জড়। জীবন্মৃতবৎ সেই সমাজ শীঘ্রই ধ্বংসের মুখে যায়। অপর পক্ষে যে সমাজ কেবলই গতিকে বা চলাকে আদর্শ করিয়া লইয়াছে, সে সমাজ নিজের স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা হারাইয়া ফেলে; চারি পার্শ্বের নানা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে কেবলই চলিতে গিয়া সে নিজের লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বিশ্ব-মানবের সভাতে কোন স্থানই অধিকার করিতে পারে না। যে সমাজ স্থিতি ও গতি এই দুইকেই

(১৭) Darwin—Origin of Species.

যথাযোগ্য মিলাইয়া, কালপ্রবাহের সঙ্গে আপনার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে, সেই সমাজই আপনার স্বাতন্ত্র্য ও লক্ষ্য স্থির রাখিয়া যথার্থ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে। আধুনিক ইউরোপ ও আমেরিকার উন্নতিশীল জাতিসমূহের মধ্যে এই লক্ষণ অনেক পরিমাণে দেখা যায়। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, রাশিয়া, মার্কিণ প্রভৃতি সকলেই নিজের বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া, পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার সঙ্গে আপনাদিগকে মিলাইয়া স্থির গতিতে বিকাশের পথে চলিয়াছে। গতিকে এই সকল জাতি কোন দিনই উপেক্ষা করে নাই। বরং গতির দিকে একটু বেশী ঝোঁক দিতে গিয়াই উহারা জাতীয় জীবনে নানা কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। প্রাচ্য জাতির মধ্যে আধুনিক জাপান বিকাশ ও উন্নতির পথে আশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে। বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপ ও আমেরিকার জাতিসকলের সংস্পর্শে আসিয়া, সে বর্ত্তমান জগতের নবীন আদর্শ ধরিয়া ফেলিয়াছে ও সমস্ত প্রাচীন জড়তা ও দৈন্য পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বমানবসমাজে একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। পক্ষান্তরে জাপানের প্রতিবাসী চীন ঠিক ইহার উল্টাপথে চলিয়াছে। এই স্থবিরজাতি স্থিতিকেই প্রবলরূপে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। বহুশত বৎসরের আবর্জ্জনার জাল 'সনাতনীর' মোহে স্তূপাকার করিয়া তাহাতেই পরমানন্দ বোধ করিতেছে। বিশ্বমানবের গতিপথে যে সকল নব নব সমস্যার উদয় হইতেছে, তাহার সঙ্গে সে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিতেছে না, ও আপনাদের অতি প্রাচীন বিধিব্যবস্থা, আচার-প্রথা, রীতিনীতি প্রভৃতিকে প্রবল আসক্তির বশে নির্ব্বিচারে রক্ষা করিয়া, পঙ্গুতা ও জড়তার ভারে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। এরূপ ভাবে চলিলে তাহার মৃত্যু যে অদূরবর্ত্তী হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষ জীবন্ত ছিল। তাই প্রাচীন ভারতবর্ষ কোন দিনই 'সনাতনীর' মোহে জড়তাকে প্রশ্রয় দেয় নাই। নব নব অবস্থার

সঙ্গে সে আপনাদের বিধিব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া, নব নব সমস্যার সমাধান করিয়া বিকাশের পথে অগ্রসর হইয়াছে। প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের 'যুগধর্ম্ম' ও 'আপদ্ধর্ম্ম'ই সে বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ। কিন্তু আধুনিক ভারতবর্ষ স্থবির ও বৃদ্ধ চীনের ন্যায় নিজেকে পঙ্গু করিয়া ফেলিতেছে। নূতন পৃথিবীর নূতন আদর্শের সঙ্গে সে আপনাকে মিলাইয়া লইতে পারিতেছে না। পূর্ব্বপুরুষের গৌরবের মোহে অন্ধ হইয়া সে জীবনহীনতাকেই প্রশ্রয় দিতেছে ও অনাদিকালের জঞ্জালজাল সযত্নে রক্ষা করিয়া মৃত্যুব্যাধির বীজকেই পুষ্ট করিয়া তুলিতেছে। কিরূপে প্রাচীনের সঙ্গে নবীনকে মিলাইয়া লইতে হয়, কি করিয়া আপনার স্বাতন্ত্র্য ও আদর্শ বজায় রাখিয়া বিকাশের পথে অগ্রসর হইতে হয়, তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, ও বিকৃত-বুদ্ধি চিররুগ্ন ব্যক্তির ন্যায়, শ্রেয়কে গ্রহণ করিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকেই অগ্রসর হইতেছি। সম্প্রতি একটা দৃষ্টান্ত দিলেই আমাদের এই শোচনীয় জড়তার কথা হৃদয়ঙ্গম হইবে। যে সময়ে পৃথিবীর সমস্ত মানবজাতি পরস্পরের সঙ্গে ভাব ও আদর্শের আদানপ্রদান করিতেছে, বিভিন্নজাতি পরস্পরের সাহায্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি করিতেছে,—সমুদ্র, আকাশ, জলবায়ু বা প্রাকৃতিক কোন শক্তিই যখন মানুষের উৎসাহকে বাধা দিতে পারিতেছে না, ঠিক সেই সময়েই আমরা 'সমুদ্রযাত্রানিষেধ' বিধি দৃঢ়রূপে রক্ষা করিয়া আপনাদের সূর্য্যালোকহীন অন্ধগুহার মধ্যে আরামে বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছি। এই বিংশ শতাব্দীর নব জাগ-রণের দিনেও যে জাতি এইরূপে জড়তাকে প্রশ্রয় দিয়া দিব্য আরামে ঘুমাইতে পারে, তাহাদের যদি ধ্বংস না হয়, তবে আর কাহার হইবে? নবীন পৃথিবীর নব নব আদর্শ, নব নব ভাবকে আমাদের 'অচলায়তনের' দৃঢ় প্রাচীর দিয়া ঠেকাইয়া রাখিতেই আমরা বিপুল চেষ্টা করিতেছি ও তাহার ফলে সেই অচলায়তনের মধ্যেই যে আমাদের জীবন্ত সমাধি ঘটিতে পারে তাহা ভুলিয়া যাইতেছি।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

কুন্দনন্দিনী

[আত্মকাহিনী]

১।

— আমি আবার আসিয়াছি। তোমরা আমায় চিনিতে পারিবে কি ? কেমন করিয়াই বা চিনিবে। আমি এখন যে "বয়সে স্ত্রীলোক সুন্দরী" সেই ত্রয়োদশ বর্ষীয়া কিশোরী নহি। অথবা বর্ষার পূর্ণ-সলিলা নদীর মত আমার মরণ সময়ের সপ্তদশ বর্ষীয়া যুবতী নহি। কাল আমার রূপ, যৌবন, প্রাণ সকলই অপহরণ করিয়াছে—লইতে পারে নাই আমার এই বুকভরা অনন্ত দুঃখ। যে দুঃখ আজিও আমার অন্তরাত্মাকে তুষানলের মত ধিকি ধিকি দগ্ধ করিতেছে, যে আগুন বুকে করিয়া আমি এই সীমাশূন্য মহাশূন্যের কোথাও ক্ষণেকের জন্য শান্তি পাই না, সে দুঃখ কাল অপহরণ করিতে পারে নাই। যদি মেঘারাবের মত আমার গম্ভীর স্বর থাকিত, তাহা হইলে এই অনন্ত মহাশূন্য আজ আমার হাহাকার ধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া যাইত।

কিন্তু আর পারিব না। এ দারুণ দুঃখ বুকে চাপিয়া রাখিয়া একাকিনী আর অনন্ত যন্ত্রণা সহিতে পারি না। যদি দেখাইবার হইত তবে দেখাইতাম যে, এ দারুণ আগুনে আমার হৃদয় ছারখার হইয়া গিয়াছে। হৃদয় ভস্ম হইয়া গিয়াছে—কিন্তু আগুন ত নিবিল না। ইন্ধন না পাইলেও কি দুঃখের আগুন আপনি জ্বলিতে থাকে ?

আর পারি না বলিয়া তোমাদের নিকট আমার দুঃখ-কাহিনী প্রকাশ করিতে আসিয়াছি। দেখি যদি তাহাতে যাতনার কিছু

উপশম হয়। শুনিয়াছি প্রকাশ করিতে পারিলে শোক দুঃখের লাঘব হয়। অনন্ত মহাশূন্যে আমার এ দুঃখ-কাহিনী শুনিবার কেহ নাই, তাই যে মর্ত্ত্যে আমার এই অনন্ত দুঃখের সৃষ্টি—সেইখানে দুঃখের কথা প্রকাশ করিতে আসিয়াছি। দুঃখের কথা শুনিতে কে চায়? সুখের পিপাসী তোমরা—আমার দুঃখের কথা শুনিতে চাহিবে না তাহা জানি। কিন্তু সুখ চাহিলেও জগতে তোমরা কেবল ত সুখ পাও না। সুখের সঙ্গে দুঃখও পাইয়া থাক। আমার ন্যায় অনন্ত দুঃখভাগিনী কেহ না থাকিলেও তোমাদের সকলেরই হৃদয়ে দুঃখের আগুন লুকায়িত আছে। হয় ত সেই দুঃখের কথা মনে পড়িয়া সময়ে তোমরা কাতর হইয়া থাক। যেমন উজ্জ্বল আলোকের পার্শ্বে ক্ষুদ্র দীপালোকের দীপ্তি একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে, তেমনি আমার অনন্ত দুঃখকাহিনী শুনিলে তোমাদের দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হইবে না। তাই বলিতেছি, আমার দুঃখ-কাহিনী শুনিয়া তোমাদের লাভ ব্যতীত ক্ষতি নাই।

তোমরা বোধ হয় এতদিন আমায় ভুলিয়া গিয়াছ। না ভুলি-বেই বা কেন? এ দুঃখিনীর স্মৃতি বুকে করিয়া রাখিবার, এ অভাগিনীর জন্য একবিন্দু অশ্রুপাত করিবার আবশ্যক বা অধিকার কাহারও নাই। আবশ্যক নাই কেন তাহা তোমরা বুঝিতে পার। জগতে ত আমার—আমার বলিবার কিছু—আমার বলিবার কেহ ছিল না। জগতে ত আমাকে একবিন্দু ভালবাসিবার কেহ ছিল না! ভালবাসিয়াছিল এক নগেন্দ্র। কিন্তু সে কি ভালবাসা, না রূপের মোহ? আমার উজ্জ্বল রূপবহ্নিতে মুগ্ধ নগেন্দ্র পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতে আসিয়াছিল। কিন্তু আমার কপালে বিধির বিধি বিপরীত হইল। আগুনে পড়িয়া পতঙ্গ পুড়িয়া মরে তাহা তোমরা চির-দিনই দেখিয়া আসিতেছ। কিন্তু পতঙ্গ পতনে আগুন নিবিয়া যায়, তাহা কখনও দেখিয়াছ কি? বলিতে পার ক্ষুদ্র দীপালোকে পতঙ্গ পড়িলে কখন কখন অগ্নি নির্ব্বাপিত হইতেও পারে। কিন্তু আমার

রূপ ত ক্ষুদ্র দীপালোকের মত ছিল না—জ্বালাময়ী অত্যুজ্জ্বল বহ্নির মত ছিল। নগেন্দ্র, দেবেন্দ্র—আরও কত ইন্দ্র চন্দ্র আমার রূপে পাগল হইয়াছিল। রূপ ত আমার সামান্য ছিল না। কিন্তু বলিয়াছি ত আমার কপালে বিধির বিধি বিপরীত হয়। নগেন্দ্র পুড়িল না—মরিলাম আমি। তোমরা বলিতে পার যে কেন নগেন্দ্র ত পুড়িয়াছিল। তোমার রূপবহ্নি নগেন্দ্রের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। তোমার রূপে নগেন্দ্র পাগল হইল, সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিল, নগেন্দ্রের সোণার সংসার ছারখার হইতে বসিয়াছিল। কিন্তু তার পর? তার পর সূর্য্যমুখী ফিরিয়া আসিল, নগেন্দ্র আবার সেই নগেন্দ্র হইল, নগেন্দ্রের সোণার সংসার আবার সেই সোণার সংসার হইল। সর্ব্বনাশ হইল কেবল এই অভাগিনীর। আমার ইহকাল, আমার পরকাল, আমার রূপ, আমার যৌবন—সকলই আমি হারাইলাম। কেবল রহিল রাবণের চিতার মত আমার এই চিরপ্রজ্বলিত দুঃখের আগুন। হায়! এ আগুন কি যুগযুগান্তরেও নিবিবে না?

বিধাতা কেন আমায় এত দুঃখভাগিনী করিয়াছিলেন—তাহা জানি না। তোমরা কেহ বলিতে পার কি? জন্মান্তর বাদী! তুমি বলিবে—পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে তোমার এত দুঃখ। আমি জাতিস্মরা হইয়া জন্মাই নাই। সুতরাং বলিতে পারি না যে পূর্ব্বজন্মে কত পাপ করিয়াছিলাম। কিন্তু দারুণ পাপই যদি করিয়াছিলাম, তবে এ বিসদৃশ সম্মিলন কেন? আঢ্য বংশে জন্মিয়া আমি দরিদ্র [illegible] আমার এ অসামান্য রূপলাবণ্য কেন? আমার হৃদয়ে এত কোমলতা কেন? বিধাতা যদি আমায় দরিদ্র বংশে জন্ম দিতেন, যদি আমায় কুরূপা—অঙ্গহীনা করিতেন, যদি আমার হৃদয়ে সুখদুঃখ অনুভবের এরূপ তীক্ষ্ণশক্তি না দিতেন, তবে এত দুঃখ সহিয়াও—[illegible]মার এত দুঃখ থাকিত না। তুমি আবার বলিবে, সকলি তোমার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল। ভাল, মানিলাম কর্ম্মফল—কিন্তু একটা কথা আমার বলিবার আছে। কোথা হইতে এ কর্ম্মফল

উদ্ভূত? এ বিশ্বের স্রষ্টা কে? কে এই অনন্ত বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া—অসংখ্য জীব সৃষ্টি করিয়া—তাহাদের হৃদয়ে সুখদুঃখ দিয়া—এই বিরাট বিশ্বসংসাররূপ খেলা খেলিতেছে? আস্তিক! তুমি অবশ্যই বলিবে যে বিধাতাই এ বিশ্বের স্রষ্টা। কিন্তু কেন এ বিশ্ব সৃষ্টি? কেন এ জীবের সৃষ্টি? কেন এ কর্ম্মফলের সৃষ্টি? শুধু কি জীবদিগকে দুঃখ দিবার জন্য? আমার অনন্ত দুঃখের কথা ছাড়িয়া দাও—ইহার তুলনা আর কোথাও নাই—কিন্তু বলিতে পার সংসারে সুখী কে? জগতের প্রত্যেক নরনারীকে জিজ্ঞাসা কর—কেহই বলিবে না আমি সুখী। কোন না কোন প্রকার দুঃখ সবের আছেই। তাহার তুলনায় সুখ অতি অল্প। তাই কবিগণ ঘনান্ধকারে দীপশিখার সহিত দুঃখের ও সুখের তুলনা দিয়াছেন। জীবের দুঃখের জন্যই যদি এ জগতের সৃষ্টি, তবে এ সৃষ্টির আবশ্যকতা কি? যিনি মঙ্গলময়—করুণাময় জীবদিগকে এত দুঃখ দিবার জন্য তাঁহার এ সৃষ্টি করা কেন?

আরও একটা কথা আমার বলিবার আছে। স্বীকার করি—আমি পাপ করিয়াছি, স্বীকার করি—আমার কর্ম্মফলেই আমি এত দুঃখ পাইতেছি। কিন্তু পাপের কি ক্ষমা নাই? পিতা পুত্রের শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন, কিন্তু বিশ্বপিতার নিকট কি আমাদের সামান্য অপরাধেরও ক্ষমা নাই। দেখ, যত নীচ বা যত পাপীই হউক, কাহারও দারুণ দুঃখ দেখিলে তোমার আমার হৃদয়েও দয়া হয়। আর যিনি দয়ার আধার, বিশ্বের নিয়ন্তা তাঁহার এই অভাগিনীকে ধনজনশূন্য করিয়া, নিরাশ্রয় করিয়া, বিধবা করিয়া, দারুণ দুঃখের বোঝা মাথায় দিয়া, তথাপি তৃপ্তিলাভ হয় নাই—যে আবার নগেন্দ্ররূপ বিষাক্ত শল্যকে আমার নিষ্পাপ কৈশোর হৃদয়ে বিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন? ইহাতে সেই মহান্ হইতেও মহান্ বিশ্বস্রষ্টার হৃদয়ে কি একটুও করুণার উদ্রেক হয় নাই? বিধাতঃ! এতই যদি তুমি হৃদয়হীন, এতই যদি তুমি কঠিন, এতই যদি তুমি নির্ম্মম—

তবে সংসারের লোকে বৃথা তোমার পূজা করে কেন? কি ফলের প্রত্যাশায় বিশ্ববাসী তোমার অর্চ্চনা করিয়া থাকে বিভো! নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়, নির্ম্মম, কঠিনহৃদয় তুমি—যে তোমার পূজা করে সে ভ্রান্ত! যাহার নিকট করুণাকণার প্রত্যাশা নাই—তাহার পূজা কিসের জন্য?

শুনিয়াছি কোন জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে বিধাতা দুই জন। একজন শুভ, আর একজন অশুভের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। আমার মনে হয় তাহাই সত্য। নচেৎ যিনি করুণাময়, মঙ্গলময়, সর্ব্বশক্তিমান্ তাঁহার রাজ্যে এত দুঃখ কেন, এত হাহাকার কেন, এত অশ্রুপাত কেন—আমার এত বিড়ম্বনা কেন?

সংসারের শত কার্য্যে ব্যস্ত তোমরা—জগতের দুঃখ দেখিবার বা ভাবিবার অবকাশ তোমাদের নাই। কিন্তু আমি এই অনন্ত মগাশূন্য হইতে দেখিতেছি জগৎ কেবল হাহাকারে পূর্ণ। রোগে, শোকে, তাপে জগতের জীব জর্জ্জরিত। কোথাও অন্নহীনের হাহাকার, কোথাও ব্যাধিগ্রস্তের আর্ত্তনাদ, কোথাও প্রিয়জনবিরহিতের করুণ ক্রন্দন। দুঃখ—কেবল দুঃখ—অনন্ত দুঃখে এ পৃথিবী পরিপূর্ণ। হে নিত্য, হে শাশ্বত, হে অব্যয়, হে মহান্, হে সর্ব্বগত, হে সর্ব্বশক্তিমান্ বিশ্বপাতা। তোমার কর্ণে কি বিশ্ববাসীর এ হাহাকার ধ্বনি প্রবেশ করে না? না তোমার হৃদয় এমনই পাষাণ—যে এই বিশ্বব্যাপী করুণ আর্ত্তনাদে তোমার হৃদয় গলে না। জানি না কি ঘোর প্রহেলিকাময় তুমি—আর তোমার এই সৃষ্টি!

যাক্! বৃথা বিধাতার নিন্দা করিতেছি! ক্ষুদ্র আমি—সে অনন্তের রহস্য আমি কি বুঝিব। এখন যাহা বলিতে আসিয়াছি তাহাই বলিব। জগতে দুঃখ সকলেই পায়, কিন্তু আমার মত চিরজীবন বুঝি কেহ এত দুঃখ পায় নাই। আমার সেই প্রাণভরা অনন্ত দুঃখকাহিনী তোমরা শ্রবণ কর।

২।

শৈশবের স্মৃতি আমার নাই। কাহারই বা থাকে? কিন্তু যদি থাকিত তবে সে স্মৃতি আমার পক্ষে সুখের না হইয়া দুঃখেরই হইত। আমার জীবনের আরম্ভ দুঃখে, শেষ দুঃখে। একবার এক ভিখারীর মুখে গান শুনিয়াছিলাম, তাহার সবটা আমার মনে নাই, কতকটুকু মনে আছে :—

এবার আমি ভবে এসে,
একদিন মা বেড়াইনি হেসে,
শুধু কেঁদে কেঁদে দিন গেল মা—

যদি এ সঙ্গীতের সার্থকতা কোথাও ঘটিয়া থাকে তবে সে আমার জীবনে। যে কবি ঐ সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন তিনি কখনও ভাবেন নাই যে তাঁহার এই উক্তি সত্য—তিনি কবি-জনোচিত অতিশয়োক্তিই করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই অতি-শয়োক্তি আমার জীবনে সত্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে। শৈশব হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আমার জীবনে সুখের দীপালোক কখন দেখা যায় নাই—চিরদিনই দুঃখের ঘনান্ধকার। জীবনে কখন আমার অধরে হাসি ফুটিয়া উঠে নাই।

হাসি ফুটিবে কি করিয়া? যেখানে সুখ, সেইখানে হাসি। সুখ ব্যতীত ত হাসি ফুটিতে পারে না। অগ্নি ব্যতীত কি আলোক সম্ভবে? পিতামাতা বা আত্মীয় স্বজনের হর্ষোৎফুল্ল লোচন দেখিয়া শিশুর অধরে হাসি ফুটিয়া উঠে। কিন্তু আমার জন্মের সঙ্গে আমাদের গৃহ হইতে হর্ষ অন্তর্হিত হইয়াছিল। ছিল কেবল দুঃখ, দারিদ্র্য, নিরাশা আর মৃত্যুর বিকট মূর্ত্তি। পিতামাতার স্নেহ ছিল বটে, তাঁহাদের স্নেহমাখা দৃষ্টি আমার উপর বিন্যস্ত হইত বটে, কিন্তু সে স্নেহমাখা দৃষ্টিতে সুখ বা হর্ষ ছিল না। ছিল বিষাদ, নিরাশা, কাতরতা, দারিদ্র্য ও দুঃখ। সে দৃষ্টি দেখিয়া আমার শৈশবাধরে কেমন করিয়া হাসি ফুটিয়া উঠিবে?

যখন যে দিকে—যাহার দিকে চাহিতাম কেমন একটা আতঙ্ক—বিভীষিকা, দুঃখ, দারিদ্র্য, নিরাশা আমার শিশু-হৃদয়ে প্রতিফলিত হইত। স্বচ্ছ দর্পণে যেমন চতুর্দ্দিকস্থ পদার্থের মূর্ত্তি প্রতিফলিত হয়, আমার শিশু হৃদয়েও সেইরূপ দুঃখ, দারিদ্র্য ও নিরাশার ভাব প্রতিফলিত হইত। তাই হাসোজ্জ্বল না হইয়া আমার অধর বিষাদান্ধকারে সঙ্কুচিত হইত। আমি জীবনে কখন হাসি নাই। হে বিশ্ববাসী! তোমাদের মধ্যে এমন কেহ আছে কি যে জীবনে—শৈশবে, বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে, কখন হাস্য করে নাই?

কবিগণ শৈশবকে "মধুময়" "সুখময়" প্রভৃতি বিভূষণে বিভূষিত করিয়াছেন। বোধ হয় তাঁহারা আমার জীবনের ঘটনা জানিতেন না। কেননা তাহা হইলে বিশেষণগুলি অমন স্বাধীন ভাবে প্রয়োগ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন। শিশু ভালমন্দ বোঝে না, সময়ে অসময়ে—সুখে দুঃখে—তাহার রক্তিম অধরে মধুর হাসির ছটা ফুটিয়া উঠে। কিন্তু আমার শৈশবাধর কখন হাসির আলোকে উজ্জ্বল হয় নাই। জানিনা বিধাতা জন্ম হইতেই আমাকে দুঃখ অনুভব করিবার শক্তি দিয়াছিলেন কিনা, কিন্তু সুখ কখন অনুভব করিতে পারি নাই। দারিদ্র্যলাঞ্ছিত পিতামাতার করুণ দৃষ্টির প্রভাব যেন আমার হাসিকে মুকুলেই বিনষ্ট করিয়াছিল। সেই ভগ্ন আবাসের, আবাসের সাজসজ্জার, আবাসের অধিবাসিগণের প্রতি যখনই দৃষ্টিপাত করিতাম, তখনই কেমন একটা দুঃখাবেগ আমার শিশুহৃদয়কে ব্যথিত করিয়া তুলিত। সে বাধা অতিক্রম করিয়া আমার অধরে হাসি কখন ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। কাঁদিবার জন্য যাহার জন্ম, হাসিতে তাহার অধিকার কি?

অভাগিনী আমি কি কুক্ষণেই জন্মিয়াছিলাম? আমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই আমার বংশের অধঃপতন আরম্ভ হইল। অগ্নি সংযোগে তূলারাশি যেমন শীর্ণ হইয়া দগ্ধ হইয়া যায়, আমার কঠোর ভাগ্যের স্পর্শে আমার পিতৃকুলেরও সেই দশা ঘটিল। জন্মিয়াছিলাম আঢ্য

বংশে—আমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্য আসিল। যাহাদের অর্থে বহু নিরন্ন প্রতিপালিত হইত—আজ তাহারা অন্নহীন, শত শত দাস দাসী যাহাদের আজ্ঞাপালন করিত—আজ তাহাদের গৃহ জনমানব-শূন্য। জনকল্লোলমুখরিত, শত অর্থিপ্রত্যর্থি-সমাগমজনিত কলরব-পূর্ণ, প্রতিবেশী ও আত্মীয়জনসেবিত সেই বিপুল প্রাসাদ—দাসদাসী রহিত, অর্থিপ্রত্যর্থি বিরহিত এবং আত্মীয়-স্বজন শূন্য হইয়া পড়িল। কেন এমন হইল? দীপ্ত রবিকরোজ্জ্বল প্রদেশ সহসা এমন দারুণ অন্ধকারে আবৃত হইল কেন? এই অভাগিনী চিরদুঃখভাগিনীর জন্মই তাহার একমাত্র কারণ।

শাস্ত্রে কথিত আছে যে বিরুদ্ধ গুণের সংযোগে প্রবল গুণ দুর্ব্বল গুণকে জয় করিয়া থাকে। আমার দৌর্ভাগ্যের প্রাবল্য সেই জন্য আমার আত্মীয়স্বজনের ক্ষীণবল সৌভাগ্যকে জয় করিয়াছিল। নহিলে এমন ঘটিবে কেন? যদি আমার আত্মীয়স্বজন জীবিত থাকিবে তবে আমি দুঃখ পাইব কি করিয়া? বিষম বন্যার প্লাবনে লোকালয় যেমন শ্মশানে পরিণত হয়, আমার দুর্ভাগ্য-বন্যার প্লাবনে আমার পিতৃকুলেরও সেই দশা ঘটিল। একদিকে দারিদ্র্য তাহার বিকট মূর্ত্তি প্রকট করিল, অপর দিকে নিষ্ঠুর কাল আত্মীয়-স্বজনদিগকে একে একে কবলিত করিতে লাগিল। অন্নাভাবক্লিষ্ট পুত্রকন্যার মুখের দিকে করুণ নেত্রে চাহিতে চাহিতে জননী আমার শ্মশান শয্যায় শয়ন করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইলেন। অনিন্দ্যসুন্দর-কান্তি মধুরস্বভাব বংশের একমাত্র আশা—ভ্রাতা আমার অন্না-ভাবে—বস্ত্রাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। রহিলাম কেবল আমি আর আমার রোগশোকক্লিষ্ট চিন্তাজ্বরজীর্ণ বৃদ্ধ পিতা। যে বিশাল ভবনে একদিন কত ফুল্লকুসুম তুল্য কুমার কুমারী পিতামাতা আত্মীয়-স্বজনগণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইত—আজ সে প্রাসাদ তাহাদের কলহাস্তে মুখরিত না হইয়া পেচককুলের বিকট রবে কম্পিত। কত যুবক-যুবতী শত আশা-উৎসাহ-আনন্দ বুকে

করিয়া স্নিগ্ধহাস্যে ও কলগুঞ্জনে একদিন যে ভবন আমোদিত করিত, আজ দারিদ্র্য ও শমনের বিকট মূর্ত্তি সে ভবন একেবারে নিরানন্দ ও অন্ধকারময় করিয়া তুলিল। বৃদ্ধজনমুখোচ্চারিত ভগবৎস্তোত্র-ধ্বনি একদিন যে ভবন শান্তিময় করিয়া রাখিয়াছিল, আজ সেই ভবন আমাদের দুই পিতাপুত্রীর হতাশের দীর্ঘশ্বাস এবং নিরন্নের কাতরতায় নিতান্ত অশান্তিময় হইয়া পড়িল। সহসা যেন কোন যাদুবিদ্যাবলে নন্দনকানন শ্মশানে পরিণত হইল।

৩।

যে যতই দুঃখ পাউক সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। দিন আসে, দিন যায়, দিনে দিনে মাস, মাসে মাসে বৎসর অতিবাহিত হয়। আমাদেরও দিন কাটিতে লাগিল। সেই দারিদ্র্য-পীড়িত জন-মানব-শূন্য ভগ্ন প্রাসাদে দুই পিতাপুত্রী আমরা দুঃখের পসরা মাথায় করিয়া দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। অনন্ত শোক-দুঃখ-ভার-বহন-ক্লিষ্ট জীবন্মৃত পিতা আমার করুণ-দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিতেন, আর অনন্ত দুঃখপূর্ণ হৃদয় লইয়া আমি কাতর-নেত্রে পিতার দিকে চাহিতাম। দুঃখের বিনিময়ে দুঃখ আমরা উভয়ে উভয়কে দিতাম। আর কিছু দিবার, লইবার, বা ভাবিবার ছিল না। দুঃখ—কেবল দুঃখ। অনন্ত সমুদ্রমধ্যে যেমন অপার—অগাধ—অনন্ত নীল জল-রাশি ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না, তেমনি অনন্ত দুঃখ-সমুদ্রে [illegible]ন আমরা দুই পিতাপুত্রী অপার দুঃখ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইতাম না। দুঃখ! তুমি কি এতই অসীম?

সুখসৌন্দর্য্যপূর্ণ বিশাল পৃথিবী আর তাহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য আমাদের চক্ষে একেবারে নীরস ও অপ্রীতিকর হইয়া পড়িয়াছিল। প্রকৃতির [illegible]ত দান দরিদ্র বলিয়া আত্মীয়স্বজনগণের ন্যায় আমাদের পরিত্যাগ করে নাই। শরতের শুভ্র জ্যোৎস্না অনাহূতভাবে গৃহে প্রবেশ করিত, বসন্তের সুন্দমলয়ানিল গৃহমধ্যে সঞ্চালিত হইত,

প্রভাতে ও সন্ধ্যায় বিহঙ্গমকুলের মধুর সঙ্গীতধ্বনি বায়ু-বাহিত হইয়া কর্ণে প্রবেশ করিত। কিন্তু কে চায়? সে সকলে ত দুঃখের অস্তিত্ব ছিল না। দুঃখভোগের জন্য আমাদের জন্ম—যাহাতে দুঃখের সংস্পর্শ নাই তাহা আমাদের ভাল লাগিবে কি করিয়া? অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সেই ভগ্ন-প্রাসাদের কয়েকটি জীর্ণ মলিন এবং শ্রীহীন প্রকোষ্ঠে প্রাণভরা দুঃখ লইয়া আমরা দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলাম।

অন্ন সংস্থানের চেষ্টায় পিতা কখন কখন গৃহ হইতে বহির্গত হইতেন। কিন্তু সে কেমন চেষ্টা? হয়ত কোন প্রজার নিকট প্রচুর রাজস্ব বাকী আছে, সে যদি দয়া করিয়া কিছু দেয়। হয়ত কেহ ঋণ লইয়াছিল, সে যদি কৃপা করিয়া কিছু অর্থ প্রদান করে। হয়ত কেহ উপকৃত হইয়াছিল, সে যদি কিছু প্রত্যুপকার করে। কিন্তু প্রায়ই পিতাকে বিমুখ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইত। হইবে নাই বা কেন? যাহার বলপূর্ব্বক লইবার শক্তি নাই—প্রজা তাহাকে রাজস্ব দিবে কেন? যাহার রাজদ্বারে অভিযোগ করিবার ক্ষমতা নাই, ঋণী তাহার ঋণ পরিশোধ করিবে কেন? যে নিঃস্ব নিঃসহায় নির্ধন উপকৃত তাহার প্রত্যুপকার করিবে কেন? পিতার শুষ্ক ও বিষন্ন মুখ দেখিয়া আমার বালিকা হৃদয় বুঝিতে পারিত যে পিতা আমার আজ হয়ত কোন ঋণীর নিকট কিঞ্চিৎ অর্থ প্রার্থনা করিতে যাইয়া অপমানিত হইয়াছেন, হয়ত কোন প্রজার নিকট রাজস্ব চাহিতে গিয়া লাঞ্ছিত হইয়াছেন। আমি প্রাণপণে তাঁহার দুঃখাপনোদন করিতে চেষ্টা পাইতাম—কিন্তু পারিতাম না। শত পরিচর্য্যাতেও পিতা আমার সে দুঃখ ভুলিতে পারিতেন না। অশ্রু-ভারাক্রান্ত নয়নে—করুণ বচনে আমাদের বংশের পূর্ব্ব সমৃদ্ধি ও প্রজা, ঋণী এবং উপকৃতের বশ্যতার কথা, আর বর্ত্তমানে আমাদের চরম দুরবস্থায় প্রজা, ঋণী ও উপকৃতের ঔদ্ধত্যের কথা জীবন্ত-চিত্রের মত আমার চক্ষুর সম্মুখে অঙ্কিত করিতেন। আমি তন্ময় হইয়া

শুনিতাম আর ভাবিতাম, এই কি সংসার? এই জগৎ কি মনুষ্যের আবাসভূমি? ইহাই যদি মনুষ্যের আবাসভূমি হয়, তবে পিশাচের আবাস কোথায়? তখন আমার বালিকা-হৃদয়ে বোধ করিতাম যে ইহা মনুষ্যের দেশ নহে—পিশাচের দেশ। কর্ম্মবিপাকে আমরা এই পিশাচের দেশে নীত হইয়াছি।

পিতা যখন বহির্গত হইয়া যাইতেন, তখন প্রায়ই আমি একাকিনী থাকিতাম। কিন্তু তাহাতে আমার ভয় হইত না। সেই জনশূন্য ভগ্ন-প্রাসাদ, সেই বিভীষিকাময় দৃশ্য, সেই গভীর নিস্তব্ধতা আমার প্রাণে ভয় উৎপাদন করিতে পারিত না। পারিবে কেমন করিয়া? দুঃখে যাহার জন্ম, দারিদ্র্য যাহার নিত্য সহচর, জগতে এমন কোন বিভীষিকা আছে কি যাহা তাহাকে ভীত করিতে পারে। সে সময়ে আমি বরং সচ্ছন্দ বোধ করিতাম। কেননা, পিতার সেই বিষণ্ণ বদন, করুণ দৃষ্টি, নিরাশার দীর্ঘশ্বাস আর আমার দেখিতে বা শুনিতে হইত না। পিতার অনুরোধে কখন কখন দুই একটি বালিকা আমার নিকট আসিত। কিন্তু সে ক্ষণেকের জন্য। সুখপালিতা তাহাদের সহিত আমার হৃদয় মিলিবে কেন? আলোক ও অন্ধকারের মধ্যে যে পার্থক্য—তাহাদের হৃদয়ের সহিত আমার হৃদয়েরও সেই পার্থক্য। অন্ধকার আলোক হইতে যেমন দূরে থাকে, আমার হৃদয়ও তাহাদের সমাগম হইতে সেইরূপ দূরে থাকিতে চাহিত। তাহারা এই জগতের কথা, জগতের সুখ দুঃখের কথা, আশা ও নিরাশার কথা আমার নিকট বলিতে আসিত। কিন্তু [illegible]ত সে সকল জানিতাম না। আমি এ জগৎ বা জগদ্বাসীকে চিনি না। চিনি কেবল আমাদের সেই ভগ্ন আবাস আর আমার সেই বৃদ্ধ পিতা। আমি জগতের সুখের কথা কিছুই জানি না, জানি কেবল দুঃখের কথা। আশার আলোক কখন আমার হৃদয় আলোকিত করে নাই, নিরাশার ঘোর অন্ধকারে চিরদিন তাহা পরিপূর্ণ। তাই তাহাদের সহিত আমার মনের মিলন হইত না।

অসুখকর বোধে ক্ষণেকের জন্য আসিয়া তাহারা চলিয়া যাইত, আর আমি সেই নির্জ্জন-প্রাসাদে দুঃখ ও দারিদ্র্যকে অন্তরঙ্গ করিয়া একাকিনী থাকিতাম। দুঃখ-দারিদ্র্য! তোমরা যাহার চিরসঙ্গী—তাহার আর অন্য সঙ্গীর আবশ্যকতা কি।

দারিদ্র্য! এ জগতে তুমিই শ্রেষ্ঠ! মৃত্যু তোমার নিকট অতি তুচ্ছ। যে সংসারজ্বালায় জ্বালাতন, বিষদিগ্ধ বাণের মত সংসারের শত যন্ত্রণা যাহার হৃদয় কাতর করিয়া তুলিয়াছে মৃত্যু তাহার সকল যাতনার অবসান করিয়া দেয়। আর হে দারিদ্র্য! তুমি? তুমি মৃত্যু অপেক্ষা ভীষণ, মৃত্যু অপেক্ষা কঠোর, মৃত্যু অপেক্ষা নির্ম্মম। মৃত্যু ত এ জগতের সকল যন্ত্রণার অবসান করিয়া দেয়, কিন্তু তুমি পলে পলে তিলে তিলে মনুষ্যের অন্তরাত্মাকে দগ্ধ করিতে থাক। শুনিয়াছি ধর্ম্মশাস্ত্রে সুরাপানের প্রায়শ্চিত্ত কঠোর তুষানল; কিন্তু তুষানল তোমার নিকট অতীব অকিঞ্চিৎকর। তুষানলে দগ্ধ হইয়া মনুষ্য এক, দুই, তিন দিনে বা সপ্তাহে প্রাণত্যাগ করে। আর তুমি তুষানলের মত ধিকি ধিকি দগ্ধ কর, কিন্তু প্রাণসংহার করনা ত? তোমাকে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছি, কিন্তু তথাপি তোমায় চিনিতে পারিলাম না। কবিগণ মায়াকে অঘটনঘটনপটীয়সী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আমার মনে হয় যে সর্ব্বাপেক্ষা অঘটনঘটনপটীয়ান্ যদি কেহ থাকে তবে সে তুমি। মহাকবি কালিদাস হিমাচল-বর্ণন-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, যাহার বহু গুণ আছে এক দোষে তাহার গুণের খর্ব্বতা করিতে পারে না। কিন্তু হে দারিদ্র্য! তোমার নিকট মহাকবির এবাক্য সম্পূর্ণ বিফল। তাই কোন কবি কালিদাসের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন যে বহুগুণের সন্নিপাতে একটি দোষ নিমজ্জিত হয়—কবির এই উক্তি সত্য বটে, কিন্তু কবি ইহা লক্ষ্য করেন নাই যে দারিদ্র্যদোষ সকল গুণ নষ্ট করিয়া থাকে। দারিদ্র্য! তুমি যাহাকে আশ্রয় করিয়াছ তাহার রূপ, গুণ, বিদ্যা বুদ্ধি সকলি বিফল! তোমার প্রভাবে যাহার জিহ্বাগ্রে সরস্বতী

বিদ্যমানা ছিলেন, সেই কবি কালিদাসের বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় নাই, তোমার প্রভাবে রাজচক্রবর্ত্তী হরিশ্চন্দ্র চণ্ডালের দাস, তোমার প্রভাবে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বিরাট রাজের ভৃত্য। তোমা অপেক্ষা জগতে আর বলবান্ কেহ আছে কি? দারিদ্র্য! তোমার কি হৃদয় আছে? সে হৃদয়ে কি ভালবাসা আছে? সে ভালবাসা কি আমার উপর ন্যস্ত করিয়াছ? ভালবাসা নহিলে তুমি ক্ষণেকের জন্য আমায় ভুলিতে পারিতেছ না কেন? কালিদাসের মূকতা সেত দিনেকের জন্য, হরিশ্চন্দ্রের চণ্ডালের দাসত্ব সেত অল্প সময়ের জন্য, যুধিষ্ঠিরের ভৃত্যভাব সেত বৎসরেকের জন্য! কিন্তু তুমি কি আমায় এতই ভালবাস যে জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আমার ত্যাগ করিতে পারিলে না? দারিদ্র্য! তোমার কঠোর নির্ম্মম প্রেমে আমি জর্জ্জরিত, আমার হৃদয় দীর্ণ বিদীর্ণ, আমার অন্তরাত্মা নিতান্ত কাতর। তোমার ভালবাসা হইতে আমায় অব্যাহতি দিতে পার কি? এ অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কি ভালবাসিবার আর কাহাকেও পাও নাই যে আমার এই বাল্যহৃদয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ? যদি এতই ভাল বাসিয়া থাক—তবে হে দারিদ্র্য! তোমার চরণে শত প্রণিপাত করিতেছি, তোমার ঐ কঠোর ভালবাসা হইতে আমায় নিষ্কৃতি দাও। অনেক সহিয়াছি, আর পারি না। আর তোমার ভালবাসা—তোমার প্রগাঢ় আলিঙ্গনের বেগ আমার সহ্য হয় না।

৪।

এমনি করিয়া দিন কাটিতে লাগিল। আমি শৈশব হইতে বাল্যে, বাল্য হইতে কৈশোরে পদার্পণ করিলাম। আমার দেহ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইল, কিন্তু অবস্থায় অবস্থান্তর হইল না। সেই একই অবস্থা! দুঃখ—দারিদ্র্য—আর নিরাশা। শৈশবে, বাল্যে, কৈশোরে তাহারা কেহই আমায় পরিত্যাগ করে নাই।

যেখানে দুঃখ, দারিদ্র্য, অভাব ও অনটন, সেই খানেই আধিব্যাধির প্রাবল্য। বৃদ্ধ পিতা আমার এ দুঃখ দারিদ্র্য সহিয়া অব্যাহত থাকিতে পারিলেন না। মনঃ যাহার দুঃখে শোকে জর্জ্জরিত তাহার দেহ কি সুস্থ থাকিতে পারে? অচিরে কঠিন ব্যাধি পিতার শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। একাকিনী সেই ভগ্ন প্রাসাদে ব্যাধিগ্রস্ত পিতাকে লইয়া আমি দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলাম।

আমার বিবাহের বয়স হইয়াছিল। অভাগিনীর রূপের খ্যাতিও বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল। তাই অনেক পাত্রের পিতা রূপবতী বধূ লাভের জন্য পিতার নিকট আসিত। কিন্তু বঙ্গের ব্রাহ্মণ কায়স্থের পাত্র ত কেবল পাত্রী বিবাহ করে না, পাত্রী এবং অর্থ উভয়ই বিবাহ করিয়া থাকে। পাত্রী পাত্রের জন্য—আর অর্থ পাত্রের পিতার জন্য। আমার পিতার অর্থ ছিল না। সেইজন্য অনেক পাত্রের পিতা ফিরিয়া যাইত। কয়েকজন পাত্রের পিতা বিনা অর্থে আমাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিয়া অনুগৃহীত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সকল পাত্রের রূপগুণের বর্ণনা করিয়া পিতা আমার একদিন বলিয়াছিলেন—"মা কুন্দ! তোমার গলায় পাথর বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দিতে পারি, কিন্তু ওরূপ পাত্রে তোমায় সমর্পণ করিতে পারি না।" হা পিতঃ! তুমি কখন স্বপ্নেও কল্পনা কর নাই যে ভবিষ্যতে এরূপ পাত্রই আমার অদৃষ্টে ঘটিবে।

পিতা যে আমার বিবাহ দেন নাই তাহার আরও একটি কারণ ছিল। আমাকে পরের হাতে সমর্পণ করিয়া পিতা কাহাকে লইয়া থাকিবেন? এ সংসারে এ দুঃখিনী কন্যা ব্যতীত আর ত তাহার কেহ ছিল না। পিতা বলিতেন, "মা! তোমাকে পরের হাতে সমর্পণ করিয়া কাহাকে লইয়া এ জগতে থাকিব।" আমিও তাহাই ভাবিতাম। আত্মীয়স্বজনহীন, অর্থহীন, সামর্থ্যহীন, রোগগ্রস্ত বৃদ্ধ পিতাকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া আমি পরগৃহে বাস করিব? এ বিশ্বে এমন কোনও স্থান আছে কি—সে স্থানে এমন কোন

সুখ আছে কি—সে সুখের এমন কোন আকর্ষণী শক্তি আছে কি—যাহা আমার বৃদ্ধ পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া তথায় যাইবার জন্য আমাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে? আমি সুখ চাহি না, ঐশ্বর্য্য চাহি না, স্বর্গ চাহি না, চাই কেবল আমার অভাগ্য পিতার সান্নিধ্য।

সংসার পরিবর্ত্তনশীল। কবি বলিয়াছেন, সংসারে সুখ এবং দুঃখ চক্রবৎ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। কিন্তু আমার জীবনচক্রে বিধাতা বুঝি সুখের অংশ সংযুক্ত করিতে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তাই আমার জীবনচক্রের পরিবর্ত্তন কেবল দুঃখই বহন করিয়া আনিতেছিল—তিল মাত্র সুখ তাহাতে ছিল না। দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল—আমার দুঃখময় জীবনের দুঃখরাশি ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল। ব্যাধিগ্রস্ত পিতা আর অর্থাহরণের চেষ্টায় বহির্গত হইতে পারিতেন না। কোন দিন অর্দ্ধাশনে—কোন দিন অনশনে আমাদের দিন কাটিতে লাগিল। আমার অনশনক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া পিতা কাতর হইতেন। আমি বৃদ্ধ রুগ্ন পিতার অনশনক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া মর্ম্মাহত হইতাম।

ভারবাহী ব্যক্তির উভয় দিকের ভার যেমন পরস্পরের মুখাপেক্ষী—একের অভাবে অপরের অস্তিত্ব যেমন অসম্ভব, আমাদের দুই পিতাপুত্রীরও সেইরূপ হইয়াছিল। আমার অভাবে পিতার এবং পিতার অভাবে আমার অস্তিত্ব যেন অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু আমার অদৃষ্টে অসম্ভবও সম্ভব হইল। পিতা আমায় ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু আমার মৃত্যু হইল না। আমার মৃত্যু হইলে এ অসহ্য দুঃখভার কে বহন করিবে? তাই বুঝিয়াই বুঝি মৃত্যু আমায় অব্যাহতি দিয়াছিল।

কোন দিন অর্দ্ধাহারে, কোন দিন অনাহারে আমি দিন-রাত্রি পিতার পরিচর্য্যা করিতাম। জগতে আর ত আমার বলিতে আমার কেহ নাই। সংসারে একমাত্র সহায়—একমাত্র জব

তখন পিতার মৃত্যু হইলে আমার কি হইবে,—আমি কোথায় দাঁড়াইব—কে আমায় আশ্রয় দিবে—এই চিন্তা অহর্নিশি আমার ব্যাকুল করিয়া তুলিত। পিতাকে কালের করাল কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিতাম। উদরে অন্ন নাই, রাত্রে নিদ্রা নাই, দিবানিশি বিশ্রাম নাই—আমি অনন্যমনে পিতার শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম।

পিতা বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার জীবনের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে! কোন্ সময়ে শমন তাঁহাকে লইতে আসিবে সেই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, আর ভাবিতেছিলেন তাঁহার এই দুঃখিনী কন্যার ভবিষ্যৎ। মৃত্যুশয্যাশায়িত পিতার আমার যন্ত্রণা যেন শতগুণ বাড়িয়া উঠিয়াছিল। আমাকে একাকিনী—নিরাশ্রয়া ফেলিয়া যাইবেন, সেই চিন্তা তাঁহার মরণযন্ত্রণাক্লিষ্ট অন্তরাত্মাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছিল। পিতা আমার ক্ষণে ক্ষণে ভাবিতেন, কত কথা বলিতেন, কত বুঝাইতেন, কত আদর করিতেন—কিন্তু প্রাণে তাঁহার শান্তি ছিল না। কথায়, ভঙ্গিতে, আকারে, দৃষ্টিতে বুঝিতেছিলাম যে, এই অভাগিনী কন্যার ভবিষ্যৎ ভাবনাজনিত দুশ্চিন্তা তাঁহার অন্তরাত্মাকে দীর্ণ বিদীর্ণ করিতেছিল।

এমনি করিয়া সেই ভগ্ন-আবাসে মরণোন্মুখ পিতাকে লইয়া অনশনে অর্দ্ধাশনে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। তারপর আসিল—সেই দিন।

৫।

সে দিনের কথা মনে করিলে—কি করিয়া বলিব—ওগো কি ভাষায় বুঝাইব—সে আমার কেমন দিন। ভাষায় এমন কথা নাই —কথায় এমন শক্তি নাই—শক্তির এমন বিকাশ নাই—যে সে দিনের কথা প্রকাশ করিতে পারি। এমন দিন এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কখন কাহারও ভাগ্যে আসিয়াছিল কি না সন্দেহ। যদি চেতনা থাকিত তবে আমার সে দিনের দুঃখ দেখিয়া পৃথিবী বজ্রকঠোরনাদে

বিদীর্ণ হইয়া যাইত, আকাশ স্বস্থানচ্যুত ও ভীমবেগে পৃথিবীর বক্ষে আপতিত হইয়া আপনাকে ও পৃথিবীকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিত, সপ্ত সমুদ্রের জল উথলিয়া উঠিয়া বিশ্বসংসার প্লাবিত করিয়া দিত। যে দিনের কথা মনে করিলে আজিও আমার চক্ষুঃ সপ্ত সমুদ্রের সৃষ্টি করে, আজিও আমার হৃদয় কোটি শূলভেদের যন্ত্রণা অনুভব করে, আজিও আমার কণ্ঠ হাহাকার রবে দিগ্‌দিগন্ত পূর্ণ করিতে চায়—আসিল সেই দিন। সে দিনের কথা বলিবার নহে, বুঝাইবার নহে, শুধু—বুঝিবার।

সে দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে হইতেই প্রলয়ের কাল মেঘে আকাশ ঢাকিয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ভীষণ বেগে বায়ু প্রবাহিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিয়া বজ্র গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল। ক্ষণপ্রভার দীপ্তি ক্ষণেকের জন্য জগৎকে পরিদৃশ্যমান করিয়া পরক্ষণেই অন্ধকারের গাঢ়তা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়া তুলিতে লাগিল। যেন লক্ষ দৈত্য গভীর গর্জ্জন ও অট্টহাস্য করিয়া সৃষ্টি ধ্বংস করিতে উদ্যত।

সেই বাত্যাবর্ষণবিক্ষুব্ধা ঘোরান্ধকারাবৃতা রজনীতে পিতার রোগযন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পিতা অস্থির হইলেন, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়িতে লাগিল, ইন্দ্রিয়সকল শিথিল হইয়া আসিল। পিতা আমাকে কাছে ডাকিয়া আমার মস্তকে হস্তার্পণ করিলেন। তার পর কত কথা বলিলেন, কত উপদেশ দিলেন, কত বুঝাইলেন। আমি কতক শুনিলাম, কতক শুনিতে পাইলাম না। পিতার প্রতি নিঃশ্বাসে, প্রতি কথায়, প্রতি ভঙ্গীতে, অসহ্য যন্ত্রণার ভাব পরিব্যক্ত হইতেছিল, আর তাহা দেখিয়া আমার হৃদয় শত বৃশ্চিক দংশনের যন্ত্রণা অনুভব করিতেছিল।

কোন কোন দিন দুই একজন প্রতিবাসী দয়া করিয়া সন্ধ্যার পরে সংবাদ লইতে আসিত; কিন্তু সেই দুর্য্যোগের দিনে কে আর

এ দরিদ্রদিগের সংবাদ লইতে আসিবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমি একাকিনী থাকিতেই ভাল বাসিতাম, কিন্তু সে দিন অন্য কাহারও উপস্থিতি আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলাম। সে যদি কিছু জানে, যাহাতে পিতার এই যন্ত্রণার উপশম হয়। ভাল চিকিৎসা হইলে বোধ হয় পিতার প্রাণ রক্ষা হইতে পারে, এইরূপ ভাবিয়া অন্যের সান্নিধ্য প্রার্থনা করিতেছিলাম। হায়! কোথায় চিকিৎসক, কোথায় ঔষধ, কোথায় পথ্য! সেই ভীমা রজনীতে, সেই জনমানবশূন্য ভগ্নপ্রাসাদে একাকিনী মরণোন্মুখ পিতার শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু ক্রমেই রোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে স্বর অস্পষ্ট হইল, অঙ্গ অবশ হইয়া আসিল।

মৃত্যুযাতনাক্লিষ্ট পিতার ক্ষীণ শরীরে নির্ম্মম মৃত্যু তাহার তুষারশীতল হস্ত বিস্তৃত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু সেই অন্তিমকালে মরণযাতনা সহিয়াও পিতা আমার এই অভাগিনী নিরাশ্রয়া কন্যার মমতা ভুলিতে পারেন নাই। আমার প্রাণের ভাব—তাহা আমি কি বলিয়া বুঝাইব? অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমার একমাত্র আত্মীয়, একমাত্র হিতৈষী, একমাত্র আপনার, একমাত্র ভরণপোষণকর্ত্তা, একমাত্র আশ্রয়স্থল—জীবনের সর্ব্বস্ব পিতা আমার মৃত্যুশয্যায় শায়িত। মৃত্যুশীতল নিস্পন্দ—নিশ্চেষ্ট দেহ বক্ষে লইয়া আমি বার বার ডাকিতেছি—"বাবা! বাবা"! সেই কাতরধ্বনি পিতার কর্ণে এক একবার প্রবেশ করিতেছে, পিতা তখন মৃত্যুজড়ালস-নয়নে এক একবার আমার দিকে চাহিতেছেন। সে কি দৃষ্টি! কি করুণ সে দৃষ্টি! কি মর্ম্মস্পর্শী সে দৃষ্টি! সে দৃষ্টি যেন বলিতেছিল—মা—মা কুন্দ! আমার জীবনের সর্ব্বস্ব! আমার যাইবার ইচ্ছা ছিল না মা—তোমাকে [illegible] অনাথিনী অসহায়া রাখিয়া আমার যাইবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কি করিব মা! মৃত্যু আমায় বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছে। কখন বা পিতা চক্ষুঃ উন্মীলন করিবার চেষ্টা করিয়াও উন্মীলিত করিতে পারিতেছিলেন না। কখন বা সামান্য চক্ষুঃ উন্মীলন করিতে পারিলেও সে দৃষ্টিতে কোন ভাব ছিল না, মৃত্যু সকলই অপহরণ করিয়া

লইয়াছিল। শেষ একবার আমার প্রতি করুণদৃষ্টিতে চাহিয়া পিতা চক্ষুঃ মুদ্রিত করিলেন, দেহ নিস্পন্দ হইল।

সভয়ে ডাকিলাম—"বাবা! বাবা"! উত্তর নাই। আবার চীৎকার করিয়া ডাকিলাম—"বাবা! বাবা!" হায়! কে উত্তর দিবে! সেই নির্জ্জন প্রাসাদে প্রতিধ্বনি উপহাস করিয়া বলিল—"কোথায় তোর বাবা"! বায়ু শন্ শন্ শব্দ করিয়া বলিল—"কোথায় তোর বাবা"। মেঘ গর্জ্জন করিয়া উঠিল—"কোথায় তোর বাবা"! বারিধারা ঝম্ ঝম্ করিয়া বলিল—"কোথায় তোর বাবা"। পিশাচীর ন্যায় অট্টহাস্য করিয়া বিদ্যুৎ উপহাস করিল—"কোথায় তোর বাবা"। তবে কি পিতা আমার জীবিত নাই? যে কথা ভাবিতেও আতঙ্ক হয় আমার অদৃষ্টে কি তাহাই ঘটিয়াছে? ওগো কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব—কে বলিয়া দিবে? এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কে দয়াবান্ আছ বলিয়া দাও আমার পিতা মৃত কি জীবিত?

না—না—অসম্ভব। আমায় একাকিনী, অসহায়া, নিরাশ্রয়া রাখিয়া পিতা কখনই মরিতে পারেন না। তিনি মরিলে তাঁহার আদরের কুন্দ কোথায় দাঁড়াইবে। পিতা আমার নিদ্রিত। আহা! ঘাও বাবা! নিদ্রা যাও। রোগ যন্ত্রণায় না জানি কি কষ্টই তোমার হইতেছে। নিদ্রার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া ক্ষণেকের জন্য শান্তিলাভ কর। হায়! তখনও বুঝি নাই যে এ মহানিদ্রা। এ নিদ্রায় নিদ্রিত হইলে মনুষ্য আর জাগরিত হয় না।

এইরূপ কত ভাবিলাম। ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রা আসিল। অজ্ঞে ম্যস্ত করিয়া হর্ম্ম্যতলে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন দেখিলাম অনেক প্রতিবেশী গৃহমধ্যে সমবেত হইয়াছে। বিস্মিত ও শঙ্কিত-চিত্তে উঠিয়া বসিলাম, দেখিলাম পিতার সৎকারের আয়োজন হইতেছে। তখন বুঝিলাম কাল আমার পিতাকে অপহরণ করিয়াছে। পিতার মৃতদেহ বক্ষে ধারণ করিয়া অবিরলিত-নেত্রে কাঁদিতে লাগিলাম।

হে শমন! তুমি সাবিত্রীর প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া তাহার স্বামীর জীবন দান করিয়াছিলে, আমার বৃদ্ধ পিতাকে আমার ফিরাইয়া দিতে পার কি? দেখ আমি নিঃসহায়, নিরাশ্রয়—ক্ষুদ্র বালিকা—ঐ বৃদ্ধ পিতা ব্যতীত আর আমার কেহ নাই। হে ত্রিভুবনজনান্তক! তোমার রাজ্যে ত প্রাণীর অভাব নাই। এই অক্ষম বৃদ্ধের প্রাণ লইয়া তোমার রাজ্যের কি উন্নতি সাধিত হইবে? তুমি দেবতা—মানবের না হউক—আমার এ দুঃখ দেখিয়া দেবতার দয়া হয় না কি? আর যদি একান্তই লইতে হয় তবে পিতার সহিত আমাকেও গ্রহণ কর। হে মৃত্যু! তোমার চরণে ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি তোমার করাল পাশে আমাকেও বদ্ধ করিয়া লও। পিতাকে ছাড়িয়া আমি এ জগতে থাকিতে চাহি না।

না—না—কাজ নাই! আমাকে যদি লইতে পার তবে লও—কিন্তু পিতার জীবন দানে আর প্রয়োজন নাই। কিসের জন্য জীবন দান? রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য সহিবার জন্য ত? তাই বলিতেছি কাজ নাই। আমি ত ডুবিয়াছি—ডুবিব। কিন্তু পিতা আমার সকল দুঃখ, সকল শোক, সকল যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন—সেই ভাল। যাও পিতঃ! যেখানে রোগ নাই, শোক নাই, দুঃখ নাই, দারিদ্র্য নাই, সেই পরম লোকে যাও। আমার অদৃষ্টে যাহা ঘটে ঘটিবে।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে

[২]

শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছিলেন, "১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় সম্মানসূচক এল, এল, ডি-উপাধি প্রাপ্ত হন। কলিকাতা য়ুনি-ভার্সিটী তাঁহাকে এই উপাধি দান করেন। ইহার পূর্ব্বে কোনও বাঙ্গালী এই সম্মান পান নাই। উপাধি প্রাপ্তির খবর পাইয়াই রাজেন্দ্রলাল ভাবিলেন, শুভসংবাদটা গৃহিণীকে একবার দিয়া আসি; শুনিয়া নিশ্চয়ই তাঁহার খুব আহ্লাদ হইবে।—সটান গৃহিণীর সকাশে গমন। ভুবনমোহিনী তখন সাংসারিক কাজকর্ম্মে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি পূর্ব্বেই স্বামীর উপাধি প্রাপ্তির সংবাদ শুনিয়াছিলেন। স্বামীকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

তুমি নাকি কি একটা 'পায়া' পাইয়াছ?

রাজেন্দ্রলাল বলিলেন—হাঁ, য়ুনিভার্সিটী আমাকে এল, এল, ডি পদবী দিয়াছেন। ইহা একটা খুব বড় সম্মান। কোনও বাঙ্গা-লীর ভাগ্যে পূর্ব্বে এ পদবী ঘটে নাই। ভুবনমোহিনী এল, এল, ডি'র অর্থ ঠিক বুঝিলেন না। খানিক স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া বলি-লেন,—পদবী-টদবী বুঝি না, উহাতে কত টাকা পাওয়া যাইবে তাই শুনি। রাজেন্দ্রলাল বলিলেন—টাকা ত পাওয়া যাইবেই না, উপরি ৩০০৲ টাকা দিয়া গাউন তৈয়ারী করাইতে হইবে।

রাজেন্দ্রলালের পত্নী সেকালের ইংরাজীভাববর্জ্জিতা সরলা নারী। সম্মান অর্জ্জন করিতে হইলে যে কিঞ্চিৎ রজতখণ্ডেরও বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাহা তাঁহার সরল বুদ্ধিতে আসিল না। বিস্মিত হইয়া স্বামীকে বলিলেন—"টাকা পাওয়া যাবে না? তবে অমনধারা 'পায়ায়' কাজ নেই, ছেড়ে দাও।"

রাজেন্দ্রলাল পত্নীর কথায় ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া অন্তঃপুর হইতে ধীরপদে প্রস্থান করিলেন।—এ গল্প আমরা পরে, সম্ভবতঃ ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলালের নিজের মুখে শুনিয়াছিলাম।

কৃষ্ণদাস পাল ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র এক সঙ্গে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের কাজ করিতেন। কিন্তু কোনও কোনও বিষয়ে উভয়ের মতের মিল হইত না। পাল মহাশয় হিন্দু পেট্রিয়ট চালাইতেন। যখন পেট্রিয়টে রাজেন্দ্রলালের দ্বারা ঐ সকল বিষয়ে কোনও প্রস্তাব লেখার দরকার হইত, কৃষ্ণদাস তাঁহার বাসায় গিয়া ধরিয়া বসিতেন। অগত্যা মিত্র মহাশয়ের কথামত তিনি লিখিয়া লইয়া যাইতেন। এই সকল লেখায় অবশ্য রাজেন্দ্রলালের নিজের মতই ব্যক্ত থাকিত। কিন্তু ছাপিতে দেওয়ার সময় কৃষ্ণদাস ঐ সকল প্রবন্ধের স্থানে স্থানে, ঠিক নিজের মতের সমর্থক হয় এমনি ভাবে ঈষৎ বদলাইয়া পেট্রিয়টে বাহির করিতেন। এই রকম মজা প্রায়ই হইত। বলা বাহুল্য, রাজেন্দ্রলাল ভারি চটিয়া যাইতেন এবং কৃষ্ণদাসকে ডাকিয়া অচ্ছা করিয়া ধমকাইয়া দিতেন! অবশ্য তাঁহার রাগ কিছু স্থায়ী হইত না। কৃষ্ণদাসকে না হইলে তাঁহার চলিত না, রাজেন্দ্রলাল ভিন্ন কৃষ্ণদাসেরও অন্য গতি ছিল না!

কৃষ্ণদাসকে লইয়া রাজেন্দ্রলাল কৌতুক করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার চাপকানের সমালোচনাই কতদিন যে হইয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। যাঁহারা রাজেন্দ্রলালকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন, বেশের পারিপাট্য তাঁহার খুব ছিল। তিনি অধিক দাম দিয়া চাপকান, পিরাণ প্রভৃতি বেশ পছন্দসহি করিয়া প্রস্তুত করাইতেন। তিনি যে ঠিক বিলাসী ছিলেন তাহা নহে, তবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন এবং নিজে পরিষ্কৃত থাকিতে ও পরকে পরিষ্কৃত দেখিতে ভালবাসিতেন। বাবু কৃষ্ণদাস পালের বেশের পারিপাট্যের প্রতি একেবারেই লক্ষ্য ছিল না। বোধ হয় তাহা লক্ষ্য করিবার অবসরও তাঁহার অল্পই ছিল। সর্ব্বদা কাজ লইয়াই

তিনি ব্যস্ত থাকিতেন। রাজেন্দ্রলাল প্রায়ই আঙ্গুল দিয়া কৃষ্ণদাসকে দেখাইয়া বলিতেন—এঁর এই যে চাপকানটি দেখ্ছেন, এটি মান্ধাতার আমলের। লাট সাহেবের কৌন্সিল হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বত্রই ইহার অবাধ গতি। কাপড়-চোপড়ের উপর বাজে ব্যয় করা ইঁহার মোটেই অভ্যাস নেই।—এরূপ পরিহাস কৌতুক রাজেন্দ্রলালের বৈঠকখানায় প্রায়ই চলিত।"

শাস্ত্রী মহাশয় একটু থামিয়া পরে বলিতে লাগিলেন, "একবার রাজেন্দ্রলাল আমার উপর ভয়ানক চটিয়া গিয়াছিলেন। সেই ঘটনার কথা বলিতেছি। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ঋগ্বেদের Translation বাহির করিবার উদ্যোগ করেন। আমি তাহার কিয়দংশ লিখিয়া দিব, রমেশবাবু বাঙ্গলা দেখিয়া দিবেন এবং ছাপাইবার সমস্ত খরচখরচা দিবেন এইরূপ বন্দোবস্তে কাজ আরম্ভ হয়। পুস্তক বাহির হইবার পূর্ব্বেই শশধর তর্কচূড়ামণি 'বঙ্গবাসী'তে লিখিলেন—রমেশবাবু ইংরাজী হইতে বেদ ব্যাখ্যা করিতেছেন। সে ব্যাখ্যা একেবারেই অগ্রাহ্য; বেদের প্রত্যেক ঋকে গূঢ়ভাবে তিন প্রকার অর্থ আছে, নির্গুণ ব্রহ্মপক্ষে, সগুণ ব্রহ্মপক্ষে এবং সূর্য্যদেবপক্ষে।—এইরূপ মত প্রকাশ করায় আমিও বঙ্গবাসীতে লিখিতে সুরু করি। উভয়পক্ষে যুক্তি-তর্ক এবং শাস্ত্রালোচনার সঙ্গে সঙ্গে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কটূক্তিও বেশ চলিতেছিল। শেষ বঙ্গবাসী আমার লেখা আর লইলেন না। আমি 'ভারতবাসী'তে গেলাম। পূজার ভারতবাসীতে 'চূড়ামণিব্যাকরণ' নামে আমার লম্বা এক প্রবন্ধ বাহির হইল। [ছাপার দোষে, চূড়ামণিব্যাকরণ চড়ামণিব্যাকরণ হইয়া গিয়াছিল] তাহাতে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আমার অদৃষ্টে তাহার জন্য বড়ই দুর্গতি হইয়াছিল।

পূজার পর আমি রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া উঠিলেন, এবং ডান হাত লম্বা করিয়া একটু উচ্চৈঃস্বরে আমাকে বাহিরে যাইতে বলিলেন।

আমি একটু থমকাইয়া গেলাম। ব্যাপারখানা কি জানিবার জন্ম আমি ঘুরিয়া তাঁহার বামকর্ণের কাছে উপস্থিত হইলাম। দক্ষিণ অপেক্ষা বাম কর্ণে তিনি একটু বেশী শুনিতে পাইতেন। কাণের গোড়ায় মুখ লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—আজ একি? এ মূর্ত্তি কেন?

রাজেন্দ্রলাল বলিলেন—মূর্ত্তি হবে না? তুমি—তুমি লেখাপড়া শিখেছ, ভদ্রসমাজে বেড়াও, তুমি.........কিনা মেছোনাদের মতন মেছোবাজারের চৌমাথায় দাঁড়িয়ে লোকের সঙ্গে গালিগালাজ করছ! ভদ্রলোকের সমাজে তোমার বসা উচিত নয়।

আমি বলিলাম—চূড়ামণি যে বড় অন্যায় করছে। কতকগুলি ভুল প্রচার করছে।

তিনি আরও রাগিয়া বলিলেন—ভুল প্রচার করছে, তা'তে তোমার কি? তোমার একছত্র লেখায় উহার একশ পাতা পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে তা' জান? তুমি কি না তা'র সঙ্গে সমান উত্তর করতে যাচ্ছ! আমার বাড়ীতে তোমার জায়গা হবে না।

আমি সভয়ে বলিলাম—এই ত, আর ত কিছু না। আচ্ছা এমন কর্ম্ম আমি আর করব না।

তখন তিনি ঠাণ্ডা হইয়া আমাকে বসিতে বলিলেন। রাজেন্দ্রলাল আমাকে এই ঘটনায় যে শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহা আমি জীবনে ভুলিব না। সেই অবধি খবরের কাগজে আমাকে যতই গালি দিক না আমি তাহার কখনই জবাব দিই না। তত্ত্বনির্ণয় করিয়া যাইতেছি, উদ্দেশ্য আমার ঠিক আছে। ভুল ভ্রান্তি মানুষের হইয়াই থাকে। যিনি উহা ভদ্রভাবে দেখাইয়া দেন আমি তাঁহার গোলাম হইয়া যাই। গালাগালি দিলে জবাব দিই না। আমি যে নিজেই এই কার্য্য করি তাহা নহে, আমার ছাত্রবর্গকেও একথাটি আমি বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিই।

একবার গরমির ছুটিতে ওয়ার্ডের ছেলেগুলিকে বাড়ী পাঠাইয়া রাজেন্দ্রলাল কলিকাতার নিকটে কাশীপুরের গঙ্গার ধারে, মতি-

ঝিলের পশ্চিমে, মতিশীলেদের যে অনেকগুলি বড় বড় কুঠি ছিল তাহার একটিতে বাস করিতে লাগিলেন। আমায় বলিলেন—তোমার ত অনেক দূর হইবে, তুমি যাইবে কিরূপে? আমি বলিলাম—দূর হইবে না। কাশীপুরে আমার এক মামী থাকেন, আমি তাঁহার কাছে কাশীপুরেই থাকিব। এইবার রাজেন্দ্রলালের নিকট সমস্ত দিন থাকিবার সুযোগ হইল। প্রায় সমস্তদিনই তাঁহার কাছে থাকিতাম। তিনি সেসময় বোধগয়ার উপর তাঁহার বহি লিখিতেছিলেন। তাঁহার কাছে খুব চটাল চটাল প্রুফ্ আসিত। তিনি সেইগুলি নিজে দেখিতেন এবং আমাকেও দেখিতে বলিতেন। আমি তাঁহার কথামত দেখিয়া দিতাম। বৌদ্ধদের গ্রন্থে গল্প আছে, এক স্ত্রীলোক শ্রাবস্তীতে আসিয়া বুদ্ধদেবের চরিত্রে কলঙ্ক অর্পণ করিয়াছিল। একদিন সেই লেখার প্রুফ্ রাজেন্দ্রলাল দেখিতেছিলেন। আমি তাঁহার নিকটে বসিয়াছিলাম। হাসিয়া বলিলেন—তা' হ'লে শাক্যসিংহেরও ও সব দোষ ছিল। কেননা, যা' রটে তা' বটে।

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম—শুধু যে কলঙ্ক ছিল তা' নয়, বোধ হয় একটু দোষও ছিল।

তিনি কৌতূহলের সহিত বলিলেন—সে কি রকম?

আমি বলিলাম—অবদানকল্পলতার প্রথম গল্পে একথা আছে। [আমি যাহাকে তখন প্রথম গল্প বলিয়াছিলাম, সেটা বাস্তবিক অবদানকল্পলতার ৫১ গল্প। এসিয়াটিক সোসাইটিতে যে পুঁথি আছে, তাহাতে ঐ ৫১ গল্পেই বহি আরম্ভ হইয়াছে। রায়বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস তিব্বত হইতে পুরা অবদানকল্পলতার পুঁথি আনিলে উক্ত গল্প যে বহির ৫১ গল্প তাহা প্রকাশ হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই দ্বিতীয় অংশেরই Notice করিয়াছেন] বুদ্ধদেবের একবার একটা মূত্রকৃচ্ছ্র হইয়াছিল। তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে বুঝাইয়াছিলেন, যে পূর্ব্বজন্মে তিনি একজন কবিরাজ ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল তিক্তমুখ। শ্রীমান্ নামে এক ধনবানের পুত্রকে তিনি

অনেকবার কঠিন পীড়া হইতে আরাম করেন। কিন্তু সে লোকটা বড় দুষ্ট ছিল। পুত্রের পীড়া সারিয়া গেলে (ঠিক এখনকার লোকেরই মত) সে তাঁহাকে দর্শনী বা ঔষধের দাম বলিয়া কিছুই দেয় নাই। তাই ফের যখন তার পুত্রের অসুখ হইল, বুদ্ধদেব ঔষধের পরিবর্ত্তে বিষ দিয়া তাহার প্রাণ-সংহার করিলেন। সেই পাপেই তাঁহার একটা খারাপ ব্যারাম হয়।

রাজেন্দ্রলাল বলিলেন—বুদ্ধদেবের রোগটা যত ঠিক, রোগের explanationটা তত ঠিক নয়।

আমি বলিলাম—শ্রাবস্তীতে সুন্দরী তাঁহার চরিত্রে যে কলঙ্ক অর্পণ করিয়াছিল, শিষ্যদিগের নিকট বুদ্ধদেব তাহারও কারণ দেখাইলেন—পূর্ব্বজন্মে কি কি অপরাধ করিয়াছিলেন যে কারণে সুন্দরী তাঁহার বিরুদ্ধে কলঙ্ক আনিয়াছে।

বুদ্ধদেব বলিলেন—পূর্ব্বজন্মে আমি একজন বৈশ্য ছিলাম, আমার নাম ছিল মৃণাল। আমি ভদ্রা নামে এক বারবিলাসিনীকে রাখি। সর্ত্ত ছিল, সে আর কাহাকেও তাহার কাছে আসিতে দিবে না। কিন্তু একদিন অন্য এক পুরুষকে তাহার নিকটে দেখিয়া রাগিয়া সেই রমণীকে হত্যা করি। তাই এজন্মে সুন্দরী আমার নামে কলঙ্ক রটাইতেছে।

এই সকল কথা শুনিয়া রাজেন্দ্রলাল খুব হাসিলেন। তখন তাঁহার কাছে কলিকাতার দুই তিন জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও বসিয়াছিলেন। তাঁহারাও বুদ্ধদেবের এই অদ্ভুত গল্প শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। দিনটা নানারকম গল্পগুজবে ও হাসিখুসিতে বেশ কাটিয়া গেল।"

শ্রীননীগোপাল মজুমদার।

তীর্থ-ভ্রমণ*

৮ই বৈশাখ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বদরীনারায়ণ যাত্রা করিলেন। হরিদ্বার হইতে বদরীনারায়ণের পথ পূর্ব্বেও যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে। তবে পাহাড় কাটিয়া রাস্তাগুলি একটু চওড়া করা হইয়াছে, আর লছমনঝোলা নামে নদীর উপর যেসকল দড়ীর পুল ছিল, তাহার বদলে লোহার ক্যান্টিলিভার ব্রিজ হইয়াছে, এই মাত্র প্রভেদ। যদুবাবু বলেন, তাঁহাদের সঙ্গে দুই ঝাঁপান ও তিন কাণ্ডি ছিল। কাণ্ডি একটা পিঠওয়ালা মোড়া। পাহাড়ী-দের পিঠে মোড়াটি বাঁধা থাকে, মোড়ার উপর একজন চড়নদার থাকে। পাহাড়ী যে পথে যায়, চড়নদারের মুখ তার ঠিক উল্টা-দিকে থাকে। পাহাড়ীর হাতে একটা 'টি' আকারের কাঠ থাকে। সে সেইটার উপর ভর করিয়া উঠিতে থাকে, আর যখন কোমরে বড় বেদনা হয়, তখন সেই 'টি'টি মোড়ার নীচে লাগাইয়া একবার কোমরটা সোজা করিয়া লয়। এখনও কাণ্ডি আছে, বড় কম। ঝাঁপানও আছে, বড় কম। ইহার বদলে হইয়াছে 'দাঁড়ী' বা ডাণ্ডী'। হিন্দুস্থানী ডাণ্ডী একটা বাঁশে সতরঞ্চ বাঁধা। দুই হাতে বাঁশের উপর ভর করিয়া চড়নদার সেই সতরঞ্চেতে ঝুলিতে

* সাহিত্যপরিষদ গ্রন্থাবলী নং ৫৩। তীর্থ-ভ্রমণ ৺যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী রচিত টীকা ও টিপ্পনী ও সবিস্তার মুখবন্ধ সহ প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি সম্পাদিত। কলিকাতা ২৪৩।১ নং অপার সারকুলার রোড বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ মন্দির হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ১৩২২। মূল্য সাধারণপক্ষে ১।।০

শাখাসভার সদস্যপক্ষে ১।০

পরিষদের সদস্যপক্ষে ১৲

থাকে। ডাণ্ডীওয়ালারা চলে, পূব্‌মুখ হইয়া,—চড়নদার ঝুলিতে থাকেন উত্তর বা দক্ষিণমুখ হইয়া, একেবারে ৯০ ডিগ্রী তফাতে তাঁর চোখ্‌ থাকে। এখনকার ডাণ্ডী তার চেয়ে অনেক ভাল হইয়াছে। কিন্তু সেকালের ডাণ্ডী হইতে এখনকার ডাণ্ডী পর্য্যন্ত যতরকম ডাণ্ডী হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। শতরঞ্চি ঝুলান বাঁশ প্রথম ডাণ্ডী। তারপর দুইয়ের নম্বর ডাণ্ডী—দু'খানা পাতলা সরু তক্তা নৌকার মত করিয়া আঁটা, ঠিক মাঝখানে একটু শতরঞ্চি ঝুলান। আর যেখানটায় পা রাখিবে, সেখানটাও একটু শতরঞ্চি ঝুলান। আগের শতরঞ্চিতে পা রাখ, পিছনের শতরঞ্চিতে বস, আর পিট রাখ নৌকার ছালের দিকে। দু'জনে তোমায় তুলিয়া লইয়া যাইবে। তোমার কিন্তু নড়বার চড়বার জো নাই। যদি শতরঞ্চির ফাঁকে কোন অঙ্গ পড়িয়া গেল, তুমি একেবারে "পপাত"। তিনের নম্বর ডাণ্ডী দুইয়ের নম্বরেরই মত, কেবল সমস্তটা শতরঞ্চি দিয়ে ছাওয়া, সুতরাং ইহাতে শোয়াও যায়, নড়াচড়াও যায়। চারের নম্বরের ডাণ্ডী শতরঞ্চিমোড়া না হইয়া কার্পেটমোড়া। হাতখানেক বা হাত দেড়েকের উপর একখানা ডাণ্ডী উপুড় করা। আর মাঝখানে যে ফাঁক থাকে সেটা ঝালর দেওয়া; পর্দ্দানশীন স্ত্রীলোকের যাওয়া-আসায় বেশ সুবিধা। বৃষ্টির সময়ও বেশ সুবিধা, গায়ে জল লাগে না, উপরে একটা আচ্ছাদন থাকে। এখনকার ডাণ্ডী, একখানা চেয়ার ঠিক ডাণ্ডীর মাঝখানে বসান, শতরঞ্চিও নাই কার্পেটও নাই। যেখানটায় পা ঝুলিবে সেখানে একখানা তক্তা দেওয়া। রোদের সময় [illegible]টি না খুলিয়া বসিবার জো নাই।

সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ত হাঁটিয়াই গিয়াছিলেন। ডাণ্ডী কাণ্ডা ঝাঁপান কিছুই লয়েন নাই। যে পাহাড় দেখিয়াছে আর পাহাড়ে উঠিয়াছে, সেই যদুবাবুর বর্ণনার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে। রাস্তা—পাক ডাণ্ডী, অর্থাৎ পায়ে চলা রাস্তা, কড়া চড়াইয়ে উঠিবার সময় এক-

বার খানিকটা ডানদিকে যাইতে হয়, বিশ হাত গিয়া বড়জোর চার পাঁচ হাত উঠিলে, আবার বাঁ দিকে ফির, বিশ হাত গিয়া বড়জোর চার পাঁচ হাত উঠিলে। অর্থাৎ চল্লিশ হাত ঘুরিয়া তুমি আট দশ হাত মাত্র উঠিবে। এইরূপ তিন চার শত হাত উঠিতে তোমায় ত্রিশ চল্লিশ বার ফিরিতে হইবে ও ৮: ৪০০ :: ৪০ : ক ১৫০০ হাত ঘুরিতে হইবে। সবটাই চড়াই, সুতরাং উঠিবার সময় গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হইবে ও বুকে লাগিবে। ইহার মধ্যে যদি কোথাও পদস্খলন হয়, কোথায় যে গিয়া পড়িবে, তার ঠিক নাই। জীবনের তো আশাই নাই, হাড় পর্য্যন্ত চূর্ণ হইয়া যাইবে। যদুবাবু অনেক জায়গায় লিখিয়াছেন, "ক্রমেই চড়াই ইহাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত।" "ভীমগড়া হইতে চারি ক্রোশ পাহাড়ে উঠিতে হয়। তাহার এক ক্রোশ পর কোথাও পর্ব্বতের পাথর, কোথাও বরফগলা জল, কোথাও ঘাস পাতা, এইমতে এক ক্রোশ। তাহার পর তিন ক্রোশ ক্রমেই বরফের উপর দিয়া পথ। পর্ব্বতের উচ্চের কথা কি লিখিব। গঙ্গাসাগর হইতে কেদারনাথ পাহাড় ৪৫০ শত ক্রোশ উচ্চ। ওই পর্ব্বতের শিরোভাগে উঠিয়া গমন করিতে হয়। বরফের পর্ব্বত—কত যুগের বরফ জমিয়া আছে, তাহা নিরাকরণ করিতে পারা যায় না। এই তিন ক্রোশ পর্য্যন্ত তৃণাদি জন্মে না, কেবল ধবলাকার। চলিতে পায়ের সাড় থাকে না। যেমন ঝিঞ্ঝিনা হইয়া পা অসাড় হয়, সেইমত বরফে পদক্ষেপে পদের অচৈতন্য হয়। পথের ভীষণত্ব কি কহিব। বরফে আচ্ছাদিত পর্ব্বত, তাহার বরফসকল কাটিয়া পথ হইয়াছে, এক এক পদক্ষেপ হইতে পারে, এই পরিসর পথ। যে যে স্থানে পদের কোন চিহ্ন আছে, তাহার উপর পদক্ষেপ করিতে হয়। যদি সম্মুখে কেহ আসিতেছে দেখিয়া কিঞ্চিৎ আশে পাশে পদক্ষেপ কর, তবে মহাবিপদ হয়। পশ্চিম দিকে পদক্ষেপ হইলে কোমর পর্য্যন্ত, কোথায় অস্থায়ী, হইয়া ডুবে। পূর্ব্বদিকে পদক্ষেপ হইয়া কোথায় যায় তাহার নিরাকরণ হয় না।

তাহার কারণ পাহাড়ের গড়েন। * * ঐ দিকে পতিত হইলে একেবারে বরফে মগ্ন হইয়া গঙ্গায় পড়িতে হয়। এক-ব্যক্তির পা বেহিসাব পড়িয়াছিল, সে ব্যক্তি প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া অনেক নিম্নে বরফের উপরে পতিত আছে। প্রায় এক-মাস হইল প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, বরফের গুণে পচে গলে নাই, তাজা আছে।”

পাহাড়ের—বরফের এইরূপ সুন্দর বর্ণনা বাঙ্গালায় আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। যদুবাবুর বর্ণনারও বেশ বাহাদুরি আছে। তিনি এক জায়গায় আকাশের বর্ণনা করিতেছেন। “বৈশাখ মাহার আড়াই প্রহর বেলা, কিন্তু শীতে কম্পমান, কাহারও পদক্ষেপ করি-বার ক্ষমতা হয় না, পর্ব্বতে এমন বেষ্টিত, যে, সূর্য্যের উদয়াস্ত কিছুই জানা যায় নাই—একখানি থালার ন্যায় আকাশ, যাহাকে কহে শূন্য ভাগ, দেখা যাইতেছে। সূর্য্যদেব বরফে আচ্ছাদিত আছেন।” ঠাকুর দেবতার মন্দির পূজা অর্চ্চার নিয়ম, দর্শন, স্পর্শন, ইত্যাদি বিষয়ে যদুবাবু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ খবর দিয়াছেন। উত্তরাখণ্ডের অনেক বড় বড় মন্দির ছয় মাস বরফে আচ্ছন্ন থাকে। অক্ষয়তৃতীয়ার পর বরফ কাটাইয়া মন্দির বাহির করিতে হয়। যদুবাবু বলেন এক-বার কেদারের মন্দির ১২। ফুট বরফে ঢাকা ছিল। মন্দিরের চূড়ার ত্রিশূলটি মাত্র দেখা যাইতেছিল। সেখানকার বাড়ী ঘর একেবারে বন্ধ, ঘরের একটি মাত্র দোর আছে, কোথাও জানালা গবাক্ষ এউজি কিছুই নাই। ঘর ঘোর অন্ধকার, প্রদীপ না জ্বালিলে দিনেই ঢোকা যায় না। খাবার জিনিসও খুব কম পাওয়া যায়, [illegible] ডাল, চিঁড়ে, গুড় আর ঘি এইমাত্র।

সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বদরিকাশ্রম হইতে আবার বৃন্দাবন ফিরিয়া আসেন, কিন্তু যে পথে গিয়াছিলেন সে পথে আর ফিরেন নাই। কেহই সে পথে ফিরে না। গিয়াছিলেন হরিদ্বারের পথে, আসি-লেন আলমোরার পথে।

বৃন্দাবনে আসিয়া তথায় কিছুদিন অবস্থান করেন এবং বৃন্দা-বনের দ্বাদশ বন ভ্রমণ করিয়া বেড়ান।—যথা, মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বেহুলাবন, লাঠাবন, কাম্যবন, কোকিলবন, ডাণ্ডীর বন, বেলবন, মহাবন, ভদ্রবন ইত্যাদি। সন ১২৬২ সালের ১৯শে মাঘ সর্ব্বাধি-কারী মহাশয় জলন্ধর যাত্রা করেন' চৌমুয়া, কুশী হড়েল, পরওল বল্লভগড় ফরিদাবাদ হইয়া দিল্লীতে পঁহুছিলেন। দিল্লী, পড়াউ, উক্সানী, জইগ্রাম, রসনেগ্রাম, শ্যামহানাকী পড়াবু হইয়া পানিপথ সহর। পানি পথ হইতে কর্ণাল ও থানেশ্বর হইয়া কুরুক্ষেত্র। তথায় নানা দেবদেবী দর্শন স্পর্শন পূজা অর্চ্চনা স্নান দান ইত্যাদি করিয়া দশদিন তথায় বাস করিয়া যদুবাবু পুনরায় উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। প্রথম পিপ্‌লী, তারপর েওড়া, সাহাবাদ, আম্বালা, রামপুরা, সর্‌হিন্দ, লস্কর ও পরে লুধিয়ানা। লুধিয়ানা হইতে চারিক্রোশ দূরে শট্‌-লেজ নদী, পার হইয়া ফাগুওয়াড়া। যদুবাবু সেখানে এক সাধু দেখিয়াছিলেন, তিনি বার বৎসর দাঁড়াইয়া আছেন। ফাগুয়াড়ার পর কোরেলা, হুসিয়ারপুর, বোটা, আমবাগ, রাজপুরী, চম্পা, পরে জ্বালামুখীর মন্দির।

"মন্দির মধ্যে মহাদেবীর জ্যোতি জ্বলিত আছে। মন্দিরের মধ্যস্থলে এক কুণ্ড আছে, ওই কুণ্ডের উত্তরদিকে চারি জ্যোতি আছে, মধ্যস্থলে দুই জ্যোতি, তাহার মধ্যে এক জ্যোতি প্রবল, আর জ্যোতি কখন প্রকট কখনও অপ্রকট থাকে। যে প্রবল জ্যোতি আছে, তাহার নাম হিঙ্গলাজ। এই জ্যোতির মধ্যে পেঁড়া দুগ্ধ [illegible]া ধরিবে তাহাই ভক্ষিত হয়।...সকল জ্যোতিতে পেঁড়া ঘৃত বিল্বদল দিলে ভস্ম হয়। পেঁড়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দিলে জ্যোতি শিখার কিছু মৃদু হয়, কিঞ্চিৎ পরে পূর্ব্বমত উজ্জ্বলিত হয়। দুগ্ধ ভক্ষণ যে দুই প্রবল [illegible]্যোতি আছে, তাহাতে হয়। একটি পাত্রে করিয়া দুগ্ধ এই জ্যোতির সম্মুখে সংলগ্ন করিয়া ধরিলে, ক্ষণকাল মধ্যে ওই পাত্র মধ্যে জ্যোতি প্রবিষ্ট হইয়া ভক্ষিত হয়। দুগ্ধ কম হয়। পেঁড়ার

বাতাসা আর একটু মিষ্টান্ন কিম্বা মেওয়া যে কিছু নৈবেদ্য দ্রব্য লইয়া জাগ্রত জ্যোতি মহাদেবীর সম্মুখে ধারণ করিলে ওই সকল দ্রব্যের উপর জ্যোতি আসিয়া অগ্নি-দগ্ধের ন্যায় প্রসাদী দ্রব্য থাকে।”

জ্বালামুখীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করিয়া যদুবাবু ২৬শে ফাল্গুন নাদওন, ফতেপুর, সিমুলিয়া, লম্বুডুর, গোপালপুর হইয়া রেওয়াশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রেওয়াশ্বরে এক প্রকাণ্ড কুণ্ড আছে, কুণ্ডের জল অতলস্পর্শ—দুই ক্রোশের পরিক্রম—ঐ জলমধ্যে সাত বেড়া (ভাসা-বাগান) আছে। ইহার মধ্যে ছয় বেড়া বারমাস ভাসিয়া বেড়ায়। মহাদেবী দুর্গার বেড়া শ্রাবণ ভাদ্র দুই মাস ভাসে। ব্রহ্মার বেড়ার উপরে নলের ও ঘাসের বন, এক অশ্বত্থ ও এক বট দুই বৃক্ষ আছে। বৃক্ষের বেড় দেড়হাত দু'হাত হইবে, খাড়া তিন হাত, তাহার উপর শাখা-পল্লবে শোভিত। বেওয়াশ্বর হইতে মুণ্ডী, মুণ্ডী রাজার রাজধানী। সেখান হইতে পুরাণ সহর পারমণ্ডী। অতি ভয়ানক হড়হড়ানে পথ, পায়ের ঠিক রাখা দুষ্কর। তথা হইতে জজরু কুফরু, তথা হইতে কুমাদের হট্টা, ডোলচীর হট্টা, তথা হইয়া বেজওয়াড় কুলুর রাজার রাজধানী। এখানে যে নদী আছে, মশকে চড়িয়া পার হইতে হয়। পারে বিয়োড় গ্রাম, তথা হইতে বামনকোটী, জরিগ্রাম; তথা হইতে মণিকর্ণ। সেখানে গরম জলে, কুণ্ড আছে, সর্ব্বদা ধোঁয়া উঠিতেছে। “কুণ্ডের মধ্যে অন্ন খেচরান্ন রুটী মালপো পায়স ডাল তরকারী ইত্যাদি যাহা দিবে, সুপক্ক হইয়া সুখাদ্য হয়। অগ্নি-সংস্কার পাকে বহুবিধ রন্ধনের সুগন্ধি দ্রব্য দিয়া সুযত্নে পাক করিলেও এতাদৃশ সুখাদ্য হয় [illegible] মণিকরণ হইতে বামনকোটী, তথা হইতে বিজলীশ্বর মহাদেব ও কুলু সহর। এই সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের পাহাড়-ভ্রমণের শেষ। তিনি এইখান হইতে ফিরিলেন। কিন্তু যে পথে গিয়াছিলেন সেই পথেই প্রায়। কুলু হইতে বেজবর, বেজবর হইতে ডোলচী, ডোলচী হইতে কুমাদ, কুমাদ হইতে জজরু কুফরু। ফুটাখল—ফুটাখল পাহা-

ড়ের উপর। ফুটাখল হইতে গোমা, গোমা হইতে ভাঙ্গাহাল, ভাঙ্গাহাল হইতে বৈদ্যনাথ। সেখানে অনেক দেবদেবী আছেন। বৈদ্যনাথ হইতে বেবামনা, তথা হইতে পরবল, পরবল হইতে ভাগশু, ভাগশু হইতে নগরোগ্রাম, তথা হইতে কাঙ্গরা দেবীর মন্দির, জালন্ধর পীঠ। এখানে পাঁচ মহাদেবী আছেন, ৩৬০ তীর্থ আছে। কাঙ্গড়া হইতে গণেশঘাটী পাহাড়, তথা হইতে রাণী তলাও, তথা হইতে জোয়ালাজীর মন্দির। জোয়ালাজী ছাড়িয়া চিন্তাপুরলী, চিন্তাপুরলী হইতে চোটা, চোটা হইতে হুসিয়ারপুর। তথা হইতে বাজেশ্বরী দেবীর মন্দির, জেজো পর্ব্বত, তথা হইতে সন্তোখ্‌গড়, তথা হইতে শতলেজ নদী, পার হইয়া বরমপুর, তথা হইতে নন্দপুর, থুপ্‌ গাঁ কোটগ্রাম। কোটগ্রামে বড় জলকষ্ট, এক কলসী জলের দাম দু'পয়সা। তথা হইতে নয়নাদেবীর মন্দির,—পাহাড়ের চূড়ায়। অন্যান্য দেবদেবীও যথেষ্ট আছে। এই মন্দির হইতে ফের কোটগ্রাম সন্তোখগড় হইয়া হুসিয়ার পুর। ক্রমে দিল্লী, তথা হইতে বৃন্দাবন আগ্রা। আগ্রা হইতে নৌকাপথে যমুনা বাহিয়া প্রয়াগ, ক্রমে কাশী, গাজীপুর, বক্সার, পাটনা, মোকামা, মুঙ্গের, ভাগলপুর, রাজমহল, মুর্শিদাবাদ, বহরম, কাটোয়া, নবদ্বীপ, কাল্‌না, শান্তিপুর, চাক্‌দা, ত্রিবেণী, হুগলী হইয়া কলিকাতা প্রত্যাগমন করিলেন। এবার জলপথে আসার কারণ স্থলপথে মিউটিনি। যদুবাবু মিউটিনির অনেক কথা বলিয়াছেন। যদুবাবু স্বাধীনভাবেই বলিয়াছেন। সম্পাদক তাহার মধ্যে কিছু কিছু তুলিয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালীর মুখে মিউটিনির কথা একটা নূতন জিনিস।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যদুবাবুর লেখার আমরা একটি পুরাণ জিনি- খবর পাই। লোকে রেলওয়ে হইবার পূর্ব্বে কিরূপে স্থলপথে বা জলপথে দূরদূরান্তরে গমন করিত। যদুবাবু বরাবর হাঁটিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁর নিকট আমরা অনেক বেশী খবর পাই। পাহাড়ের মধ্যে একবার তিনি বদরিক-কেদার ও আর একবার কুলুর পাহাড়, পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। তিনি পাকা হিন্দু, তীর্থদর্শন দেবদর্শন

পূজা অর্চা, তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি সেইগুলিই বেশী করিয়া দেখিয়াছিলেন। তাঁহার পুস্তক সুপাঠ্য ও সুন্দর।

নগেনবাবু এই পুস্তক সম্পাদন করিয়াছেন। গোড়ায় ৯৫ পৃষ্ঠা ভূমিকা লিখিয়াছেন ও শেষে চৌত্রিশ পাত টিপ্পনীর পরিশিষ্ট ও একটি বর্ণানুক্রমিক নাম সূচী দিয়াছেন। যদুবাবু সম্বন্ধে তিনি অনেক খবর দিয়াছেন, তাঁহাদের বংশ-পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার নিজেরও অনেক পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার লিখিত কয়েকটি গানও তুলিয়া দিয়াছেন। নগেন্দ্রবাবুর হাতে পড়িয়া যদুবাবুর রোজনামচা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এই পুস্তক প্রচার করিয়া বাঙ্গালার বিশেষ উপকার করিয়াছেন। তাঁহারা খরচা লইয়াই অতি অল্প দামেই এ পুস্তক বিক্রয় করিতেছেন।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

বিশ্ব-সেবায় বিদ্যুৎ

২।

গত মাসের প্রবন্ধে বিদ্যুতের দৌত্যকার্য্যের কথা কিছু বলা হইয়াছে। এবারে তাহার দূতিগিরির কথা কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। ব্যাকরণবিশারদগণ বলেন যে, বিশেষরূপে দ্যুতিদান করে বলিয়া ইহার নাম বিদ্যুৎ হইয়াছে। তাঁহাদের এই ভ্রম সংশোধন করিয়া আমরা বলিব, বিশেষভাবে দূতিপনা করে বলিয়াই ইহার নাম হইয়াছে বিদ্যুৎ। নানাবিধ রাসায়নিক পদার্থের মিলন ও বিচ্ছেদ ঘটাইতে চঞ্চলার খুব কেরামতি দেখিতে পাওয়া যায়। তবে মিলন অপেক্ষা বিচ্ছেদ বাধাইতে ইনি অধিক সিদ্ধহস্ত; এবং

এই কাজের জন্ত বৈজ্ঞানিকেরা ইঁহার বিশেষ খাতির করিয়া থাকেন।

অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের রাসায়নিক যোগে জল জন্মে। এই জলের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চালিত করিলে তাহা বিশ্লিষ্ট হইয়া পুনরায় অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনে পরিণত হয়। বিবিধ খনিজ পদার্থের মধ্যে নানাপ্রকার ধাতু আছে। কাশ্মারী জাঙ্গাল ও তুঁতের মধ্যে তামা আছে; হীরাকষের মধ্যে লোহা আছে; এবং ফট্‌কিরীর মধ্যে এলুমিনাম ও পটাসিয়াম নামে দুই প্রকার ধাতু আছে। বিদ্যুতের দ্বারা এইরূপ একটি খনিজ পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক বিচ্ছেদ বাধাইয়া তাহা হইতে কোন কোন মূল-পদার্থকে পৃথক করিয়া লইতে পারা যায়।

এই দূতিপনার জন্য সৌদামিনীর নিকট আজ সমস্ত সভ্যজগৎ বিশেষভাবে ঋণী। পূর্ব্বপুরুষদিগের আমল হইতে আমরা এতদিন পিতল কাঁসার বাসনই ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি। আজ বিদ্যুতের কৃপায় বিশ্ববাসী হাল্‌কা এলুমিনামের তৈজসপত্র উপঢৌকন পাইয়াছে। পূর্ব্বে এক সের এলুমিনাম উৎপাদন করিতে পঁচিশ টাকা ব্যয় হইত। এখন বিদ্যুতের সাহায্যে এই কাজ পাঁচ সিকা ব্যয়ে হইয়া থাকে। ইদানীং বৈদ্যুতিক উপায়ে জগতে প্রতি বৎসর প্রায় পাঁচ লক্ষ মণ এলুমিনাম উৎপন্ন হইতেছে। তাই সভ্যজগতে এই ধাতুর ব্যবহার দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। এলুমিনাম সুলভ না হইলে তদ্দারা এত এরোপ্লেন ও জেপেলিন নির্ম্মিত হইতে পারিত না; এবং [illegible]াতে আরোহণ করিয়া মেঘের আড়ালে থাকিয়া বিংশ শতাব্দীর [illegible] শত ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ করাও সম্ভব হইত না।

পূর্ব্বে টিনের ছাঁট ও টুক্‌রাগুলিকে আবর্জ্জনা জ্ঞানে ফেলিয়া দেওয়া হইত। এখন ইউরোপের অনেক স্থানে বিদ্যুতের দ্বারা তাহা হইতে বিস্তর রাঙ্‌ সংগ্রহ করা হয়। টাঁকশালের আবর্জ্জনা হইতে বৈদ্যুতিক উপায়ে এখন প্রচুর স্বর্ণ রৌপ্যের পুনরুদ্ধার হইয়া

থাকে। এতদিন সোরা হইতে নাইট্রিক এসিড্ প্রস্তুত হইত। সম্প্রতি সুইডেনের একটি কারখানায় আকাশের বায়ু হইতে বিদ্যুতের দ্বারা নিত্য পঁয়তাল্লিশ মণ করিয়া নাইট্রিক এসিড্ তৈয়ার হইতেছে। একদিন চঞ্চলা হয় ত আমাদের জন্য আসমান হইতে স্বর্ণ রৌপ্যও আনিয়া হাজির করিবেন। আসমানে এই সকল মহার্ঘ ধাতুর পরমাণু যে অদৃশ্যভাবে উড়িয়া বেড়াইতেছে তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। কলিকাতায় প্রাচীন লোকদের নিকট শুনিয়াছিলাম যে হোসেন খাঁ নামে প্রসিদ্ধ যাদুকর আসমান হইতে অকস্মাৎ সোণা রূপা, এমন কি মতী জহরৎ পর্য্যন্ত আনিয়া বড়লোক দর্শকবৃন্দের তাক্ লাগাইয়া দিত। আমরাও দেখিয়াছি, কোন কোন ম্যাজিসিয়ান তাহার যাদুদণ্ডের দ্বারা শূন্য হইতে ক্রমাগত টাকা সংগ্রহ করিয়া টেবিলের উপর স্তূপাকার করে। চঞ্চলা যখন বিংশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুকরী, তখন মনে হয় ইনিও এককালে আকাশ হইতে স্বর্ণ রৌপ্যের বৃষ্টি করাইতে সক্ষম হইবেন। অলঙ্কারপ্রয়াসী বঙ্গললনাদিগকে আপাততঃ চঞ্চলার মুখের দিকে চাহিয়া আকাশবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে। তবে তাঁহাদের আশা জাগাইয়া রাখিবার জন্য এই যাদুকরী সম্প্রতি অসংখ্য প্রকারের গিল্টির গহনা সরবরাহ করিতেছেন। Electro-plating বা গিল্টির যত কিছু কাজ আছে তাহা বিদ্যুৎ এখন একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে। আসল যতদিন না পাই, ততদিন নকলেই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

বিদ্যুতের অদ্ভুত পদার্থ-বিশ্লেষণ শক্তির ফলে আমরা আর এক আবশ্যকীয় বস্তু লাভ করিয়াছি। সেকালে রোসনাই করিতে হইলে সকলকেই তেল ও বাতির উপর নির্ভর করিতে হইত। এখন সুদূর পল্লীগ্রামেও বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে অনেকে কার্বাইডের শ্রাদ্ধ করিয়া এসিটেলিন্ লাইটের ছড়াছড়ি করিয়া থাকেন। অনেকেই জানেন না যে, এসিটেলিন্ গ্যাসের এই মসলা একমাত্র বৈদ্যুতিক

উপায়েই প্রস্তুত হইয়া থাকে। কার্বাইডের জন্ম দিয়া বিদ্যুৎ প্রকারান্তরে "দুনিয়ার রোসনিদার" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইলেক্‌ট্রিক্ লাইট্ কেবল বড় বড় সহরেই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু এসিটেলিন লাইট্ না আছে, জগতে এমন স্থান বিরল।

বিদ্যুতের সহিত চুম্বকের অতি নিকট সম্বন্ধ। একটি লৌহদণ্ডের উপরে রেশমাবৃত ইন্‌সুলেট্‌করা তামার তার জড়াইয়া, সেই তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ চালাইয়া দিলে, লৌহদণ্ডটি তৎকালে চুম্বকের গুণ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহা নিকটবর্ত্তী অপর লৌহখণ্ডকে আকর্ষণ করে। তারের মধ্যে বিদ্যুতের গতি বন্ধ করিয়া দিলে লৌহদণ্ডের চুম্বকত্বও লোপ পায়। ঐ তারের মধ্যে যতক্ষণ ও যতবার বিদ্যুতের গতি, ততক্ষণ ও ততবার ঐ লৌহদণ্ডের চুম্বকত্ব। এইরূপ অস্থায়ী চুম্বককে Electro-magnet বা বৈদ্যুতিক চুম্বক বলে। চিরস্থায়ী প্রাকৃতিক চুম্বককে আমরা এইরূপ কল্পনা করিয়া লইতে পারি যেন তাহা একখণ্ড লৌহমাত্র, যাহার গাত্রে বৈদ্যুতিক শক্তি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রদক্ষিণ করিতেছে। Magnet বা চুম্বকের একটি আশ্চর্য্য শক্তি আছে। একটি লম্বা ইন্‌সুলেট্‌করা তারকে গোলাকার গুচ্ছে পাকাইয়া চুম্বকের সন্নিকটে আনিলে, ঐ তারের মধ্যে বিদ্যুতের ক্ষণিক আবির্ভাব হয়। আবার ঐ তারগুচ্ছকে চুম্বকের নিকট হইতে যে মুহূর্ত্তে সরাইয়া লওয়া হয়, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তাহার মধ্যে আর একবার (উল্টাগতিবিশিষ্ট) বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। ক্ষণপ্রভার ঈদৃশ ক্ষণিক আবির্ভাব ও তিরোভাবের কৌশল অবলম্বন করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বিস্তর বিদ্যা-বুদ্ধি ব্যয় করিয়া তাড়িৎ-উৎপাদক বড় বড় ডাইনামো-যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই যন্ত্রের দ্বারা অফুরন্ত ভাবে বিদ্যুৎ জন্মাইতে পারা যায়। ডাইনামো চালাইতে কিছু শক্তির আবশ্যক হয়। আমেরিকায় মার্কিণজাতি নায়াগ্রা জলপ্রপাতের প্রাকৃতিক শক্তিদ্বারা উপযুক্ত আকারের ডাইনামো চালাইয়া দশ লক্ষ horse-power বা অশ্ব-শক্তির বিদ্যুৎ সৃষ্টি

করিয়া, তদ্দ্বারা তাঁহাদের কয়েকটি সহরের রাস্তাঘাট আলোকিত করিতেছেন, এবং ট্রামগাড়ী ও কলকারখানাগুলি চালাইতেছেন। ইহাকেই বলে, ষোল আনা ঠকাইয়া সাড়ে ষোল আনার কাজ করাইয়া লওয়া। মানুষের বিদ্যা-বুদ্ধির অসাধ্য কর্ম্ম নাই।

ফলতঃ মার্কিণদেশেই এখন বিদ্যুতের যাহাকিছু আছে, তাহার চূড়ান্ত করিয়া ছাড়া হইতেছে। Steam বা বাষ্পকে লইয়া ইংরেজজাতি জগতে অনেক কেরামতি দেখাইয়াছেন। সেকারণে আমেরিকার প্রসিদ্ধ মনীষী এমার্স ন সাহেব ষ্টীমের জাতি নির্দ্দেশ করিতে গিয়া তাহাকে 'আধা-ইংরেজ' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। সেই হিসাবে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে আজ আমরা বলিতে পারি, ইনি জাত্যাংশে 'চৌদ্দ-আনা মার্কিণ'।

বিদ্যুতের জন্মপত্রিকা বা কোষ্ঠী লিখিতে হইলে প্রথমে লিখিতে হইবে, ফরাসী বিপ্লবের সময় ইটালীতে গ্যাল্‌ভানি ও ভল্টা ইহার প্রথম আবিষ্কার করেন। পরে ১৮১৯ সালে আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের প্রারম্ভে বিলাতে বিদ্যুৎ ও চুম্বকের সম্বন্ধ প্রথম আবিষ্কৃত হয়। এই সনেই বাষ্পীয় অর্ণবপোতের প্রথম সৃষ্টি হয়। ১৮৩৭ সালে মর্স্‌ নামে একজন মার্কিণ সাহেব টেলিগ্রাফের প্রথম সৃষ্টি করেন। তৎপরে ১৮৬০ সালে জার্ম্মাণীতে টেলিফোনের উদ্ভাবনা হয়। টেলিফোন যে কেবল কথা কহিবার জন্যই আবশ্যক হয়, তাহা নহে। ইহার সাহায্যে ভূগর্ভে লুক্কায়িত লৌহখনি এবং সমুদ্রগর্ভে লুক্কায়িত টর্পিডোর সন্ধান পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। ইলেক্ট্রো-ম্যাগ্‌নেটে চুম্বকত্বের আবির্ভাব ও তিরোভাবের সময় একপ্রকার শব্দ হয়। এই তথ্য অবলম্বন করিয়াই টেলিফোনের সৃষ্টি। টেলিফোনের মধ্যে ইলেক্ট্রো-ম্যাগ্‌নেট্‌ হচ্চে অত্যাবশ্যকীয় অংশ। লৌহখনি বা লৌহময় টর্পিডোর সান্নিধ্যে টেলিফোনের অন্তর্গত ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটে শব্দবিশেষের অনুভূতি হয়। তাহা হইতেই জানা যায়, নিকটে লৌহখনি বা টর্পিডো আছে।

১৮৭৯ সালে বার্লিন্ একজিবিশনে ছোট ইলেক্ট্রিক্ রেলগাড়ীর নমুনা প্রথম প্রদর্শিত হয়। ১৮৮১ ও ১৮৮২ সালে পারিস ও লণ্ডন নগরে ইলেক্‌ট্রিক্ ল্যাম্পের প্রথম নমুনা দেখান হয়। কথিত আছে, এই ল্যাম্প দেখিয়া গ্যাস কোম্পানির অংশীদারদের হৃদ্‌কম্প হইয়াছিল। তার পর ১৮৮৭ সালে আমেরিকার রিচ্‌মণ্ড নগরে সর্ব্বপ্রথম ইলেক্ট্রিক্ ট্রামওয়ে খোলা হয়। ১৮৯৩ সালে আমেরিকার সিকাগো একজিবিশনে যাইবার জন্য দশ লক্ষ লোক পঞ্চাশখানি ইলেক্ট্রিক্ বোটে করিয়া সেখানকার হ্রদ পার হইয়াছিল। বঙ্গমাতার বরপুত্র বিবেকানন্দ স্বামীও এই সিকাগো একজিবিশনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার জগৎ-প্রসিদ্ধ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। স্বামিজীও সম্ভবতঃ ইহার একখানি নৌকায় পাড়ি জমাইয়াছিলেন।

১৮৯৫ সালে জার্ম্মাণীতে X'ray বা রঞ্জেন-রশ্মির আবিষ্কার হয়। এই অদ্ভুত আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানক্ষেত্রে যুগান্তর সূচিত হইয়াছে। এই রঞ্জেন-রশ্মি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়বিশিষ্ট মানুষকে একটি ষষ্ঠেন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছে। এতাবৎ যেসকল তত্ত্ব ইন্দ্রিয়াতীত ছিল, তাহার কতকগুলি এখন এই রশ্মির প্রভাবে মানবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতেছে। ১৮৯৬ সালে মার্কণী নামক একজন ইটালীয়ান্ পণ্ডিত তারবিহীন টেলিগ্রাফের উদ্ভাবনা করেন। ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটের প্রভাব তরঙ্গাকারে শূন্যপথে বহুদূর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে পারে—এই তথ্য লইয়াই তারবিহীন টেলিগ্রাফের সৃষ্টি। ভারতগৌরব আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁহার নিজের উদ্ভাবিত পরীক্ষাদ্বারা দেখাইয়াছিলেন [illegible] এবম্বিধ বৈদ্যুতিক শক্তিকে তারবিহীন শূন্যপথে পরিচালিত করিয়া তাহা[illegible] স্থানান্তরে কার্য্য করাইয়া লওয়া যাইতে পারে।

[illegible]কিৎসার ব্যাপারে বহুদিন হইতে সকল দেশেই বিদ্যুতের নামে অনেক [illegible]কম জুয়াচুরি চলিয়া আসিতেছে। বৈদ্যুতিক মাদুলী, বৈদ্যুতিক কবজ, বৈদ্যুতিক অঙ্গুরী ও বৈদ্যুতিক বেল্ট্ বা কোমরবন্ধের বিজ্ঞাপনে সংবাদপত্রের কলেবর প্রায়ই অলঙ্কৃত দেখিতে

পাওয়া যায়। বিলাতে এক ধড়িবাজ লোক কেশের শ্রীবৃদ্ধির জন্য এক 'বৈদ্যুতিক ব্রাশ্' আবিষ্কার করিয়া বাজারে বিস্তর বিক্রয় করিয়াছিল। তাহার মতে, ইহাদ্বারা চুল আঁচড়াইলে সত্বর তাহা ঘন হইয়া গজাইয়া উঠে। ব্রাশের কাঠের মধ্যে একখানি চুম্বক লুকানো থাকিত। গ্যাল্ভানোমিটার বা দিক্‌দর্শন-কম্পাসের নিকট এই ব্রাশ লইয়া গেলে তাহার কাঁটা তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া যাইত। অজ্ঞলোকের নিকট ইহা নিশ্চয়ই বৈদ্যুতিক শক্তির পরিচায়ক।

কিছুদিন পূর্ব্বে বিজ্ঞাপনে ইলেক্‌ট্রিক্ মিক্‌শ্চার ও ইলেক্‌ট্রিক্ সালসার নাম দেখিয়াছিলাম। ভক্তি ও বিশ্বাসপূর্ব্বক সেবন করিলে সম্ভবতঃ এই ঔষধগুলি পেটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্যাটারির কাজ করিত। একবার এক বাতের রোগী বেদনায় লাগাইবার জন্য একপ্রকার 'ইলেক্‌ট্রিক্ মলম' খরিদ করিয়া আনিয়াছিল। তাহার বেদনার স্থানে একটি ক্ষত থাকায় সেখানে ঐ মলম লাগাইবামাত্র রোগী 'বাপ্‌রে' বলিয়া চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিল। বোধ হয় মলমের মধ্যে অত্যন্ত অধিক ইলেক্‌ট্রিসিটি ছিল; তাহাতেই তাহার ঐরূপ 'শক্' (shock) লাগিয়াছিল। ইলেক্‌ট্রো-হোমিওপ্যাথিক ঔষধেও নাকি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ইলেক্‌ট্রিসিটি থাকে; সেজন্য ঐ সকল ঔষধের নাম শ্বেত ইলেক্‌ট্রিসিটি, পীত ইলেক্‌ট্রিসিটি, লোহিত ইলেক্‌ট্রিসিটি, ইত্যাদি। এগুলি সেবন করিলে রঙ্-বিরঙের 'শক্' লাগে কিনা জানি না।

রঙ্গরহস্য ছাড়িয়া দিয়া বলিতে পারা যায় যে, চিকিৎসা ব্যাপারে বিদ্যুৎ এক নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। যে সকল রোগ পূর্ব্বে অসাধ্য বলিয়া গণ্য হইত, এখন বৈদ্যুতিক চিকিৎসার অনুকম্পায় তাহার অনেকগুলি সাধ্যরোগের তালিকাভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। 'লুপাস' নামক অধরোষ্ঠের একপ্রকার অসাধ্য ক্ষত এখন বৈদ্যুতিক রশ্মিবিশেষের প্রয়োগে আশ্চর্য্যরূপ আরোগ্য হইতেছে। বাত, পক্ষাঘাত ও অনেক রকম স্নায়বিক রোগ ইদানীং বিদ্যুৎপ্রয়োগে সুন্দররূপে

চিকিৎসিত হইতেছে। বিদ্যুতের সাহায্যে শরীরের স্থানবিশেষকে সম্পূর্ণ অসাড় করিয়া সেখানে বিনা কষ্টে অস্ত্রপ্রয়োগ করা হয়। বিদ্যুতের দ্বারা 'ওজোন' বা ঘনীভূত অক্সিজেন তৈয়ার করিয়া তাহার সাহায্যে যক্ষ্মা ও অন্যান্য কতকগুলি রোগ আরোগ্য করিবার চেষ্টা চলিতেছে। আজকাল বিদ্যুৎকৃত ওজোনের দ্বারা কোন কোন দেশে ড্রেন ও পচা পুষ্করিণীর জল শোধিত করা হইয়া থাকে।

বৈদ্যুতিক রঞ্জেন-রশ্মির সাহায্যে দেহের মধ্যস্থ ভাঙ্গা হাড় ও ধাতুপদার্থ পরিষ্কাররূপ দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাতে ডাক্তারের বিশেষ সুবিধা হয়। বন্দুকে আহত ব্যক্তির শরীরের ঠিক কোন্ স্থানে বুলেট্ রহিয়াছে তাহা এই উপায়ে দেখিতে পাওয়া যায়। সার্জ্জেনের পক্ষে রঞ্জেন-রশ্মি হচ্চে অন্ধের চক্ষু। একটি বালিকা খেলাঘরের ছোট একটি বাইসাইকেল খেলনা খাইয়া ফেলিয়াছিল। রঞ্জেন-রশ্মির দ্বারা তাহার ফটোগ্রাফ লইয়া দেখা গেল ঐ খেলনাটি বালিকার বুকের কাছে অন্ননালীর ভিতরে আটকাইয়া আছে। লেখক একখানি পুস্তকে এই ফটোগ্রাফের হাফ্‌টোন ছবি দেখিয়াছিলেন। ডাক্তার সাহেব অস্ত্র করিয়া বাইসাইকেলখানি বাহির করিয়া দিলেন। তিনি বালিকাকে বলিয়া দিলেন যেন সে ভবিষ্যতে তাহার খেলাঘরের সকল বাইসাইকেলগুলিতে এক একটি মোটা সূতা বাঁধিয়া রাখে; কারণ, তাহা গিলিয়া ফেলিলে ঐ সূতা ধরিয়া টানিলেই সহজে বাহির হইয়া আসিবে, আর অস্ত্র করিবার আবশ্যক হইবে না।

বৈদ্যুতিক আলোকেরও অপকারিতা আছে। রৌদ্রে অধিকক্ষণ থাকিলে যেমন সর্দ্দিগর্ম্মি হয়, বিদ্যুতের তীব্র আলোকে অধিকক্ষণ থাকিলেও একপ্রকার সর্দ্দিগর্ম্মি হইতে পারে, তাহার নাম Electric sunstroke। উদর বা দেহের অন্যান্য গহ্বরের মধ্যে জ্বলন্ত ছোট বৈদ্যুতিক ল্যাম্প প্রবেশ করাইয়া তাহার আলোকে তাহা বাহির হইতে পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয়। বিদ্যুতের দ্বারা কটারাইজ্ করিয়া নাকি, মুখ ও মলদ্বারের ভিতর বিনা রক্তপাতে নানাবিধ অস্ত্র করা

হইয়া থাকে। চোখের মধ্যে ছুঁচ ফুটিয়া থাকিলে বড় বৈদ্যুতিক চুম্বকের সাহায্যে আকর্ষণ করিয়া ঐ ছুঁচ বাহির করিয়া লওয়া হয়, চোখের মধ্যে ছুরি বা চিম্‌টা চালাইতে হয় না।

শ্রীহরিদাস হালদার।

সাধু ও শিল্পী*

শিল্পী ইন্দ্রিয়ের খেলা যে দৃষ্টিতে দেখেন, তাহা একদিকে যেমন বিষয়বদ্ধের দৃষ্টি নহে, অন্যদিকে তেমনি সাধুরও দৃষ্টি নহে, তাহা হইতেছে ঋষিদৃষ্টি—'আর্টের আধ্যাত্মিকতা' প্রবন্ধটির ইহাই মূল কথা। শিল্পী স্থূলকে শুধু স্থূলভাবেই দেখেন না, তিনি অন্বেষণ করেন স্থূলের মধ্য দিয়া সূক্ষ্মের রহস্যবিকাশ, আত্মার আপনারই বিভূতির খেলা। অতএব একান্ত ইন্দ্রিয়পর যিনি তাঁহার মধ্যে শিল্পীর বোধ নাই। রাধাকমল বাবুও এই কথাটিই মুখ্যতঃ তাঁহার প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। দ্বিতীয় কথা হইতেছে শিল্পীর দৃষ্টি সাধুর দৃষ্টি নহে, কারণ শিল্পী ইন্দ্রিয়ের সব খেলাতেই ভালমন্দ পাপপুণ্য ক্ষুদ্রমহৎ সমানভাবে সকলের মধ্যে নিগূঢ় ভাগবতরসেরই বিচিত্র সঞ্চার দেখিতে পান, সা[illegible] কিন্তু ইন্দ্রিয়খেলার বিশেষ প্রকরণের মধ্যে—পুণ্যের মধ্যে, মঙ্গ[illegible] মধ্যে, ইন্দ্রিয়ের অতীত হইবার প্রয়াসের মধ্যে শুধু ভগ[illegible]ক দেখেন। রাধাকমল বাবু এইখানে আপত্তি করিয়[illegible]ছেন। তিনি বলেন সাধু ও শিল্পীর মধ্যে এইরূপ কোন প্রভেদ ন[illegible]ই। চৈতন্য-

---

* ভাদ্র সংখ্যার 'সাহিত্য ও সুনীতি' নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

দেব ও যীশুখৃষ্টের উদাহরণ দেখাইয়া তিনি বলিতেছেন, প্রকৃত সাধু যিনি, পাপের প্রতি তাঁহার কোন ঘৃণা নাই, পাপের মধ্যেও তিনি ভগবানকে দেখেন। কিন্তু প্রশ্ন এই—সাধু পাপের মধ্যে দেখেন কোন্ ভগবান, কি ভাবে? পাপের মধ্যে সাধু দেখেন 'পুণ্যাত্মক' ভগবান, 'পাপাত্মক' ভগবানকেও তিনি দেখেন কি? সাধুর পাপের প্রতি ঘৃণা, ঘৃণা বলিতে যে বিশেষ প্রকার চিত্ত-বিক্ষোভ বুঝি তাহা না থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু পাপকে তিনি একটা নিকৃষ্টতর জিনিস বলিয়াই বোধ করেন, উহা হইতে দূরেই থাকিতে চাহেন। তাঁহার লক্ষ্য, রাধাকমল বাবু যেমন বলিয়াছেন, পাপীকে 'উদ্ধার' করা। পাপীকে সাধু আলিঙ্গন করিতে পারেন কিন্তু পাপকে কখন তিনি আলিঙ্গন করিবেন না। পাপীর পাপের অন্তরালে একটা পুণ্যবান শুদ্ধিমান কিছুর সহিতই তাঁহার একাত্মতা, পাপের সহিত নহে। পাপীর মধ্যে সাধু ভগবানকে দেখেন তাহার পাপ সত্ত্বেও, কিন্তু পাপের জন্যই কি তিনি সেখানে ভগবানকে দেখেন? চৈতন্যদেব পাপীকে যখন বলিতেছেন, "তা'ই ব'লে কি প্রেম দিব না" তাঁহার মুখ হইতে অলক্ষিতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে 'তা'ই ব'লে', অর্থাৎ পাপ তাঁহার প্রেমের প্রতিবন্ধক, পাপকে ভালবাসা যায় না। যীশুখৃষ্ট পাপিনীকে বলিতেছেন, go and sin no more—যীশুখৃষ্টের সমস্ত দীক্ষাই ত এই পাপকে হেয় বলিয়া পরিবর্জ্জন করা। শিল্পীর বোধ কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য প্রকার। তিনি পাপীর মধ্যে ভাবগত-সৌন্দর্য্য দেখেন তাহার [illegible]পের জন্যই। পাপের বিশেষত্বের মধ্যে কি অপার রস খেলি-তেছে তাহাই তাঁহার লক্ষ্য। পাপীর পাপের অতীত প্রদেশে শুদ্ধাত্মা, মঙ্গলময় কিছু সদাসর্ব্বদা আছে কি না তাহা দেখান শিল্পীর কার্য্য নহে। বস্তুতঃ সাধু যে ভগবান দেখেন সে ভগবান অবিকল্প সমরসাত্মক, সর্ব্বত্র যিনি বিকারশূন্য হইয়া বাহ্যবিক্ষোভের অন্তরালে অবস্থিত। সাধুর উপলব্ধিতে এই ভগবান মঙ্গলময়, মহত্বপূর্ণ, অপাপ-

বিদ্ধ। শিল্পী কিন্তু ভগবানকে দেখেন ভগবানের বিচিত্রতা, তাঁহার অনন্তরসের দিক হইতে—বাহ্যবিক্ষোভের মধ্যে তিনি কি হইয়াছেন। পুণ্যবানের মধ্যে তাঁহার পুণ্যমূর্ত্তি, পাপীর মধ্যে কিন্তু পাপমূর্ত্তি—তবুও উভয়ক্ষেত্রে উহা ভগবৎ-মূর্ত্তিই। পিশাচের মধ্যে দেবভাবের অস্তিত্ব, বারনারীমধ্যে মাতা ভগবতীর অস্তিত্ব দেখাই সাধুর সব। শিল্পী কিন্তু পিশাচের মধ্যে দেখেন পিশাচ ভগবান, বারনারীর মধ্যে দেখেন ভোগবতী যে ভগবতী।

পাপ পাপ বলিয়াই সুন্দর, পুণ্য পুণ্য বলিয়াই সুন্দর। যাহাকে বল উৎকৃষ্ট, যাহাকে বল অপকৃষ্ট, সকলেই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য লইয়াই পরমরসপূর্ণ। যাহা আছে, তাহা যেমন যে ভাবে আছে তাহা ঠিক সেই ভাবে আছে বলিয়াই সুন্দর। এই সৌন্দর্য্য চোখের দেখা, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সৌন্দর্য্য নহে কিন্তু ঋষির সমাধিদৃষ্ট ভগবৎ সৌন্দর্য্য। তাই শিল্পীর কাছে এ প্রশ্ন উঠে না, পাপ চাই না, চাই পুণ্য, অমঙ্গল চাই না, চাই মঙ্গল, ইন্দ্রিয়ের এইরূপ খেলা চাই না, চাই অন্যরূপ। সাধুর সাধুতা কিন্তু এইখানেই—বস্তু যেমন ভাবে আছে তাহাকে ঠিক ঠিক তিনি মনে করেন না, তাহাতে অভাব অসামঞ্জস্য নিরর্থকতা কত পরিলক্ষিত করেন। তিনি এক আদর্শ পাইয়াছেন, ভগবানকে একভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, জগৎকে সেই অনুসারে যতক্ষণ তিনি গড়িতে পারিতেছেন না, ততক্ষণ তাঁহার যেন স্বস্তি নাই। শিল্পী কিন্তু দেখেন জগৎ যেমন ভাবে আছে, তেমন ভাবেই পরম-সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত। সাধু উচ্চ নীচের একটা কল্পনা করেন, নীচকে উচ্চে লইয়া তবে তাহার সার্থকতা দেখেন। শিল্পীর নিকট [illegible] নীচে সমান সৌন্দর্য্য, সমান সার্থকতা।

কিন্তু অন্তরে শিল্পীর এই অখণ্ড অনন্তরসবোধ অক্ষুণ্ণ র[illegible]ও বাস্তব জীবনকে যে একটা বিশেষ রসাধার করিয়া [illegible]ড়িয়া তোলা যায় না তাহা নহে। বাস্তব জীবনের একটি প্রে[illegible]ণাই হইতেছে এইরূপ একটা বিশেষ আদর্শের প্রতি। কিন্তু আর্টের তাহা বিষয়

নহে। বাস্তব জীবনের প্রেরণা দ্বারা যখন আর্টকে নিয়ন্ত্রিত করিতে যাই, তখন আর্টের যে নিজস্ব অন্তরঙ্গ কথা—অনন্তরসবোধ তাহা হারাইয়া ফেলি। তখন হই কেবল সাধু। ইহার জ্বলন্ত উদাহরণ টলষ্টয়। Anna Kareninaর টলষ্টয় হইতেছেন শিল্পী—তিনি যে সত্য প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিয়াছেন তাহা চিরকালের জিনিস; কিন্তু Five Commandments এর টলষ্টয়, যে টলষ্টয় সেক্সপীয়রে কোন নীতিশিক্ষা না পাইয়া বলিয়াছেন, সেক্সপীয়রের কিছু মূল্য নাই, সে টলষ্টয় সাধুমাত্র। তিনি যে আদর্শের মধ্যে আপনাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা যতই মহান হউক না কেন, চিরকালের বস্তু নহে। বাস্তব জীবনকে একটা আদর্শে রচিত করিতে হইবে হউক, কিন্তু ঋষিদৃষ্টির যে সর্ব্বত্র সমত্ববোধ, যে অনন্তরস ভোগ, তাহার স্বাতন্ত্র্যকে বিলুপ্ত করিয়া নয়—বরং তাহাকেই প্রতিষ্ঠা-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া।

রাধাকমল বাবু আর্টকে রসসৃষ্টি না বলিয়া যে বলিতে চাহিতেছেন আত্মস্ফূর্ত্তি জীবনসৃষ্টি তাহার মূলে রহিয়াছে আর্ট ও জীবনের মধ্যে—বাস্তব জীবনের যে উর্দ্ধমুখী গতি ও আর্টের যে সর্ব্বত্র স্থির সমরসভোগ এই উভয়ের মধ্যে একটা অসামঞ্জস্যের বোধ। তিনি বলিতেছেন জীবনটাই সমগ্র, রসবোধ ইহার অঙ্গমাত্র। অঙ্গের উচ্ছৃঙ্খলতাকে দমনে রাখিতে হইবে, উহাকে নিয়মিত করিতে হইবে সমাজের ধর্ম্ম দিয়া। কিন্তু জিজ্ঞাস্য—আত্মা কি, জীবন কি? উহাদের ধর্ম্মই বা কি? আত্মাকে জীবনকে রাধাকমল বাবু যত [illegible] করিয়া দেখিয়াছেন, উহা তত সহজ নহে। আত্মার জীবনের [illegible]ক্রম বিকাশ, প্রত্যেক বিকাশের আপন আপন ধর্ম্ম আছে। দর্শন বি[illegible] রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতি ব্যবসা-বাণিজ্য—এ সকলই আত্মার স্ফূর্ত্তি জীবনের [illegible]সৃষ্টি। ইহাদের প্রত্যেকেরই আপন আপন প্রকৃতি রহিয়াছে। স[illegible]ধুতার ধর্ম্মশীলতার প্রকৃতিও বিভিন্ন প্রকারের। আর্টেরও প্রকৃতি আবার অন্যরূপ। আত্মাকে জীবনকে অন্যান্য যে

দিক দিয়াই দেখা যাউক না কেন, রসের দিক দিয়া সৌন্দর্য্যের দিক যে দেখা তাহা লইয়াই আর্ট।

রসবোধ জীবনের অংশমাত্র হইতে পারে কিন্তু জীবনকে রাধাকমল বাবু যে ভাবে দেখিয়াছেন, সুনীতির দিক দিয়া—পারতপক্ষে উর্দ্ধমুখী গতির দিক দিয়া—তাহাও কি জীবনের অংশমাত্র নহে? পাপপুণ্য নীতিবোধই জীবনের সব বা প্রধান কথা নহে, উর্দ্ধমুখী গতি ছাড়া জীবনস্রোতে কত তির্য্যকগতি কত অর্ব্বাক্ গতি রহিয়াছে। বস্তুতঃ জীবন অর্থই বিরুদ্ধগতি সমূহের সংঘর্ষ, মানুষমাত্রই একটা অসামঞ্জস্যের পিণ্ড। সামঞ্জস্য যদি চাহি তবে জীবনের কোন বিশেষ খণ্ড প্রকরণে বদ্ধ হইয়া নহে—এমন একটি জিনিস চাই যাহা কোন অংশকে খর্ব্ব করিয়া ধরিবে না, কিন্তু সকলের স্বাতন্ত্র্য, সকলের বিশেষত্ব, সকলের মধ্যে যে সত্য—আত্মা তাহাকে অবাধে পূর্ণভাবে বিকশিত হইতে দিবে।

আমি বলি, আর্টই এমন একটি জিনিসের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে। আর্টের যে রসবোধ তাহা জীবনের অংশমাত্র নহে, প্রকৃতপক্ষে উহাই জীবনের মর্ম্মকথা। জীবন যাহা লইয়া জীবন, তাহার নামই ত রস। এই রসের উৎসস্থান, আর্টের যে ঋষিদৃষ্টি, রাধাকমল বাবু যেমন নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যাহার নাম তুরীয় লোক, সেইখানে যে সামঞ্জস্য একমাত্র তাহাই প্রকৃত সামঞ্জস্য।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

সকলি আছে—কিছুই নাই

হিন্দুর সকলই আছে, আবার কিছুই নাই। কথায় যাহা আছে কাজে তাহা নাই, অনুষ্ঠানে যাহা আছে জ্ঞানেতে তাহা নাই, আদর্শে যতটা আছে বাস্তবে তার কিছুই নাই। এই জন্য হিন্দু বলিয়া আমরা যে গৌরব করি, তাহা সর্ব্বদা সত্য হয় না।

তাই বলিয়া এই গৌরবটুকুও ত ছাড়িতে পারি না। এই গৌরবটুকুই যে এখন আমাদের একমাত্র সম্বল। এই গৌরবটুকু আছে বলিয়াই ত আমরা আজও দুনিয়ার মাঝখানে যা'হউক একটু-আধটু মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছি। এই গৌরব মিথ্যা হইলেও, বিদেশীয় সভ্যতা ও সাধনার আঘাতে এইটিই এখন আমাদের একমাত্র বর্ম্ম-চর্ম্ম স্বরূপ হইয়া আছে। এই জন্যই এই মিথ্যা গৌরবে আঘাত করিতে এমন সঙ্কোচ হয়। এটি যেমন আমাদের বর্ত্তমানের আশ্রয়, তেমনি ভবিষ্যতেরও আশা। এই গৌরবটুকু গেলে আমাদের সব গেল।

কিন্তু এই শূন্যগর্ভ অভিমান লইয়া চিরদিন চলিবে না। স্বানুভূতিহীন শাস্ত্র, অর্থহীন অনুষ্ঠান, প্রাণহীন কর্ম্ম লইয়া চিরদিন চলে না। ইহাতে জাতির শক্তি থাকে না, স্থবিরতামাত্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। প্রাচীনের শবকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া কোনও জাতি নবজীবন লাভ করিতে পারে না। আবার এই শবকে "মাটি দিয়া" বা পোড়া-[illegible]য়া, শূন্যতাকে ধরিয়াও কোনও জাতির বৈশিষ্ট্য ও জাতিত্ব বজায় [illegible]। জাতীয়তা কেবল কতকগুলি ভাবে নহে। এই মূল্যবান ভা[illegible]লি স[illegible]ল সমাজেই স্বল্প বিস্তর পাওয়া যায়। জীবনের মূল সমস্যা সর্ব[illegible]ই এক। ধর্ম্মের ও কর্ম্মের মূল লক্ষ্য সকল-[illegible]দেশেই সমা[illegible]। সমুদায় সভ্যসমাজেই এগুলি আছে। তবে বস্তুতে এক হইলেও, আকারে বিভিন্ন হইয়া আছে। এই

আকারগত বৈচিত্র্যই জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্যের প্রাণ। বাল্যে ও শৈশবে শিক্ষা, যৌবনে সংসার, সকলেই করে; এবং বার্দ্ধক্যে অবসর লইয়া নির্ঝঞ্ঝাট হইয়া জীবনের সন্ধ্যাকাল সকলেই শান্তিতে ও আরামে কাটাইতে চাহে। অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য এবং বানপ্রস্থের মূল আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা, মূল প্রয়োজন ও সাধন সকল সভ্যসমাজেই পাওয়া যায়। কিন্তু বস্তুতে কতকটা ঐক্য থাকিলেও, আকারে আমাদের আশ্রমচতুষ্টয়ের মতন কোনও কিছু অপর সভ্য সমাজে নাই, ছিল বলিয়াও জানি না। আমাদের বিবাহের মূল লক্ষ্য যাহা, অপর সভ্যজাতির বিবাহের মূল লক্ষ্যও তাই। সর্ব্বত্রই প্রজোৎপাদনের জন্য, বংশধারা রক্ষার জন্য, সমাজস্থিতি-ভঙ্গ-নিবারণের জন্য বিবাহপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি আমাদের বিবাহপ্রথার এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা অন্যত্র দেখা যায় না। এই বৈশিষ্ঠ্য যে কি, ইহা বুঝিতে হইলে আমাদের বিবাহের অনুষ্ঠানটির আলোচনা করিতে হয়। অর্থাৎ এই বৈশিষ্ট্য ভাবের অপেক্ষা অনুষ্ঠানের মধ্যেই বেশী ফুটিয়াছে। আমরা যদি খৃষ্টীয়ানের মতন রেজিষ্টারি করিয়া বিবাহ করি, অথবা মুসলমানের মতন কাবিননামা সহি করিতে আরম্ভ করি, তাহাতে বিবাহের মূল লক্ষ্য— প্রজোৎপত্তি ও সংসাররক্ষার কোনও ব্যাঘাত জন্মিবে না। কিন্তু এ সত্বেও এরূপ বিবাহ আর হিন্দুবিবাহ থাকিবে না।

সুতরাং আমাদের সমাজের প্রাচীন, পুরাগত আচারানুষ্ঠান, রীতিনীতি, চালচলন,—এককথায়, আমাদের জীবনের বাহিরের কর্ম্মাক[illegible], আমাদের সভ্যতা ও সাধনার বাহিরের কাঠামটাকেও একেবারে [illegible] করিতে পারি না। প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া পো[illegible]ইয়া [illegible] আবার নূতন করিয়া জাতীয় জীবনের এই বহিরঙ্গ[illegible]কে গড়িয়া তুলিতে পারি না।

ফলতঃ যাহা একান্ত প্রাণহীন, তাহা আপনা হইতেই পচিয়া

ধসিয়া বিলোপ প্রাপ্ত হয়। যার মধ্যে প্রাণবস্তু নাই, তাহাকে ধরিয়া রাখিবে কে? এই পথেই বৈদিক কর্ম্মাদি কালক্রমে লোপ পাইয়াছে। একদিন ইন্দ্রবরুণাদি বৈদিক দেবতারা লোকের প্রত্যক্ষ, অনুভবগম্য, সত্যবস্তু ছিলেন। ভারতের আর্য্যেরা যখন বরুণের যজ্ঞ করিতেন, তখন এই প্রত্যক্ষ আকাশকে তাঁরা সত্য সত্যই প্রাণবান্ ও চেতনবান্ বলিয়া অনুভব করিতেন। বজ্রধারী ইন্দ্র তখন তাঁহাদের চক্ষে প্রত্যক্ষ রাজার মতন ছিলেন। তাঁরা অগ্নিকে যে-চক্ষে দেখিতেন তাহাতে অগ্নির পূজা তাঁদের নিকটে সত্য ও স্বাভাবিক ছিল। ক্রমে লোকে সে সরল সহজ অনুভূতি হারাইল। সূর্য্যাদির পুরাতন প্রভাব নষ্ট হইয়া গেল। প্রাণ-জ্যোতিঃর সাক্ষাৎ-কারে বাহিরের জ্যোতিঃসকল হীনপ্রভ হইয়া পড়িল। তখন উপ-নিষদ গাহিয়া উঠিলেন—

> ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
> নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
> তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
> তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

অর্থাৎ—যেখানে সূর্য্য কিরণ দান করে না, চন্দ্রতারকা কিরণ দান করে না, বিদ্যুৎসকল যেখানে প্রকাশিত হয় না; এই অগ্নি কিরূপে তাহাকে প্রকাশ করিবে? সমুদয় বস্তু সেই জ্যোতির্ম্ময়েরই প্রকাশে অনুপ্রকাশিত, তাঁহার দীপ্তিতেই সকলে দীপ্তি পাইতেছে। এতাবৎকাল লোকে সূর্য্যাদি জ্যোতির্ম্ময় বস্তুসকলকেই বাহিরের ও অন্তরের সকল জ্যোতিঃর মূল বলিয়া মনে করিতেছিল। তখন যে [illegible]। এই প্রত্যক্ষ জগতেই বাঁধা ছিল, অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক জগতের সন্ধান পাইলেও তখনও তার সাক্ষাৎকারলাভ হয় নাই। কিন্তু যখনই আত্ম-জ্যোতিঃর প্রত্যক্ষলাভ হইল, তখন হইতেই সূর্য্যা-দির অলৌকিকত্ব নষ্ট হইয়া গেল, ইহারা যে স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময় ও স্বপ্রকাশ নহে ইহা দেখা গেল। আর তখন হইতেই ইন্দ্রবরুণাদির

উপাসনার অন্তরতম প্রাণবস্তু চলিয়া গেল। ইহার পরেও নানা-প্রকারের আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার দ্বারা কিছুকাল পর্য্যন্ত বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড সমাজে প্রচলিত রহিল সত্য, কিন্তু ক্রমে সমাজ-জীবনের ক্রমবিকাশে নব নব ভাবের ও আদর্শের প্রকাশে এসকল ক্রিয়াকাণ্ড পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া গেল। প্রাণহীন বৈদিক কর্ম্মকে আর ধরিয়া রাখা গেল না। নূতন কর্ম্ম ও নূতন অনুষ্ঠানাদি আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া বসিল।

যথা পূর্ব্বং তথা পরং। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যাহা হইয়াছে, কাল-ক্রমে বর্ত্তমান যুগেও তাহাই হইবে। নূতন ভাব ও আদর্শের প্রকাশে সর্ব্বপ্রথমে সমাজ-চৈতন্য প্রাচীন ও প্রচলিতকেই নূতন ব্যাখ্যাদির দ্বারা সময়োপযোগী করিয়া লইতে চেষ্টা করে। এই চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতী হয় না। আংশিকভাবে হয় মাত্র। যতটুকু পরিমাণে এই চেষ্টা ফলবতী হয়, ততটুকু পরিমাণে প্রাচীন ও প্রচলিত টিকিয়া যায়। নূতন অর্থলাভ করিয়া, নূতন প্রাণতা পাইয়া, নবযুগের নব-সাধনার সঙ্গে তাহা মিশিয়া যায়। যাহা এরূপ অর্থলাভ করিতে পারে না, কিম্বা যাহা নবযুগের সঙ্গে কিছুতেই আর মিশ খায় না, যাহাতে নূতন প্রাণসঞ্চার করা নিতান্ত কষ্টসাধ্য বা একান্ত অসাধ্য হয়, নবযুগের জ্ঞানবিজ্ঞানসম্মত ও প্রত্যক্ষ-অনুভূতিযুক্ত অর্থ যার করা যায় না, তাহা ক্রমে ক্রমে লোপ পাইয়া যায়। এইরূপেই আমাদের দেশে বহুতর প্রাচীন ক্রিয়াকলাপাদি ক্রমে লোপ পাইয়াছে। তাহার পুনরুদ্ধার অসম্ভব ও অসাধ্য। এই জন্য যাঁহারা বৈদিকযুগের ক্রিয়াকর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছেন, তাঁহাদের সে চেষ্টা কদাপি সফল হইবে না, হইতে পারে না। যাঁহারা প্রাচীন যজ্ঞাদির উদ্ধারকল্পে যত্ন করিতেছেন, তাঁহারাও সফল হইবেন না। সে-সকল যাগহোমাদি আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরাই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, আমাদের পক্ষে তাহাকে কোনও সত্য অর্থ ও সতেজ প্রাণতা দান করা অসম্ভব। যে অতিলৌকিক অনুভূতি

এই সকল যজ্ঞাদিকে সজীব রাখিয়াছিল, আমরা তাহা হারাইয়াছি। এই যুগে সে অনুভূতিকে আবার জাগাইয়া তোলা অসাধ্য। এখন এগুলিকে বজায় রাখিতে কিম্বা পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিতে হইলে, প্রাচীন যাজ্ঞিকদিগের অতিলৌকিকতার বা ঐন্দ্রজালিক ভাবের আশ্রয় লইলে চলিবে না; ধর্ম্ম-কল্পনা ও ধর্ম্ম-কলার—religious imagination'এর এবং religious art'এর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। ফসলের জন্য বৃষ্টি ও বৃষ্টির জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছি, গীতার এই অজুহাতও আর এখন খাটিবে না। এখন মনস্তত্ত্বের বা psychology'র এবং রসতত্ত্বের বা æsthetics'এর দিক্ দিয়া এসকল যজ্ঞাদির বিচার করিতে হইবে। এই বিচারে যদি ইহাদের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগীতা প্রতিষ্ঠিত হয়, তবেই কেবল প্রাচীন হোমাদি বর্ত্তমান জীবনের অঙ্গীভূত হইবে; অন্যথা হইবে না, হইতেই পারে না।

এই ভাবেই, সম্ভব হইলে, প্রাচীন ও প্রচলিত প্রতিমা-পূজাদিও নূতন অর্থে, নূতন প্রাণতা লাভ করিয়া, আমাদের নূতন সমাজের ধর্ম্মকর্ম্মাদির অঙ্গীভূত হইতে পারিবে; অন্য কোনও প্রকারে হইবে না। ধর্ম্ম-কল্পনা ও ধর্ম্ম-কলা—religious imagination এবং religious art'এর আশ্রয়েই এসকল প্রতিমা-পূজাকে বর্ত্তমানে রক্ষা করা সম্ভব হইতে পারে। এই দিক্ দিয়াই এখন এগুলির বিচার ও আলোচনা করা আবশ্যক। গতানুগতিকভাবে এগুলি রক্ষা করা আর সম্ভব নয়।

প্রাচীন বর্ণাশ্রমকে যদি রাখিতে হয়, তাহা হইলে তাহার মধ্যেও নূতন প্রাণতার সঞ্চার করিতে হইবে। ফলতঃ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বহু, বহু-[illegible]তেই এদেশে লোপ পাইয়াছে। গীতাতে বর্ণসঙ্করের হাত হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্যই বর্ণাশ্রম সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু এখন সঙ্কর[illegible]ই ত ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বাঙ্গালার হিন্দুসমাজকে ছাইয়া [illegible]সিয়াছে। কেহ কেহ ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে বৈদ্যদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন,—কিন্তু এই বৈদ্য ত একটা সঙ্করবর্ণ। তার পর

কায়স্থগণও যে সঙ্করবর্ণ নহেন, শূদ্র-মিশ্রণ যে এখানে হয় নাই, এমন কথাই কি বলিতে পারা যায়? ফলতঃ প্রাচীন চতুর্ব্বর্ণ ত এখন এদেশে নাই। আর বর্ণ যতটুকুও বা আছে, আশ্রম ত আদৌ নাই। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম উপনয়ন-সংস্কারে পরিণত; বানপ্রস্থ পেন্‌-শন্‌গ্রস্ত; সন্ন্যাস বৌদ্ধ আদর্শের অনুসরণ করিয়া সকল বয়স ও সকল আশ্রমকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। আশ্রমধর্ম্মের পুরাতন পৌর্ব্বাপর্য্য ত কিছুই নাই। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম দুইটা ধর্ম্ম নয়, একটা; বর্ণ ও আশ্রম এই দুইএর যোগে যে-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই ত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। এযে কর্ম্মধারয় সমাস, দ্বন্দ্ব-সমাস ত নহে। কিন্তু কার্য্যতঃ বর্ত্তমানে ইহা এই দ্বন্দ্বেই পরিণত হইয়াছে। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আর নাই, আশ্রমের বিলোপে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ধর্ম্মত্ব লোপ পাইয়া, এখন বাকি পড়িয়া আছে কেবল বর্ণভেদ বা জাতিভেদ। প্রাচীন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এরূপ ভেদ কল্পনা করে নাই। গীতা গুণ আর কর্ম্মের উপরে চতুর্ব্বর্ণের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মনু পর্য্যন্ত গুণকর্ম্মকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান বর্ণভেদ কি মনুর আদর্শে, না গীতার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? অধ্যয়ন-অধ্যাপন যজন-যাজন ব্রাহ্মণের কর্ম্ম—সে ব্রাহ্মণ কোথায়? কেহ দুধ-বেচা ব্রাহ্মণ, কেহবা তামাকাঁসাবেচা ব্রাহ্মণ, কেহবা আড়তদার, কেহবা জমিদার। ওকালতি ও জজিয়তিটা ব্রাহ্মণ্যকর্ম্মের মধ্যে ধরিয়া লইলেও, দাস্যবৃত্তি—কেরাণীগিরি ত আর ব্রাহ্মণা কর্ম্ম নয়? মনু যে-সকল ব্রাহ্মণকে চোর বলিয়াছেন, গ্রাম ও সমাজ হইতে যাহা-দিগকে চোর বলিয়া তাড়াইয়া দিবার সুস্পষ্ট ব্যবস্থা দিয়াছেন, —সেই সকল ব্রাহ্মণই ত আজ ব্রাহ্মণ্যের দাবী করিয়া সমাজে একটা নূতন রেষারেষির ভাব জাগাইয়া তুলিতেছেন। বর্ণাশ্রমের নামে বিলাতী রক্তকৌলীন্যের একটা অদ্ভুত অনুকরণ বর্ত্তমানে আমাদের সমাজে প্রচলিত করা হয় ত বা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু প্রাচীন বর্ণাশ্রমকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব ও অসাধ্য।

তবে বর্ণাশ্রমের আদর্শটি অতি উদার এবং মহৎ একথাও অস্বীকার করা যায় না। এটি ভুলিয়া গেলেও চলিবে না। দেশকালপাত্রের উপযোগী করিয়া যাহাতে ঐ আদর্শটিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায়, তার চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য। সে চেষ্টা করিতে হইলে বর্ত্তমান বর্ণভেদ বা জাতিভেদকে একেবারে ঝাড়ে-মূলে উপড়াইয়া ফেলিতে হইবে। দ্বিজ-শূদ্রের প্রাচীন ভেদ রক্ষা করিবার চেষ্টা এখন নিষ্প্রয়োজন ও আত্মঘাতী হইবে। বর্ত্তমান সমাজে হয় শূদ্র নাই, না হয় দ্বিজ নাই; দু'এর একটা মানিতেই হইবে। মনুর বিধানে বেদাধ্যয়নের দ্বারা দ্বিজত্বের প্রতিষ্ঠা হইত। যেখানে লাখে একজন ব্রাহ্মণও বেদের "ব" জানে না, সেখানে তবে আর ব্রাহ্মণের দ্বিজত্ব আছে কোথায়? তারপর আধ্যাত্মিক জন্মের দ্বারা যদি দ্বিজত্ব হয়, তবে গুরুদীক্ষা যে'ই লাভ করে, সে'ই দ্বিজ হইয়া যায়। সদ্‌গুরুর নিকটে মন্ত্রদীক্ষালাভে ব্রাহ্মণ-শূদ্র সকলের সমান অধিকার। তন্ত্রে সর্ব্ববর্ণকে এই অধিকার দিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের শাক্ত ও বৈষ্ণব সকলেরই এই অধিকার আছে। অন্ত্যজবর্ণের লোকেও গুরুকরণ ও মন্ত্রদীক্ষা-গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইঁহারা যে-কুলেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকুন না কেন, এই মন্ত্রদীক্ষাপ্রভাবে দ্বিজত্বের অধিকারী হইয়া থাকেন। এইজন্যই বলিতে হয় যে সত্যভাবে বিচার করিলে, কি গুণের হিসাবে, কি কর্ম্মের হিসাবে, কি অধ্যাত্ম-জীবনে দীক্ষালাভের হিসাবে, যেদিক দিয়াই দেখা যাউক না কেন, বর্ত্তমানে বাঙ্গালী সমাজে প্রাচীন চাতুর্ব্বর্ণ্যের কোন কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। আশ্রম ত নাই; বর্ণও নাই। এ অবস্থায় [illegible] বর্ণভেদ বা জাতিভেদ বা "ছোৎমার্গকে" আশ্রয় করিয়া বর্ণা-[illegible]ধর্ম্মের আদর্শ রক্ষা বা তাহাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা আদৌ সম্ভব নয়। এদিকে যা কিছু চেষ্টা হইতেছে তার মূল প্রেরণা জাত্যা-ভিমান, নির্দিষ্ট লক্ষ্য শ্রেণীবিশেষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা। এককথায় বলিতে গেলে আমরা বর্ণাশ্রমের দোহাই দিয়া প্রকৃতপক্ষে বিলাতী

শ্রেণীবিভাগ ও শ্রেণী-বিরোধই class distinction এবং class-warই প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছি। এভাবে হিন্দুসভ্যতা ও সাধনাকে রক্ষা করা যাইবে না, বরং আরও বেশী করিয়া তাহার উচ্ছেদই সাধিত হইবে।

অথচ আমাদের প্রাচীন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যে আদর্শের সন্ধানে যাইয়া সমাজ-সমস্যার যে মীমাংসাটি করিতে চাহিয়াছিল তাহাকে উপেক্ষা করিলেও চলিবে না। বর্ত্তমানের শ্রেষ্ঠতম চিন্তা ও সাধনা সেই আদর্শেরই অনুসরণ করিতেছে। সে আদর্শটি বিশ্বজনীন সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা। এই আদর্শ ইউরোপেরও নূতন আবিষ্কার নহে, আমাদেরও নিতান্ত অপরিচিত নহে। যেখানে উচ্চতর ধর্ম্ম ফুটিয়াছে, সেখানেই এই আদর্শটি জাগিয়াছে। ফরাসী বিপ্লবের বহু বহু শতাব্দ পূর্ব্বে যীশুখৃষ্ট এই আদর্শটিই প্রচার করেন। তারও বহু শতাব্দ পূর্ব্বে এদেশে ভগবান বুদ্ধদেব এই আদর্শটিই প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবেরও বহু বহু যুগ পূর্ব্বে ভারতের প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণ এই সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতাই সাধন করিয়াছিলেন। খৃষ্টের বহু শতাব্দ পরে, আরবে হজ্‌রত মোহম্মদও এই সাম্যই প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। জগতের সকল ধর্ম্মেরই মূল লক্ষ্য এটি। অথচ আজ পর্য্যন্ত কোনও সমাজে বা কোনও ধর্ম্মমণ্ডলীতে এই সনাতন আদর্শটির সম্যক প্রতিষ্ঠা হয় নাই। কারণ, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা যেমন একটা সার্ব্বজনীন আদর্শ, সেইরূপ বৈষম্য, বিরোধ এবং প্রভুতাও একটা সার্ব্বজনীন সামাজিক ব্যবস্থা। সাম্য আত্মার ঈ[illegible] কিন্তু বৈষম্য সংসারের অপরিহার্য্য নিয়তি। মৈত্রী প্রাণের আকা[illegible] কিন্তু বিরোধ, প্রতিযোগিতা, সংগ্রাম জীবনধারণের অপরি[illegible] সার্ব্বজনীন পন্থা। স্বাধীনতা পরম পুরুষার্থ, কিন্তু অধীনতা ব্যতীত সমাজ-স্থিতি আর সমাজ-স্থিতি ব্যতীত লোকর[illegible] ও জীবনরক্ষা, আত্মরক্ষা ও আত্মোন্নতি, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম সকলই অসম্ভব ও অসাধ্য হয়। বৈষম্যের মধ্যেই সাম্যকে, বিরোধের মধ্যেই মৈত্রীকে, পরাধীনতার

মধ্যেই স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, তবে এই জটিল, দুরূহ, সার্ব্বজনীন সমাজ-সমস্যার মীমাংসা সম্ভব। এই অঘটন ঘটাইব কিরূপে ?

ভারতবর্ষের প্রাচীন সাধনা এই বর্ণাশ্রমব্যবস্থার দ্বারা এই সমস্যার একটা মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সে চেষ্টা যে সম্পূর্ণ-রূপে ফলবতী হইয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু নিষ্ফল হইলেও, এই সমস্যার মীমাংসার অন্য পথ যে আছে, তাহাও ত মনে হয় না। অন্ততঃ এ পর্য্যন্ত ইহার আর কোনও শ্রেষ্ঠতর পন্থা আবিষ্কৃত হয় নাই। এই জন্যই নিতান্ত সরাসরিভাবে এই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে বর্জ্জন না করিয়া ইহার সংশোধন, পরিবর্ত্তন ও সময়োপ-যোগী সম্প্রসারণ সম্ভব কি না, আমাদিগকে ধীরভাবে তাহাই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

আর এই বিচারের মূলে, সকলের আগে আমাদিগকে এটি বুঝিতে হইবে যে, যে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতাকে আমরা ইউরোপের আমদানী ভাবিয়া অনেক সময় অমন বিদ্রূপ ও অ[illegible]ক্ষা করিয়া থাকি, তাহা ইউরোপের বিশিষ্ট ও নিজস্ব সম্পত্তি নহে, কিন্তু আমাদেরও প্রাচীনতম সাধনের ধন। ফলতঃ স্বাধীনতার বা সাম্যের বা মৈত্রীর সম্পূর্ণ তথ্য আজি পর্য্যন্ত ইউরোপে ভাল করিয়া প্রকাশিত হয় নাই। প্র[illegible]্যেক বস্তুর বা তত্ত্বের বা আদর্শেরই দুইটা দিক্ আছে—[illegible]কটা তার ভাবের দিক্, আর একটা তার অভাবের দিক্ ; একটা [illegible] দিক্—হাঁ'র দিক্, একটা নেতির দিক্—না'র দিক্ ;—একটা [illegible]itive দিক্, আর একটা negative দিক্। ইউরোপ এপর্য্যন্ত [illegible]র ভাবের দিক্, ইতির দিক্, হাঁ'র দিক্ বা positive দিক্টা ভাল [illegible]য়া ধরিতে পারে নাই ; তার অভাবের দিক্, নেতির দিক্, না'র দিক্ বা [illegible]gative দিক্টাই খুব শক্ত করিয়া আঁকড়াইয়া রহিয়াছে। ইউ[illegible]প স্বাধীনতা বলিতে কেবল অধীনতার অভাবটাই বুঝে, স্বাধীনতার ভিতরেও যে একটা অধীনতা আছে, একথা এখনও

পরিষ্কাররূপে ধরিতে পারে নাই। এইজন্ত ইউরোপীয় ভাষায় আমাদের স্বাধীনতার সত্য প্রতিশব্দ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমাদের ভাষাতেও তাহাদের independence, freedom, বা libertyর কোনও সত্য প্রতিশব্দ নাই। আমাদের প্রাচীন সাধনায় স্ব'এর অধীনতাকেই স্বাধীনতা বলিয়াছে। আর এই স্ব-বস্তু আত্ম বস্তু, ইহা একই সঙ্গে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ, ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিভূত, একই সঙ্গে ইহা সোপাধিক ও নিরুপাধিক, অংশ ও অংশী। আত্মবস্তু আর ব্রহ্মবস্তু একই বস্তু বা একই তত্ত্ব। এই আত্মতত্ত্বের উপরেই ভারতীয় সাধনার সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত। এই আত্মবস্তুর প্রত্যক্ষ লাভ করিয়াই উপনিষদ কহিয়াছেন—

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।

অর্থাৎ যিনি আত্মাতে সমুদায় বস্তু দেখেন এবং সমুদায় বস্তুতে আত্মাকে দেখেন, তিনি সেই কারণে কাহাকেও ঘৃণা করেন না।

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥

এই যাবতীয় ভূতগ্রাম তাঁর আত্মারই মতন—জ্ঞানী ব্যক্তি যখন এই জ্ঞানলাভ করেন, তখন সেই একত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির মোহ এবং শোক দুই' নষ্ট হইয়া যায়। এই একত্বানুভূতির উপরেই ভারতের সাধনার সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা। অধিকারের বা স্বত্বের বা রাইটের (right'এর) সমতার উপরে এই সাম্য প্রতিষ্ঠিত নহে; কিন্তু আত্মার একত্বের উপরেই ইহার প্রতিষ্ঠা। আমার যেমন সুখদুঃখের অনুভূতি হয়, সকলেরই সেইরূপ হয়; আমার মতন তাহারাও প্রিয়বস্তুলাভে উৎফুল্ল ও অপ্রিয়লাভে বিষণ্ণ হইয়া থাকে। এই যে সমবেদনা বা সহানুভূতি ইহাই আমাদের সাম্যসাধনার মূল মন্ত্র। ইহারই উপরে ভারতের সনাতন মৈত্রী ও অহিংসা-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হই-

য়াছে। আমাদের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার আদর্শ সামাজিক নহে, কিন্তু আধ্যাত্মিক; বাহিরের নহে কিন্তু ভিতরের। এই জন্য বাহিরের বৈষম্যে, বিরোধে, অধীনতাতে ইহাকে নষ্ট করিতে পারে না। ভারতীয় সাধনা বিশেষভাবে অন্তরঙ্গজীবনে—subjective life'এতেই—এই আদর্শের অনুশীলন করিয়াছে; বহিরঙ্গে ইহার অবাধ প্রতিষ্ঠার তেমন প্রয়াস পায় নাই।

ভারতীয় সাধনা ইহা বেশ বুঝিয়াছিল যে আপামর সাধারণ সকলেই এই শ্রেষ্ঠতম আদর্শলাভের অধিকারী নহে। আত্মজ্ঞানী ও তত্ত্বজ্ঞানী ব্যতীত কেহই এই আধ্যাত্মিক সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার মর্ম্ম ও মর্য্যাদা বুঝিতে পারে না। কেবল তত্ত্বজ্ঞানীগণই সম্যকরূপ এই আদর্শ আয়ত্ত করিতে পারেন। এখনও এমন সকল মহাপুরুষ মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়, এই সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা যাঁদের সম্পূর্ণরূপে সাধন হইয়াছে। ইঁহারা অপরের শরীর আহত হইলে, নিজের অক্ষত শরীরে বেদনা অনুভব করেন; অপরকে শীতার্ত্ত দেখিলে ইঁহাদের শীতবস্ত্রাবৃত দেহ থর থর কাঁপিতে থাকে; অপরের ক্ষুন্নিবৃত্তিতে ইঁহারা নিজেরা পরিতৃপ্তি লাভ করেন; অপরের পাপযাতনা পর্য্যন্ত ইঁহারা নিজেদের মনেতে ভোগ করিয়া থাকেন। গুরুকৃপায় এমন মহাপুরুষের প্রত্যক্ষলাভ করিয়াছি। ইঁহাদের দেখিয়াই আমাদের প্রাচী[illegible] সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার আদর্শটা যে কি, ইহা কথঞ্চিৎ বুঝিতে [illegible]রিয়াছি। ইঁহারাই এই শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্মের সত্য অধিকারী। এই অধিকারলাভে প্রথম সাধন শমদমাদি—ইন্দ্রিয়সংযম ও মনঃসংযম। [illegible]তীয় সাধন বিবেক-বৈরাগ্য। শমদমাদির দ্বারা দেহশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্[illegible]। [illegible]বেক বৈরাগ্যের দ্বারা আত্মজ্ঞানের অন্তরায় দূর হয়। যখন এইরূ[illegible]সাধকের নিজের ইন্দ্রিয়-লালসা নিঃশেষে নষ্ট হইয়া যায়, তখন [illegible]শ্বের লোকের ভোগেতে তাঁহার পরমতৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে; তখন [illegible]শ্বজনের সুখদুঃখের মধ্যে তাঁহার আপনার ক্ষুদ্র সুখদুঃখ একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মিশিয়া যায়। তখনই সর্ব্বভূতে আত্ম-

জ্ঞান, সর্ব্বজীবে মৈত্রীলাভ হইয়া থাকে। তখন সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতাতে সাধক নিত্যসিদ্ধ অবস্থা লাভ করেন।

সকলের পক্ষে এই উচ্চতম অবস্থালাভ সম্ভব নহে। বহু, বহু জন্মের তপস্যা ও সুকৃতির বলে, ক্বচিৎ কোনও ভাগ্যবানের পক্ষে ভগবৎ-কৃপায় এই শ্রেষ্ঠ সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। কিন্তু এই অবস্থাই জীবের সাধ্য। ইহাই সকলের চরম লক্ষ্য। এইটি প্রতিষ্ঠিত করাই সমাজধর্ম্মের উদ্দেশ্য। আর জন-সাধারণকে ক্রমে ক্রমে এই লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্যই, মনে হয়, প্রাচীন ভারতীয় সাধনায় এই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। মানুষের ভেদবুদ্ধিকে স্থায়ী করিবার জন্য বর্ণবিভাগের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, তাহাকে তিলে তিলে নষ্ট করাই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অভিপ্রায়। গীতায় ভগবান—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ

এই বলিয়া এই উদ্দেশ্যটিকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চতুর্ব্বর্ণাঃ শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই, চাতুর্ব্বর্ণ্যং শব্দই এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে। চতুর্ব্বর্ণাঃ বলিলে, চারিটি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ বুঝাইত। চাতুর্ব্বর্ণ্যং বলাতে এই ব্যষ্টিভাব নিরস্ত হইয়া, চারিবর্ণের মিলনে যে সমষ্টির সৃষ্টি হয়, সেই সাকুল্যকেই বুঝাইতেছে। অর্থাৎ ভগবান ব্রাহ্মণা[illegible] ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র ও পরিচ্ছিন্ন চারিটি বর্ণের সৃষ্টি করেন নাই, বি[illegible] বিরাট সমাজ-দেহের একত্বের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি চারিটি বিশেষ বিশেষ অঙ্গের প্রতিষ্ঠা মাত্র করিয়াছেন। অঙ্গের সংস্থান অঙ্গীর মধ্যে, অংশের প্রতিষ্ঠা অংশীতে। অঙ্গীর লক্ষ্যই অঙ্গের সাধ্য, [illegible] স্বার্থই অংশের অর্থ। এই অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধেতে বা organi[illegible]latio[illegible] এ—বিভিন্ন অঙ্গের বৈশিষ্ট্য মাত্র থাকে, কিন্তু সত্য[illegible]বে কোনও প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব-নিকৃষ্টত্ব থাকে না। এই শ্রেষ্ঠত্ব-নিকৃ[illegible]ত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এক্ষেত্রে সর্ব্বদাই নিতান্ত আত্মঘাতী হইয়া উঠে। আর সমাজ-অঙ্গীর অঙ্গস্বরূপ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে যাহাতে

এরূপ স্বাতন্ত্র্যাভিমান ও শ্রেষ্ঠত্বাভিমান না জন্মিতে পারে, এই সকল বৈষম্যেতে যাহাতে মৌলিক মানবীয় সাম্যের আদর্শকে নষ্ট করিতে না পারে, তারই জন্য আমাদের প্রাচীন সমাজ-বিজ্ঞানে এই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

জীবনের প্রথম বিভাগে, শিক্ষার্থীর অবস্থায়, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে সকলেই সমান শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করিবে; সেখানে সকলেই ভিক্ষাজীবী, সকলেই গুরুসেবা-নিরত, কাহারওই জন্মগত, বংশগত, বা পারিবারিক ধনসম্পত্তি প্রভৃতি-জনিত কোনও প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার বিন্দুমাত্রও অবসর থাকিবে না। তার পর, গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিয়া ইহারা আপন আপন কর্ম্ম বা profession ও calling হিসাবে সমাজ-অঙ্গীর বিভিন্ন অঙ্গের সঙ্গে যাইয়া মিলিয়া যাইবে। কেহ বা ব্রাহ্মণ্য কর্ম্ম অবলম্বন করিয়া লোকশিক্ষক ও লোক-নায়ক হইবে, কেহ বা ক্ষাত্র কর্ম্ম অবলম্বন করিয়া দেশরক্ষক ও সেনা-নায়কাদি হইবে, কেহ বা বৈশ্যকর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কৃষি-গোরক্ষা বাণিজ্যাদিতে নিযুক্ত হইবে। এইরূপে সংসারী হইয়া, নানাভাবে সমাজের সেবা করিয়া, বংশধারা রক্ষার নিমিত্ত পুত্রকন্যাদি উৎপাদন করিয়া, পরে পঞ্চাশূর্দ্ধং-বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া, সংসার-কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া শান্তিতে আত্মচিন্তা প্রভৃতির দ্বারা পারমার্থিক তত্ত্বের অনুশীলনে নিযুক্ত হইবে। আর সর্ব্বশেষে সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিয়া, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনের দ্বারা, সর্ব্বপ্রকারের আত্মাভিমানশূন্য হইয়া, সর্ব্বভূতে সাম্য মৈত্রী সাধন করিবে।

গুণ ও কর্ম্মের দ্বারাই প্রত্যেক ব্যক্তির সামাজিক পদ নির্দ্ধারিত হইবে। যাহার ব্রাহ্মণ্য-লক্ষণ আছে, অর্থাৎ যে বিদ্যাবিনয়াদির দ্বারা লোকশিক্ষক ও ধর্ম্মযাজকের কর্ম্মের সম্পূর্ণ উপযুক্ত সে'ই ব্রহ্মকর্ম্ম অব-লম্বন করিয়া সমাজের সেবা করিবে। যাহার ক্ষাত্রলক্ষণ আছে, চরিত্র ও শিক্ষার দ্বারা যে দেশ-রক্ষা ও দেশ শাসনের উপযুক্ত সেই ক্ষাত্র-কর্ম্ম অবলম্বনে সমাজ-সেবা করিবে। যে পণ্য উৎপাদনে ও ব্যবসা-

বাণিজ্যাদি বিষয়ে কৃতিত্বলাভ করিবে সে'ই বৈশ্যকর্ম্ম অবলম্বন করিবে। কিন্তু শূদ্র বলিয়া ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদির দাস্যবৃত্তি করিবার জন্য কোনও নির্দ্দিষ্ট বর্ণ আর থাকিবে না। আজ যদি ভগবান আবির্ভূত হইয়া গীতাধর্ম্ম প্রচার করিতেন, তাহা হইলে চাতুর্ব্বর্ণ্যের কথা বলিতেন না। পরিচর্য্যা করিবার জন্য একটা বিশেষ বর্ণের বা শ্রেণীর কোনও প্রয়োজন ভবিষ্যতে থাকিবে না। পরিবারের কনিষ্ঠেরাই জ্যেষ্ঠদিগের সেবা ও পরিচর্য্যা করিবে; আর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ও কলা-কুশলতার কল্যাণে পূর্ব্বে শূদ্রেরা যে-সকল কর্ম্ম করিতেন তাহার সংখ্যা এবং শ্রমসাধ্যতাও ক্রমে হ্রাস হইয়া যাইবে। ইউরোপে এখনি রন্ধনাদি কর্ম্ম কিম্বা গৃহাদি মার্জ্জন ও আবাসবাটীর আবর্জ্জনা ও ময়লা পরিষ্কার করিবার জন্য বিশেষ লোক নিযুক্ত অথবা অত্য-ধিক কালক্ষেপ করা নিষ্প্রয়োজন হইয়া উঠিতেছে। আমাদের দেশে বর্ণাশ্রমের বা জাতিভেদের ও "ছোঁৎমার্গের" প্রভাবেই বোম্বাই ও মান্দ্রাজে ব্রাহ্মণ পরিবারে পরিবারের লোকেরাই আপনাদিগের প্রয়োজনীয় সেবা-কর্ম্ম করিয়া থাকেন। শূদ্রের সেবা-গ্রহণও যে তাঁহা-দের পক্ষে নিষিদ্ধ। এই জন্য "ছোঁৎমার্গে" শূদ্র বলিয়া একটা বর্ণ থাকিলেও, গুণ কর্ম্মানুসারে মান্দ্রাজের ও বোম্বাইএর শূদ্রেরা কৃষি-গোরক্ষা কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া বৈশ্যকর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। দক্ষিণের "পারিয়া"দিগকে প্রকৃতপক্ষে আর শূদ্র বলা যায় না, বৈশ্যই বলা কর্ত্তব্য। কারণ, কৃষিগোরক্ষা প্রভৃতি কর্ম্মের দ্বারাই এখন [illegible]ই পারিয়ারা আপনাদের জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকেন। সুতরা[illegible] কি ইউরোপে কি হিন্দুস্থানে সর্ব্বত্রই সমাজবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শূদ্র বলিয়া একটা বিশেষ বর্ণ আর থাকিবে না। বর্ত্তমানেই যাহা[illegible] জন খাটিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে, কেবল তাহা[illegible] শূদ্র [illegible]ায় হইয়া আছে। কিন্তু মহাজন ও জনের—capitalist [illegible] labo[illegible]rer মধ্যে বর্ত্তমানে যে পার্থক্য ও বিরোধ আছে, [illegible]মে তাহাও থাকিবে না। সমাজ-গতি সেই পথেই চলিয়াছে। [illegible]ার আধুনিক

সভ্যজগতের এই সমস্যায় মীমাংসার সঙ্গে সঙ্গে সমাজদেহে পুরাতন দাসের বা শূদ্রের কোনও বিশেষ স্থান ও সঙ্গতি আর থাকিবে না বলিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য গুণকর্ম্ম বিভাগানুসারে সমাজে এই তিন বর্ণমাত্র থাকিবে। সর্ব্বত্রই মানব-সমাজে চিরদিন এই ত্রিবিধ কর্ম্মবিভাগ ছিল—চিরদিনই থাকিবে। লোকশিক্ষক ও লোকশাসকেরা সর্ব্বদাই সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানার্হ হইয়া থাকিবেন। বণিকাদি তাঁহাদের নিম্নে ও কৃষিগোরক্ষা-ব্যবসায়ে যাঁহারা নিযুক্ত থাকিবেন, তাঁহারা সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদাই সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প মর্য্যাদা পাইবেন। এইরূপ ভেদবৈষম্য অপরিহার্য্য। আর জন্মগত (বা hereditary) না হইয়া গুণকর্ম্মগত হইলে, এই অপরিহার্য্য ভেদ-বৈষম্যে প্রকৃতপক্ষে সাম্যমৈত্রীর কোনও বিশেষ অন্তরায়ও উৎপাদন করিবে না। আর অভ্যাসবশতঃ ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠকর্ম্মী বা ব্যবসায়ীর অন্তরে যাহা কিছু আভিজাত্য ও অভিমান জন্মিবার আশঙ্কা আছে, আশ্রমধর্ম্মের দ্বারা তাহারও নিবারণের ব্যবস্থা করা যায়। এই জন্যই আমাদের প্রাচীন বর্ণাশ্রমের মূল আদর্শ ও লক্ষ্যটি এমন উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়।

আদিতে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে জন্মজনিত ভেদবুদ্ধি নষ্ট করিবার চেষ্টা হইত। মধ্যে গার্হস্থ্যাশ্রমে সমাজের বিবিধ কর্ম্ম সাধন করিতে যাইয়া, আবার একটা কর্ম্মগত ও কর্ম্মের জন্য পদমর্য্যাদাগত ভেদ ও বৈষম্য প্রতিষ্ঠিত হইত। এই ভেদবুদ্ধি নষ্ট করিবার জন্যই পরবর্ত্তী বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসাশ্রমের ব্যবস্থা ছিল। এইরূপে প্রাচীন সমাজের গুণকর্ম্মগত বর্ণবিভাগ আশ্রমচতুষ্টয়ের শিক্ষা ও সাধনের দ্বারা শোধিত ও সংস্কৃত হইয়া, উভয়ে মিলিয়া সমাজধর্ম্মের অপরিহার্য্য বৈষম্যের মধ্যেই একটা শ্রেষ্ঠ সাম্যকে ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছিল। বৈষম্য, ভেদ, বিরোধ, অ[illegible]তা এগুলি আকস্মিক; একটা অবস্থায়, একটা আশ্রমেই এগুলির অবসর ছিল। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা এগুলি নিত্য, মৌলিক বস্তু। প্রাচীন বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ব্যবস্থার দ্বারা ভেদের মধ্যেই

অভেদ, বিরোধের মধ্যেই মৈত্রী, অধীনতার উপরেই স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। এই চেষ্টাটি এইরূপ ভাবে আর কোথাও হইয়াছিল বলিয়া জানি না। বর্ত্তমানেও আমাদিগকে সমাজের কর্ম্ম-জন্য ও ব্যক্তিগত গুণাগুণ-জন্য অপরিহার্য্য ভেদ, বৈষম্য, বিরোধ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, পরাধীনতাকে স্বীকার করিয়াই, তাহারই উপরে সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই জন্য প্রাচীন অভিজ্ঞতার আশ্রয় লইয়া, এই বর্ণাশ্রমের মূল ভাব ও আদর্শটিকে বর্ত্তমানের উপযোগী করা সম্ভব কি না, ইহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। তবে কার্য্যতঃ এই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বহুদিন আপনার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বর্ণভেদমাত্রে পরিণত হইয়াছে। ইহার প্রাচীন প্রাণ আর নাই, সনাতন অর্থ আর নাই, আছে কেবল জীর্ণ কঠোর কাঠাম মাত্র।

এইরূপে জীবনের প্রায় প্রত্যেক বিভাগেই দেখিতে পাই যে হিন্দুর শাস্ত্র-ইতিহাসে একটা উচ্চতম আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু এখন তার সাধন নাই। শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র আছে, তার সত্য অর্থবোধ নাই। উন্নত পন্থা আছে, কিন্তু উপযোগী অনুশীলন নাই। বহুবিধ শ্রেষ্ঠতম সংস্কার ও অনুষ্ঠান আছে, কিন্তু তাহাদের প্রাণ নাই। এইজন্যই বলি হিন্দুর সকলই আছে, অথচ কিছুই নাই। আছে কেবল একটা দেশব্যাপী অজ্ঞতা। আর আছে এই অজ্ঞতার চিরসাথী একটা শূন্যগর্ভ অতিকায় অভিমান। এই অভিমানকে নষ্ট করিতে চাই না, এ অভিমানকে নষ্ট করিলে চলিবে না। ইহাকে সত্য করিতে হইবে। এই অজ্ঞতাকে দূর করিয়া, প্রাচীন সাধনার মধ্যে বর্ত্তমানের উপযোগী ও আবশ্যক সংস্কারগুলিকে অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত করিয়া, জ্ঞানগম্য ও জীবন্ত করিতে হইবে। এরই জন্য প্রাচীনকে লইয়া এতটা নাড়াচাড়া করি। এরই জন্য যথাসাধ্য প্রাচীনকে রাখিতে চাই। কারণ এই প্রাচীন দেহগুলির মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে যে বস্তুটি ফুটিয়া উঠিবে, তার মতন কোনও কিছু আধুনিক জগতের আর কোথাও আছে বা পাওয়া সম্ভব বলিয়া যে বোধ হয় না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

দুর্গাপূজা

দুর্গাপূজা বাঙ্গালীর মহামহোৎসব। এখনও খাঁটি হিন্দুর ঘরে পূজা দেখিলে মনে ভক্তির উদয় হয়। আরতির সময় পুরোহিত ঠাকুর প্রথমে পঞ্চপ্রদীপ লইয়া পরে পাণিশঙ্খ লইয়া, তা'র পর কাপড় লইয়া, নির্ম্মাল্য লইয়া, তা'র পর কর্পূরের আলো, ধুনুচি লইয়া, দেবীর আরতি করিতেছেন, তাঁহার চোখ দিয়া দর্‌দর্‌ করিয়া জল পড়িতেছে। ধূপ ও ধুনার ধোঁয়ায় প্রকাণ্ড দালান অন্ধকার। কর্ত্তা চামর ঢুলাইতেছেন। তাঁহার পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, দাস-দাসী, প্রতিবেশীতে দরদালান ভরিয়া গিয়াছে। বাহিরে উঠানে লোকে লোকারণ্য; তাহার মাঝে ঢুলিরা মাথা চালিয়া ঢাক-ঢোল বাজাইতেছে; সকলের উপর চড়িয়া শানাই বাজিতেছে। শাঁখ, কাঁসর, ঘণ্টা ত আছেই। কর্ত্তা এক একবার উচ্চৈঃস্বরে মা—মা—বলিয়া ডাকিতেছেন; সে স্বর তাঁহার নাভিকমণ্ডলু হইতে হৃদয়ের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিয়া উঠিতেছে। সে স্বরে সকলেরই মন ভক্তিতে গলিয়া যাইতেছে। গৃহিণী ও তাঁহার কন্যারা, পাড়ার আর আর স্ত্রীলোকদের লইয়া, একপাশে দাঁড়াইয়া আরতি দেখিতেছেন। ক্রমে গৃহিণী পুরোহিতের নিকটে আসিলেন ও আসনপিঁড়ী হইয়া বসিলেন। পুরোহিত তাঁহার মাথার উপরে আগুনের সরা বসাইয়া দিলেন ও ক্রমাগত ধুনা দিতে লাগিলেন। আবার ধুনার ধোঁয়ায় ঘর ভরিয়া গেল। কন্যা ও পুত্রবধূ আসিলেন। তিনি কর্পূরের সরা মাথায় তুলিয়া লইলে, পুরোহিত ঠাকুর সেটি জ্বালাইয়া দিলেন। যতক্ষণ সে কর্পূর না নিভিল, ততক্ষণ তিনি নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন। আরতি শেষ হইল; ঢাক-ঢোলের বাদ্য থামিল; সকলেই মাটিতে

লুটাইয়া দেবীকে প্রণাম করিলেন এবং দেবীর প্রণামের মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। এক এক করিয়া সকলেই উঠিল, কর্ত্তার মন্ত্রও শেষ হয় না, প্রণামও শেষ হয় না, তিনি উঠেনও না। তাঁহার যেন ভাব লাগিয়াছে। অনেক পরে তিনি উঠিলেন। আরতির পর্ব্ব শেষ হইল। এখন দেবীর বৈকালির আয়োজন।

এই যে আরতির মুহূর্ত্ত, যে মুহূর্ত্তে যতলোক উপস্থিত, সকলেরই মনে অন্য কোন চিন্তা নাই, কেবল মহামায়ার চিন্তা, আত্মহারা হইয়া—আত্ম-পর-জ্ঞান শূন্য হইয়া—কল্পনার অতীত মহামায়াকে আত্ম-সমর্পণের মহামুহূর্ত্ত—এ বড় গম্ভীর মুহূর্ত্ত। এ মুহূর্ত্তে শোক-তাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা, ঈর্ষ্যা-দ্বেষ, অন্ততঃ এক দণ্ডের জন্যও, অন্তরিত হয়—এজন্য এ বড় মধুর মুহূর্ত্ত। বৎসরে একদিনের জন্যও যদি এ মুহূর্ত্ত ফিরিয়া আসে, লোকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও, পৃথিবীতে স্বর্গসুখ অনুভব করে।

এক বছর, অষ্টমী পূজার রাত্রি, পরদিন সাতটার পূর্ব্বেই সন্ধি-পূজা করিতে হইবে। বাড়ীর কর্ত্তা সমস্তদিন নিমন্ত্রিত ইতর ভদ্র সকলেরই আদর-অভ্যর্থনা, খাওয়ান-দাওয়ান ইত্যাদিতে ক্লান্ত হইয়া, রাত্রি ১টার পর সব নিস্তব্ধ হইলে, সদর দরজাটি বন্ধ করিয়া সিঁড়ী দিয়া শুইবার ঘরে যাইতেছেন; শুনিলেন দুইজনে কথাবার্ত্তা করি-তেছে, দুটিই স্ত্রীলোক। এতরাত্রিতে এবাড়ীতে কে কথাবর্ত্তা—জানিবার জন্য কর্ত্তা নামিয়া আসিলেন; দেখিলেন দালানের এক কোণে বসিয়া গৃহিণী স্বহস্তে কোষা-কুষী, পুষ্পপাত্র, তাম্রকুণ্ড মাজি-তেছেন। এ কাজটি আর কাহারও মনে পড়ে নাই। কিছু পরেই সন্ধিপূজার জন্য এসব চাই; তাই গৃহিণী নিজেই [illegible] ঘষা আরম্ভ করিয়াছেন, আর প্রতিমার মুখপানে চাহিয়া যেন তাহার সহিত কথা কহিতেছেন। কর্ত্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ও গিন্নী, কা'র সঙ্গে কথা কহিতেছ?"

গিন্নী। "কেন, জান না? যাঁ'কে তুমি এত এরেবরে বাড়ীতে আনিয়াছ?"

কর্ত্তা। 'তিনি কে?'

গিন্নী। "জান না? ঐ দেখ! দালান আলো করিয়া বসিয়া আছেন। তুমি ত একবার দালানে উঠিলেও না। তাই আমি মাকে বলিতেছি যে তাঁ'র কাছে ত আমাদের সবই অপরাধ। তিনি যেন আমাদের সে সব অপরাধ না লয়েন। আর ক্ষমা ঘৃণা করিয়া তিনি যেন বছর বছর এমনই করিয়া আসেন।"

কর্ত্তা। (একটু লজ্জিত হইয়া) "কিঁ করি গিন্নী? অনেকগুলি ভদ্র লোক পায়ের ধূলা দিয়াছিলেন। তাঁ'দের আদর অভ্যর্থনা করাও ত আমার কাজ। তা'তেই বড় ব্যস্ত ছিলাম। এদিকে একবারও আসিতে পারি নাই।"

গিন্নী। "তুমি ত বাবু-ভাইদের লইয়াই ব্যস্ত। কিন্তু তুমি কি জান না কাঁ'কে তুমি বাড়ীতে লইয়া আসিয়াছ? তাঁ'র চেয়ে বড় কে আছে? তুমি তাঁর দিকে একবার চাইলে না! বাবুদের লইয়াই মাতিয়া রহিলে! উনি কি আর তোমার বাড়ী এমন করিয়া আসিবেন মনে করিয়াছ?"

কর্ত্তা অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেলেন। গৃহিণী কিন্তু সারারাতটি কেবল মহামায়ার কাছেই এই কথাই বলিতে লাগিলেন, "মা, আমাদের অপরাধ লইও না। আবার যেন এস।"

আজ বিজয়া। প্রতিমা দালান হইতে উঠানে নামিয়াছেন। আজ আর পুরোহিত নাই; বাজে লোক নাই; শুদ্ধ বাড়ীর মেয়ে ছেলে, ও নিতান্ত আত্মীয়স্বজনের মেয়ে ছেলে। পুরুষেরা উঠান ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। গিন্নী নূতন কাপড় পরিয়া, বরণডালা মাথায়, উপস্থিত হইলেন; সঙ্গে মেয়ে, বৌ, বাড়ীর আর আর মেয়েছেলে। সকলে আসিয়া মাকে নমস্কার করিলেন। অধিবাসের যত জিনিস ছিল, গিন্নী সকলগুলিই এক এক করিয়া মাএর মাথায় ছোঁয়াইয়া বরণডালায় রাখিতেছেন; এক একবার ছোঁয়াইতেছেন আর তাঁহার চোখ ফাটিয়া জল পড়িতেছে। ক্রমে সব মেয়েদেরই চোখে জল

আসিল। পুরুষেরাও আর থাকিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া ফেলিলেন। অন্য সময় এ দুর্ব্বলতাটুকু যাঁহারা দেখাইতে চা'ন না, এখন তাঁহাদের সে ভাব রহিল না। কারণ, এ শোকে লজ্জা নাই। বরণ আরম্ভ হইল। বিশ ত্রিশ জন স্ত্রীলোক মহামায়াকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন, একবার, দুইবার, তিনবার, ক্রমে সাতবার প্রদক্ষিণ হইল। তাহার পর সকলে গলায় বস্ত্র দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া নমস্কার করিলেন। পরে কর্ত্তা এক পূর্ণপাত্র আনিয়া প্রতিমার সম্মুখ হইতে—গৃহিণী প্রতিমার পিছনে দাঁড়াইয়াছিলেন—তাঁহার অঞ্চলে ঢালিয়া দিলেন। গৃহিণী এই 'কনকাঞ্জলি' লইয়া সম্বৎসর মায়ের শোক নিবারণ করিবেন।

এ সব ত হইয়া গেল। তাহার পর কিছু মিষ্টান্ন আসিল। গৃহিণী একটি মিস্টান্ন লইয়া মায়ের মুখে দিলেন, আর একটি মায়ের হাতে দিলেন। এইরূপে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ সকলকেই মিষ্টান্ন খাওয়ান হইল, ও পথের সম্বল স্বরূপ কিছু হাতেও দেওয়া হইল। ইহার পর বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিয়া উঠিল!!!

এই দুর্গোৎসবের ব্যাপারটা কি? হৈমবতী বিবাহের পর মহাদেবের সঙ্গে কৈলাসে চলিয়া গিয়াছেন। মেনকা ক্রমাগত গিরিরাজকে মেয়ে আনিবার জন্য জিদ্ করিতেছেন। শেষে, গিরিরাজ কৈলাসে লোক পাঠাইলেন, অনেক কষ্টে মহাদেব, পার্ব্বতীকে তিন দিনের জন্য ছাড়িয়া দিবেন, স্বীকার করিলেন। যে তিন দিন [illegible]তী গিরিরাজের বাড়ীতে ছিলেন, সেই তিন দিন গিরিরাজপুরে মহামহোৎ[illegible] হইল। তাহার পর দশমীর দিন হৈমবতী পুনরায় কৈলাসে ফিরিয়া গেলেন। এখন বুঝিলেন, দুর্গোৎসবের ব্যাপারটি মেয়ে আনা ও মেয়ে বিদায়ের ব্যাপার। কর্ত্তা স্বয়ং গিরিরাজ, গৃহিণী স্বয়ং মেনকা, আর মহামায়া তাঁহাদের কন্যা। মেয়ে বিদায়ের ব্যা[illegible] যে [illegible]খিয়াছে, যে ভুগিয়াছে, সেই 'বিজয়া'র অর্থ গ্রহণ ক[illegible]তে পারে। ভক্তেরা বলেন, বিজয়ার সময় মহামায়ারও চোখের কোণে জ[illegible] দেখা যায়। ভালবাসা ত শুধু বাপমায়ের নয়, মে[illegible]র ত ভাল-

বাসা আছে। যখন বাড়ীশুদ্ধ সকলেই কাঁদিয়া আকুল, মহামায়া কি তা দেখিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারেন? তাঁহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হয়।

নদীতে হউক, পুষ্করিণীতে হউক, হ্রদে হউক, বিলে হউক, মা'এর বিসর্জ্জন হইয়া গেল। জগৎকারণ যে মাটি, সেই মাটি হইতেই মহামায়ার মূর্ত্তি গড়া হইয়াছিল, মাটিরই সাজসজ্জায় তাঁহাকে সাজান হইয়াছিল। যিনিই মাটি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনিই মাটির মূর্ত্তিতে আসিয়া অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাকে সজীব করিয়াছিলেন, তাহাকে 'পরা শক্তি' করিয়াছিলেন, তাহাকে সকলের চেয়ে বড় করিয়াছিলেন—এখন তিনি আর নাই—যে মাটি সে আবার মাটিই হইয়া গেল, জলে মিশিয়া গেল। যতলোক দেখিতে আসিয়াছিল, এ ব্যাপার সকলেই স্বচক্ষে দেখিল। শোকে, ক্ষোভে, দুঃখে, আপন আপন ঘরে ফিরিল। যাহার দালানে দুর্গা আসিয়াছিলেন, তাহার কথা ত দূরে যাউক, দেশশুদ্ধ লোক দেখিতে লাগিল—সব শূন্য!! সবাই শূন্য মনে বাড়ী ফিরিল!!! তাহারা এতক্ষণ যে এক অমানুষ শক্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছিল, সে শক্তির আজ অন্তর্দ্ধান হইয়াছে; তাই তাহাদের আবার আত্মীয়-স্বজন মনে পড়িয়াছে—মনে পড়িয়াছে এ শক্তি ক্ষণকাল আমাদের নিকটে আসিলেও আমরা এ শক্তি হইতে ভিন্ন, এ শক্তির অনেক [illegible], এখন আমাদের যাহা আছে, যাহা লইয়া আমাদের ঘর করিতে হইবে, যাহা লইয়া আমাদের চিরদিন থাকিতে হইবে, তাহাদের [illegible]ন, সম্ভাষণ, পূজা করাই আমাদের আবশ্যক। তাই ছেলে আসিয়া ধাপের পায়ে গড়াইয়া পড়িল, বাপ তা'কে কোলে লইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, তাহার মস্তকের ঘ্রাণ লইতে লাগিলেন। ছোট ভাই বড় ভাইএর পায়ে লুটাইয়া পড়িল, বড় ভাই তাঁহাকে কোল দিলেন। যাহার সহিত যেরূপ সম্পর্ক, সকলেই পরস্পর সম্মান ও সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। যিনি সকল সম্পর্কের অতীত,

তিনি যতদিন উপস্থিত ছিলেন, ততদিন এ সকল পার্থিব সম্পর্ক তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল। এখন আবার সে সম্পর্ক জাগিয়া নূতন হইয়া উঠিল। গৃহিণী শূন্য দালানে আসিয়া সব শূন্যময় দেখিলেন, তিনি একেবারে বসিয়া পড়িলেন, কাঁদিয়া ত আকুল। কর্ত্তারও অবস্থা তাই। তবে তিনি পুরুষ। তিনি গৃহিণীকে প্রবোধ দিলেন, বলিলেন, "ভয় কি? মা আবার এক বৎসর পরে আসিবেন।" সেই আশায় বুক বাঁধিয়া, সকলে আবার সংসার-ধর্ম্মে মন দিল।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

মাতৃ-পূজা

দুর্গোৎসবের স্মৃতি।

ছেলে-বেলা দুর্গোৎসব করিয়াছি এক ভাবে। হিন্দুর ঘরে জন্মিয়া, মানুষ ছাড়া, মানুষের উপরে, অদৃশ্য দেবতারা আছেন; এই বিশ্বাস রক্তমাংসের সঙ্গে জড়িত ছিল। তখনও কোনও স[illegible] কোনও জিজ্ঞাসা জাগে নাই। কোমল-শ্রদ্ধাভরে যাহা শুনিতাম, তাহাই বিশ্বাস করিতাম। আর দুর্গামূর্ত্তিটিও বড় মিষ্ট লাগিত। মুখে যেন তার হাসি লাগিয়াই আছে। সন্ধ্যা-আরতির সময় সুগন্ধি ধূপের ধূমে যখন চণ্ডীমণ্ডপ আচ্ছন্ন হইত, সেই [illegible]র ভিতর দিয়া দুর্গাপ্রতিমাকে বাস্তবিক যেন সজীব বলিয়া মনে হ[illegible]। [illegible]-য়ার দিন মনে হইত, আমাদের মনের বিষাদে যেন দুর্গা[illegible] মুখখানিও ম্লান হইয়া গিয়াছে। তারপর পুরোহিতেই দেবতার [illegible]ছে বসিয়া তাঁর পূজা করিতেন বটে, কিন্তু আমরাও আপন আপ[illegible] অধিকারে

থাকিয়া সে পূজার সাহচর্য্য করিতাম। ফুল তুলিয়া আনিতাম, বিল্ব-পত্র বাছিয়া দিতাম, আরতির সময় দাঁড়াইয়া কাঁসরঘণ্টাদি বাজাই-তাম। চক্ষু দিয়া দেবতার রূপ দেখিতাম, কাণ দিয়া পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ ও চণ্ডীপাঠ শুনিতাম, হাত দিয়া পুষ্প-চয়ন ও বিল্বপত্র শোধন করিয়া দিতাম, রসনায় প্রসাদ-ভক্ষণ করিতাম,—এইরূপে পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা দেবতার পূজার সাথী হইতাম। সে-পূজার সঙ্গে বড় মাখামাখি ছিল। প্রতিমা যে মাটির ইহা দেখিতাম, কিন্তু মাটি ছাড়া যে তাহাতে আর কিছু নাই, এ সন্দেহও তখন মনে জাগিত না। এইভাবে এই প্রতিমার সঙ্গে অতি নিকট সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিত। বিসর্জ্জনের কালেও কি জানি কোনও কারণে তার অঙ্গহানী হয়, এই ভাবিয়া অস্থির হইতাম। আর প্রতিমা-বিসর্জ্জন করিয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বাড়ী ফিরিতাম। সে-সকল কথা মনে হইলে, এখনও প্রাণটা কেমন করিয়া উঠে। ঐ শৈশব স্মৃতির জন্যই মনে হয়, এখনও শরতের সূর্য্য, শরতের চন্দ্র, শরতের বায়ু, শরতের প্রকৃতির ছবি এমন মধুর লাগে!

প্রতিমা-পূজার প্রতিবাদ।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে, বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবে, শৈশবের কোমল শ্রদ্ধা [illegible] হইল। ভালই হইল। তার জন্য দুঃখ করি না। সে [illegible]ল শ্রদ্ধা আবার ফিরিয়া পাইতেও চাহি না। বিচার জাগিয়া পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া দিল। এই ভাঙ্গাটা নূতন করিয়া গঠনের জন্য আবশ্যক ছিল। গতানুগতিক বিশ্বাস যার একবার ভাঙ্গিয়া না যায়, সে কদাচিৎ সত্যের প্রত্যক্ষলাভ করিতে পারে। এই ভাঙ্গার মুখে বুঝিলাম, [illegible]াতে ঈশ্বর-বুদ্ধি অসত্য। শুনিলাম, ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূ[illegible]। যিনি একথা লিখিয়াছিলেন, তিনি ইহার সকল মর্ম্ম বুঝিয়া[illegible]লেন কি না, জানি না। আমরা সে-বয়সে তার কিছুই বুঝি নাই। আকার চক্ষে দেখা যায়; আকারের ধর্ম্মই

আয়তনের সৃষ্টি করা। আয়তনের ধর্ম্মই বস্তুকে সীমাবদ্ধ করা। এইজন্য অসীম ও অনন্তের আকার নাই, আকার থাকিতে পারে না। এ সকল কথা মোটামোটি বুঝিলাম। আর এই স্থূল বুদ্ধিতেই স্থূল প্রতিমাপূজাদি পরিহার করিলাম।

বাহ্যপূজা ও মানসপূজা।

কিন্তু দেবতাদিগকে যেমন অনুভূতি দিয়া সাক্ষাৎভাবে ধরিতে পারি নাই ; এই নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ ঈশ্বরকেও সেইরূপ অপরোক্ষ অনুভূতির দ্বারা প্রত্যক্ষ করিলাম না। জড় প্রতিমার পূজা ছাড়িয়া মানস-প্রতিমার পূজা আরম্ভ করিলাম। বাহ্যপূজা অপেক্ষা মানসপূজা শ্রেষ্ঠ—একথা সকলেই কহিয়াছেন। আমাদের দেশের জ্ঞানী এবং ভক্তেরাও একথা বারম্বার কহিয়াছেন। কিন্তু বাহ্যপূজা এবং মানসপূজা উভয়ই সকাম হইতে পারে। শক্তি-উপাসক দুর্গা কালী প্রভৃতির সমক্ষে দাঁড়াইয়া—রূপ চান, ধন চান, যশ চান, পুত্র চান, এক কথায় সংসারের সুখসম্পদ ভিক্ষা করেন। আর আধুনিক ব্রহ্মোপাসকও আপনার মনোমত বর প্রার্থনা করিয়া থাকেন। সাংসারিক সম্পদের জন্য কামনাও কামনা, অধ্যাত্মসম্পদের জন্য কামনাও কামনা। উভয়বিধ কামনা-মূলক উপাসনাই সকাম। দেবোপাসনা ছাড়িয়াও সকামপূজা ছাড়িলাম না, [illegible]ড়িতে পারিলাম না। প্রার্থনা ত মুখের কথা নহে। প্রাণের গভীর[illegible] ব্যাকুলতম আকাঙ্ক্ষা ও আর্ত্তনাদই সত্য প্রার্থনা। আর যে যাহা ব্যাকুল হইয়া চায়, তারই জন্য সে প্রার্থনা করে। যে যে-বস্তুর অভাব বোধ করে, আত্মশক্তিতে যে-ঈপ্সিত লা[illegible]অসাধ্য বলিয়া বুঝে, তারই জন্য আপনার ইষ্টদেবতার চরণে ব[illegible]ভিক্ষা [illegible]রে। বিষয় চায় বিষয়ী, ভোগ চায় ভোগী, মুক্তি চায় মু[illegible]ক্ষু। দেবতায় ঈশ্বরবুদ্ধি নষ্ট হইলেই মানুষ মুমুক্ষু হয় না। [illegible]বোপাসকের[illegible] মুমুক্ষু হইতে পারেন, আমরা যেরূপ ব্রহ্মোপাসক, [illegible]মাদের মতন

বহু বহু লোকে সেইরূপ ব্রহ্মোপাসকের অভিমান করিয়াও মুমুক্ষুত্ব লাভ না করিতে পারেন। এই মুমুক্ষুত্ব অতি দুর্লভ বস্তু। বিবেক বৈরাগ্যাদি সাধনের দ্বারা ইহসংসারের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ রূপরসাদি সম্বন্ধে অনিত্য ও অসারবুদ্ধি দৃঢ় হইলে, নিত্যবস্তু ও সারসম্পদের জন্য প্রাণ অস্থির হইয়া জীবকে মুক্তিপিয়াসু বা মুমুক্ষু করে। এই বুদ্ধি যার দৃঢ় হয় নাই, অর্থাৎ মুমুক্ষু যে নয়, সে মুক্তির জন্য সত্য প্রার্থনা করিতে পারে না। আমরা ভগবানের নিকটে যশ না চাহিতে পারি, কিন্তু সম্ভাবিত কুযশের ভাবনায় অধীর হইয়া, অবমাননা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রার্থনা করি। আর "যশো দেহি" বলা যা', "লজ্জানিবারণ করিও" বলাও তাহাই। আমরা পুত্র চাই না, কারণ পুত্র যে কি বস্তু তাহা ভাল করিয়া বুঝি না। কিন্তু পুত্র পাইলে সে বাঁচিয়া থাকুক, ভাল হউক, এ প্রার্থনা ত করি। এইরূপে তলাইয়া দেখিলে শক্তি-উপাসক আপনার ইষ্টদেবতার নিকটে যাহা কিছু চান, আমরা পাকে প্রকারে আমাদের উপাস্যের নিকটেও তাহাই চাই। তাঁদের দেবোপাসনা যেমন সকাম, আমাদের এই ব্রহ্মোপাসনাও সেইরূপই সকাম। পূর্ব্বকার বাহ্য-পূজাতে আর পরবর্ত্তী সংস্কৃত মানসপূজাতে এবিষয়ে কোনও পার্থক্য ঘটিল না। আর তখন বুঝি নাই, এখন বুঝিয়াছি, প্রতিম[illegible] মাত্রেই যে বাহ্যপূজা তাহাও ত নহে। যে পূজার [illegible] অন্তরের অনুভূতির যোগ নাই, ধ্যানের দ্বারা যাহা পুষ্ট হয় [illegible], কেবল যন্ত্রারূঢ়ের মতন কতকগুলি বাহিরের ক্রিয়াকর্ম্মই যে পূজার সকলটা, তাহাই বাহ্যপূজা। মন্ত্রের অর্থবোধ নাই, মন্ত্রার্থের অনুভূতি নাই, [illegible]র্থের সঙ্গে ধ্যানের ও ভাবের যোগ নাই, টীয়া পাখীর মতন [illegible] আওড়াইয়া যাইতেছি, কলের পুতুলের মতন অঞ্জলি পুরিয়া দেবতার চরণে ফুল-বেলপাতা ফেলিয়া দিতেছি— [illegible]ই ত বাহ্যপূজা। কিন্তু নিরাকার ব্রহ্মের পূজাও এইরূপ বাহ্য-পূজা হইতে পারে। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" মুখে বলিতেছি কিন্তু

প্রাণে সত্যের, জ্ঞানের অনন্তের কোনও কিছুর জীবন্ত অনুভূতি নাই, শব্দের উপর শব্দ, পদের উপর পদ, বাক্যের উপর বাক্য, উপমার উপর উপমা, অলঙ্কারের উপর অলঙ্কার চাপাইয়া আরাধনা করিতেছি, অথচ অন্তরে কোনও প্রত্যক্ষ ধারণা নাই,—এও ত বাহ্য-পূজা। দেবোপাসনার মতন এই তথাকথিত ব্রহ্মোপাসনাও ত—"ধমাধমা।" যেমন সাকারোপাসনায় সেইরূপ নিরাকারোপাসনাতেও এই বাহ্যপূজার সমান আশঙ্কা ও অবসর আছে। এইজন্যই দেবতায় বিশ্বাস হারাইলাম, কিন্তু সকাম উপাসনা অতিক্রম করিতে পারিলাম না, সত্য মানসপূজার অধিকারই যে সম্পূর্ণ পাইলাম তাহাও নহে।

এইরূপে প্রতিমা-পূজা ছাড়িলাম, কিন্তু বাহ্যপূজার আশঙ্কার নিঃশেষ নিবৃত্তি হইল না। আর ক্রমে, ভগবৎ-প্রসাদাৎ, গুরু-কৃপায় বাক্যের মোহ যত কাটিতে আরম্ভ করিল, প্রার্থনা যত থামিয়া আসিতে লাগিল,—"তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক!"—যখন সকল প্রার্থনার সেরা প্রার্থনা হইল, সাকারে নিরাকারে একাকার হইয়া যত ভগবানের বিশ্বরূপ প্রকাশিত হইতে লাগিল, তত পুরাতন প্রতিমা-পূজারও নূতন মর্ম্ম বুঝিতে লাগিলাম। তখন বুঝিলাম সাকার ও নিরাকার দু'এর কিছুই সম্পূর্ণ ও চরম সত্য নহে। তত্ত্ববস্তু, ব্রহ্মবস্তু প্রচলিত অর্থে সাকারও নহে, প্রচলিত অর্থে নিরাকারও নহে। প্রচলিত অর্থে যাহা সাকার তাহা জড়, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। যাহা নিরাকার, সাধারণ লোকের মানস-অভিজ্ঞতাতে তাহা শূন্য, কিম্বা ভাব বা idea মাত্র। সাকার স্থূল বা gross; নিরাকার সূক্ষ্ম বা abstract। আমাদের সাধারণ মানস-ক্ষেত্রে যাহা সাকার ও নিরাকার রূপে প্রকাশিত হয়, ব্রহ্মবস্তু বা তত্ত্ববস্তু, তাহার কিছুই নহে। আমাদের অনুভূতির অভিধানে ব্রহ্মকে আমরা সাকারও বলিতে পারি না, নিরাকারও বলিতে পারি না। তিনি সাকার নহেন, অথচ সকল আকারকে প্রকাশ করিয়া, সকল

আকারকে ধারণ করিয়া আবার সকল আকারকে অতিক্রম করিয়া আছেন। তিনি নিরাকার বটেন অথচ শূন্য নহেন। এইটি যে-দিন হইতে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি, সে-দিন হইতে আমাদের দেশের পুরাতন ও প্রচলিত পূজাপদ্ধতিকেও নূতন চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি।

প্রতিমা-পূজার অধিকার।

প্রতিমা-পূজা করি বা না করি, ইহা যে নিম্ন-অধিকারীর জন্য বিহিত হইয়াছে, একথা আর বিশ্বাস করিতে পারি না। ধর্ম্মের বিকাশে ও তত্ত্বের ইতিহাসে মোটের উপরে তিনটি স্তর দেখিতে পাই। প্রথম স্তরে আত্মানাত্মবিবেক জন্মে নাই, অতীন্দ্রিয়ের অনুভূতি ভাল করিয়া ফুটে নাই, আত্মা ও অনাত্মায়, ইন্দ্রিয়ে ও অতীন্দ্রিয়ে জড়াজড়ি করিয়া থাকে। শিশুদের মধ্যে এই ভাবটি দেখিতে পাই। তারা বিশ্বের সকল পদার্থকেই সচেতন ও নিজেদের মতন রাগদ্বেষাদি-সম্পন্ন মনে করে। শিশু হুঁচট খাইলে, মাটিতে লাথি মারে; 'পবন আয়, পবন আয়' বলিয়া হাতে বুড়ীর সূতা ধরিয়া আকুল হইয়া ডাকে; চাঁদ দেখিয়া তাহাকে হাত ছানি দিয়া নিকটে ডাকিয়া আনিতে চাহে। শিশুর চক্ষে বিশ্ব সচে[illegible], সকলই তার মতন। আর সমাজের শৈশবে মানুষের [illegible]পাস্যও সকলই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ। বেদের ইন্দ্র-বরুণাদি সকলই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ ছিলেন। চর্ম্মচক্ষু দিয়াই লোকে এই সকল দেবতাকে দেখিত। ক্রমে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জগতের যাবতীয় পদ[illegible] সচেতন ও অচেতন এই দুইভাগে বিভক্ত হইল। এই চৈতন্যে[illegible] সন্ধানে যাইয়া মানুষ এক অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত চিদ্রাজ্যে উপস্থিত হইল। এই স্তরে তার ধর্ম্ম ও উপাস্য একান্ত অন্তর্মুখীন হই[illegible] পড়িল। এই অন্তর্মুখীন বা একান্ত subjective স্তরের ধর্ম্মই আমাদের প্রাচীন উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মসাধন

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এই স্তরের মূল মন্ত্র—নেতি, নেতি, যাহা চক্ষে দেখি তাহা ব্রহ্ম নহে, যাহা কাণে শুনি তাহা ব্রহ্ম নহে। এই ব্যতিরেকী উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে একটা অন্বয়-ধারাও চলিল। প্রাচীন উপনিষদ ব্যতিরেকী ও অন্বয়ী এই উভয় ধারা মিশ্রিত উপাসনার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কেনোপনিষদে এই তত্ত্বটি অতি পরিস্ফুট হইয়াছে।

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনো
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ

সেখানে এই চক্ষু যায় না, এই বাক্য যায় না, এই মনও যায় না। আমরা তাহাকে জানি না, কিরূপে তাহার উপদেশ দিতে হয় তাহাও জানি না।

অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি

যাহা কিছু আমরা প্রত্যক্ষ করি, তিনি তাহা হইতে ভিন্ন, আমরা যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করি না, তিনিই তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ। তবে ইন্দ্রিয়াতীত হইয়াও তিনি এসকল ইন্দ্রিয়ের প্রেরয়িতা—তাঁহারই শক্তিতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় জগতের যাবতীয় রূপরসাদি প্রত্যক্ষ করে।

যদ্বাগানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।
যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতম্
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।
যচক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।

বাক্যের দ্বারা যিনি প্রকাশিত হন না, কিন্তু যাহার দ্বারা বাক্য প্রকাশিত হয়; মনের দ্বারা যিনি গৃহীত হন না, কিন্তু যিনি মনকে মনন করেন; চক্ষুদ্বারা যাহাকে দেখা যায় না, কিন্তু যাহার শক্তিতে চক্ষু দেখে;—তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান। বাক্য, মন, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যেসকল বস্তুকে প্রাপ্ত হয়, তাহা ব্রহ্ম নহে। এই স্তরে

এইভাবে পরমতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব কেবল অন্তরের ধ্যানগম্য ও সমাধিলভ্য হইয়া পড়েন। তাঁর স্বরূপ-উপলব্ধি করিতে হইলে তখন সকল প্রকারের ইন্দ্রিয়-চেষ্টাকে একান্তভাবে নিরোধ করিয়া আত্মস্বরূপে বা শুদ্ধ দ্রষ্টাস্বরূপে অবস্থান করিতে হয়। এই সমাধির অবস্থা অতি উচ্চ অবস্থা; শ্রেষ্ঠতম অধিকারী ব্যতীত কেহ এ অবস্থালাভ করিতে পারেন না। এই স্তরের সাধ্য কৈবল্য, উপাস্য বা ধ্যেয় নির্গুণ ব্রহ্ম।

সম্পদুপাসনা ও প্রতীকোপাসনা।

এই স্তরে এই সমাধিগ্রাহ্য স্বরূপোপাসনার সঙ্গে সঙ্গে, সাধকের মানসকল্পনাকে আশ্রয় করিয়া সম্পদুপাসনা এবং প্রতীকোপাসনারও প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। স্বরূপোপাসনায় যাহারা অনধিকারী, তাহারা সম্পদুপাসনা ও সম্পদুপাসনায় পর্য্যন্ত যাদের অধিকার জন্মে নাই, তাহারা প্রতীকোপাসনা করিয়া থাকে। সূর্য্যোপাসনা, প্রাণোপাসনা, মনোপাসনা,—এসকল সম্পদুপাসনা। সূর্য্য, প্রাণ, মন এ সকলের সঙ্গে ব্রহ্মবস্তুর কতকটা গুণ-সামান্য আছে। ব্রহ্মবস্তু জ্ঞানবস্তু, ব্রহ্মের জ্ঞানেতে জগতের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা। ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ ও বিশ্বপ্রকাশক; আপনাকে প্রকাশিত করিতে যাইয়া বিশ্বকে প্রকাশিত করিয়াছেন, বিশ্বকে প্রকাশিত করিতে যাইয়া আপনাকে প্রকাশিত করিয়াছেন। এই নৈসর্গিক সূর্য্যও সেইরূপ আপনাকে প্রকাশ করিয়া জগৎকে প্রকাশিত করে, জগৎকে প্রকাশিত করিতে যাইয়াই আপনাকেও প্রকাশিত করে। সূর্য্যেতে ও ব্রহ্মেতে এই সামান্য-ধর্ম্ম আছে। এই সামান্য ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, অন্তরে ব্রহ্মের অতীন্দ্রিয় চিন্ময় প্রকাশ ভাবিয়া এই প্রত্যক্ষ সূর্য্যের ধ্যান করা—সম্পদুপাসনা। উপাসক এখানে সূর্য্যের বাহিরের আকারাদির, রূপাদির বা অন্য জড়ধর্ম্মাদির প্রতি লক্ষ্য করেন না, কিন্তু তাহার জগৎ-প্রকাশকত্ব ও স্বপ্রকাশত্ব ধর্ম্মের প্রতিই মনোনিবেশ করেন ও এই সূর্য্যের প্রত্যক্ষ জগৎপ্রকাশকত্ব ও স্বপ্রকাশত্বকে আপনার মননের বিষয়

করিয়া, ইহার আশ্রয়ে অপ্রত্যক্ষ ও অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্ম-অনুভূতিগ্রাহ্য ব্রহ্মস্বরূপের চিন্তা করিতে চেষ্টা করেন। এইরূপে সাধক আপনার প্রাণবস্তুকে মননের বিষয় করিয়া, কিম্বা আপনার অন্তরীন্দ্রিয় মনকে মননের বিষয় করিয়া, ব্রহ্মের বিশ্বপ্রাণতা ও বিশ্ব-চিন্তামণি-স্বরূপ ধ্যান করিতে চেষ্টা করিতে পারেন। এইগুলিই সম্পদুপাসনার পথ। এইপথে চলিয়া ক্রমে স্বরূপ-উপাসনার ক্ষমতালাভ করা যাইতে পারে। স্বরূপোপাসনার ন্যায় এই সম্পদুপাসনাও ধর্ম্ম-বিকাশের মধ্যমস্তরের কথা। এই সম্পদুপাসনার অবলম্বন কেবল শাস্ত্র বা শ্রুতি নহে কিন্তু শাস্ত্র বা শ্রুতি এবং বিচার। এই সম্পদুপাসনার সাধন কেবল শ্রবণ নহে, কিন্তু শ্রবণ এবং মনন দুই। কেবল শ্রদ্ধার অর্থাৎ গুরুশাস্ত্রবাক্যে সত্যবুদ্ধির দ্বারা এই সম্পদুপাসনার অধিকার জন্মে না। বিচার-শক্তি, আপনাপন প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে নিঃশেষে বিশ্লেষণ করিবার এবং তাহার রহস্য ও তথ্য বুঝিবার ক্ষমতাও থাকা আবশ্যক। এখানে কেবল বিশ্বাসের বা শ্রদ্ধার দোহাই দিলে চলে না। এই স্তরে শ্রদ্ধা থাকা চাই, গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে আস্থা থাকা আবশ্যক, এই বিশ্বাসই ধর্ম্মের নহে কিন্তু সাধনের মূল। কিন্তু এখানকার প্রধান উপদেশ—পরীক্ষা। গুরু মানিবে, শাস্ত্র মানিবে কিন্তু সকলের উপরে নিজের অনুভূতিকে প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিবে। এখানকার উপদেশ—

"যাহা না দেখ আপন নয়নে।
তাহা না মান গুরুর বচনে॥"

এই স্তরেই আবার নিম্নতম অধিকারীর জন্য প্রতীকোপাসনারও ব্যবস্থা আছে। স্বরূপোপাসনায় সম্পূর্ণ সত্যকে লাভ করে, সম্পদুপাসনা এই সত্যের একদেশমাত্র গ্রহণ করে। প্রতীকোপাসনায় নিভাজ মিথ্যাকে আশ্রয় করে। এইজন্য প্রতীকোপাসনাকে অধ্যাসজনিত উপাসনা কহিয়াছেন। অধ্যাস অর্থ—অন্যত্র দৃষ্টঃ পরত্রাবভাসঃ। একস্থানে যে-বস্তুর প্রত্যক্ষ হইয়াছে, অন্যস্থানে যেখানে বস্তুতঃ তাহা

নাই, সেখানে তাহার অস্তিত্ব কল্পনা করার নাম অধ্যাস। জঙ্গলে সাপ দেখিয়াছি, ঘরের মেজেয় দড়ী পড়িয়া আছে, সাপ নহে; আর এই দড়ীগাছকে পূর্ব্বদৃষ্ট সাপ বলিয়া মনে করা অধ্যাসের কার্য্য। অন্তরে অপরোক্ষানুভূতিতে যে ব্রহ্মবস্তুর সাক্ষাৎকার লাভ হয়, বাহিরের কোনও পদার্থে তার অস্তিত্ব আরোপ করা অধ্যাস। যেখানে যে-বস্তু বাস্তবিক জ্ঞানগোচর হয় না, সেখানে সে-বস্তুর অবস্থিতি আরোপ করা অধ্যাস। জ্ঞানমাত্রেই বস্তুতন্ত্র, বস্তুর অধীন, বস্তুসাক্ষাৎকারে উৎপন্ন হয়। প্রস্তরে বা মৃৎপিণ্ডে স্বতঃ ব্রহ্ম-প্রেরণা সাধারণ লোকের হয় না। ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হইবার পরে, সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্মময়ং জগৎ—এই ধারণা সাধনবলে বদ্ধমূল হইয়া গেলে, প্রতীকের মধ্যেও সাধু মহাপুরুষদিগের অন্তরে ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি হইতে পারে, হইয়া থাকে। এরূপ ব্রহ্মস্ফূর্ত্তিতে তাঁহারা যে প্রতীকের সমক্ষে ভাবে বিভোর হইয়া অর্চ্চনাবন্দনাদি করেন, তাহাতে কোনও প্রকারের অধ্যাস নাই। এরূপ প্রতীকোপাসনা সত্য ব্রহ্মোপাসনাই হয়, অধ্যাসজনিত মিথ্যা কল্পনার উপাসনা হয় না। কিন্তু এই প্রতীকোপাসনার অধিকারী সকলে হয় না। শ্রেষ্ঠ-তম সিদ্ধ মহাপুরুষদিগেরই কেবল এই অধিকার আছে। আর তাঁহারাও অনবচ্ছিন্নভাবে সর্ব্বদাই এরূপ প্রতীকের মধ্যে ব্রহ্মোপ-লব্ধি করেন না। ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি হয় তাঁহাদের অন্তরে। অন্তরের ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি নিবন্ধন বিশ্ব তখন তাঁহাদের চক্ষে ব্রহ্মময় হয়। যে-খানেই তাঁহারা মানুষকে কোনও বস্তুর আরাধনা করিতে দেখেন, সে-খানেই ভাব-যোগ বশতঃ বা association বা ideas'এর বলে, তাঁহাদের প্রাণের মধ্যে আরাধনার ভাব জাগিয়া তাঁহাদের আরাধ্য দেবতার [illegible] অনুভূতি জাগাইয়া তুলে। এই ভাবেই এই সকল সিদ্ধ মহাপুরুষেরা এই সকল প্রতীকেতে ব্রহ্মোপলব্ধি বা ঈশ্বরোপলব্ধি করিয়া ভাবে বিভোর হইয়া পড়েন। যখন এরূপ ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি তাঁহাদের হয়, তখন তাঁহাদের এই সকল প্রতীকে ব্রহ্ম-

জ্ঞান আর কল্পিত থাকে না, সত্য হইয়া যায়। কারণ তখন ভগবদ্‌ভাবে তন্ময় সাধক—

স্থাবর জঙ্গম দেখে, দেখে না তার মূর্ত্তি।
যাঁহা নেত্র পড়ে হয় ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি।

কিন্তু যাঁহাদের এই তন্ময়তা জন্মে না, যাঁহারা অন্তরের অপরোক্ষ অনুভূতিতে ভগবদ্‌সাক্ষাৎকারলাভ করেন নাই, তাঁহাদের নিকটে প্রতীকোপাসনা অধ্যাসজনিত মিথ্যা উপাসনা মাত্র।

প্রতীকোপাসনার অধিকার।

ফলতঃ অধ্যাসের প্রকৃত অর্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, এই প্রতীকোপাসনার অধিকারই যে সকলের আছে, এমন বলাও সম্ভব হয় না। অধ্যাস অর্থ অন্যত্র দৃষ্টঃ পরত্রাবভাসঃ। সুতরাং অধ্যাসের মূলেও প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে। যে কখনও সাপ দেখে নাই, তার পক্ষে রজ্জুতে সর্প অধ্যাস করা কদাপি সম্ভব হয় না। এইরূপ যে প্রকৃতপক্ষে কদাপি অন্তরের মধ্যে ভগবদ্‌বস্তুর অনুভূতিলাভ করে নাই, তার পক্ষে শালগ্রামাদিতে ভগবদধ্যাস করা সম্ভব নয়। তবে যে সাধারণ লোকে এসকল প্রতীকের পূজা করে, ইহার মূলে একটা শ্রুতজ্ঞান আছে। ইহারা ঈশ্বরের কথা শুনিয়াছে, গুরুশাস্ত্রমুখে ঈশ্বরতত্ত্বের স্বরূপবিস্তর উপদেশলাভ করিয়াছে। পুরুষক্রমানুগত একটা বিশ্বাসের বা আস্তিক্যবুদ্ধির জন্য ইহাদের মনে একটা ঈশ্বর-ভাব আছে। এই ঈশ্বর-ভাবটাকেই ইহারা এসকল প্রতীকে আরোপ করে।

প্রতীকোপাসনার অর্থ।

কিন্তু এদেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতীকোপাসক সাধকেরা অধ্যাত্মযোগের একটা পন্থারূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। পরমতত্ত্ব যে নিরাকার, ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করেন। এই নিরাকারতত্ত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহারা বলেন যে সমাধিতে সকলইন্দ্রিয়চেষ্টার নিঃশেষ

নিবৃত্তি না হইলে এই বিশুদ্ধ নিরাকারতত্ত্বের প্রত্যক্ষলাভ সম্ভব হয় না। এই সমাধিলাভ করিতে হইলে চিত্তবৃত্তির নিরোধ অভ্যাস করা প্রয়োজন। এই যোগের পথে এক এক করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে সংহৃত করিতে হয়। ধ্যান এই সাধনের অবলম্বন। প্রথমে কোনও দৃষ্টবস্তুকে অবলম্বন করিয়া ধ্যান শিখিতে হয়। এই প্রথম অবস্থায় বস্তুর সমগ্রতাকে নিবিষ্ট চিত্তে লক্ষ্য করিতে হয়। ক্রমে ক্রমে দৃষ্টি ও মনকে এই ধ্যেয় বস্তুর অংশ বিশেষে নিবদ্ধ করিতে হয়। তখন ঐ অংশই জ্ঞানগম্য হয়, অপরাংশ হয় না। এইরূপে শেষে একটা অঙ্গে ও সর্ব্বশেষে সেই অঙ্গকেও পরিহার করিয়া নিরাকার শূন্যে দৃষ্টি ও মনকে নিবদ্ধ করিতে হয়। এইরূপে নিরালম্ব ধ্যানের দ্বারা শূন্য-সমাধিলাভ হইলে পরে, ব্রহ্মাত্মৈকত্ব উপলব্ধি হয়। তখন দ্রষ্টা ও দৃষ্ট দুই লোপ পাইয়া, শুদ্ধ চৈতন্য বা জ্ঞানমাত্র অবশিষ্ট থাকে। ইহাই কৈবল্যমুক্তি। এই কৈবল্যমুক্তি সাধনের জন্য, সমাধিলাভের উপায়স্বরূপ, শালগ্রামাদি প্রতীকের উপাসনা বিহিত হইয়াছে। দেশপ্রচলিত প্রতীকোপাসনার মূলতত্ত্ব ইহাই। কৈবল্যপ্রার্থী বৈদান্তিক ও তান্ত্রিকের পক্ষে এই প্রতীকোপাসনা নিম্ন অধিকারে, সাধনের প্রথমাবস্থায়, প্রশস্ত হইলেও, ভক্তিপন্থী বৈষ্ণবের পথ ইহা নহে। বৈষ্ণব ভক্তিসাধকের চরম লক্ষ্য নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান নহে, কিন্তু চিদাকারসম্পন্ন ভগবদ্‌-সাক্ষাৎকার। ভক্তির পথ অন্বয়ের পথ, ব্যতিরেকের পথ নয়।

প্রতিমা-পূজা ও ভক্তিপন্থা।

প্রকৃত প্রতিমা-পূজা ভক্তিপথেই প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞানসাধক কৈবল্যের পথে ইহার স্থান নাই। এই জন্য এসকল প্রতিমাকে ঠিক প্রতীক বলা যায় না। প্রতিমা রূপক। অরূপের রূপক হয় না, হইতেই পারে না। নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞানীর গভীরতম অনুভূতি ব্রহ্মসমাধির। এই ব্রহ্মসমাধিকে শাস্ত্রে ও

মহাজনমুখে গভীর সুষুপ্তির সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। সুষুপ্তিতে যেমন অস্তিমাত্র-বোধ থাকে এবং অনাবিল ও অনবচ্ছিন্ন আনন্দ-ভোগ হয়, কিন্তু জ্ঞাতা-জ্ঞেয়, ভোক্তা-ভোগ্য প্রভৃতি কোনও দ্বৈতের বা সম্বন্ধবোধ থাকে না; এই ব্রহ্ম সমাধিতেও সেইরূপ হয়— আমাদের বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞানীগণ এই কথাই কহিয়াছেন। সুতরাং এই অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয় অনুভূতিকে কোনও প্রকারের প্রত্যক্ষ বস্তুর উপমা বা রূপকাদির দ্বারা ব্যক্ত করা কিছুতেই সম্ভব হয় না। যেখানে সমাধিতে, অপরোক্ষ অনুভূতির দ্বারা কোনও অজড় শুদ্ধ চিন্ময় ভাবমূর্ত্তির বা রসমূর্ত্তির স্বতঃ ও সত্য প্রকাশ হয়, সেইখানেই কেবল সত্যভাবে এইরূপ রূপক গড়িয়া উঠিতে পারে। আমাদের প্রচলিত প্রতিমা-পূজার অধিকাংশই যে রূপক একথাও অস্বীকার করা যায় না। রূপক বলিলেই রূপ আছে; যার কোনও রূপ নাই, বা রূপের সঙ্গে কোনও সামান্য ধর্ম্ম নাই, তার রূপক হয় না ও হইতেই পারে না। এই জন্য প্রতীকোপাসনা আর প্রতিমা-পূজাকে ঠিক এক বলা যায় না। শালগ্রামশীলা প্রতীক। শালগ্রামশীলার মধ্যে আরাধ্য বস্তুর কোনও সত্য ও সহজ প্রেরণা নাই। সূর্য্যকে দেখিয়া যেমন আপনা হইতেই চিত্তে ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্ব ও জগৎপ্রকাশকত্ব ধর্ম্ম অর্থাৎ তাঁহার জ্ঞানস্বরূপের ভাব অন্তরে জাগিয়া উঠে বা উঠিতে পারে, শালগ্রামকে দেখিয়া তাহা হয় না, হইতে পারে না। শাল-গ্রামকে সম্মুখে রাখিয়া চক্ষু বুজিয়া অন্তরের ব্রহ্মানুভূতি বা ব্রহ্ম-প্রত্যয়কে ইহাতে অধ্যাস করিয়া, অর্থাৎ এই শীলাতে ব্রহ্ম আছেন এরূপ ভাবিয়া তবে তার উপাসনা করিতে হয়। অর্থাৎ এখানে "অন্যত্র দৃষ্টঃ পরত্রাবভাসঃ"—অধ্যাসের এই সংজ্ঞাটি সার্থক হয়। এই জন্য, এমন কি, শাক্তদিগের শিবলিঙ্গকেও ঠিক প্রতীক বলা যায় না। শিবলিঙ্গ সম্পদ বা রূপক। ব্রহ্মের বিশ্বস্রষ্টৃত্ব বা বিশ্বযোনিত্বের সঙ্গে শিবমূর্ত্তির কতকটা সামান্য ধর্ম্ম আছে। লিঙ্গো-পাসনা বিশ্বযোনির উপাসনা। কিন্তু শালগ্রামের মধ্যে ব্রহ্মস্বরূপের

এরূপ কোনও সহজ প্রেরণা নাই বলিয়া ইহা খাঁটি প্রতীক। আর শালগ্রামকে যদি রূপক বলিতেই হয়, তাহা হইলেও ইহাকে শুদ্ধ নিরাকারেরই রূপক বলিয়া ধরিতে পারা যায়; নিত্যসিদ্ধ চিন্ময়-রস-মূর্ত্তি নারায়ণ বা পুরুষোত্তমের রূপক বলা যায় না। শূন্যবাদী বৌদ্ধদিগের নিকট আধুনিক হিন্দুগণ এই শালগ্রামযন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন কি না, ইহাও ভাবনার ও গবেষণার বিষয়। অন্য পক্ষে কালী-দুর্গা প্রভৃতি তান্ত্রিকোপাসনা-প্রতিষ্ঠিত প্রতিমাসকল যে রূপক, এ সম্বন্ধে কোনও দ্বিধাই মনে জাগে না। ইহাদের রূপকত্ব প্রত্যক্ষ। গতানুগতিক হিন্দুও

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা"

সাধকদিগের হিতের জন্য অরূপ বা চিদ্রূপ পরমতত্ত্বের চাক্ষুষ রূপাদির কল্পনা হয়—এই বলিয়া এসকল প্রতিমা-পূজার সমর্থন করিয়া, ইহার রূপকত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন।

রূপ ও রূপক।

কিন্তু এখানেও প্রশ্ন উঠে, রূপের সাক্ষাৎকার যার লাভ হয় নাই, রূপকের মর্ম্ম ও মর্য্যাদা সে কি কখনও বুঝিতে পারে? প্রতিমা যে দেবতা নহেন, হিন্দু ইহা বেশ জানেন। অজ্ঞ লোকেও একথা বুঝে। পূজাকালে প্রতিমাকে প্রথমে শোধন করিয়া লইতে হয়। এই শোধন একটা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার, ইহা সত্য। এরূপ শোধনের দ্বারা দ্রব্যগুণের কোনও সত্য পরিবর্ত্তন ঘটে না; কেবল এতক্ষণ যাহা প্রাকৃত কাষ্ঠলোষ্ট্রমৃত্তিকা মাত্র ছিল, তাহাই এই সকল প্রাকৃত ধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া দৈবগুণ ও দেবতার চিদ্‌ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ যে প্রতিমার জড়ধর্ম্মের বিলোপ হয় বা বিপর্য্যয় ঘটে, তাহা নহে, কিন্তু উপাসকের মনেতেই ইহাতে আর জড়বুদ্ধি ও প্রতিমাজ্ঞান থাকে, দেববুদ্ধির উদয় হয়। এইজন্য এই শোধন-ক্রিয়া বাহিরের নয় ভিতরের—objective নহে নিতান্ত subjec-

tive ; ইহা magic ও hypnotism'এর—ইন্দ্রজাল ও সম্মোহনের একপর্য্যায়ভুক্ত। শোধনের পরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা। অপ্রাণীতে প্রাণ-আরোপই এই প্রাণপ্রতিষ্ঠার মর্ম্ম। এই প্রাণপ্রতিষ্ঠাকে অধ্যাস বলা যাইতে পারে। অন্যত্র দৃষ্টঃ পরত্রাবভাসঃ—যে প্রাণবস্তু নিজের মধ্যে ও অপরাপর প্রাণীমণ্ডলীতে প্রত্যক্ষ হয়, এই অচেতন প্রতিমায় তাহা অপ্রত্যক্ষ। অথচ এই প্রাণপ্রতিষ্ঠার দ্বারা এই অপ্রাণী প্রতিমায় সেই প্রাণধর্ম্ম কল্পিত হয়। এই দিক্ দিয়া দেখিলে প্রতিমা প্রতীক হইয়া যায়, প্রতিমা-পূজা প্রতীকোপাসনার একপর্য্যায়ভুক্ত হয়।

প্রতিমা-পূজা ও নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা।

অন্যদিকে প্রতিমাতে লোকে নিরাকারের ধ্যান করে না, শালগ্রামেতে করিয়া থাকে। আধুনিক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার দ্বারা যাঁহারা প্রতিমা-পূজার সমর্থন করিয়া থাকেন, তাঁদেরও মধ্যে অনেকেই প্রতিমার প্রকৃত মূল্য ও মর্য্যাদা বুঝেন না, প্রতিমা-পূজাকে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার নিম্ন অধিকারের বহিরঙ্গ সাধনরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। তাঁরা বলেন, স্থূলবুদ্ধি মানুষ নিরাকারের চিন্তা করিতে পারে না, মন তাহাতে বসে না, ধ্যান তাহাতে স্থির হয় না। আর প্রাকৃতজনকে মনঃসংযম শিক্ষা দিবার জন্য এ-সকল প্রতিমা কল্পিত হইয়াছে। ইহারা প্রথমে একটা বিশিষ্ট মূর্ত্তিতে মনঃস্থির করিতে অভ্যাস করিবে। ক্রমে জগতের অপর সকল বস্তুকে পরিহার করিয়া এই গোটা প্রতিমাতে মন যখন অনন্য-মনা হইয়া বসিতে পারিবে, তখন এই প্রতিমারও একটি একটি করিয়া অঙ্গকে প্রত্যাহার বা পরিহার করিতে হইবে। প্রথমে সমগ্র প্রতিমার ধ্যান করিবে, এই ধ্যান সাধন হইলে অর্থাৎ প্রতিমার সম্মুখে বসিবামাত্র বিশ্বের অন্য সকল রূপের স্মৃতি ও চিন্তা যখন একান্তভাবে চিত্ত হইতে লোপ পাইয়া, একমাত্র এই প্রতিমার রূপই নয়নে-মনে জাগিয়া রহিবে, তখন একটি একটি করিয়া

ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকেও ধ্যানের বহির্ভূত করিতে হইবে। প্রথমে ইহার হস্তপদ নাই, এরূপ ভাবিতে হইবে। এসময় প্রতিমার হস্ত-পদের প্রতি লক্ষ্য করিলে চলিবে না। তার পর এই অঙ্গগুলি ধ্যান হইতে নিঃশেষে অপসৃত হইলে, উরস ও উদরাদিকে পরিহার বা প্রত্যাহার করিতে হইবে। তখন কেবল মুখ ও মস্তকই ধ্যেয় হইবে। সর্ব্বশেষে মুখ এবং মস্তকও আর ধ্যেয় থাকিবে না। শেষে কেবল চক্ষু তিনটিমাত্র—দেবতামাত্রেরই তিন চক্ষু, ভূত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকাল দর্শন করে—ধ্যানের বিষয় হইবে। অন্তে এই চক্ষুও মন হইতে, ধ্যান হইতে, সরিয়া যাইবে এবং নিরাকার সত্তামাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। এই নিরাকার চিন্ময় সত্তাই ব্রহ্মসত্তা। ইহাই তখন ধ্যানের বিষয় হইবে ও রহিবে। এই ভাবেই এক এক করিয়া প্রতিমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি হইতে চিত্তবৃত্তির প্রত্যাহার করিয়া, সোপানা-বলি আরোহণে নিত্যসত্য নিরাকার শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপে বা আত্মস্বরূপে বা ব্রহ্মস্বরূপে সাধক সমাধি লাভ করিয়া নির্ব্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। মধ্যযুগের নিরাকারবাদী বা শূন্যবাদী ব্রহ্মসাধকেরা এই ভাবেই প্রতিমা-পূজাকে ব্রহ্মসাধনার অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছিলেন। আমাদের দেশের শাক্ততন্ত্র সমুদায়ই বোধ হয় অদ্বৈতব্রহ্মপরায়ণ। অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি ও কৈবল্যমুক্তিই তান্ত্রিক সাধনার সাধ্য ও লক্ষ্য। এই জন্য তান্ত্রিক উপাসকেরা কালীদুর্গা প্রভৃতির মূর্ত্তিকে যে-ভাবে দেখেন, তাহাতে এ গুলিকে প্রতীকই বলিতে হয়, রূপক বলা যায় না। ধর্ম্মবিকাশের যে স্তরে সত্য রূপকোপাসনার প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হয়, এই সকল নিরাকারবাদী বা নির্গুণবাদী বা শূন্যবাদী সাধকেরা সে স্তরে এখনও পৌঁছিতে পারেন নাই।

ভক্তিপন্থা ও প্রতিমা-পূজা।

সে স্তর ধর্ম্মবিকাশের উচ্চতম স্তর। এখানে ব্রহ্মবস্তু বা পরম-তত্ত্ব জড়-ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ নহেন। এখানে পরমতত্ত্ব নিরাকার ও নির্গুণ শূন্য এবং কেবল ধ্যানসমাধিগ্রাহ্যও নহেন। এখানে ব্রহ্মবস্তু চিদৈশ্বর্য্যপূর্ণ

চিদ্বিভূতি-সমন্বিত, চিদাকার রস-মূর্ত্তি ভগবান। এই রাজ্যের কথাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কহিয়াছেন:—

ব্রহ্ম শব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান।
চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ সমান॥
তাঁহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার।
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া কহে নিরাকার॥

সত্য রূপকোপাসনা এই ভগবদুপাসনার অঙ্গ। কারণ—এই ভগবৎ-তত্ত্বের কোনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ না থাকিলেও নিত্যসিদ্ধ চিদানন্দ-ঘন রূপ আছে। জগতের রূপ মাত্রেই সেই নিত্যসিদ্ধ চিদানন্দ-ঘনরূপের নানাপ্রকারের প্রতিচ্ছায়া, অনুপ্রকাশ, প্রতিবিম্ব বা প্রতি-রূপ। সৃষ্টির মূলে, বিশ্বের অন্তরালে, স্রষ্টার নিজস্ব প্রকৃতি ও স্বরূপের মধ্যে, যদি এই দৃশ্যমান রূপরসাদির একটা নিত্য-প্রতিষ্ঠা না থাকে, তাহা হইলে সৃষ্টির কোনও অর্থ হয় না, এই দৃশ্যমান জগতের কোনও প্রকারের সত্যতা ও বস্তুত্ব বা reality থাকে না। এই সৃষ্টি ও এই জগৎ তখন মায়িক হইয়া দাঁড়ায়। আর এখানে মায়িক অর্থ শঙ্কর-বেদান্তের পরিভাষায় কেবল ব্যবহারিক মাত্র হয় না, কিন্তু নিতান্ত অলীক, প্রাতিভাষিকের প্রতিশব্দ হইয়া দাঁড়ায়। মায়াটা ব্রহ্মের একটা বিকট কুস্বপ্নে পরিণত হয়। আর ব্রহ্মাণ্ড যদি মিথ্যা হয়, তবে ব্রহ্মও মিথ্যা হইয়া যান। কারণ, ব্রহ্মাণ্ডের অনাদি আদিকারণ-রূপেই আমরা এই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকি। জন্মাদ্যস্য যতঃ—যাঁহা হইতে এই দৃশ্যমান বিশ্বের জন্ম-আদি হয়, বেদান্ত তাঁহাকেই ব্রহ্ম কহিয়াছেন। জন্মাদ্যস্য সূত্রে ব্রহ্মকে ব্রহ্মাণ্ডের কারণরূপেই প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। আর কার্য্য যদি মিথ্যা হয়, কারণও মিথ্যা হয়। মিথ্যা হইতে কেবল মিথ্যারই উৎপত্তি সম্ভব। এইটি দেখিয়াই জগৎকে যাঁহারা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে গিয়াছেন, তাঁহারা সত্যস্বরূপ ব্রহ্মেতে জগৎকারণত্ব আরোপ করেন নাই। তাঁহারা ব্রহ্মের মায়া

শক্তি নামে একটা বিরাট রহস্যের কল্পনা করিয়া এই অঘটনঘটন-পটীয়সী শক্তিকেই সৃষ্টির কারণরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ব্রহ্ম জগৎকারণ নহেন। তাঁহার সান্নিধ্যে মায়া বা প্রকৃতি জগৎ-প্রসব করেন। এইজন্য ব্রহ্মের সত্যতা জগৎকে সত্য করে না, জগতের অলীকত্ব ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না। ব্রহ্ম যে মায়া-শক্তির আড়ালে বসিয়া রহিয়াছেন। এদেশের অধিকাংশ লোক শাক্তবৈষ্ণব নির্ব্বিশেষে এই মায়াবাদের দ্বারা আচ্ছন্ন ও অভিভূত হইয়া আছেন।

বিশ্ব-রূপ ও ব্রহ্ম-স্বরূপ।

আধুনিক হিন্দু অদ্বৈতবাদীই হউন, আর দ্বৈতবাদী বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী বা অচিন্ত্যাভেদাভেদবাদীই হউন; মুক্তি সাধকই হউন, কিম্বা ভক্তি-সাধকই হউন;—সকলেই কোনও না কোনও আকারে এই মায়াবাদের দ্বারা অভিভূত হইয়া আছেন। এই জগৎটা যে সত্য—পরিণামী হইয়াও যে ইহা নিত্য, এই জ্ঞান অতি অল্পলোকেরই আছে। আর এই জ্ঞান নাই বলিয়া, অথবা জগৎটা অলীক, মিথ্যা, মায়িক এই ধারণাটা লোকের হাড়ে হাড়ে ঢুকিয়া আছে বলিয়া—এই জগতের রূপরসের মতন কোনও কিছু যে পরমতত্ত্বে বা ব্রহ্মতত্ত্বে আছে কি থাকিতে পারে, ইঁহারা কিছুতেই একথা বুঝিতে ও ধরিতে পারেন না। আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানীগণ চারিদিকের বাহ্যপূজা-পার্ব্বণের প্রাচুর্য্য দেখিয়া সাধারণ হিন্দুসমাজকে যতই সাকারবাদী বলিয়া নিন্দা করুন না কেন, প্রকৃতপক্ষে এদেশের কেউ সাকারবাদী নহে। প্রায় সকলেই ভিতরে ভিতরে, মর্ম্মে মর্ম্মে, জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে ঘোরতর নিরাকারবাদী। ক্বচিৎ কোনও সাধনশীল কিম্বা তত্ত্বদর্শী বৈষ্ণবে পরমতত্ত্বের চিদানন্দঘনরূপ স্বীকার করিলেও, অধিকাংশ বৈষ্ণব ও সকল শাক্তই ঘোর নিরাকারবাদী। আর যাঁহারা এই চিদানন্দঘন রসমূর্ত্তির কথা বলেন,—"শ্যামসুন্দর মদনমোহন" বলিয়া নৃত্য করেন বা মূর্চ্ছা যান, তাঁহাদেরও অনেকে এই চিদানন্দঘন মূর্ত্তিকে হয় ঐন্দ্রজালিক কিম্বা প্রত্যক্ষ জড়রূপসম্পন্ন বলিয়াই

মনে করেন। না হইলে ধাতু গালিয়া, পাথর খুদিয়া, কিম্বা মাটি ছানিয়া, নবনটবর মূর্ত্তি গড়িয়া ভগবানের সত্যরূপ-জ্ঞানে ইহারই ভজনা করিতেন না। ভগবানের চিদানন্দঘন নিত্য বিগ্রহের সন্ধান যে পাইয়াছে সে ইহা জানে, আমাদের চিন্তায় ও ভাবনায় যিনি শ্যামসুন্দর, ত্রিভঙ্গমুরলীধর, নর-বপু বেণুকর; প্রাচীন গ্রীশীয়দিগের চিন্তায় ও ভাবনায়, সাধনা ও ধর্ম্ম-কল্পনায় এবং ধর্ম্মকলায়—religious culture, religious imagination এবং religious art'এতে—তিনিই এ্যাপলো (Appolo); রোমক সাধনায় তিনিই জুপিটার। তিনিই বিশ্বের সর্ব্বত্র সর্ব্ব জীবের সর্ব্বেন্দ্রিয়াকর্ষক—শ্রীশ্রীকৃষ্ণ।

সাকারবাদ ও নিরাকারবাদ।

আর ভগবানের বা পরম-তত্ত্বের বা ব্রহ্মের বা আদিকারণের এই চিদানন্দঘনরূপের সন্ধান যে পাইয়াছে সে প্রচলিত অর্থে সাকারবাদীও নহে নিরাকারবাদীও নহে। ভগবানের কোনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ আছে, দৈর্ঘ্যপ্রস্থবেধাদি কোনও আয়তন আছে,—একথা সে বিশ্বাস করে না। কোনও প্রকারের অতিলৌকিক বা ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার দ্বারা ধাতুমৃত্তিকা বা প্রস্তরকে শোধন করিলে, বিশিষ্টভাবে তাহাতে ভগবানের চিদানন্দঘন-বিগ্রহের প্রকাশ হইতে পারে, একথাও সে বিশ্বাস করে না। সে-রূপ অতীন্দ্রিয়, চক্ষুগ্রাহ্য নহে। সে রস অতীন্দ্রিয়—রসনাগ্রাহ্য নহে। সে-স্পর্শ কোটীন্দুশীতল বটে,—কিন্তু জ্যোৎস্নার স্পর্শেরই ন্যায় অন্তরের অনুভূতিলভ্য বাহিরের ত্বকের দ্বারা তার অনুভব হয় না। ভগবৎ-রূপরসের যে সকল বর্ণনা আছে, তাহার দ্বারাই এগুলি যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, অন্তরতম অপরোক্ষ অনুভূতির দ্বারাই কেবল গ্রহণ করিতে হয়,—ইহা বুঝিতে পারা যায়। আর এইটি যে জানে ও বুঝে, সে সাকারবাদী নহে। আবার ভগবানের নিত্যসিদ্ধ, নিত্য-পূর্ণ চিদা-

নন্দঘনরূপ আছে, ইহা বিশ্বাস করে বলিয়াই, সে নিরাকারবাদীও নহে। তাহাকে চিদাকারবাদী বলিলেও বলা যায়, কিন্তু সাকার-বাদী বা নিরাকারবাদী বলা সম্ভব নয়। ধর্ম্মবিকাশের শ্রেষ্ঠতম স্তরেই ভগবানের এই চিদানন্দঘনরূপের প্রকাশ হইয়া থাকে। ধর্ম্মের নিম্নতম স্তরের আশ্রয় এবং অবলম্বন—এই সকল প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়। মধ্যম স্তরের অবলম্বন ব্যতিরেকী বুদ্ধি ও ভেদ-বিচার। ঊর্দ্ধতম ও শ্রেষ্ঠতম স্তরের অবলম্বন ধর্ম্ম-কল্পনা। প্রথম স্তরে উপাস্য ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ নিসর্গদেবতা বা স্মৃতিপ্রতিষ্ঠ পরলোকগত পিতৃলোকেরা। এই স্তরে আমাদের ধর্ম্ম বেদোক্ত দেব-পিতৃধারাকে ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। দ্বিতীয় স্তরে উপাস্য অতীন্দ্রিয় নিরাকার, নির্গুণ ও শুদ্ধ সত্তামাত্র-জ্ঞেয় ব্রহ্ম। তৃতীয় বা চরমস্তরে উপাস্য নিখিলরসামৃত-মূর্ত্তি ভগবান। প্রথম স্তরের সাধনে ইন্দ্রজালের প্রাধান্য বেশী। দ্বিতীয় স্তরের সাধনে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ; শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তি ও বিবেক-বৈরাগ্যাদি সাধন চতুষ্টয়ের দ্বারা সর্ব্বেন্দ্রিয়চেষ্টানিবৃত্তিরূপ ধ্যান ধারণা ও সমাধিরই প্রাধান্য বেশী। তৃতীয় স্তরে ইন্দ্রজালের স্থান নাই, কিন্তু যে অতীন্দ্রিয় সত্তায় বিশ্বাস সকলপ্রকারের ইন্দ্র-জালের প্রাণস্বরূপ, তাহা প্রত্যক্ষ অন্তরঙ্গ অনুভূতিতে ফুটিয়া উঠে; এই অতীন্দ্রিয়ের অনুভূতিকে প্রবল ও প্রস্ফুট করিবার জন্য এই স্তরেও শমদমাদি এবং বিবেক বৈরাগ্য প্রভৃতির অনুশীলন করিতে হয়। কিন্তু এই স্তরে ধ্যান ও সমাধির সাধ্য চিদানন্দমূর্ত্তি ভগবান—নির্গুণ ব্রহ্ম নহেন, সর্ব্বকল্যাণগুণাকর পুরুষোত্তম। এই স্তরের পথ ব্যতিরেকী নহে, কিন্তু অন্বয়ী। এই স্তরে সাধকের প্রধান অবলম্বন ধর্ম্মকল্পনা ও ধর্ম্মকলা —religious imagination ও religious art—এই স্তরেই ভগবদ্রূপের আভাসে যাবতীয় সত্য রূপকের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হয়। এইজন্য ধর্ম্মের নিকৃষ্ট অধিকারীর ত কথাই নাই, মধ্যম অধিকারীরও প্রকৃত রূপকোপাসনায় অধিকার নাই। শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী ও সাধকেরাই কেবল এই উপাসনার অধিকারী। ভগবৎ-

রূপের সাক্ষাৎকারলাভ যার হইয়াছে সে'ই কেবল সত্যভাবে ভগবদারাধনার্থে যথার্থ রূপক গড়িয়া তুলিতে পারে।

সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপকল্পনা

—এই সর্ব্বজন-উদ্ধৃত শাস্ত্রপ্রামাণ্যের সত্য অর্থ করিতে হইলে বলিতে হয়, সাধকেরা নিজেদের উপাসনার নিমিত্ত নিজেরাই উপাস্যদেবতার রূপ-কল্পনা করিয়া থাকেন; পরের নিমিত্ত করেন না। ফলতঃ এক ব্যক্তি ভগবানের যে রূপ-কল্পনা করিবেন, অপরের নিকটে তাহা সর্ব্বথা সত্য নাও হইতে পারে, না হওয়ারই কথা। সাধক নিজের অন্তরের অপরোক্ষ অনুভূতিতে যে চিন্ময় রসরূপের প্রত্যক্ষ করেন, তাহাকেই বাহিরের রূপরসাদির সন্নিবেশে চাক্ষুষ করিয়া তুলিয়া এসকল রূপের কল্পনা করেন। এ কল্পনা সত্যও হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে। যেখানে এই কল্পনা অন্তরের অপরোক্ষ অনুভূতির আশ্রয়ে গড়িয়া উঠে, সেখানেই ইহা সত্য হয়। যেখানে এই অপরোক্ষ অনুভূতির আশ্রয় থাকে না, সেখানে এই কল্পনার বস্তুতন্ত্রতাও থাকে না, তাহা মিথ্যা হইয়া যায়। এই মিথ্যা কল্পনাকে ইংরাজিতে ফ্যান্সী (fancy) বলিব, imagination—ইমাজিনেষণ কহিব না। ধর্ম্মজগতে বহুতর ফ্যান্সীর বা মিথ্যা-কল্পনার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ও নিত্যই হইতেছে, ইহা সত্য। এই সকল মিথ্যা কল্পনায় ধর্ম্মকে সতেজ, সজীব ও সরস করে না, নিস্তেজ, নির্জীব ও নিতান্ত বাহ্য আড়ম্বরপূর্ণ করিয়া তুলে। আমাদের দেশের প্রতিমা-পূজার মূলে যে সকল ক্ষেত্রেই এরূপ ফ্যান্সী বা মিথ্যা কল্পনা আছে বা ছিল, এমন কথা বলিতে পারি না। কোনও কোনও স্থলে এই সকল রূপকল্পনা সত্য—ফ্যান্সী নহে, কিন্তু ইমাজিনেষণ—বস্তুতন্ত্র ও প্রত্যক্ষ-প্রতিষ্ঠ। কিন্তু অনধিকারীর হাতে পড়িয়া এসকল সত্য কল্পনাও মিথ্যা হইয়া উঠিয়াছে। অনুভূতিবিচ্যুত, জ্ঞান-সম্পর্কহীন, শুদ্ধ কিম্বদন্তি ও শ্রুতি-স্মৃতির আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত পূজা-অর্চ্চনাতে দেশের লোকের বুদ্ধিকে মোহাচ্ছন্ন, ভাবকে অলীক, কর্ম্মকে প্রাণহীন করিয়া ফেলিয়াছে। এই

জন্যই এসকলের প্রতিবাদ করিতে হয়, ঘোরতর প্রতিবাদ করা প্রয়োজন। এই কারণেই এই সকল ক্রিয়াকলাপকে একবার ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দেওয়া আবশ্যক। ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, তন্ন তন্ন করিয়া এসকলের মূল পর্য্যন্ত বিশ্লেষণ করিয়া, ইহাদের মধ্যে কতটা সত্য ও কতটা সত্যাভাস, কতটা বস্তু ও কতটা কল্পনা, কতটা ইমাজিনেষণ ও বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠ আর কতটা ফ্যান্সী ও অজ্ঞতাপুষ্ট—ইহার বিচার না করিলে এসকল ক্রিয়াকর্ম্ম ও সাধনভজনাদি কখনই সত্যোপেত ও সজীব হইবে না। আর এইরূপে সত্যোপেত ও সজীব না হইলে, এসকলের দ্বারা কোনও শ্রেয়ঃলাভ হইবারও আশা নাই।

ভগবৎ-স্বরূপ ও রূপক।

পরমতত্ত্বের বা ভগবানের একটা অতীন্দ্রিয় সমাধিগ্রাহ্য অপরোক্ষ অনুভূতি প্রত্যক্ষ রূপ আছে, এই সিদ্ধান্তের উপরেই যাবতীয় সত্য রূপকের প্রতিষ্ঠা হয়। আর সমাধির শক্তি যাহারা লাভ করে নাই, তাহাদের পক্ষেও, ধর্ম্মের দ্বিতীয় বা মানসস্তরে উঠিয়া, সামান্য অন্তর্দৃষ্টি ও বস্তু-বিশ্লেষণ-ক্ষমতা জন্মিলেই এই প্রত্যক্ষ জগতের ও এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়াদির বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া এই প্রত্যয় বা বিশ্বাস লাভ করা সম্ভব। এই বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারাই আমরা ইহা বুঝিতে পারি যে এই বিশ্বের ক্রমাভিব্যক্তির অন্তরালে ইহার একটা নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ অবশ্যই আছে। এই বিশ্ব বর্ত্তমান আকারে ছিল না। জড়বিজ্ঞান পর্য্যন্ত এই বিশ্বের প্রাচীনতম অবস্থাকে বায়বীয় বা gaseous বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। এই ব্রহ্মাণ্ডে যখন এই বৈচিত্র্য একদিন ফুটিয়া উঠে নাই, এমন এক দিন ছিল; যখন এই নক্ষত্রখচিত অন্তরীক্ষ প্রকাশিত হয় নাই, সৌর জগতের সমাবেশ হয় নাই, পৃথিবীর প্রতিষ্ঠা হয় নাই, উদ্ভিদের উদ্ভব হয় নাই, প্রাণীমণ্ডলীর প্রজনন আরম্ভ হয় নাই,—এমন একদিন ছিল। তখন এই বিশাল ও বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডের কোনও আকার, কোনও চাক্ষুষ গঠন, কোনও প্রত্যক্ষ রূপ ফোটে নাই। সেই একত্ব হইতেই বর্ত্তমান বহুত্বের,

সেই একাকার হইতেই আজিকার অশেষ প্রকারের আকারবিশিষ্ট পদার্থের, সেই বায়ুমণ্ডল হইতে, সেই তেজঃপিণ্ড হইতে এই সকল গ্রহনক্ষত্রাদির, এই শ্যামলা পৃথিবীর, এই গণনাতীত প্রাণীপুঞ্জের ও ক্রমে এই মানবমণ্ডলীর প্রকাশ বা অভিব্যক্তি হইয়াছে। অরূপ হইতে রূপের প্রকাশ হয় নাই। আর জড়বিজ্ঞানই এই প্রশ্ন তোলে—ঐ একাকারত্ব হইতে এই অপূর্ব্ব বিচিত্রতার, ঐ তেজঃ-পিণ্ড হইতে এই শীতল শ্যামল বসুন্ধরার, এবং এই পৃথিবী-গর্ভে ও পৃথিবী-বক্ষে অগণ্যজাতীয় জীবের উদ্ভব ও অভিব্যক্তি হইল কেমনে? তখন এই বৈচিত্র্য, এই শৈত্য, এই জীবমণ্ডলী, এই জনসঙ্ঘ ছিল কোথায়? এই ক্রমবিকাশ বা ক্রমাভিব্যক্তির বিচার-আলোচনাতে এই সিদ্ধান্তেরই প্রতিষ্ঠা করে যে ঐ মূলের একাকারত্বের মধ্যেই এই আকার-বৈচিত্র্যের, ঐ নির্জ্জীবতার মধ্যেই এই জীবমণ্ডলীর অদৃশ্য বীজ লুকাইয়া ছিল। অরণীর মধ্যে যেমন অগ্নি অদৃশ্য থাকে, কিন্তু তার লিঙ্গনাশ হয় না, সেইরূপ ঐ একাকার বিশ্ববীজের গর্ভেই এই বিচিত্র বিশ্বের সকল রূপ, সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি নিহিত ছিল। প্রাণীগণের সমগ্র দেহটা যেমন তাহাদের মাতৃগর্ভের জীব-কোষাণুর মধ্যে লুকায়িত থাকে, অনাদি-আদি-কারণ-পয়োধিজলেতে ঐ একাকার অণ্ডের মধ্যে এই ব্রহ্মাণ্ডের সকল পদার্থ ও সকল রূপ বীজাকারে বিদ্যমান ছিল। বটবীজের ভিতরে বটবৃক্ষ যেমন নিত্য-সিদ্ধ হইয়া রহে, জরায়ু-গর্ভস্থ কোষাণুর বা cell'এর মধ্যে যেমন সাকুল্য জীব দেহ-জীবরূপ নিত্যসিদ্ধ অবস্থায় থাকে, সেইরূপ কারণ-জল-মগ্ন একাকার জগদ্বীজ বা জগদণ্ডের মধ্যে এই জগতের সমগ্র রূপটি নিত্যসিদ্ধ হইয়া ছিল এবং এখনও আছে। পরমতত্ত্বকে বা ব্রহ্মবস্তুকে বা ভগবানকে জগদ্বীজ বলিলে, তাঁহার স্বরূপের মধ্যে এই জগতের সমগ্র স্বরূপটি নিত্যসিদ্ধ বা etrnally realised হইয়া আছে, ইহা বুঝিতেই হইবে। আর কেবল সমষ্টি-ভাবেই যে এই বিশ্ব বীজাকারে স্বরূপতঃ ব্রহ্মের মধ্যে নিত্যসিদ্ধ হইয়া আছে, তাহাও

নহে; প্রত্যেক ব্যষ্টি পদার্থ এবং জগতের সমুদায় সম্বন্ধও সেইরূপ নিত্যসিদ্ধ হইয়া তাঁহার স্বরূপের মধ্যে রহিয়াছে। এটি না মানিলে, জগতের ক্রমাভিব্যক্তির কোনও বোধগম্য সত্য অর্থ হয় না। যাহা কোথাও প্রস্ফুট আছে, তাহাই একটা শৃঙ্খলার বা পারম্পর্য্যের বা অলঙ্ঘ্য নিয়মের অনুগত হইয়া তিলে তিলে ফুটিয়া উঠিতে পারে। এই জাগতিক ক্রমাভিব্যক্তির বা cosmic evolution'এর পশ্চাতে কোনও নিয়ম, কোনও অপরিহার্য্য ক্রম, কোনও অনন্ত বিধান বা eternal law যদি না থাকে, তবে এই অভিব্যক্তি সম্ভব হয় না, ইহাতে কোনও বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হইতেই পারে না। এ জগতের কোনও শৃঙ্খলা, নিয়ম, কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ বা কোনও পারম্পর্য্য সম্ভব হয় না। এক কথায় ক্রমবিকাশের বা অভিব্যক্তির কোনও অর্থ হয় না।

এই প্রত্যক্ষ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ প্রয়োগে প্রতিষ্ঠিত অভিব্যক্তি-তত্ত্বের আলোচনা করিয়াই আমরা জগৎ-কারণের মধ্যে এই জগতের একটা নিত্যসিদ্ধ স্বরূপের প্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হই। এখানে যাহা কিছু দেখিতেছি ও জানিতেছি, সেখানে সেই অনাদি আদি কারণের মধ্যে তাহা চিরদিন পরিপূর্ণ ও প্রস্ফুট হইয়াছিল ও রহিয়াছে। এখানে এই বহিরাকাশে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রত্যক্ষ হইতেছে ও তিলে তিলে অভিব্যক্ত হইতেছে, ব্রহ্মের সত্তার মধ্যে তাহা অনাদিসিদ্ধ হইয়া আছে। এখানে যেমন আমরা ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া উঠিতেছি, সেইখানে ভগবৎসত্তার মধ্যে সেইরূপ এই আমরাই অনাদিসিদ্ধ হইয়া আছি। যে জ্ঞান, যে ভাব, যে রস, যে সম্বন্ধ এখানে অণু অণু করিয়া গড়িয়া উঠিতেছে, তাঁর মধ্যে তৎসমুদায় অনাদিসিদ্ধ হইয়া আছে। এই সকল অনাদিসিদ্ধ নিত্য বিভূতি লইয়াই তিনি বিশ্বরূপ হইয়া আছেন। ভগবানের বিশ্বরূপ মিথ্যা জল্পনা নহে, অলীক কল্পনা নহে, কিন্তু সত্য বস্তু। কবি যে বিশ্বরূপের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা ঐ সত্যের আশ্রয়েই

সত্যোপেত হইয়াছে ; এই কবি-কল্পনা ইমাজিনেষণ, ফ্যান্সী নহে। এই সংসারে আমরা যাহাকে আদর্শ বলি, বাস্তবজীবনের অপূর্ণতার মধ্যেই প্রতিনিয়ত যার প্রেরণা প্রাপ্ত হইতেছি, সেখানে তাহা অনাদিসিদ্ধ, পূর্ণপ্রকট ও পূর্ণায়ত্ত হইয়া আছে। এখানকার পুরুষ দেখিয়াই পুরুষোত্তমের বা পূর্ণপুরুষধর্ম্মীর সন্ধান পাই-তেছি। সুতরাং ভগবানের নিত্যসিদ্ধ পৌরুষরূপ অবশ্যই আছে,—সেরূপ জড়রূপ নহে, উপচয়-অপচয়ধর্ম্মাধীন নহে, কিন্তু অতীন্দ্রিয় ও নিত্য। ভগবানের ঐ পৌরুষরূপই ত আমাদের অন্তরের পুরুষা-দর্শের আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠা। এখানে নরকে দেখিয়াই, এই নরের মধ্যে যাহা তিলে তিলে ফুটিতেছে ইহা লক্ষ্য করিয়া,—আমাদের অন্তরেতে যে নরত্বের আদর্শ ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া উঠিতেছে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া, এই অভিব্যক্তি ধারার মূলে একটি নিত্যসিদ্ধ নরোত্তমরূপ আছে; ইহা বুঝিতেছি। না দেখিয়াও যেমন ব্রহ্মতত্ত্বে বা ঈশ্বরতত্ত্বে বা ভগ-বানেতে বিশ্বাস করি, বিশ্বাস করিতে বাধ্য হই ; সেইরূপ না দেখিয়াও এই নরোত্তম—এই নারায়ণরূপে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হই। এই পুরু-ষোত্তম ও নরোত্তমরূপের মধ্যে পুরুষের পুরুষত্ব, নরের নরত্ব সমুদায় শ্রেষ্ঠতম পুরুষধর্ম্ম ও নরধর্ম্ম অনাদিসিদ্ধ হইয়া আছে। এই প্রত্যক্ষ পৌরুষ ও নররূপের মধ্যে যাহা ফুটে ফুটে কিন্তু ফুটিয়া উঠিতে পারিতেছে না, যাহা আপনাকে প্রকাশিত করিবার জন্য যেন নিয়ত আকুলি-বিকুলি করিতেছে কিন্তু কিছুতেই অনন্ত বলিয়া দেশকালের সীমার মধ্যে, অব্যক্ত বলিয়া এই লৌকিক অভিব্যক্তি ধারাতে আপনাকে নিঃশেষে প্রকাশিত করিতে পারিতেছে না, অপ্রত্যক্ষ ভগবানের মধ্যে সেই নিত্যসিদ্ধ পৌরুষ ও নররূপের প্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হই। এই জন্যই পরব্রহ্মের নিগূঢ়তম রহস্য বা supreme mystery যে এই নিত্যসিদ্ধ অতীন্দ্রিয় "মনুষ্য-লিঙ্গ" বা নরবপু বা নররূপ, একথা শুনিয়া বুদ্ধি প্রতিবাদ করিতে পারে না, প্রাণ জুড়াইয়া যায়। এই জগতের সকল সম্বন্ধই

এইরূপে সেখানে, অনাদি-আদি-কারণেতে, তাঁর স্বরূপের মধ্যে, তাঁর স্বরূপের অন্তঃপুরে নিত্যসিদ্ধ বা অনাদিসিদ্ধ বা eternally realised হইয়া রহিয়াছে। মাতৃত্ব, পিতৃত্ব, সখীত্ব, ভ্রাতৃত্ব, পতিত্ব, পত্নীত্ব, পুত্রত্ব, কন্যাত্ব, দাসত্ব প্রভৃতি এখানে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ও পঙ্গু কল্পনার নিকটে—ভাবমাত্র; কিন্তু মাতা, পিতা, সখা প্রভৃতি, কেবল ভাব নহেন। ইঁহারা যে বস্তু! আর ইঁহারা যে আদর্শটিকে ফুটাইয়া তুলিতেছেন, যে আদর্শটি কাহারও মধ্যে বেশী, কাহারও মধ্যে কম ফুটিয়াছে ও ফুটিতেছে, তাহা যদি আপনার স্বরূপে, সাকার ও মূর্ত্তিমান হইয়া, কোথাও অনাদিসিদ্ধ ও নিত্যপ্রস্ফুট না থাকে, তবে এই আদর্শের কোনও সত্য ও অর্থ থাকে না। আর মাতৃত্ব একটা ভাববাচ্য পদ হইলেও, অবস্তু নহে। মাতৃত্ব একটা প্রত্যক্ষ বস্তু। মাতৃত্বের একটা আকার—একটা রূপও আছে। অপরিচিত স্ত্রীলোকের দেহেও এই মাতৃরূপ দেখিয়া—তাঁহার গুণ, ভাব, স্বভাব কিছু না জানিয়াই, মা বলিয়া প্রণাম করি। এইরূপ পিতৃত্ব, সখীত্ব, প্রভৃতি আদর্শেরও এক একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, ইহা প্রত্যক্ষ কথা। এই সকল রূপ অনাদিসিদ্ধ, নিত্য। জগতের পিতা মাতা প্রভৃতিতে ঐ অনাদিসিদ্ধ রূপই ফুটিয়া উঠে। কেবল মানুষে নহে, সমগ্র জীবমণ্ডলীর মধ্যে এই বিশ্বজনীন, এই অনাদিসিদ্ধ রস-রূপসকল প্রতিফলিত হয়। এ যে বিশ্বপিতৃত্বের, বিশ্বমাতৃত্বের, বিশ্বসখীত্বের, বিশ্বমাধুর্য্যের, বিশ্বদাসত্বের, বিশ্ব-রসের বিশিষ্ট বিশিষ্ট অনাদিসিদ্ধ রসমূর্ত্তি। এই সকল মূর্ত্তি লইয়াই ভগবান চিদাকারসম্পন্ন হইয়া আছেন। তাঁর নিখিলরসামৃতমূর্ত্তিতে এই সমুদায় রস জীবন্ত, প্রস্ফুট, অনাদিসিদ্ধ, পূর্ণাভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। এইজন্যই স্বরূপতঃ তিনি নিরাকার নহেন, কিন্তু চিদাকার। ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা সুকৃতিবলে ভগবানের এই চিদ্রসমূর্ত্তির, এই চিদানন্দঘনরূপের প্রত্যক্ষলাভ করিয়াছেন। এই প্রত্যক্ষলাভ যাঁহাদের হইয়াছে, গণেশজননী বা দশভুজা তাঁহাদের চক্ষে কবিকল্পনা নহে, তাঁহারা এ সকল

প্রতিমাপূজাকে নিম্ন অধিকারীর জন্য বিহিত বলিবেন না। তাঁহারা এই পূজাকেই যে সত্য স্বরূপোপাসনা বলিয়া জানেন। এই পূজা প্রতিমার পূজাই নয়। ইহা রূপকের সাহায্যে রূপের পূজা। মনুষ্য-জননীর মধ্যে নিয়ত যে মাতৃরূপ প্রত্যক্ষ হয়, এই পরিণামী রূপের আশ্রয়ে তাহার অনাদিসিদ্ধ স্বরূপের ধ্যানই সত্য মাতৃ-পূজা। এইটি যে বুঝে, এইটি যে জানে, ইহার আভাস যে পাইয়াছে, সে'ই সত্যভাবে এই রূপের ভিতরই মায়ের পূজা করিতে পারে। কিন্তু যার এ অধিকার জন্মায় নাই, সে মাটিই পূজা করিবে, সে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া করিবে, সে এ পথে অনধিকার চর্চ্চা করিতে যাইয়া, অন্ধতম তমেতে প্রবেশ করিবে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

দুর্গা-স্তোত্র

[৺রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-বিরচিত *]

নমো মহাশক্তি, দেবি! জগৎ-জীবনী।
বীর্য্য, প্রেম, মৃত্যু, মায়া, সকলি আপনি॥
যে হোক তোমার নাম, তুমি মাগো তারা।
কালের জনমপূর্ব্বে ছিলে সারাৎসারা॥
বিনতমস্তকে দুর্গে! প্রণতি চরণে।
এসো, এসো, এসো, মাগো ভুবনভবনে॥
নমো! দশভুজা দেবি! সিংহে সমাসীন;
দেশ কাল পাত্র তব আজ্ঞার অধীন॥
তুমি সকলের বীজ, তব মহোদরে।
অবিরত জাত হ'য়ে পুনঃ তথা মরে॥
তিনে এক, একে তিন, অচিন্ত্য বিশেষ,—
তোমাতেই জাত ব্রহ্মা, উপেন্দ্র, মহেশ,—

* এই অপ্রকাশিত কবিতাটি শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্তের নিকট হইতে শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদারের মারফতে প্রাপ্ত।—নাঃ সং।

তুমি আদ্য সনাতন, দেবি! ভয়ঙ্করী।
তুমি সকলের সৃষ্টি আর লয়করী॥
নীলাকাশে বিভাসিত তারা-রত্নহার।
কুসুম-মাধুরী চারু ঘেরি চারিধার॥
ঘোর ঝঞ্ঝাবাত, আর বিদ্যুৎবল্লরী।
প্রকাশিছে তব শক্তি, লাবণ্যলহরী।
উর মহাদেবি! আজি মেঘাবৃতাসন।
হিমাদ্রি অনন্তহিমে আছে উন্নয়ন॥
যেখানেতে তোমার যুগল রাঙ্গা পায়।
মুগ্ধ হ'য়ে মহাকাল সুখে নিদ্রা যায়॥
যেখানে নক্ষত্রনেত্র বিহঙ্গ-উপরি।
দেবসেনাপতি দেব, সুযোগ্য প্রহরী॥
প্রশান্ত বেশেতে তথা দেবগণপতি।
বিদ্যারে করেন ধ্যান প্রেমানন্দমতি॥
কমলা কমল-আভা, হসিতা বিমল।
উষা যথা চিত্রকরে আকাশমণ্ডল॥
কোলে ল'য়ে স্বর্ণবর্ণ, ধর ধান্যধন।
মাতা বসুধার করে দেবনিকেতন॥
শ্বেত-সরোজাভা, সরস্বতী বীণাপাণি।
মোহিনীর শ্রেণী, কলাকলাপের রাণী॥
তুহিনের মাঝে জাগাইল দিব্যতান।
প্রজ্বলিত আনন্দ-অনলে যেই স্থান॥
এসো, এসো, মহাশক্তি! দেবি! প্রভান্বিতা।
হইয়ে সৌন্দর্য্যে আর মাধুর্য্যে মণ্ডিতা॥
তুমি এক আশা দুর্গে! দুর্গতিসময়।
তুমি গো আশ্রয়মাত্র, সহায় নিশ্চয়॥
শান্তি আর সুখে ধন্য কর এই দেশ।
এবৎসর যেন নাহি হয় দুঃখলেশ॥
সুতসুতা সহ এস, কৈলাসবাসিনী।
দুর্গে! দুর্গে! ওমা দুর্গে! দুর্গতিনাশিনী॥

নারায়ণ

মাসিক পত্র।

সম্পাদক

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ।

দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা

কার্ত্তিক, ১৩২৩ সাল।

সূচী।

নারায়ণ

২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা] [কার্ত্তিক, ১৩২৩ সাল

অশোকের ধর্ম্মলিপি

[১]

মৌর্য্য নরপতি অশোক তাঁহার সাঁইত্রিশ বর্ষব্যাপী রাজত্বকালের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সাঁইত্রিশটি লিপি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে আবার হায়দারাবাদ রাজ্যে আর একটি নূতন অশোক-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই লিপিগুলি ইতিহাসে কখন অশোক-লিপি, কখন বা অশোক-অনুশাসন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণ এই লিপিসকলকে কখন Asoka Inscription কখন বা Asoka Edicts নামে অভিহিত করিয়াছেন। বঙ্গভাষায় তাহার অনুবাদ হইয়াছে অশোক-লিপি বা অশোক-অনুশাসন; কেহবা তাহাকে শুদ্ধ করিয়া বলিয়া থাকেন অনুশাসন লিপি। অনুশাসন অর্থে সাধারণতঃ রাজার আদেশ বুঝায়। কিন্তু মহারাজ অশোক সে অর্থে উহা কোথাও ব্যবহার করেন নাই। অনুশাসন লিপিগুলির ভাব ও ভাষা মনোযোগ সহকারে আলোচনা করিলে এই সত্য আরও পরিস্ফুট হইবে। মূলে আছে ধর্ম্মলিপি— "ইয়ং ধংমলিপি দেবানং প্রিয়েন প্রিয়দসিনা রাঞা লেখাপিতা"। উৎকীর্ণ অনুশাসন মধ্যে সর্ব্বত্রই ধর্ম্মলিপি পদ ব্যবহৃত হইয়াছে।

অনেকেই এই ধর্ম্মলিপিকে অনুশাসন বা আদেশ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই প্রকার ধারণার জন্যই অশোক-লিপির অর্থের পার্থক্য আমরা দেখিয়া থাকি।

ইতিহাস-পাঠকের বুঝা উচিত যে অশোক কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ লেখরাজি আদেশমুলক নহে, উহা উপদেশমূলক। এই ধর্ম্মলিপি মধ্যে কোন প্রকার রাজ-আদেশের কঠোরতা নাই, উহার মধ্যে আছে বিশ্বের প্রতি মৈত্রী ভাবে অনুপ্রাণিত মহা-প্রতাপান্বিত এক সম্রাটের উদার কোমল উপদেশবাণী। উহাতে আছে মাতাপিতার প্রতি ভক্তি, গুরুজনে শ্রদ্ধা, আত্মীয় সুহৃদের উপকার, পরোপকারিতা, জীবে দয়া, অন্যের বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা, বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি সম্মান, সত্যের প্রতি সমাদর। ধর্ম্মলিপি পাঠে প্রতীয়মান হয় যে প্রাণী-জগতের হিতসাধনই অশোকের মুলমন্ত্র ছিল। লোকের যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য ও প্রকৃত কল্যাণপ্রদ, তাহাই মহারাজ অশোক সহজ ও সরল ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ধৌলি ও জৌগড় অনুশাসন মধ্যে রাজনীতির উচ্চ আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন; সকল মনুষ্যই আমার পুত্র, এই মহাবাক্য পর্ব্বতগাত্রে উৎকীর্ণ করিয়াছেন। রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি এই উভয় আদর্শের সামঞ্জস্য পূর্ব্বক এক ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। অশোকের পূর্ব্বে যদিও মিশর, বাবিলন, আসিরীয় ও পারস্য প্রভৃতি দেশে অনুশাসন উৎকীর্ণ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল এবং তাঁহার পরেও অনেক নরপতি এবম্প্রকার অনুশাসন উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মানবের কল্যাণার্থে প্রস্তরগাত্রে নীতিতত্বের এরূপ উচ্চ আদর্শ অমর তুলিকায় আর কেহ কথনও উৎকীর্ণ করেন নাই। এই সব অনুশাসনলিপি যদি আদেশমূলক হইত, তাহা হইলে ইহার লঙ্ঘনে কোন না কোন প্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা থাকিত। কি আধুনিক, কি প্রাচীন নৃপতিবর্গের আদেশের মধ্যে আদেশ লঙ্ঘন করিলেই দণ্ডের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অশোক কর্ত্তৃক

উৎকীর্ণ অনুশাসন মধ্যে কোথাও দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা নাই। ধর্ম্ম-লিপিগুলি প্রধানতঃ প্রজাবৃন্দের উপদেশরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। উহা-দিগকে সাধারণতঃ sermons on rock বলিলেই উহাদের অর্থ অধিকতর পরিস্ফুট হয়।

ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের যত প্রকার পন্থা নির্দ্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে (১) বিদেশীয় ঐতিহাসিক ও ভ্রমণকারিগণের লিখিত ইতি-বৃত্ত, (২) প্রস্তরগাত্রে ধাতুফলকে বা অন্য কোন আধারে খোদিত লেখরাজি ও মুদ্রালিপি, (৩) গাথা, কাহিনী ও আখ্যায়িকা এবং সমসাময়িক সাহিত্যই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই সকলের মধ্যে আবার অনুশাসনলিপি ও মুদ্রালিপিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হয়। কারণ অনুশাসনাবলী ও মুদ্রালিপি অনুমানের প্রতীক্ষা না করিয়াই সহজ ও সরল ভাবে ঐতিহাসিক ঘটনানিচয় নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ইহা হইতে যে কেবল কতকগুলি ঘটনাপরম্পরা অবগত হওয়া যায় তাহা নহে, উহা হইতে অতীত যুগের ভাষা, লিখন-প্রণালী, লিপিবিদ্যার ক্রমোন্নতি, সমাজ, ধর্ম্ম, রাজকীয় রীতিপদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়েও অসংখ্য জ্ঞানলাভ করা যায়। এই নিমিত্তই অশোক কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ লেখরাজি ঐতিহাসিকের নিকট এত মূল্যবান। প্রাচীন মেম্‌ফিস্ নগরের ধর্ম্মযাজকগণ কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ রোসেটালিপি * যেমন

* খ্রীঃ পূঃ ১৯৮ অব্দে মিশরের মেম্‌ফিস্ (Memphis) নগরের মিশ-রীয় পুরোহিতগণ তাঁহাদিগের রাজা Ptolemy Epiphanesর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনপূর্ব্বক একটি লিপি উৎকীর্ণ করেন ও সেই লিপি প্রস্তরখণ্ডে উৎকীর্ণ হইয়া বিভিন্ন মন্দিরমধ্যে এক সময়ে রক্ষিত ছিল। অবশেষে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রোসেটা নামক স্থানে একটি প্রস্তরখণ্ডে খোদিত এই লিপি সর্ব্ব প্রথম আবিষ্কৃত হয়। এই লিপিটী দৈর্ঘ্যে ৩'-২", প্রস্থে ২'-৫"। ইহাতে তিনটি বিভিন্ন অক্ষরে খোদিত লিপি বিদ্যমান আছে। ইহাতে মিশরের প্রাচীন hieroglyphics বা বস্তু বা চিত্রলিপি, দ্বিতীয় demotic অর্থাৎ তৎকালে সাধারণ লোকমধ্যে যে অক্ষরের প্রচলন ছিল সেই অক্ষরে, তৃতীয় গ্রীক

মিশরীয় প্রত্নতত্ত্বের দ্বার উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক জ্ঞান-রাজ্যের এক রহস্য-ময় যবনিকার উত্তোলন করিয়াছে, সেইরূপ ভারতের এই লেখরাজি এদেশের ইতিহাস উদ্ধারকল্পে এক নব যুগের সূচনা করিয়াছে। গত ৮০ বৎসর ধরিয়া এদেশের ইতিহাস গঠনের যে একটা ধারা-বাহিক চেষ্টা চলিতেছে, অশোকলিপির পাঠোদ্ধারই তাহার একমাত্র কারণ ও উক্ত লেখরাজিই সেই ইতিহাস সংগঠনের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ উপা-দান। আমাদের আলোচ্য বিষয়ে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, যে যে স্থানে এই লিপি উৎকীর্ণ আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান আবশ্যক।

অশোক কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ লেখরাজি সাধারণতঃ নিম্নলিখিত নামে অভিহিত হইয়া থাকে—প্রথম শিলা বা গিরিলিপি, দ্বিতীয় কলিঙ্গ-লিপি; প্রাচীন কলিঙ্গরাজ্যে আবিষ্কৃত বলিয়া ইহা কলিঙ্গলিপি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই লিপি প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। যে স্থানে উক্ত অনুশাসন উৎকীর্ণ হইয়াছে, সেই স্থানের নাম অনু-সারে একটিকে বলা হয় ধৌলিলিপি, দ্বিতীয়টি জৌগড়লিপি। ইহা-দের মধ্যেও ধৌলিতে দুইটি এবং জৌগড়ে দুইটি মোট চারিটি লিপি আছে। স্তম্ভলিপি—এগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত স্তম্ভগাত্রে খোদিত বলিয়া স্তম্ভলিপি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ভাব্‌ড়া লিপি, সিদ্ধপুর, ব্রহ্মগিরি, সাসেরাম, রূপনাথ, বৈরাট, রুম্মিংদি, বা রুম্মিন্ দেবী, নিগ্লিব, দেবী বা Oueen's Edict, সারনাথ, কৌশাম্বী এলাহাবাদ, সাঞ্চী ও বরাবর গুহালিপি, তৎপরে নব প্রকাশিত মাস্কি অনুশাসন। যে যে স্থানে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, সেই সেই স্থানের নাম অনুসারে এই লিপিগুলি ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

অক্ষর। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে উহার পাঠ উদ্ধার হয়। মিশরের প্রাচীন hieroglyphics বা চিত্রলিপির ইহাই প্রথম পাঠোদ্ধার। ইহা হইতেই মিশরের অতি প্রাচীন ইতিহাসকে লোকচক্ষুর সম্মুখে আনয়নের চেষ্টা চলিতেছে। এই রোসেটা প্রস্তরখানি এক্ষণে ব্রিটীস মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।

এই অনুশাসনাবলী পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে—প্রথম শিলালিপি—চৌদ্দটি শিলালিপি ও চারিটি কলিঙ্গলিপি এই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত; দ্বিতীয় স্তম্ভলিপি—ইহার সংখ্যা সাতটি; তৃতীয় খণ্ড বা ক্ষুদ্র শিলালিপি—যথা ভাব্‌ড়ালিপি, সিদ্ধপুর, ব্রহ্মগিরি, সাসে-রাম, রূপনাথ, বৈরাট ও মাস্কি এই শ্রেণীভুক্ত; চতুর্থ ক্ষুদ্র বা অন্যান্য স্তম্ভলিপি—যেমন রুম্মিন দেবী, নিগ্লিভলিপি, সারনাথ-স্তম্ভলিপি, কৌশাম্বী বা প্রয়াগলিপি ও সাঞ্চীলিপি। পঞ্চম গুহালিপি—বরাবর গুহালিপি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

আবিষ্কৃত শিলালিপির সংখ্যা চতুর্দ্দশটি। অশোকের রাজত্বের ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ বৎসরে এই গিরিলিপিগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। অনুশাসনে অশোক তাঁহার অভিষেক বৎসর হইতে রাজত্বকাল গণনা করিয়াছেন। অশোকের অভিষেককাল খ্রীঃ পূঃ ২৬৯ বা খ্রীঃ পূঃ ২৬৮ বলিয়া একরূপ নির্ণীত হইয়াছে। সুতরাং খ্রীঃ পূঃ ২৫৫ বা খ্রীঃ পূঃ ২৫৬ অব্দ মধ্যে অশোকের শিলালিপিগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। মৌর্য্যসাম্রাজ্যের সুদূর প্রান্তস্থিত ছয়টি বিভিন্ন স্থানে এই চৌদ্দটি অনুশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্তর্গত পেশোয়ারের চল্লিশ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে ইসুফজাই সবডিভিসন মধ্যে সাহাবাজগড়ি নামক স্থানে চৌদ্দটি অনুশাসন খোদিত আছে। চৌদ্দটি অনুশাসন মধ্যে তেরটি একত্রে একটি গিরিগাত্রে উৎক দেখিতে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র দ্বাদশসংখ্যক অনুশাসন ইংরা ত যাহাকে Toleration Edict বলে—কারণ এই অনুশাসন ধ্যে অশোকের অসাম্প্রদায়িকতা, অর্থাৎ সকল সম্প্রদায়কে শ্রদ্ধার চক্ষে নিরীক্ষণ করা কর্ত্তব্য, এই উপদেশ অতি উজ্জ্বল ভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই Toleration Edict বা অসাম্প্রদায়িক শিলালিপিখানি এই স্থানের অনতিদূরে আর একটি গিরিগাত্রে উৎকীর্ণ আছে, স্যার হেরল্ড ডিন্ ইহা আবিষ্কার করেন। এই সাহাবাজগড়ি অনুশাসন প্রথমে এই স্থান হইতে প্রায় এক

ক্রোশ দূরস্থিত কপূরদগিরি নামক স্থানের নাম হইতে কপূ্রদগিরি-অনুশাসন নামে অভিহিত হইত। এক্ষণে সে নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া সাহাবাজগড়ি নামে ইতিহাসমধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে হাজ্রা জেলায় মানসহর নামক স্থানে একটি গিরিগাত্রে অশোকের গিরিলিপিগুলি খোদিত আছে। সাহাবাজগড়ির ন্যায় তেরটি গিরিলিপি একত্রে একস্থানে খোদিত দেখিতে পাওয়া যায় ও দ্বাদশসংখ্যক গিরিলিপি অর্থাৎ Toleration Edict খানি স্বতন্ত্র একটি পর্ব্বতগাত্রে খোদিত আছে। এই স্থান হইতে লোকালয় বা রাজপথ অনেক দূরে অবস্থিত। ডাক্তার ষ্টাইন বলেন যে ভৈরবী বা বট্টারিকা অর্থাৎ দেবী বা দুর্গাতীর্থে যাইবার নিমিত্ত তথায় একটি প্রাচীন রাস্তা ছিল, সেই রাস্তা দিয়া যাত্রীরা যাতায়াত করিত; সেই যাত্রীদিগকে উদ্দেশ করিয়া এই সকল বিভিন্ন অনুশাসন খোদিত হইয়াছিল, ইহাই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। সাহাবাজগড়ি বা মানসের অনুশাসন-গুলি প্রাচীন খরোষ্ঠী অক্ষরে খোদিত। এই খরোষ্ঠী অক্ষরের সহিত আরামাইক বা সিরিয়া দেশের অক্ষরের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। খরোষ্ঠী অক্ষর বাম হইতে দক্ষিণ দিকে লিখিত হয়। বোধ হয় খ্রীঃ পূঃ ৫০০ অব্দে হিস্তস্পিস্ পুত্র দারায়বুস কর্ত্তৃক সিন্ধুপ্রদেশ বিজিত হইলে পারস্যদেশীয় রাজকর্ম্মচারিগণ ভারতের সীমান্ত প্রদেশে এই অক্ষরের প্রচলন করেন। এই দুইটি ব্যতীত অবশিষ্ট অনুশাসনসকল ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে দেরাদুন জেলার অন্তর্গত কাল্সী গ্রামেও চৌদ্দটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মুসোরীর পঞ্চদশ মাইল পশ্চিমে, চক্রতা কাণ্টনমেণ্ট হইতে সাহারাণপুরের পথে একটি পর্ব্বতগাত্রে এই অনুশাসনসকল উৎকীর্ণ আছে, ইহারই অনতি-দূরে যমুনা ও টন নদীর সঙ্গমস্থল। প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র বলিয়া বোধ হয়, এই স্থানে গিরিলিপিগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। অনুশাসন-

উৎকীর্ণ-গিরিগাত্রে একটি গজমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। উহার তলদেশে 'গজতম' অক্ষর কয়টি খোদিত।

কাটিয়াবাড় বা প্রাচীন সৌরাষ্ট্রের রাজধানী জুনাগড় নগরের নিকটবর্ত্তী গির্ণার নামক গিরিগাত্রে চৌদ্দটি অনুশাসনলিপি উৎকীর্ণ আছে। এই স্থান জৈনদিগের একটি প্রধান তীর্থভূমি। এই গির্ণার পাহাড়ের পূর্ব্বদিকে অনুশাসনসকল খোদিত ও পশ্চিমে অমরকোট পাহাড়। এতদ্ব্যতীত বোম্বাই প্রদেশে থানা জেলার অন্তর্গত সোপারাগ্রামেও অষ্টম গিরিলিপির কিয়দংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। শিলালিপির এই ভগ্নাবশেষ হইতে অনুমান করা যায় যে, এস্থানেও হয় ত এক সময়ে সমগ্র চৌদ্দটি গিরিলিপি বিদ্যমান ছিল।

কলিঙ্গ প্রদেশের অন্তর্গত বঙ্গোপসাগরকূলে চতুর্দ্দশ গিরিলিপির দুইটি বিভিন্ন পাঠ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথমটি পুরী জেলার অন্তর্গত বিখ্যাত ভুবনেশ্বর নামক হিন্দুতীর্থের তিন ক্রোশ দক্ষিণে ধৌলি নামক গ্রামের নিকটবর্ত্তী একটি প্রস্তরগাত্রে খোদিত আছে। দ্বিতীয় গঞ্জাম জেলার প্রাচীন জৌগড় নামক স্থানে অবস্থিত। এই উভয় স্থানেই একাদশ, দ্বাদশ, এবং ত্রয়োদশ লিপির পরিবর্ত্তে দুইটি করিয়া নূতন অনুশাসন খোদিত আছে। ইহার মধ্যে একটিকে বলে Provincial বা প্রাদেশিক ও অপরটিকে Borderers বা সীমান্তলিপি বলা হয়। পর্ব্বতগাত্রে যে স্থানে ধৌলিলিপি উৎকীর্ণ আছে, তাহারই উপরিভাগে একটি গজমূর্ত্তির সম্মুখভাগ অঙ্কিত দেখা যায়। ধৌলিলিপি তোসলির এবং জৌগড়লিপি সোমাপার মাহামাত্র ও শাসনকর্ত্তাদিগকে উদ্দেশ করিয়া উৎকীর্ণ করা হইয়াছিল। (১) দেবানং পিযস বচনেন তোসলিয়ম্ মহামাত নগল বিয়োহালক বতবিয়স (ধৌলি), (২) দেবানং পিযে হেবং আহা, সমাপায়ং মহামাতা নগল বিয়োহালক বে বতরিয়া। (জৌগড়)।

ধৌলি এবং জৌগড়ের প্রথম লিপিদ্বয় Provincial বা প্রাদেশিক এবং দ্বিতীয় লিপিদ্বয় Borderers Edict বা সীমান্তলিপি

নামে অভিহিত হয়। যে স্থলে নগরব্যবহারকদিগকে সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহাই Provincial এবং যে লিপিমধ্যে প্রত্যন্ত বাসিগণ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য বিবৃত করা হইয়াছে, তাহাই Borderers বা সীমান্তলিপি। উপরি উক্ত বিবরণ হইতে দেখা গেল যে চতুর্দ্দশ গিরিলিপি নিম্নলিখিত ছয়টি স্থানে উৎকীর্ণ আছে—যথা সাহাবাজ-গড়ি, মানসেরা, কালসী, গির্ণার, ধৌলি ও জৌগড়। এই স্থানগুলি অশোক সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন সীমান্তভাগে অবস্থিত।

অশোকের খণ্ড বা ক্ষুদ্র গিরিলিপির সংখ্যা ছয়টি। একই লিপি বিভিন্ন স্থানে উৎকীর্ণ। তন্মধ্যে তিনটি দক্ষিণ প্রদেশে ও তিনটি উত্তর ভারতে অবস্থিত। দক্ষিণে মহীশুর প্রদেশে চিত্তলগড় জেলার অন্তর্গত সিদ্ধপুর, জটিঙ্গরামেশ্বর এবং ব্রহ্মগিরি এই তিনটি স্থানে উক্ত অনুশাসন উৎকীর্ণ হইয়াছে। উত্তর ভারতে বৈরাট, সাসেরাম, ও রূপনাথ এই তিনটি স্থানে উহা খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুর রাজ্যে বৈরাট, দক্ষিণ বিহারে সাহাবাদ জেলায় সাসেরাম এবং জব্বলপুর জেলায় রূপনাথ। বৈরাটের নিকটবর্ত্তী ভাব্ড়া নামক স্থান; ঐ স্থানে কোন এক গিরিচূড়ায় একটি বৌদ্ধবিহারভূমিতে এক লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহা ভাব্ড়া লিপি নামে পরিচিত। ভিক্ষুসংঘকে উদ্দেশ করিয়া এই লিপিটি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। গয়ার আট ক্রোশ উত্তরে ফল্গুনদীর পশ্চিম পারে বরাবর শৈলশ্রেণী অবস্থিত; এই শৈলশ্রেণীমধ্যে কতকগুলি গুহা নির্ম্মিত; সেই গুহামধ্যেই উৎকীর্ণ লিপি দেখিতে পাওয়া যায়।

চীন পরিব্রাজক হিউএন্-ৎসাঙ্ (য়ুআন-চুআঙ) অশোক-নির্ম্মিত ষোলটি স্তম্ভের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। ষোলটির মধ্যে এ পর্য্যন্ত দশটিমাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রত্যেক স্তম্ভ একটি সমগ্র প্রস্তর হইতে নির্ম্মিত, ও নানাবিধ কারুকার্য্য-শোভিত। নিম্নে তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। (১) লৌড়িয়া নন্দনগড়স্তম্ভ—চম্পারণ জেলার অন্তর্গত বেথিয়া হইতে নেপাল যাইবার পথে লৌড়িয়াগ্রাম,

ইহা মথিয়া হইতে তিন মাইল উত্তরে। এই স্তম্ভটি ৪০ ফিট উচ্চ। শিরোদেশের পীট্ মণ্ডলাকারে নির্ম্মিত এবং নানাবিধ কারুকার্য্যে বিভূষিত,—কতকগুলি রাজহংস তাহাদের আহার চঞ্চুপুটে তুলিতেছে, এই খোদিত চিত্রটি এদেশের প্রাচীন শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিতেছে। এই স্তম্ভের মস্তকোপরি একটি সিংহমূর্ত্তি পূর্ব্বাস্য হইয়া স্থাপিত আছে। আরংজেবের সময়ে এক গোলার আঘাতে এই সিংহমূর্ত্তির কিয়দংশ নষ্ট হইয়াছে। সাতটির মধ্যে ছয়টি স্তম্ভলিপি এই স্থানে খোদিত আছে; বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত মঁন্স্যুর সেনার ইহাকে মথিয়লিপি নামে অভিহিত করিয়াছেন।

প্রয়াগস্তম্ভ—ইহার মণ্ডলাকার স্তম্ভদেশ সদ্যস্ফুট পদ্মপুষ্প ও লতাদির চিত্রে বিমণ্ডিত হইয়া দর্শকের বিস্ময়োৎপাদন করিতেছে; ইহার দৈর্ঘ্য ৩২´ ও ব্যাস ২´-২″। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিত ইহাকে গ্রীকৃশিল্পের আদর্শ হইতে গৃহীত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার এরূপ অনুমানের কোন কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই। কোন কারণে ইহার চূড়াটি নষ্ট হইয়াছিল, সেই নিমিত্ত ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে রয়াল ইঞ্জিনিয়ার Capt. Smith লৌড়িয়ানন্দনগড়ের স্তম্ভের আদর্শে ইহার শিরোভাগ সংস্কার করিতে আহূত হয়েন, কিন্তু তাহাতে আদৌ কৃতকার্য্য হয়েন নাই। এলাহাবাদ ফোর্টে এলেন্‌বরা বারাকের নিকট এক্ষণে উহা স্থাপিত। প্রথম ছয়টি স্তম্ভলিপি, কৌশাম্বী-লিপি ইহাতে উৎকীর্ণ আছে। ইহার উপরিভাগে অশোক অনুশাসন, তাহার নিম্নে একদিকে কৌশাম্বীলিপি ও অন্যদিকে দেবী অনুশাসন (Queen's Edict), তাহার নিম্নে সমুদ্রগুপ্তের খোদিত লিপি।

রামপুরস্তম্ভ—চম্পারণ জেলার অন্তর্গত পিপারিয়া গ্রামের এক মাইল দূরে রামপুর নামক একটি গ্রামমধ্যে এই স্তম্ভটি স্থাপিত আছে। ইহাতেও প্রথম ছয়টি স্তম্ভলিপি খোদিত। স্তম্ভোপরি অতি সুন্দর সিংহমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। সম্প্রতি উহা মৃত্তিকা গহ্বর হইতে

উৎখাত হইয়াছে। Sir John Marshall বলেন, ইহা মৌর্য্য যুগের একটি শ্রেষ্ঠ ভাস্কর কীর্ত্তি; ইহাতে প্রথম ছয়টি স্তম্ভলিপি উৎকীর্ণ আছে।

লৌড়িয়া অররাজ—চম্পারণ জেলার অন্তর্গত বেথিয়ার পথে কেশরী স্তূপের দশক্রোশ দূরে অররাজ মহাদেবের মন্দির। এই মন্দিরের এক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে লৌড়িয়াগ্রাম। এই স্থানে একটি স্তম্ভ স্থাপিত আছে, ইহা দৈর্ঘ্যে ৩৬'-৬"। এই স্তম্ভগাত্রে প্রথম ছয়টি স্তম্ভলিপি উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। মঁনস্যুর সেনার ইহাকে রধিয়লিপি নাম দিয়াছেন।

দিল্লী তোপ্রাস্তম্ভ—দিল্লীর সন্নিকট ফিরোজাবাদের অন্তর্গত কোথিল পাহাড়ের চূড়ায় এই স্তম্ভটি স্থাপিত আছে। আম্বালার নিকটবর্ত্তী তোপ্রা হইতে ১৩৫৬ খৃষ্টাব্দে সুলতান ফিরোজতোগলক কর্ত্তৃক ইহা আনীত হইয়াছে। সুলতান এই স্তম্ভটি দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং বহুযত্নে সহস্র সহস্র ব্যক্তির সাহায্যে উহা দিল্লীতে আনয়ন করেন। ইহাতে সাতটি স্তম্ভলিপি অবিকৃত ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্তম্ভটি দিল্লীসিবালিক বা ফিরোজসার লাট নামে কখন কখনও উক্ত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৪২'-৭"।

দিল্লী মিরাট স্তম্ভ—এই স্তম্ভটি দিল্লীর অন্তর্গত একটি উচ্চ ভূমির উপর সংস্থাপিত রহিয়াছে, ইহা এক্ষণে ভগ্নপ্রায়। ১৩৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান ফিরোজতোগলক এই স্তম্ভটিও মিরাট হইতে আনয়নপূর্ব্বক দিল্লীতে তাঁহার মৃগয়াবাসের নিকট স্থাপন করেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত গবর্ণমেণ্ট ইহার বর্ত্তমান স্থানে ইহাকে পুনঃস্থাপিত করিয়াছেন। স্তম্ভগাত্রে প্রথম ছয়টি স্তম্ভলিপি অসম্পূর্ণ ভাবে উৎকীর্ণ আছে।

সাঁচী-স্তম্ভ—মধ্যভারতের অন্তর্গত ভূপালরাজ্যে সুবৃহৎ সাঁচী-স্তূপের দক্ষিণদ্বারে এই স্তম্ভটি স্থাপিত আছে। সারনাথ, কৌশাম্বী ও প্রয়াগলিপির পাঠ ইহাতে অসম্পূর্ণ ভাবে উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

ইহার চূড়াটি এক্ষণে ভগ্নপ্রায়। এক সময়ে চারিটি সিংহমূর্ত্তি ইহার শিরোদেশে স্থাপিত ছিল।

সারনাথ স্তম্ভ—বারানসীর প্রায় দুই ক্রোশ উত্তরে যেস্থানে সুবৃহৎ সারনাথ স্তূপ বিদ্যমান, তাহার সন্নিকটে ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে সাঞ্চী ও কৌশাম্বী লিপির পাঠ বিস্তারিত ভাবে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। ধর্ম্মচক্র চারিটি সিংহ কর্ত্তৃক রক্ষিত; স্তম্ভের শীর্ষদেশ ভারতীয় শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচায়ক। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

রুম্মিন্ দেবীস্তম্ভ—বস্তি জেলার অন্তর্গত দুলহার গ্রামের ছয় মাইল উত্তর-পূর্ব্বে রুম্মিন্ দেবীর মন্দির; এই মন্দির সম্মুখে একটি স্তম্ভ বিরাজিত। রুম্মিন্‌দীই প্রাচীন লুম্বিনী গ্রাম। মাগধী প্রাকৃতের অনেক কথাই 'ল' সংযুক্ত; পরে এই 'ল' স্থানে 'র' প্রয়োগ হইয়াছে। লুম্বিনি=লুম্মিনি=রুম্মিন্। এই স্থান গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান বলিয়া অশোক এই স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন ও এই লিপি উৎকীর্ণ করেন। সুবিখ্যাত জার্ম্মণ পণ্ডিত ব্যুলার এই লিপিকে পাদেরিয়া লিপি নামে অভিহিত করিয়াছেন।

নিগ্লীভ স্তম্ভ—বস্তী জেলার অন্তর্গত নেপাল তরাই প্রদেশে নিগ্লীভ নামক গ্রামে এই স্তম্ভ এক্ষণে স্থাপিত আছে। নিগ্লীভসাগর নামক একটি কৃত্রিম হ্রদের তীরে উহা প্রতিষ্ঠিত। এরূপ প্রবাদ যে পূর্ব্বে এই স্তম্ভটি গৌতমবুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী কনকমন নামক বুদ্ধের জন্মস্থানে প্রোথিত ছিল। গিরিগাত্রে তীর্থসমূহে, রাজপথে এই সকল অনুশাসন পথিকের নয়ন আকর্ষণ করিত। যাহাতে সর্ব্বসাধারণের বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হয়, সেই নিমিত্ত অনুশাসনগুলি সেই সময়কার প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত হইয়াছে।

ক্রমশঃ

শ্রীচারুচন্দ্র বসু।

আরতি

সন্ধ্যা যবে ধীরে নেমে আসে
শান্ত-স্নিগ্ধ আঁধার লইয়া,
তখনি ও মন্দির-প্রাঙ্গণে
ওঠে তব আরতি বাজিয়া।
কি মহান্ উদাত্ত সে সুর,
কি মধুর গম্ভীর বন্দনা,
ওঠে মোর পরাণ-বীণায়
ঝঙ্কারিয়া অনন্ত-মূর্চ্ছনা।
ধূপ গুগ্‌গুলের গন্ধ
অন্ধ হ'য়ে চারিদিকে বহে,—
তুমি আছ এ শুভ বারতা
এ বিশ্বের কাণে কাণে কহে।
হে দেবতা, সে পবিত্র-ক্ষণে
লহ মোর ভকতি প্রণতি,
আমার এ হৃদয়-মন্দিরে
হোক্ সদা তব প্রেমারতি।

শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্তভায়া।

প্রতিবাদের প্রতিবাদ

জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় "আর্ট" সম্বন্ধে যে সুচারু ও জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহার প্রতিবাদ-স্বরূপ ভাদ্র মাসের 'নারায়ণে' রাধাকমল বাবুর 'সাহিত্য ও সুনীতি' নামক প্রবন্ধে পূর্ব্বাপর কোনরূপ যথার্থ সঙ্গতি নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

প্রবন্ধারম্ভেই লেখক গুপ্ত মহাশয়ের রচনা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধার করিয়া "আর্ট" যে কোনরূপ আদর্শপ্রতিষ্ঠাকল্পে নিয়োজিত হয় না, এই মতের উপর একটু বক্রদৃষ্টিপাত করিয়াছেন; অথচ কোন যুক্তি দিয়া উক্ত মতের খণ্ডনও করেন নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে নারায়ণের পৃষ্ঠায় শ্রদ্ধাস্পদ বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় ধর্ম্ম ও "আর্ট" সম্বন্ধে আদর্শের কথা বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"সজীব সাহিত্য মাত্রেই গতানুগতিক ধর্ম্ম ও নীতিকে অগ্রাহ্য করিয়া সহজ মানব প্রকৃতির উপর আপনাকে গড়িয়া তুলিয়াছে"; আমার মনে হয় গুপ্ত মহাশয়ের সহিত এ বিষয়ে তাহার মতভেদ নাই। আদর্শ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। ধর্ম্মের ও নীতির আদর্শ যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। "আর্ট" সেই কার্য্যে নিয়োজিত হইতে পারে না, কারণ ক্ষণিক আদর্শ খাড়া করা তাহার কাজ নহে, নিত্য বস্তুর সহিত তাহার কারবার। প্রতিবাদ লিখিবার আগে উক্ত রচনাটি পাঠ করিলে তিনি ভাল করিতেন; তাহার সকল তর্কের উত্তর সেইখানেই মিলিত। সাধু ও শিল্পীর ভেদকে নিরর্থক বলিতে গিয়া রাধাকমল বাবু যে সকল উদাহরণ দিয়াছেন, সেই সকল মহাপুরুষকে কেবলমাত্র সাধু বলিলে যথার্থরূপে দেখা হয় না, কারণ ভগবদতার ও সাধারণ সাধুত্বের মধ্যে প্রভেদ যথেষ্ট। লেখক পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ না বুঝিয়াই যেন লিখিতেছেন—"শিল্পী ও সাধু উভয়েই সা[illegible]। উভয়েরই পূর্ণ সত্যানুভূতি হয় নাই, উভয়েরই সাধনাবস্থা ইত্যাদি।" তাঁহার

মতে বুদ্ধ প্রভৃতি ভগবদবতারগণ সাধু মাত্র। বুদ্ধ বা খৃষ্টের পূর্ণ সত্যানুভূতি হয় নাই এত বড় কথাটা এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিবার মত সাহস আমার নাই। আমি তাহাদিগকে পূর্ণরসস্বরূপের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করি এবং আমার বিশ্বাস হিন্দুমাত্রেই করিয়া থাকেন। কেবলমাত্র সাধুতার দিক দিয়া তাহাদের বিচার হয় না। লেখক যে ভাবে গোল মিটাইতে চাহিয়াছেন তাহা নিতান্ত বিস্ময়কর। শিল্পী ও সাধুর প্রভেদ লইয়া গুপ্তমহাশয় যে সকল কথা লিখিয়াছেন তাহা উড়াইয়া দিয়া তিনি এককথায় বলিলেন যে, উভয়েরই সমান অবস্থা, অথচ কোন যুক্তি দেন নাই। তর্ক করিয়া বিবাদ মিটাইতে গিয়া নিজের কোলে ঝোল টানিয়া মীমাংসা অবশ্য বেশ নূতন রকমের। সাধু ও শিল্পীর মুখ্য সাধনা একদিকেই বটে, সেই রসস্বরূপের পূর্ণ উপলব্ধি; কিন্তু উভয়ের পথ বিভিন্ন। সাধুর পথ ইহা নয়, ইহা নয়; শিল্পীর পথ ইহাই ইহাই। সাধু দেশকালের অতীত নহেন; তাঁহার আচার নিয়ম আছে, কারণ তাঁহার ভালমন্দের দ্বন্দ্ব এখনও ঘুচে নাই। সাধু জগতকে, মানুষকে একটা বিশেষ আদর্শে গড়িয়া তুলিতে চাহেন—তিনি দেখেন জীবনের একদিক; কিন্তু শিল্পীর আচার নিয়ম নাই, প্রথম হইতেই তিনি আপনাকে মুক্ত বলিয়া মানিয়া লন, তিনি দেখেন জীবনের পরিপূর্ণতা। তিনি মানুষের মহত্ব উদারতা ও অতীন্দ্রিয়তার মধ্যে যেমন ভগবানকে খোঁজেন; মানুষের ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতা ও ইন্দ্রিয়পরতার মধ্যেও সেইরূপ ভগবানের সাক্ষাৎ-লাভ করিয়াছেন—অসংখ্য বন্ধনের মধ্যে মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ লাভ করিয়াছেন। শিল্পী আত্মদর্শী মহাজন, তাই জীবের পাপাচরণে তিনি স্থির ও নিশ্চিন্ত রহেন, কারণ তিনি জানেন—

প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহম্ কিং করিষ্যতি

পূজনীয় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে এইরূপই লিখিয়াছেন।

লেখক পরে বলিতেছেন—যে অনেক সময় পাপ, হীনতা দেখা-

হতে গিয়া অপূর্ণ বা বিকৃত রসসৃষ্টি হইয়া থাকে—বেশ কথা, কিন্তু লেখক কি জানেন না যে সেসকল চিত্র বা সাহিত্য কোন দিনই লোকসমাজে আদর পায় নাই,—পাইবেও না। যেখানে নগ্ননারীত্বে ভগবতী দর্শন হয় নাই—সেখানে নগ্ননারীর চিত্র বা সেরূপ কোন কাহিনী স্থায়িত্ব লাভ করে নাই। মানুষের মনে পূর্ণতার রস যাহা যোগাইয়া দেয়, তাহাই স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে, যাহার মধ্যে সত্য অখণ্ড রস পাওয়া গিয়াছে তাহা চিরকালই বরণীয়। অপূর্ণ বা বিকৃত রস যাহাতে প্রকাশ পায়, তাহা যে "আর্টের" মাপকাঠিতে অতি নীচে তাহা কেহ অস্বীকার করে না এবং যাঁহারা পৃথিবীর সাহিত্য ও শিল্পের ইতিহাসের কোন খোঁজ রাখেন তাঁহারা জানেন যে শুধু রক্তমাংস, বিষয়-সম্ভোগ, ইন্দ্রিয়পরতার অপূর্ণরসপূর্ণ শিল্প কোন দিন আদর পায় নাই। বিস্মৃতির অতল গহ্বরে তাহারা নিমজ্জিত, কোন অদ্ভুতকর্ম্মা প্রত্নতাত্ত্বিকের সাহায্য ব্যতীত তাহাদের সন্ধান পাওয়া দুঃসাধ্য

ইউরোপীয় অনুকরণে বারনারীর ছবি অঙ্কিত করা একটা fashion হইয়াছে—লেখকের একথার বিরুদ্ধে আমি কবিবর রবীন্দ্রনাথের ও চিত্তরঞ্জন দাশের উক্ত বিষয়ে কবিতাদুটির উল্লেখ করিতে পারি; পাঠকসম্প্রদায় তাহার যথার্থ বিচার করিবেন। লেখক এই কথা বলিয়া পাতা ভরাইয়াছেন যে, যাহা অশুদ্ধ, যাহা অসুন্দর, যাহা অমঙ্গল তাহা বর্জ্জনীয়—নিতান্ত পুরাতন কথা; সাহিত্য—যথার্থ সাহিত্য বা "আর্ট"—চিরকালই সত্য; সুন্দর ও মঙ্গলের দিকেই মানব মনকে প্রসারিত করিয়াছে, যাহা করে নাই তাহার স্থান হয় নাই; তবে জানা কথা লইয়া বাজে বকিয়া মাসিকের পাতা ভরাইয়া লাভ কি? রাম শ্যামের দু'খানি চিত্র বা কথা-কাহিনী লইয়া যথার্থ রসজ্ঞানহীন দশজন চীৎকার করিতে পারে, বিজ্ঞাপনের জোরে কয়েকখণ্ড বিক্রয় হইতে পারে, কিন্তু সে বিকৃত শিল্প স্থায়িত্ব লাভ করিবে না—ইহা ত সকলেরই জানা কথা।

রাধাকমল বাবু বলেন, সাহিত্যের উদ্দেশ্য একমাত্র রসসৃষ্টি নহে, জীবনসৃষ্টি। রস কেবলমাত্র অঙ্গ, অঙ্গী নহে। গুপ্ত মহাশয় বলিতেছেন আর্টের উদ্দেশ্য ভগবানের রসমূর্ত্তি ফুটাইয়া তোলা, অধ্যাত্মবোধের সহায় ও ধর্ম্মজীবনের উদ্দীপক হওয়া; ইহার পরিণতি কি আত্মস্ফূর্ত্তি নহে? পূর্ণরসাধার ভগবানের একত্বের আমরা কি বহুত্ব নহি? শিল্পীর লক্ষ্য যে রসসৃষ্টি তাহার সহিত আমাদের জীবনের সমগ্রতার রসের কোন বিভিন্নতা আছে, এমন কথা ত গুপ্তমহাশয় কোথাও বলেন নাই! শিল্পীর উদ্দেশ্য জীবনসৃষ্টি, তিনি বহুত্বের মধ্যে একত্ব আনিয়া দেন; উপকরণ সজ্জিত করেন না, তাহাতে প্রাণ সঞ্চার করেন—তিনি সাধক নহেন—সিদ্ধ, তিনি সত্যদ্রষ্টা।

আমার যাহা বলিবার তাহা অল্প কথায় বলিয়াছি। কারণ বৃথা তর্ক করিয়া লাভ নাই। তিনি বিশ্বাস করেন যে যথার্থ শিল্পী যিনি, তিনি অখণ্ড রসমূর্ত্তি ফুটাইয়া তোলেন, তাঁহার দৃষ্টি শুধু সত্যই দেখে, হীনতার মধ্যে নিকৃষ্টতার মধ্যে সুন্দরকে, পূর্ণকে দেখে, এখানে গুপ্তমহাশয়ের সহিত তাঁহার ত কোন মতভেদ নাই! তবে তর্ক কিসের, প্রতিবাদ কিসের? অন্যায় যাহা, বিকৃত যাহা তাহা ক্ষণিক, তাহাকে না তাড়াইলেও সে আপনই যাইবে—সময় সে ভার আজন্ম লইয়াছে, তাহা লইয়া বাদবিতণ্ডা যত কম হয় ততই মঙ্গল; কারণ সেই সময়টুকু অন্য মঙ্গলজনক কার্য্যে ব্যয়িত হইলে দেশের ও দশের কল্যাণ হইতে পারে।

শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।

মিলন ও বিরহ

যদি মিলনের পূর্ণ-আনন্দের মাঝে
আঁখি পাতে চেপে বসে
মরণের ঘুম ;—
এই শেষ তার ; সেথা আর সব
নীরব নিঝুম।
আর যদি বিরহের তপ্ত-শ্বাস-সনে
থেমে যায় চিরতরে
বক্ষের স্পন্দন,
এই নহে শেষ তার ; তার শেষ
অনন্ত-মিলন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্তভায়া।

জাতি বা বর্ণভেদের কথা

জাতিভেদ একটা সামাজিক ব্যবস্থা। ব্যবস্থা মাত্রেই অবস্থার উপরে নির্ভর করে। সমাজের এক অবস্থায় যে ব্যবস্থা কল্যাণকর হয়, অন্য অবস্থায় তাহা হয় না।

এই জাতিভেদ একটা সনাতন ব্যবস্থা নয়। আমরা আজ যাহাকে জাতিভেদ বলিয়া জানি, প্রাচীন আর্য্যসমাজে তাহা ছিল না। বৈদিক যুগে এই ব্যবস্থা ছিল বলিয়া মনে হয় না। আমাদের বর্ত্তমান জাতিভেদ বংশগত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু প্রাচীন

কালে একই বংশে, একই পরিবারে জন্মিয়া, কেহবা ব্রাহ্মণ, কেহবা ক্ষত্রিয় আর কেহবা বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিতেন। ফলতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তিনটি জাতি নহে, কিন্তু তিনটি বিশেষ সামাজিক বৃত্তি-মাত্র। মানুষ লইয়াই সমাজ, আর মানুষ মাত্রেরই আহার-আচ্ছাদনের আবশ্যক হয়। সমাজ-জীবন একটু ভাল করিয়া গড়িয়া উঠিলেই নানা লোকে সমাজের নানাকাজে প্রবৃত্ত হয়। এক লোকে নিজের বা সমাজের সকল কাজ করে না, করিয়া উঠিতে পারে না, পারিলেও, তাহাতে যে অযথা শক্তিক্ষয় হয়, তাহার উপযুক্ত মূল্য মিলে না। এইজন্য সমাজে শ্রমবিভাগ আরম্ভ হয়। এই শ্রমবিভাগ আরম্ভ হইলে, কতকগুলি লোক বিশেষভাবে সমাজের লোকের আহার-আচ্ছাদনাদি নির্ম্মাণ ও সংগ্রহ ও সরবরাহ করিতে আরম্ভ করে। কৃষি-গো-রক্ষা, বাণিজ্যাদি কর্ম্মে, ক্রমে অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহারা বিশেষভাবে দক্ষতালাভ করে। এইরূপে বৈশ্য-বৃত্তি হইতে বৈশ্য-শ্রেণীর উৎপত্তি হয়।

কিন্তু কেবল আহার-আচ্ছাদনের দ্বারাই মানুষের সকল অভাব পূর্ণ, বা সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। মানুষ মাত্রেই কোনও না কোনও রূপে সমাজবদ্ধ হইয়া থাকে। কতকগুলি ইতর জন্তুকে যেমন আমরা নিত্যকালই যুথবদ্ধ হইয়া চলাফেরা করিতে দেখিয়া আসিয়াছি, ইহারা যে কস্মিনকালেও দল-ছাড়া ছিল এমন কথা আমরা জানি না ও বলিতে পারি না, কল্পনা করাও কঠিন; সেইরূপ মানুষকেও আমরা চিরকালই সমাজবদ্ধ হইয়া বসবাস করিতে দেখিয়াছি, তারা যে কস্মিনকালে সমাজ-ছাড়া ছিল বা থাকিতে পারে, এরূপ কল্পনাও করিতে পারি না। মানুষ যতকাল মানুষ হইয়াছে, ততকাল হইতেই সে সমাজ বাঁধিয়া বাস করিতেছে। মানুষ বলিলেই আমরা একটা সামাজিক জীব বুঝি। আর সমাজ বলিলেই আবার, কেবল কতকগুলি মানুষের সমষ্টি বুঝি না, কিন্তু একটা অঙ্গী বা অর্গেনিজ্‌ম—organism—বুঝি। কতকগুলি মানুষ

একত্র হইলে একটা জনসংঘট্য মাত্র হয়, কিন্তু সমাজ হয় না। জনসংঘট্যের মধ্যে কোনও ঘননিবিষ্ট সর্ব্বাঙ্গীণ সম্বন্ধ নাই, আকস্মিক ঘটনা-যোগে তার উৎপত্তি ও বিলয় হয়। একটা সাময়িক কারণে ইহারা একত্র হয়, আবার সে কারণ চলিয়া গেলে, তাদের সংহতিও ভাঙ্গিয়া খসিয়া যায়। কিন্তু সমাজ-বন্ধনের একটা স্থায়িত্ব আছে। সমাজের ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির সম্বন্ধ আকস্মিক নহে, কিন্তু অঙ্গাঙ্গী। . অর্থাৎ সমাজের সমষ্টিগত জীবন-ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, ব্যষ্টির জীবনের সম্যক সফলতালাভ সম্ভব হয় না। সমাজান্তর্গত মনুষ্যগণের উপরে সমষ্টিগত সমাজের শক্তি ও উন্নতি ও সমাজের সমষ্টিভূত জীবন ও গঠনের উপরে সামাজিকগণের ব্যক্তিগত বা ব্যষ্টিগত শক্তি ও উন্নতি অতি ঘনিষ্ঠ-ভাবে নির্ভর করে। একটা জনসংঘট্যের সমষ্টি ও ব্যষ্টির মধ্যে এই অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নাই। সমাজ অঙ্গী, সমাজের ভিন্ন ভিন্ন নরনারী ও পরিবার বা গোষ্ঠীবর্গ তার অঙ্গ। আবার প্রত্যেক গোষ্ঠীও এক একটি অঙ্গী, তার অন্তর্ভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন পরিবার সকল তার অঙ্গ। আবার প্রত্যেক পরিবারও এক একটি অঙ্গীস্বরূপ, পরিবারের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি এই পরিবারের অঙ্গ। এইরূপভাবে সমাজের প্রত্যেক অংশে, প্রত্যেক স্তরে, প্রত্যেক অঙ্গের মধ্যে একটা জটিল, ঘনিষ্ঠ অপরিহার্য্য অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রহিয়াছে। সুতরাং মানুষের নিজের আহার-আচ্ছাদনাদির যেমন প্রয়োজন, শীতাতপাদি হইতে আপনার জীবনকে রক্ষা করিবার জন্য মানুষ যেমন আহার ও আবাস খুঁজিয়া বেড়ায়, সংগ্রহ করে, কিংবা সৃষ্টি করিয়া থাকে; সেইরূপ সমাজের সমষ্টিগত জীবন-রক্ষারও প্রয়োজন আছে। সমাজ থাকিলেই ত মানুষ থাকে। অতএব আত্মপ্রয়োজনেই সমাজের অন্তর্গত লোক-সকলকে সমাজ রক্ষার ও সমাজ-শাসনের সুব্যবস্থা করিতে হয়। আহার ও আবাস আকাশ হইতে উড়িয়া আসে না, মাটিতেই জন্মে, মাটিতেই গড়ে। আহারের জন্য ও আবাসের জন্য মাটি চাই—

প্রত্যেক সমাজকে এক একটা ভূভাগ দখল করিয়া বসা চাই। বন-জঙ্গলেই আহার্য্য পশুপক্ষী মিলে, আর কিছু না হইলেও, অন্ততঃ এক একটা বনজঙ্গল দখল করিয়া না বসিলে, বনচারী ব্যাধদিগেরও আহার-সংগ্রহ কঠিন হয়। কৃষির জন্য ভূমি চাই। সকল ভূমিতে সমান ফসল জন্মে না; এইজন্য উর্ব্বর ভূমি সকলেই খুঁজিয়া বেড়ায়। গোচারণাদির জন্য তৃণ-জল-সচ্ছল ভূভাগের প্রয়োজন হয়। সর্ব্বত্র সমানভাবে পশুচারণ ও পশুপালনের সুবিধা হয় না। উর্ব্বর ভূমি, পশুচারণের উপযোগী তৃণ-জল-বহুল দেশ সকল সমাজেই খুঁজিয়া বেড়ায়। এইরূপে যাযাবর অবস্থাতেও ভিন্ন ভিন্ন সমাজের মধ্যে একটা প্রতিযোগীতা ও রেষারেষি সর্ব্বদাই জাগিয়া থাকিত। যেখানে এরূপ রেষারেষি থাকে, সেখানেই আত্মরক্ষার ও বিত্তরক্ষার আয়োজন আবশ্যক হয়। এই ভাবে, সমাজের অতি আদিম ও শৈশবাবস্থা হইতেই যুদ্ধবৃত্তি গড়িয়া উঠে। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে সমাজ ও স্বদেশকে রক্ষা করিতে হইলে যোদ্ধার আবশ্যক হয়। তার পর, সমাজের ভিতরেও একে অন্যের উপরে আততায়ীতা করে। এক পরিবার, এক গোষ্ঠী, এক ব্যক্তি, অপর পরিবার, অপর গোষ্ঠী ও অপরাপর ব্যক্তির সঙ্গে রেষারেষি করে। অপরের স্বত্ব কাড়িয়া লইতে চায়। অপরের সঙ্গে অন্তর্বিবাদে নিযুক্ত হয়। এরূপ অবস্থায়, সমাজের শান্তিরক্ষার জন্য সমাজশাসন আবশ্যক হয়। সমাজের সমষ্টিভূত শক্তি যদি সমাজান্তর্গত ব্যক্তিগণকে আপন আপন ন্যায্য স্বত্ব ও অধিকারের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত না রাখিতে পারে, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের যদি সুব্যবস্থা না থাকে, তাহা হইলে অরাজকতা উপস্থিত হইয়া, সমাজ নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য সমাজের সমষ্টিভূত শক্তিকে সর্ব্বদা একই সঙ্গে দুইটি কর্ম্ম করিতে হয়। এক অন্তর্শাসন, অপর বহির্শত্রু হইতে সমাজ ও স্বদেশকে রক্ষা করা। এই দুইটি কার্য্যই শক্তিসাপেক্ষ। এই দুইটি কার্য্যেই নেতৃত্বের প্রয়োজন। এই

দুইটি কার্য্যেই ঈশ্বর-ভাব বা প্রতাপ প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। এই দুইটি কার্য্যই নীতিসাপেক্ষ। নীতি অর্থ এখানে ইংরাজি মর্যালিটি—morality—নহে, কিন্তু polity—পলিটি। যাহারা সমাজ-শাসন করে, যুদ্ধ-বিগ্রহাদির সময়ে সেনা-নায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়, ক্রমে সে কার্য্যে তাহারা বিশেষ দক্ষতা লাভ করে। এই ভাবেই ক্ষাত্র-বৃত্তির উৎপত্তি ও ক্ষাত্রবৃত্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষাত্র-বর্ণের সৃষ্টি হয়। বৈশ্যেরাও মাটি ফুড়িয়া উঠে না, ক্ষত্রিয়েরাও ইন্দ্র-লোক হইতে নামিয়া আসে না। উভয়েই সমাজ-জীবনের বিকা-শের সঙ্গে সঙ্গে, সমাজের আত্মপ্রয়োজনে, সমাজ-অঙ্গী হইতে ফুটিয়া ও সমাজের অঙ্গ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়া উঠে। বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় উভয় বর্ণেরই মূল সামাজিক বৃত্তির বা কর্ম্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

ব্রাহ্মণেরাও ব্রহ্মলোক হইতে অবতীর্ণ হন নাই। বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় যেমন সমাজ-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, সমাজ-প্রয়োজনে, সমা-জের সেবার জন্য, সমাজের অঙ্গরূপে ফুটিয়া ও গড়িয়া উঠিয়াছেন, ব্রাহ্মণেরাও সেইরূপ, সেই একই প্রয়োজনে, সেই একই পথে, সেই একই সমাজ-অঙ্গীর অঙ্গরূপেই ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া উঠিয়াছেন। মানু-ষের যেমন আহার-আচ্ছাদনের প্রয়োজন আছে, এই শরীর-রক্ষার ও শরীরের বিকাশ ও উন্নতি সাধনের জন্য; যেমন শাসন-সংরক্ষণের প্রয়োজন সমাজ-রক্ষা ও সমাজের বিকাশ ও উন্নতি সাধনের জন্য; সেইরূপ পারলৌকিক ধর্ম্মশিক্ষা এবং ধর্ম্মসাধনেরও প্রয়োজন আছে। মানুষের যেমন একটা শরীর আছে ও শরীরের কতকগুলি অঙ্গ ও বৃত্তি আছে; সেইরূপ একটা মন ও মানসিক বৃত্তি এবং একটা আত্মা এবং কতকগুলি আধ্যাত্মিক বৃত্তিও আছে। মানুষের গঠন ও প্রকৃতির—তার constitution এবং nature'এর মধ্যেই [illegible] সকল আধ্যাত্মিক বৃত্তিও নিহিত রহিয়াছে। যাহা দেখিতেছে, শুনিতেছে, ছুঁইতেছে, ধরিতেছে,—তাহা ছাড়া একটা-কিছু আছে, যাহা দেখা

যায় যায়, কিন্তু যায় না; শোনা যায় যায়, কিন্তু যায় না; ধরা-ছোঁয়া যায় যায়, কিন্তু যায় না;—এই প্রত্যয় সার্ব্বজনীন। এটি মানুষের একটি মৌলিক অন্তঃপ্রত্যয় বা original intuition—ইণ্টুইষণ। অহং ও ইদং—আমি ও যাহা-আমি নই—এদুটি মানুষ মাত্রেই প্রত্যক্ষ করে। আর জ্ঞানের শৈশবে, বিচার-বিশ্লেষণ শক্তির বিশেষ বিকাশের পূর্ব্বে—মানুষ এই ইদং বা অনাত্মাকে, অহং বা আত্মা হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র হইলেও, এই অহং বা আত্মার মতন, এই অহং বা আত্মার নিগূঢ় গুণ ও লক্ষণ-যুক্ত বলিয়া মনে করে। আমাদের ঘরে শিশুরা আজও ইহা করে; আদিম অবস্থায় বয়োবৃদ্ধ বর্ব্বরেরাও এরূপ মনে করিতেন। এই বিশ্ব তাঁদের নিকটে একটা গভীর রহস্য-পূর্ণ ছিল। এই বিশ্বের সকল পদার্থের অন্তরালে তাঁহারা একটা অদৃশ্য চৈতন্য-বস্তুর সন্ধান পাইতেন। আজ আমরা যাহাকে জড়-শক্তি বা নৈসর্গিক শক্তি বলি, তাঁহারা তাহাকে শক্তিমান দেবতা মনে করিতেন। এই যে অতীন্দ্রিয়ের অনুভূতি, ইহারই দ্বারা তাঁহাদের জীবনটা ভয়ে, বিস্ময়ে, আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া, তাঁহাদিগকে বাস্তব-সুখদুঃখের অতীতে লইয়া গিয়া একটা কল্পরাজ্যের বা রস-রাজ্যের বা কবিতার রাজ্যের সৃষ্টি করিত। ঐ রাজ্যেই তাঁহাদের জীবনের যাবতীয় আদর্শের ও চিরন্তন লক্ষ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তাহারই প্রেরণায় প্রাচীন মানবের দৃষ্টি ও ধ্যান লোক-লোকান্তরে ছুটিয়া বেড়াইত ও ইহজীবনের কর্ম্মের সফলতার জন্য ইহার অতীতে একটা বিশাল ও পরিপূর্ণ পর-লোকের বা স্বর্গলোকের প্রতিষ্ঠা করিত। এই ভাবেই মানুষের নীতি ও ধর্ম্ম, কবিতা ও শিল্প, দর্শন ও বিজ্ঞান,—সভ্যতার সমুদায় মূল উপাদানগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। শাসন-সংযম, শিল্প-দীক্ষা, মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, তার কর্ম্মের প্রেরণা, [illegible]তস্কের পুরস্কার ও অকৃতির সান্ত্বনা সকলই ঐ অতীন্দ্রিয়ের অনুভূতি বা অতীন্দ্রিয়ের বিশ্বাস বা অতীন্দ্রিয়ের স্বপ্নের ও কল্পনার উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই অতীন্দ্রিয়ের আকর্ষণেই মানুষের

ধর্ম্মকর্ম্মাদি গড়িয়া উঠে। তার শরীরের প্রয়োজনে যেমন কৃষিবাণিজ্যাদির উৎপত্তি ও বিকাশ হইয়াছে, তার সমষ্টিভূত সমাজজীবনের প্রয়োজনে যেমন শাসন-সংরক্ষণের ব্যবস্থা গড়িয়াছে, সেইরূপ এই অতীন্দ্রিয়ের অনুভবের প্রেরণায় তার ধর্ম্মকর্ম্ম, সাধন ভজনাদি গড়িয়া উঠিয়াছে। কৃষিবাণিজ্যাদি যেমন একটা সামাজিক বৃত্তি বা কর্ম্ম; শাসন-সংরক্ষণ যেমন একটা সামাজিক বৃত্তি বা কর্ম্ম; যজন-যাজন, ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্ম-শিখান, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন, এসকলও একটা অত্যাবশ্যকীয় সামাজিক বৃত্তি বা কর্ম্ম। সমাজের লোকের অন্ন ও আবাসাদির ব্যবস্থার জন্য যেমন বৈশ্যবৃত্তির আশ্রয়ে বৈশ্য-বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার শাসনসংরক্ষণের ব্যবস্থার জন্য যেমন ক্ষাত্রবৃত্তির আশ্রয়ে ক্ষাত্রবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, সেইরূপ সমাজের ধর্ম্ম-সাধন ও ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থার জন্য ব্রহ্মবৃত্তির আশ্রয়ে ব্রাহ্মণ-বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। এসকল বর্ণ আকাশ হইতেও উড়িয়া আসে নাই, সমাজের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেও একেবারে পরিস্ফুট আকারে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, দুষ্টলোকে স্বার্থবশ হইয়া, ষড়যন্ত্র করিয়াও এগুলিকে গড়িয়া তুলে নাই। এই বর্ণত্রয় সমাজ-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের আত্ম-প্রয়োজনে, সমাজ-জীবনের বিকাশ ও পূর্ণতা সাধনের জন্য, ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে অতিপ্রাকৃত বা অতিলৌকিক কিছুই নাই।

অন্ন-বস্ত্রাদির উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাহ, সমাজের শাসন ও সংরক্ষণ, এবং ধর্ম্মযজন ও ধর্ম্মযাজন,—এই তিনটি সমাজ-জীবনের প্রধান কর্ম্ম। সকল সমাজে, সকল দেশে, সকল কালেই এই তিনটি কর্ম্ম ছিল; আর সর্ব্বত্রই এই তিনটি মুখ্য সামাজিক বৃত্তির আশ্রয়ে তিনটি শ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রথমে এই সকল সামাজিক বৃত্তির অনুকরণ করিয়া তিনটি বিশিষ্ট বর্ণ বা জাতির সৃষ্টি হয় নাই। আদিতে একই পরিবারের মধ্যে কেহবা কৃষিবাণিজ্য কর্ম্ম করিত, কেহবা সমাজ-শাসন ও সমাজ-রক্ষা করিত, আর কেহবা যজনযাজন

করিত। ফলতঃ তখন দুইটি মাত্র বৃত্তিই, বোধ হয়, বৈশিষ্ট্যলাভ করিয়াছিল, সমাজের সকলকেই ক্ষাত্রবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইত। শান্তির সময় যেমন কেহবা কৃষিগোরক্ষা প্রভৃতি করিত, কেহবা যজন-যাজনাদি করিত, সেইরূপ যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইলে, সকলেই অস্ত্রধারণ করিয়া স্বদেশ ও স্বরাষ্ট্র ও স্বজাতির রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইত। যুদ্ধবিগ্রহাদি যখন একরূপ দৈনন্দিন ব্যাপার ছিল, তখন সকলকেই ক্ষাত্রকর্ম্ম শিক্ষা ও ক্ষাত্রবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইত। তখন সমাজে প্রকৃতপক্ষে একই বর্ণ ছিল, সকলেই ক্ষত্রিয় ছিল; অথবা অন্য দিক্ দিয়া দেখিলে, দুই বর্ণ মাত্র ছিল, কেহবা বৈশ্য, কেহবা ব্রাহ্মণ ছিল। যুদ্ধবিগ্রহাদি যত কমিয়া যাইতে লাগিল, শান্তি যত স্থায়ী হইতে আরম্ভ করিল, ততই একদল লোক ক্ষাত্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়া বিশেষভাবে কৃষিগোরক্ষা বাণিজ্যাদি কর্ম্মে, আর একদল যজন-যাজন ও অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদি কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তখনও বর্ণভেদ গড়িয়া উঠে নাই। এই অবস্থাতেও একই পরিবারের, এমনকি একই পিতামাতার দশজন সন্তানের মধ্যে কেহবা বৈশ্যবৃত্তি, কেহবা ক্ষাত্র-বৃত্তি, কেহবা ব্রাহ্মণবৃত্তি অবলম্বন করিতেন। ইহার বহু পরেও ক্ষত্রিয়ের পুত্র ব্রাহ্মণের, ব্রাহ্মণের পুত্র ক্ষত্রিয়ের, আর বৈশ্য ও শূদ্রের পুত্র ক্ষত্রি-য়ের ও ব্রাহ্মণের কর্ম্ম করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ইহাতে কোনও প্রকারের নিষেধ ছিল না। বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদি বৃত্তি ছিল, কিন্তু বর্ণবিভাগ বা বর্ণভেদ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মহা-ভারতে বর্ণভেদ গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু একবর্ণের লোকের পক্ষে অপর বর্ণের বৃত্তি অবলম্বন একেবারে নিষিদ্ধ হয় নাই। ভারত-যুদ্ধের কালে ব্রাহ্মণেরা অবাধে ক্ষাত্রবৃত্তি অবলম্বন করিতেন; দ্রোণ ও কৃপ তার সাক্ষী। বৈশ্যেরা ক্ষাত্রবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারি-তেন—[illegible]য় তার সাক্ষী। শূদ্রেরা যজন-যাজন না করুন, অন্ততঃ নীতি ও [illegible]হারবিদ্ হইয়া রাজসভায় মন্ত্রীর আসন পাইতে পারি-তেন,—বিদুর তাহার প্রমাণ। তবে বর্ত্তমান মহাভারতে আমরা যে

সমাজ-চিত্র দেখিতে পাই, তাহাতে সমাজে একটা বর্ণবিভাগ যে কতকটা পাকিয়া উঠিয়াছিল, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। তবে এই বর্ণবিভাগ যে একদিন সমাজে একটা কঠিন আকার ধারণ করে নাই, অথবা করিয়া থাকিলেও মহাভারত রচনা সময়ে তাহার সংস্কার-সাধন যে আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল, ইহার প্রমাণ এই মহাভারতেই আছে। গীতার—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ

গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ করিয়া আমি ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ-সমান্বিত সমাজ-ব্যবস্থার সৃষ্টি করিয়াছি—এই বাক্যই তার প্রমাণ। জাতিভেদটা তখন গুণকর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জন্মগত বা বংশগত হইয়া পড়িয়াছিল বা পড়িতেছিল। আর এইরূপ জন্মগত বা বংশগত জাতিভেদ লইয়া একটা বিরাট ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন অসাধ্য; ইহা দেখিয়াই, এই ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠার প্রধান আশ্রয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় এই বর্ণচতুষ্টয়কে গুণকর্ম্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক অজ্ঞাত জাতিকুল রাধেয়ের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ইহার আর এক প্রমাণ। বিদুরের জন্মকথা ইহার তৃতীয় প্রমাণ। পঞ্চ পাণ্ডবের জাতক-কাহিনীর অন্তরালে, কোন্ নিগূঢ় সমাজ-রহস্য লুকাইয়া আছে, তাহাই বা ভেদ করিবে কে? বেদব্যাসের জন্মবৃত্তান্তও কঠোর এবং অনুল্লঙ্ঘনীয় জাতিভেদ-প্রথার সমর্থন করে না। বর্ত্তমান মহাভারতখানি যখন সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ হয়, তখন বর্ণবিভাগটা অনেক পরিমাণে পাকিয়া উঠিয়াছে, ইহা স্বীকার করি। কিন্তু তখনও পুরাতন স্মৃতি লুপ্ত হয় নাই। আর তারই জন্য যেখানেই এই জাতিভেদের বিরোধী প্রমাণ ছিল, সেখানেই একটা গোঁজামিল দিয়া ঐ পুরাতন স্মৃতির সঙ্গে আধুনিক অবস্থার ও ব্যবস্থার একটা সঙ্গতি করিবার চেষ্টা হইয়াছিল।

আদিতে গুণকর্ম্ম অনুসারেই বর্ণবিভাগের প্রতিষ্ঠা হয়, ইহা যেমন সত্য, এই গুণকর্ম্ম-প্রতিষ্ঠিত বর্ণবিভাগ যে ক্রমে, স্বাভাবিক উপায়েই,

সমাজ-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, সমাজের আত্মপ্রয়োজনেই আবার জন্ম-গত ও বংশগত হইয়া উঠে, ইহাও সেইরূপই সত্য। দুষ্টলোকে চেষ্টা করিয়া, বর্ণবিভাগেরও সৃষ্টি করে নাই, আর ঐ বর্ণবিভাগ হইতে পরে বর্ত্তমান বর্ণভেদেরও প্রতিষ্ঠা করে নাই। বর্ণবিভাগ ও বর্ণভেদ দুই' সমাজ-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অপরিহার্য্য কারণে গড়িয়া উঠিয়াছিল।

প্রাচীন কালে আজিকার মতন লোকশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। প্রকাশ্য বিদ্যালয়াদির প্রতিষ্ঠা হয় নাই। শিক্ষার্থীগণ উপযুক্ত গুরুর নিকটে যাইয়া আপন আপন অভীষ্ট বিদ্যা শিক্ষা করিত। এরূপ অবস্থায় যে যে-বিদ্যা ভাল করিয়া জানিত, সহজেই সকলের আগে ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত্ন ও আগ্রহ সহকারে সেই বিদ্যা আপনার পুত্র ও অপরাপর পরিবারবর্গকেই শিখাইত। কার্য্যকরী বা বার্ত্তিক বিদ্যা কিম্বা technical এবং professional knowledge, এইরূপ ভাবে পুরুষানুক্রমেই রক্ষিত ও প্রচারিত হইত। পিতার বা পিতৃ-ব্যের নিকট হইতে প্রত্যেক পরিবারের বালকেরা তাহাদের বংশের বিশেষ বিদ্যা সকল শিক্ষা করিত। ধর্ম্মযাজন তখন একটা বিশেষ বিদ্যা হইয়া উঠিয়াছিল। ধর্ম্ম তখন যজ্ঞাদি জটিল কর্ম্মের উপরেই নির্ভর করিত। যজ্ঞের মন্ত্রাদি মুখে মুখে শিখিতে হইত। কোন্ ভাবে কোন্ যজ্ঞ করিতে হয়, তাহার ক্রম এবং কুশলতার উপরে যজ্ঞের সফলতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে,—এই ক্রমের বিন্দুমাত্র ব্যতি-ক্রম বা এই নিপুণতার একটুও অভাব হইলে সমস্ত যজ্ঞকর্ম্ম পণ্ড হইয়া যায়,—লোকের এই বিশ্বাস ছিল। এরূপ অবস্থায় ধর্ম্মযাজন-কর্ম্ম শিখিতে ও শিখাইতে বিস্তর ক্লেশ স্বীকার করিতে হইত। বিশেষতঃ ক্রমে যখন এই সকল যজ্ঞকর্ম্ম দ্বারা পুরোহিতেরা বিস্তর দক্ষিণালাভ করিতে লাগিলেন, তখন নিজেদের ব্যবসা রক্ষা করি-বার জন্য যাজ্ঞিকদিগের মধ্যে একটা মন্ত্রগুপ্তির ভাব জাগিয়া উঠিল। কেহ অপরকে সহজে আপনার বিদ্যা আর শিখাইতে চাহিত না।

এই ভাবে যাহা আদিতে কেবল সামাজিক বৃত্তিগত ছিল, এই নূতন অবস্থাধীনে, নূতন ও জটিল শিক্ষা প্রয়োজনে, ক্রমে তাহা বংশগত হইয়া পড়িল। যেমন যজন-যাজনাদি ব্রহ্মকর্ম্ম, সেইরূপ শাসন ও সংরক্ষণাদি রাষ্ট্র-কর্ম্ম বা ক্ষাত্র-কর্ম্ম, এবং কৃষিবাণিজ্যাদি বৈশ্যকর্ম্মও কালক্রমে বংশগত হইয়া পড়িল। প্রাচীন সমাজের অবস্থাধীনে এইরূপ হওয়া কেবল অনিবার্য্য নহে, কিন্তু প্রয়োজনীয় হইয়াও উঠিয়াছিল। সমাজগঠন তখন কতকটা পরিমাণে বাঁধিয়াছে, কিন্তু ভাল করিয়া বাঁধে নাই। জনশিক্ষার ব্যবস্থা তখনও ভাল করিয়া হয় নাই। স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সমাজ-অঙ্গীর সঙ্গে সামাজিকগণের বাহিরের বন্ধন যে পরিমাণে শক্ত হইয়াছিল, ভিতরের যোগ সে পরিমাণে বাঁধে নাই। তখন ভয়েতেই লোকে সমাজ-শাসন মানিয়া চলিত, সমাজের সঙ্গে একাত্মতাসিদ্ধ হইয়া এই ভয় তখনও প্রকৃত ভক্তিতে পরিণত হয় নাই। ব্যক্তি অপেক্ষা তার পরিবার, পরিবার অপেক্ষা তার গোষ্ঠী, গোষ্ঠী অপেক্ষা তার জাতি বা সমাজ যে বড়, এই জ্ঞানের উন্মেষ হইয়াছে; কিন্তু কেন বড়, ইহার বিচার-বিশ্লেষণ আরম্ভ হয় নাই। সমাজের শক্তির উপরে গোষ্ঠীর শক্তি, গোষ্ঠীর শক্তির উপরে পরিবারের শক্তি আর পরিবারের শক্তির উপরে প্রত্যেক ব্যক্তির শক্তি একান্তভাবে নির্ভর করে, সমাজের কল্যাণের সঙ্গে সমাজান্তর্গত পরিবার সকলের, গোষ্ঠী-বর্গের ও ব্যক্তিগণের কল্যাণ একান্তভাবে নির্ভর করে; সমাজ দেহ, পরিবারাদি তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ; সমাজ শরীর, পরিবারাদি এই শরীরের হস্তপদাদি; সমাজ শরীরী ও অঙ্গী, পরিবারাদি তাহার জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়; শরীরের শক্তি, স্বাস্থ্য ও সুখের উপরে হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শক্তি, স্বাস্থ্য ও সুখ একান্তভাবে নির্ভর করে; সমাজের স্বার্থের সঙ্গে সমাজান্তর্গত পরিবার সকলের ও ব্যক্তিগণের স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে; সমাজের এক অঙ্গের হানি [illegible] অপর অঙ্গসকল দুর্ব্বল ও অক্ষম হয়, এক অঙ্গের দুর্ব্বলতায় বা রোগে

অপর অঙ্গসকল দুর্ব্বল ও রুগ্ন হয়,—সমাজ-বিজ্ঞানের এ সকল নিগূঢ় তথ্য তখনও ভাল করিয়া লোকের জ্ঞানগোচর হয় নাই। এখনও সভ্যতাভিমানী ইউরোপীয় সমাজে পর্য্যন্ত এ জ্ঞান ভাল করিয়া জন্মে নাই, প্রাচীন ভারতে যদি না জন্মিয়া থাকে, তাহা নিতান্ত দোষের বা ক্ষোভের বা গ্লানির কথা হয় না। আর এই জ্ঞান জন্মে নাই বলিয়াই, যে যে বিষয়ে যতটুকু বিশেষ অভিজ্ঞতা ও কৃতিত্বলাভ করিত, সে তাহাকে আপনার পুত্রকলত্রের মধ্যেই লুকাইয়া রাখিতে চাহিত। এইরূপে কেবল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি বর্ণ জন্মগত হয় নাই, কিন্তু কালক্রমে ব্রাহ্মণাদিগের মধ্যেও কেহবা ঋগ্বেদী, কেহবা শামবেদী, কেহবা যজুর্ব্বেদী, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন শাখার প্রতিষ্ঠা হয়। প্রাচীনকালে মন্ত্রগুপ্তির চেষ্টা হইতেই যে এরূপ বিভাগ গড়িয়া উঠে নাই, ইহা কে বলিবে? ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যেও বিশেষ বিশেষ অস্ত্রব্যবহারে পুরুষানুক্রমিক শিক্ষাদীক্ষা ও পারদর্শিতা এবং এই পারদর্শিতা-প্রেরিত মন্ত্রগুপ্তি নিবন্ধন যে বিভিন্ন শাখা ও উপশাখার সৃষ্টি হয় নাই, তাহাই বা কে বলিবে? বিভিন্ন সমাজের সংমিশ্রণেও এইরূপ শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে, ইহাও সত্য। কিন্তু প্রাচীনতম যুগে, সামাজিক সংমিশ্রণের অবসর ও প্রয়োজন উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্যে যে-সকল শ্রেণীবিভাগ হইয়াছিল, তাহা যে সম-ব্যবসায়ীদের স্বাভাবিক প্রতিযোগীতা ও মন্ত্রগুপ্তির চেষ্টা হইতে জন্মে নাই, এমন কথা বলা যায় না। বৈশ্যদিগের মধ্যে যে এই কারণেই নানা শ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছে এবং অধিকাংশ ব্যবসায়ই পুরুষক্রমানুগত হইয়া পড়ে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। শূদ্রেরাও এই কারণে নানাভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে, কেহবা সৎশূদ্র, কেহবা অন্ত্যজ হইয়া যায়। ব্রাহ্মণাদি জাতির অনুসেবা যাহারা করিত, তাহাদের "জল চল" হইয়া গেল; তাহারা সৎশূদ্র হইল। যাহাদের এ সুযোগ ও সুবিধা ছিল না বা ঘটিল না, তাহারা অস্পৃশ্য ও অন্ত্যজ রহিয়া গেল।

এই ভাবেই কালক্রমে আমাদের বর্ত্তমান জাতিভেদ বা বর্ণভেদের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সমাজের আত্মপ্রয়োজনে, অবস্থাবিশেষে এই বর্ণভেদের ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল। বহু, বহুদিন সে পুরাতন অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; কিন্তু সে ব্যবস্থা বদলায় নাই। ইহাই ত দোষের কথা।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

যমুনা

শ্যামের বাঁশরী শুনি উজান যমুনা নদী
বহিত নাচিয়া কিবা বৃন্দাবনে নিরবধি!
সে যমুনা আজি সেথা ছুটিতেছে কুলু কুলু,
প্রেমেতে গলিয়া যেন প্রাণখানি ঢুলু ঢুলু!
নিরমল স্বচ্ছ নীর এখনো প্রেমের ক্ষীর,
শ্যামের সোহাগ-স্রোত এখনো বহিছে ধীর!
এখনো সে প্রেমরাগ লেখা আছে নদী-গায়,
এখনো সে প্রেমগান নাচিয়া যমুনা গায়!
এখনো তেমন নদী বিহগের কলরোলে,
উষার কনক-করে সুনীল ঘোমটা খুলে;—
এখনো তেমন নদী ব্রজ-বালা-পদ চুমি
শু'য়ে আছে কোলে করি পুণ্যময় ব্রজভূমি,
এখনো অতীত স্মৃতি ডেকে আনে অনুরাগে,
এখনো রঞ্জিয়া উঠে প্রভাতে কনক-রাগে!

গোপীর চরণ-মুক্ত অলক্তের রক্তধারা
এখনো বহিয়া নদী প্রেম-গর্ব্বে মাতোয়ারা!
এখনো সে শ্যামলতা আছে যেন প্রাণ ধরি
নিষ্কাম পবিত্র শান্ত গোপী-প্রেম চুরি করি;
পাপিয়া কোকিল গায় মাতাইয়া কুঞ্জবন
পবিত্র মিলন-গান স্মরিয়া সে ব্রজধন!
বিশ্ব-জননীর কণ্ঠ আলিঙ্গিয়া বাহু-পাশে,
শারদ শশাঙ্ক-করে এখনো যমুনা হাসে।
এখনো সাধক যারা অবগাহি নদী-নীরে
হেরে সেই যুগ্ম-রূপ দাঁড়াইয়া নদী-তীরে।
নগ্ন চক্ষে শ্যামহীন হেরি সেই বৃন্দাবন,—
মনঃ চক্ষে যেন নাথ! হেরি সেথা শ্যামধন;
জুড়াই যমুনা-নীরে তাপিত পরাণ মোর,
হৃদয়ে প্রেমের ধারা বহে যেন নিরন্তর!

শ্রীযামিনীমোহন দাস।

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম

[১৪]

দলাদলি।

ধর্ম্ম হইলেই দলাদলি হয়। সভা হইলেই দলাদলি হয়। পাঁচ-জনে মিলিয়া কাজ করিতে গেলে মতান্তর হয়ই হয়, আর মতান্তর হইলে[illegible] দলাদলি হয়। দলাদলিটা দোষের কথাও বটে, দোষের কথা [illegible] বটে। দলাদলিতে যখন মূল কাজ পণ্ড হয়, তখন দোষের। যখন মূল কাজের শ্রীবৃদ্ধি হয়, তখন গুণের। যখন

দলাদলির মীমাংসা করিয়া দিবার লোক থাকে, তখন দলাদলিতে উপকার হয়। যখন মিটাইয়া দিবার লোক থাকে না, তখন উহাতে অপকার হয়। বৌদ্ধ-ধর্ম্মে যে দলাদলি হইয়াছিল তাহাতে ধর্ম্মের উন্নতিই হইয়াছিল; দুই দলই ধর্ম্মপ্রচারের জন্য কোমর বাঁধিয়া পৃথিবীর চারিদিকেই ঘুরিয়াছিলেন। একদল উত্তরে, একদল দক্ষিণে। তাঁহারা যে সব দেশে গিয়াছিলেন, তাহার অনেক দেশ এখনও বৌদ্ধ আছে। সুতরাং এতবড় একটা বড় দলাদলির ইতিহাসটা কিছু জানা চাই।

প্রথম কথা কি লইয়া দলাদলি হয়? অতি তুচ্ছ কথা! যাহা লইয়া দলাদলি হয়, পালিতে তাহাকে দশবত্থু বলে, সংস্কৃতে দশবস্তু। অর্থাৎ দশটি জিনিস লইয়া দলাদলির সূত্রপাত। যথা:—

(১) কপ্পতি, সিঙ্গিলোণ কপ্পো:—অনেক ভিক্ষু শিংয়ের পাত্রে একটু লুণ সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। তাঁহারা তো ভিক্ষা করিয়া খাইতেন? সব সময়ে তো লুণ দেওয়া ব্যঞ্জন পাইতেন না। আবার সেকালে সকলে সকলের লুণ খাইতেন না। লুণ না দিয়া ব্যঞ্জন রান্না হইত। তাই পরিবেশনও হইত। লোকে লুণ মিশাইয়া খাইত। এখনও অনেক খাঁটী হিন্দুর বাড়ীতে আলুণী ছক্কার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা বোধ হয় মনে করেন লুণ দিলেই "এঁটো" হয়। তাই পরিবেশনের সময় আলুণীই পরিবেশন করেন। পাতে লুণ থাকে, সেই লুণ মিশাইয়া লোকে 'এঁটো' করিয়া খায়। এইরূপ ব্যবহার বোধ হয় সেকালেও ছিল। লোকে ভিক্ষুদের রান্না জিনিস দিত, আলুণীই দিত। ভিক্ষুরা একটু লুণ সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন—তাও রাখিতেন শিংয়ে অর্থাৎ যাহার দাম নাই, কুড়াইয়া যথেষ্ট পাওয়া যায়। তখন ত আর Bone-Millএর এত দরকার হয় নাই! এই যে সামান্য কথা ইহা লইয়াই ঘোর দলাদলি উপস্থিত হইল। যাঁহারা কড়া ভিক্ষু, তাঁহারা বলিলেন ভিক্ষুর আবার সঞ্চয়? তাহা হইলে আর ভিক্ষু রহিল না, গৃহস্থ হইয়া

গেল। যাঁহারা তত কড়া ভিক্ষু নন, তাঁহারা বলিলেন, একটু লুণ সঞ্চয় করিলাম তাতে বহিয়া গেল কি? আমরা কি কিছুই সঞ্চয় করি না! আমাদের পাত্র আছে, চীবর আছে, শয়ন আসন এসব তো আমাদের থাকে, একটু লুণ থাকিলেই সর্ব্বনাশ হইয়া গেল? এই আপত্তির নাম সিঙ্গিলোণ কপ্পো।

(২) কপ্পতি দ্বঙ্গুল কপ্পো:—বুদ্ধদেব নিয়ম করিয়া গিয়াছিলেন, বেলা ঠিক দুই প্রহরের পর কোন ভিক্ষু আহার করিতে পারিবে না। ১২টা বাজিবার পূর্ব্বে সকলকেই আহার সারিয়া লইতে হইবে, ১২টা বাজিলে পর আর কেহই আহার করিতে পারিবে না। তাহার পর যদি খাইতে হয় তো জল ও ফলের রস খাইতে হইবে। কিন্তু ইহারা তো ভিক্ষু, ভিক্ষা করিয়া রান্না ভাত আনিয়া তো খাইতে হইবে? একালের মত তো আর স্কুল, কালেজ, আফিস ছিলনা, যে ৯টার মধ্যে ভাত চাই! সেকালের লোকে খাইত বেলায়, রাঁধিতও বেলায়। ভিক্ষুরা সেই বেলার রান্না ভিক্ষা করিয়া আনিয়া খাইত। দুপুরের আগে খাইতে হইবে দুপুরের পর এক গ্রাসও খাইবার হুকুম নাই। সুতরাং অনেকের খাওয়া হইত না, অনেকের আধ-পেটা হইত। তাই তারা মনে করিত, দুই প্রহরের সময় ছায়া যেরূপ থাকে, তাহা হইতে দুই আঙ্গুল ছায়া সরিয়া গেলেও খাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু কড়া ভিক্ষুরা বলিলেন, সে কখন হতে পারে না। মহাপ্রভুর আজ্ঞা দু'প্রহরের পূর্ব্বে খাইতে হইবে, সে আজ্ঞা কি আমরা লঙ্ঘন করিতে পারি! সুতরাং মতান্তর হইল, দলাদলির একটা কারণ হইল।

(৩) কপ্পতি গামান্তর কপ্পো:—ভিক্ষুরা একই গ্রামে ভিক্ষা করিবে, একদিনে দুই গ্রামে যাইতে পারিবে না, নিয়ম ছিল। কোন কোন ভিক্ষু মনে করিতেন, যদি গ্রামান্তরে নিমন্ত্রণ হয়, আগে স্বগ্রামে ভিক্ষা [illegible] খাইয়া গেলে দোষ কি? প্রথমতঃ দু'বার খাওয়া দোষ, দ্বিতীয় দোষ আগে স্বগ্রামে খাইয়া, গ্রামান্তরে নিমন্ত্রণ গেলে, যে

বেচারা নিমন্ত্রণ করিয়াছে, তাহার রান্না অন্নব্যঞ্জন সব ফেলা যায়। কারণ ভিক্ষুরা তো একবার খাইয়া গিয়া আবার সব জিনিস খাইয়া উঠিতে পারেন না; সুতরাং বুদ্ধদেব নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন যে গ্রামান্তরে নিমন্ত্রণ যাইলে ঘরে খাইয়া যাইতে পারিবে না। কড়া ভিক্ষুরা বলিলেন, এ নিয়ম ঠিক। অন্যে বলিলেন, গ্রামান্তরে যাইতে হইলে যদি পেটে কিছু না থাকে তাহা হইলে যাইতে বড় কষ্ট হয়। সুতরাং কিছু খাইয়া গেলে দোষ কি? এও একটা বিবাদের কারণ।

(৪) কপ্পতি আবাসকপ্পো:—এখানে আবাস শব্দের অর্থ লইয়া একটু গোলযোগ আছে। এক এক মঠে অনেক ভিক্ষু বাস করিতেন। যাঁহারা এক ঘরে বাস করেন তাঁহাদের এক আবাস। আবাস শব্দের অর্থ ঘর। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে আবাস শব্দের অর্থ পরগণা বা ডিহি। বুদ্ধদেব নিয়ম করিয়াছিলেন যে, এক জায়গার যত ভিক্ষু থাকিবে, সব এক জায়গায় আসিয়া উপোষথ করিবে। উপোষথ শব্দের অর্থ উপবাস, বাঙ্গলায় যাহাকে উপোষ বলে। সংস্কৃতে দুই এক জায়গায় উপবসথ শব্দ পাওয়া যায়, তাহা হইতে উপোষথ হইয়াছে। বৌদ্ধশাস্ত্রে ক্রমে উ লোপ হইয়া পোষথ বা পোষধ হইয়াছে। জৈন ভাষায় আবার ষ, ধ, লোপ হইয়া শুধু পো হইয়া দাড়াইয়াছে। তাহাদের ধর্ম্মে একটা পো-শালা আছে, সেখানে সকলে আসিয়া পোষধ ব্রত ধারণ করেন অর্থাৎ উপোষ করিয়া ধর্ম্মকথা শ্রবণ করেন। অষ্টমী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা এই কয়দিন পোষধের দিন। বুদ্ধদেব নিয়ম করিয়াছিলেন এক আবাসের লোক একজায়গায় পোষধ করিবে। কিন্তু কেহ কেহ বলিলেন, এ নিয়ম বড় কড়া, যাহার যেখানে ইচ্ছা, সে সেখানে পোষধ করিবে। বৃদ্ধেরা বলিলেন, তাহা হইতে পারে না, তথাগতের আজ্ঞা মানিয়া চলিতেই হইবে। আর সকলে বলিলেন, পৃথক পৃথক হইয়া পোষধ করিলে, উপাসকদিগের সুবিধা হয়, তাহাদের

ধর্ম্মকথা শুনাইবার সুবিধা হয়, এবং তাহাতে ধর্ম্মবৃদ্ধি হয়। বৃদ্ধেরা বলিলেন, সকলে একত্র বসিয়া উপবাস করিলে, লুকাইয়া খাইবার সুবিধা হয় না, পৃথক পৃথক উপবাস করিলে সেটা হওয়ার সুবিধা হয়। সেজন্য আবার ভিক্ষুদের দেখিবার দরকার হয়। সুতরাং ইহা একটা বিবাদের কারণ হইল।

(৫) কপ্পতি অনুমতি কপ্পো:—বৌদ্ধদের সকল কর্ম্মই সঙ্ঘে নির্ব্বাহিত হইত, অর্থাৎ এক বিহারের যত ভিক্ষু সকলে একত্র বসিয়া (ভোট লইয়া) বিহারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। সকল ভিক্ষু উপাস্থত না থাকিলে, কোন কোন বিহারের ভিক্ষুরা অনুপস্থিত ভিক্ষুদের অনুমতি পাওয়া যাইবে, এইরূপ মনে করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া লইতেন। এ বিষয়ে যে মতামতি হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। একদল বলিবেন, "অনুপস্থিতেরা যে তোমাদের হইয়া মত দিবেন একথা তোমরা কি করিয়া ভাব।" আর একদল বলিবেন, "তাহারা তো উপস্থিত ছিলেন না, আমরা কি করি, কাজ তো ফেলিয়া রাখা যায় না।"

(৬) কপ্পতি অচিন্ন কপ্পো:—গুরু করিয়া গিয়াছেন আমিও করিব। পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে ইহাতে দোষ কি? বৃদ্ধেরা বলিবেন, তথাগতের যাহা উপদেশ তাহার তো ব্যতিক্রম হইবার জো নাই। তোমার গুরু কোথায় কি করিয়া গিয়াছেন, সেটা তো আর তথাগতের উপদেশের বিরুদ্ধে প্রমাণ হইবে না। অতএব তোমাকে সে কার্য্যটি ছাড়িতে হইবে। সে বলিল, বাঃ, বরাবর চলিয়া আসিতেছে, আমার গুরুও করিয়া গিয়াছেন, আমি করিলেই দোষ হইবে, সুতরাং ইহা লইয়া বিবাদের একটা কারণ হইল।

[illegible] কপ্পতি অমথিত কপ্পো:—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে দুপ্রহরের পর [illegible] জল ও ফলরস খাইতে পারিবে। ঘোলটাকে ভিক্ষুরা রস [illegible]লিয়াই মনে করিতেন। ঘোল খাওয়ায় তাঁহাদের দোষ ছিল না দই মওয়া হইলে তবে তো ঘোল হয়! অনেক ভিক্ষু দইয়ে

জল দিয়া পাতলা করিয়া তাহাকে ঘোল বলিয়া খাইতেন। এই যে 'আমওয়া' দই এটা ভিক্ষুদের পক্ষে নিষিদ্ধ। অনেক ভিক্ষু বলিলেন, এ নিষেধের কোন মানে নাই। এ জিনিসটা তো দইয়ে জল দিয়া তৈয়ারী হইয়াছে, ঘোলও জল দিয়া তৈয়ারী হয়। একটা 'মওয়া', একটা 'আমওয়া'। এতে আর এতই তফাৎ কি? বৃদ্ধেরা বলিলেন, বেশ তফাৎ আছে। একটাতে মাখনটা থাকিয়া যায়, আর একটাতে থাকে না। মাখন তো ফলের রসও নয়, জলও নয়, সুতরাং সেটা তো খাওয়া উচিত নয়। সুতরাং মাখন খাওয়াও যা, 'আমওয়া' দই খাওয়াও তা। এ কার্য্যটি একেবারেই করা উচিত নয়। সুতরাং এটাও একটা বিবাদের কারণ।

(৮) কপ্পতি জলোগী কপ্পো:—মদ গাঁজিয়া উঠিবার পূর্ব্বে জল বলিয়া সেইটাকে খাওয়া। অর্থাৎ তাড়ি হইবার পূর্ব্বে ঝাঁঝ-ওয়ালা রস খওয়া। ইহা লইয়াও দলাদলি হইল। বৃদ্ধেরা বলিলেন, "ওতো মদ। মদ খাওয়া ভিক্ষুদের নিষেধ। সুতরাং মদ হওয়ার পূর্ব্বে উহাকে খাইলে পেটে যাইয়া মদ হইবে।" অপরে বলিলেন, "আমরা তো মদ খাইলাম না, তথাগতের আদেশ তো পালন করিলাম, পেটে যাইয়া মদ হইলে আমরা কি করিব।"

(৯) কপ্পতি অদশকং নিষীদনং:—নিষীদন শব্দের অর্থ আসন। আর দশা শব্দের অর্থ কাপড়ের ছিলে। যে আসনের ছিলে না থাকে, বৌদ্ধদের তাহাতে বসিতে নাই। ছিলেগুলি কাটিয়া ছাঁটিয়া দেখিতে যে সুন্দর আসন হয়, তাহাতে [illegible] ভিক্ষুদের [illegible]ষেধ। ভিক্ষুরা অনেকে চা'ন এইরূপ সুন্দর আস[illegible] বসিতে। বৃদ্ধেরা বলেন, তাহাতে ভগবানের যে আজ্ঞা আছে 'উচ্চাসনে বা মহাসনে বসিবে না', সে আজ্ঞা লঙ্ঘন হয়। অতএব ছি[illegible]কাটা আসনে বসিতে নাই। বিরুদ্ধবাদীরা বলিলেন, ছিলা কা[illegible] আর না কাটিলাম তাহাতে কি আসিয়া গেল? আমরা উচ্চ[illegible]নেও

বসিতেছি না, মহাসনেও বসিতেছি না। তবে আমরা ভগবানের আজ্ঞা কি করিয়া লঙ্ঘন করিলাম।

(১০) কপ্পতি জাতরূপরজতন্তি :—সোণারূপা গ্রহণ করা বুদ্ধদেবের আদেশে ভিক্ষুদের নিষেধ। কিন্তু বৈশালীর ভিক্ষুরা ছলে ও কৌশলে সোণারূপা লইতেন। কিরূপে লইতেন তাহার উদাহরণ দেখুন। তাঁহারা উপোষথ-শালায় একটি জলপূর্ণ পাত্র রাখিতেন এবং উপাসকদের বলিতেন, তোমরা এই জলে কার্ষাপণ কাহাপন বা কাহন ফেলিয়া দাও। তাহারা ফেলিয়া দিত, ভিক্ষুরা সোণারূপা ছুঁইতেন না, কিন্তু আপনাদের লোক দিয়া সেগুলি তুলিয়া লইয়া খরচ করিতেন। কার্ষাপণ বলিতে সেকালে চৌকা চৌকা তামার পয়সা বুঝাইত। বৃদ্ধেরা বলিলেন, ইহার দ্বারা বুদ্ধের আজ্ঞা লঙ্ঘন হইল। অন্য ভিক্ষুরা বলিলেন, আমরা তো ছুঁইলাম না, কি করিয়া বুদ্ধদেবের আজ্ঞা লঙ্ঘন হইল। সুতরাং এটিও বিবাদের কারণ হইল।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর ঠিক এক শ বৎসর অতীত হইয়া গেলে, বৈশালীর ভিক্ষুরা বিশেষতঃ যাহারা বজ্জী বংশে জন্মিয়াছিল, তাহারা এই দশ বস্তু চালাইবার চেষ্টা করিতেছিল। এমন সময় যশ নামে একজন ভিক্ষু বৈশালীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাদিগের দশবস্তু চালাইবার চেষ্টা যে ধর্ম্মবিরুদ্ধ এ বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ রহিল না। তিনি প্রথমেই মহাবনবিহারে উপোষথ-শালায় দেখিলেন একটা ধাতুপাত্রে জল রহিয়াছে, উপাসকেরা তাহাতে কাহাপন দিতেছে। তিনি বলিলেন, এটা বড় দোষের কথা। তিনি উপাসকদিগকে বারণ করিয়া দিলেন, তোমরা দিও না। বৈশালীর ভিক্ষুরা খুব চটিয়া গেল। তাহারা নানারূপে তাঁহার উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। তিনি পলাইয়া কৌশাম্বী গেলেন। এবং সেখান হইতে পাবা ও অবন্তীতে ভিক্ষুদের নিকট লোক পাঠাইয়া দিলেন ও নিজে অহোগঙ্গ পর্ব্বতে গমন করিলেন। সম্ভূত শোন-

বাসী অহোগঙ্গ পর্ব্বতে বাস করিতেন। যশ তাঁহার নিকট সকল কথা বলিলেন। ক্রমে পাবা হইতে ৬০ জন ও অবন্তী হইতে ৮০ জন ভিক্ষু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির হইল যে রেবত সকলের চেয়ে প্রাচীন ও সকলের চেয়ে বিদ্বান। তাঁহাকে এ কথা জানান যাক। তিনি তক্ষশীলার নিকট বাস করিতেন। সহজাতি নামক স্থানে রেবতের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। রেবত শুনিয়া বলিলেন, এ দশটাই ধর্ম্মবিরুদ্ধ এবং এই দশটাই উঠিয়া যাওয়া উচিত। বৈশালীর ভিক্ষুরা তাঁহাকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন এবং তাঁহার এক শিষ্যকে বশ করিয়া ফেলিলেন। রেবত তাঁহাদের কথা শুনিলেন না এবং শিষ্যটিকে বিদায় করিয়া দিলেন। বৈশালীর ভিক্ষুরা পাটলীপুত্রের রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইল না।

সহজাতিতে ১১৯০ হাজার ভিক্ষু আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কিন্তু রেবত বলিলেন, যাহারা এ বিবাদ উপস্থিত করিয়াছে তাহাদের সম্মুখেই এ বিবাদের নিষ্পত্তি হওয়া উচিত। অতএব তোমরা বৈশালী চল। সেখানে রেবত দেখিলেন যে লোকে বাজে কথা কহিয়া সময় নষ্ট করিতেছে। সুতরাং তিনি প্রস্তাব করিলেন উব্বাহিকা করিয়া ইহার নিষ্পত্তি কর। অর্থাৎ আটজন লোককে বাছিয়া লইয়া তাহাদের হাতে নিষ্পত্তির ভার দাও। ৮ জন বড় বড় ভিক্ষু বাছিয়া লওয়া হইল। ইহাদের সকলেরই বয়স এক শতের উপর। ইহারা সকলেই তথাগতকে দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই দশবস্তুর বিরুদ্ধে মত দিলেন। ক্রমেই সে মত প্রচার হইল। যাঁহারা সে মত গ্রহণ করিলেন, তাঁহাদের নাম হইল স্থবিরবাদী অথবা থেরাবাদী। যাঁহারা গ্রহণ করিলেন না, তাঁহাদের নাম হইল মহাসাঙ্গিক। এইরূপে বুদ্ধদেবের মৃত্যুর একশত বৎসর পরে দশটি সামান্য কথা লইয়া ঝগড়া হইয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মে [illegible] দল হইয়া গেল।

শ্রীহরপ্রসাদ [illegible]স্ত্রী।

বৃন্দাবনে

[বাঁশী ও কবি]

বাঁশী। সেই আমি সেই আমি
আর নহে কেহ।
রাধা রাধা রাধা রাধা
আধা মোর দেহ।

কবি। কোথা বাজে ও বাঁশরী?
যমুনার তীরে
মৃদু মৃদু মধু মৃদু
ধীর সমীরে।
আয় লো ললিতে আয়
আয় চন্দ্রাবলী,
শোন কি মধুর ভাষে
বঁধুর মুরলী।

বাঁশী। সেই আমি, সেই আমি,
আর নহে কেহ।
লো নব অঙ্গিনী সব
তোরা শুধু দেহ।
ওলো পাত্র ভেদে বারি যথা
নীল পীত সিত,
সই, আমারি মাধুরী তোরা
নোস্ গরবিত।
ওলো হয়েছিনু হইয়াছি ;—
আর যাহা হব,

ও সেই পুরাণো সোণায় গড়া
নিত্য অভিনব।

কবি। আয় আয় গোপবধূ
তোদের ভাগ্যে নাহি ওর
শুনায় গোপন কথা
মোর গোপেন্দ্র কিশোর!
আয় লো বিশখা আয়
আয় চন্দ্রকলা,
বাসন্তী যামিনা রাজে
মোর বঁধু উতলা!
সরম ভরম ত্যজি
আও গোপ নারী
ঐ শ্যাম যমুনায় ডারি
ঐ কনক গাগরী
রুনি ঝুনি রুনি ঝুনি
আইস কিশোরী,
রাধা বোলে সাধা
ডাকে মোর শ্যামের বাঁশরী।

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

মায়ের দেখা

জননী তুমি কখন এসে দাঁড়ালে,
শিউলি বনে ছায়ার আধ-আড়ালে ?
কমল মুখে মধুর হাসি
অরুণ ভাঙ্গা সুধার রাশি,
ভুবন ভরে কেমন করে ছড়ালে,
দূর্ব্বাদলে চরণখানি বাড়ালে ?

ভোরের আলো অমিয়াসরে নাহিয়া,
মেঘেরা চলে ধরণী পানে চাহিয়া।
তোমার দু'টি চরণ-রাগে,
দীঘির বুকে কমল জাগে,
ঘুমের চোখে পাখীরা উঠে গাহিয়া ;
শিশির ঝরে ধানের শীষ বাহিয়া।

নয়নে তব করুণা সুধা উছলে !
উজল দিঠি কোমল ঘন কাজলে।
ভ্রমর পড়ে চরণ-গীতা,
বরণ করে অপরাজিতা,
কামিনী বন কুসুম ঢালে আঁচলে,
সীঁথিতে শুক তারকামণি উজলে !

উদয়গিরি অস্তগিরি ঘিরিয়া,
সজল চোখে কাহারা দেখে ফিরিয়া ?
ধবল গিরি কনক চূড়ে
কাহার জয়পতাকা উড়ে ?

উঠিছে দিশি শঙ্খনাদে ভরিয়া।
রচণ ঘিরি কুসুম পড়ে ঝরিয়া!

রিক্ত করে সিক্ত চোখে দাঁড়ায়ে,
ছিলে গো দেবি, যুগল বাহু বাড়ায়ে,
ঘুচায়ে আজি চিত্ত-মসী
কে দিল হাতে দীপ্ত অসি,
বিল্বদল চরণতলে ছড়ায়ে,
গলায় দিল জবার মালা জড়ায়ে?

সেজেছে মাগো এবার ভাল সেজেছে,
মূরতি হেরি হৃদয়বীণা বেজেছে।
মিলিছে কেশ জলদজালে
দীপিছে রবি বিমল ভালে
আঁধার ভাঙ্গি নূতন আলো এসেছে—
শঙ্কাহর ডঙ্কা তব বেজেছে!

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

প্রেম ও পরিণয়

[গোবর গণেশের গবেষণা ।]

ভবের হাটে সকলেই বেচাকেনা করিতে আসে। এখানে হরেক রকমের কারবার চলিতেছে। যাহাকে আমরা সংসার বলি তাহাও এক রকম কারবার—একটি ফারম্‌বিশেষ। এই ফারমের সাইন-বোর্ডে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে—"কর্ত্তা গিন্নী এণ্ড কোম্পানি"।

এই কারবারের মূলধন হচ্চে দাম্পত্যপ্রেম বা মধুর রস। Capitalist Partner রূপে স্ত্রীকেই এই মূলধন যোগাইতে হয়; তাঁহার পুঁজীতেই এই কারবার চলিয়া থাকে। স্বামী হচ্চেন Working Partner অর্থাৎ শূন্য অংশীদার। সুতরাং তিনি সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত খাটিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইবেন। তাঁহার এই সকল ঘর্ম্মবিন্দু ঘনীভূত ও crystalised হইয়া যথাসময়ে মণিমুক্তার আকারে তাঁহার অংশীদারের শ্রীঅঙ্গের শোভা সম্পাদন করিবে। স্বামীর ইহাই ন্যায্য লভ্যাংশ; তিনি ইহার অধিক দাবী করিতে পারেন না,—করিলে ধনী চটিয়া গিয়া মূলধন তুলিয়া লইয়া কারবার বন্ধ করিয়া দিবেন।

লাভের ভাগ লইয়াই অংশীদারদের মধ্যে মনোমালিন্য ও বিরোধ হয়। কর্ত্তা গিন্নী কোম্পানির মধ্যে এইরূপ বিরোধের নামান্তর হচ্চে দা[illegible]পত্য-কলহ। ইহার বহ্বারম্ভ হইলেও ক্রিয়া অতি লঘু, তাই রক্ষা। বিরহান্তে মিলনের ন্যায় কলহান্তে আলিঙ্গনেই সকল গোলযোগ মিটিয়া যায়। তখন কারবার আবার জোরে চলিতে

[illegible] কারণে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে বিরোধ ঘটে তাহা সকলেরই [illegible]বিয়া দেখা উচিত, যেহেতু এই বিরোধে সংসারের শান্তি নষ্ট

হয়। আমিও এসম্বন্ধে কিছু গবেষণা করিয়াছি। খৃষ্টানী মতে ভগবান আদিমানুষের পঞ্জর হইতে রমণী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এটা কেবল কথার কথা। আমরা সকলেই স্ত্রীকে স্তোক দিয়া বলিয়া থাকি—"তুমি আমার বুকের কল্‌জে।" ফলতঃ স্ত্রী যদি পুরুষের বুকের কলিজা বা পাঁজর হইত, তাহা হইলে সংসারে দাম্পত্য কলহের অস্তিত্ব থাকিত না।

কোরাণ সরিফে লেখে যে স্ত্রীলোকের মধ্যে আত্মা নাই। সুতরাং মুসলমানী মতে স্ত্রী হচ্চে প্রাণহীন পুত্তলিকাবিশেষ। এটি ওয়াজিব্ কথা। অনেক ঘরে দেখিতে পাওয়া যায়, রমণী যেন পুরুষের হাতে কলের পুতুল; পুরুষ এই মাটির পুতুলকে ইচ্ছামত ভাঙ্গিতে গড়িতে ও নাচাইতে পারে। আর এক কারণেও মনে হয় স্ত্রীজাতির মধ্যে আত্মা নাই। আমরা পুরুষ মানুষ—আমাদের আত্মা আছে; তাই আমরা জগতের যতকিছু ভাল জিনিস সর্ব্বাগ্রে নিজেদের গ্রাসে দিয়া বসি—অর্থাৎ আত্মার ভোগ লাগাই। রমণী কিন্তু ভাল জিনিস নিজের মুখে না দিয়া পরের মুখে তুলিয়া দেয়। তাহার ভিতরে আত্মা থাকিলে সে কখনই এরূপ করিতে পারিত না। সুতরাং প্রমাণ হইল যে রমণীর আত্মা নাই। এখন তাহাকে এই কথাটি বুঝাইয়া দিতে পারিলেই সংসারের সকল গণ্ডগোল চুকিয়া যায়। তাহার আত্মপ্রতিষ্ঠা বা self-assertionএর চেষ্টা হইতেই দাম্পত্য-কলহের উৎপত্তি হয়। যাহার আত্মা নাই, তাহার আবার আত্মপ্রতিষ্ঠা! যার মাথা নাই তার মাথাব্যথা!

তবে আত্মার অভাব পূরণ করিবার জন্য ভগবান [illegible]র বুকের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড হৃদ্‌পিণ্ড (hypertrophied heart) দিয়াছেন। স্ত্রীলোকের এই জাতিগত হৃদ্‌রোগের জন্য পুরুষের সঙ্গে তাহার অনেক সময় বিরোধ বাধে। রমণী-হৃদয় পুরুষের [illegible]স্পর্শে আলোড়িত হয়। এই হেতু স্বামীর কোনরূপ বেচাল দেখি[illegible] স্ত্রীর প্যাল্‌পিটেশন ও হিষ্টিরিয়া হয়। নারী-হৃদয় প্রস্তরবৎ নিস্পন্দ [illegible]লে

পুরুষের সহস্র ত্রুটিবিচ্যুতিতেও সংসারে অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত না।

রমণীগণ সামান্য খুটিনাটি লইয়া পরস্পরে খেয়োখেয়ি করিতে বিশেষ মজবুত, একথা পাঠিকাগণ স্বীকার করিবেন কি না বলিতে পারি না। স্ত্রীলোকদের কথায় কথায় মতভেদ ও ঝগড়া হয়, ইহা সকলেই জানে। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, একটি বিষয়ে জগতের সকল স্ত্রীলোক একমত। তাঁহারা সকলেই বলেন, স্বামীর দোষেই স্ত্রী বিগড়াইয়া যায়। রাস্কেল স্বামী বাহিরে চরিয়া রোজ রাত্র ১টার সময় বাড়ী আসে বলিয়াই তাহার স্ত্রী দুষ্টা হয়। স্বামী বেচারা বলিবে, তাহার স্ত্রী দুষ্টা বলিয়াই তাহাকে বাহিরে চরিয়া বেড়াইতে হয়, কারণ সংসার তাহার কাছে শ্মশান। এখন প্রশ্ন হচ্চে এই যে, দোষ কোন্ পক্ষে? পুরুষ পক্ষে, না স্ত্রী পক্ষে? আমি দুষ্ট পুরুষদিগকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগকে not guilty বলিব; এবং বিগড়ান স্ত্রীদিগকে দুই ভাগ করিয়া এক ভাগের স্কন্ধে ষোল আনা দোষ চাপাইব।

কেহ কেহ বলেন, Jealousy বা ঈর্ষাতে দাম্পত্য প্রেমের রঙ্ চড়াইয়া দেয়, তাহাতে প্রেমের পাথারে তরঙ্গ তোলে। আমি বলি, ইহা হইতে ঝড় তুফান পর্য্যন্ত আসিতে পারে এবং তাহাতে দাম্পত্য সুখের ভরাডুবিও হইতে পারে। ঈর্ষা হচ্চে ব্যক্তিবিশেষের প্রকৃতিগত দোষ। কি পুরুষ, কি রমণী, ঈর্ষার আগুন যাহার ভিতর থাকিবে, বুঝিতে হইবে, সে নিশ্চয়ই বিবাহের পূর্ব্বে ভাই-ভগ্নীকে ঈর্ষা করিয়াছে, এবং বিবাহের পর দাম্পত্য জীবনে এই আগুন জ্বালাইয়া সংসারের শান্তি নষ্ট করিবে; এবং বার্দ্ধক্যে সে পাত্রাভাবে পুত্রকন্যার উপরেও ঈর্ষা করিতে ছাড়িবে না। কবিরাজেরা বলেন যে, [illegible]ক আগুনে চড়াইলে বিষ হয়। আমি বলি মধুর রসকে ঈর্ষার [illegible]গুনে উত্তপ্ত করিলে তাহাও বিষে পরিণত হয়।

[illegible]ম্পত্য সম্বন্ধের মধ্যে কৃতজ্ঞতার দাবী চলে না। স্বামী যদি

স্ত্রীর কোন উপকার করেন, এবং সেজন্য তিনি যদি কৃতজ্ঞতার দাবী করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ঠকিতে হইবে। এই দাবী না করিলে হয় ত স্ত্রী যথেষ্ট প্রেমদানে তাঁহার নিকট অঋণী হইবেন। কৃতজ্ঞতার দাওয়া হচ্চে প্রেমের দম্বল—তাহাতে মধুর রস একদম টক্ হইয়া যায়। স্ত্রীপুরুষ উভয়ের পক্ষেই একথা খাটে। খাতক-মহাজনের সম্বন্ধও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্থান পায় না। সুরসিক ফরাসী লেখক ম্যাক্স্-ও-রেল দাম্পত্য-তত্ত্বের কিছু গবেষণা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, অর্দ্ধাঙ্গিনীকে টাকা ধার দিয়া তাহার জন্য কখনও তাগাদা করিবে না, বা তাহা ফিরিয়া পাইবার প্রত্যাশা রাখিবে না। বরং যদি তোমার স্ত্রী তাহা ফেরত দেন, তাহা হইলে সেই টাকা দিয়া একখানি সুন্দর গহনা গড়াইয়া তাঁহাকেই হাস্যমুখে উপহার দিবে। এইরূপ করিলেই মধুর রস ওতপ্রোত থাকিবে এবং তোমার প্রাপ্যগণ্ডা সুদে আসলে আদায় হইবে।

ইতর জীবজন্তুর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, স্ত্রী কুরূপা এবং পুরুষ সুন্দর। সিংহীর কেশর নাই সিংহের আছে। ময়ূরের সৌন্দর্য্য ময়ূরীর অপেক্ষা অনেক অধিক। মুরগী দেখিতে নেড়াবোঁচা; কিন্তু মোরগের পালক ও চূড়ার বাহার ধরে না। ইহাতে মনে হয়, ইতর প্রাণীর মধ্যে ভগবান পুরুষের উপরে স্ত্রীর মনোহরণ করিবার ভারার্পণ করিয়াছেন। কিন্তু মনুষ্যজাতির বেলায় তাঁহার বিধান অন্যরূপ। তিনি স্ত্রীলোককেই রূপ ও রমণোপযোগী গুণে ভূষিতা করিয়াছেন। তাই স্ত্রীজাতি সাজগোজ করিতে এত ভালবাসে। ইহা দেখিয়া, অল্পবুদ্ধি পাঠক হয় ত ঠিক করিয়া [illegible]বেন, পুরুষের চিত্তবিনোদন করিবার জন্যই রমণীর সৃষ্টি। আমি বহু গবেষণার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, রমণী পুরুষের জন্য বেশভূষা করে না। বোসেদের ছোট বৌ যে জড়োয়া গহনায় সর্ব্বা[illegible] ঢাকিয়া ঝক মারিতে থাকে, তাহা কেবল সরকারদের মেজ [illegible]র উপর টেক্কা দিবার জন্য—তাহার স্বামীর চক্ষু ঝলসিবার জন্য নহে। স্ত্রীলোক

বেশভূষার পরিপাটি করে অপর স্ত্রীলোকের ঈর্ষা উৎপাদনের জন্ত। ইহা করিতে পারিলেই সে তাহার সাজগোজ সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিবে। এইজন্ত পর্দ্দাপার্টিতে বড় ঘরের রমণীরা সাজগোজের চূড়ান্ত করিয়া আসেন; সেখানে ত পুরুষদৃষ্টির প্রবেশাধিকার নাই। স্ত্রীচরিত্রজ্ঞ রসিক ম্যাক্স ও-রেল বলিয়াছেন, "যদি কোনদিন পৃথিবী হইতে সকল স্ত্রীপুরুষ লোপ পাইয়া কেবল দুইটিমাত্র রমণী অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে ঐ দুইজনের মধ্যে তখন অবিরাম বেশভূষার সংগ্রাম চলিতে থাকিবে এবং তাহারা পোষাকের বাহারে পরস্পরকে পরাস্ত করিতে চেষ্টা করিবে।" ইহাই হচ্চে স্ত্রীচরিত্রের বৈচিত্র্য।

স্ত্রী অভ্রান্ত বা চালচলনে অত্যধিক খাঁটি হওয়া সুবিধা নয়। যে স্ত্রী তাঁহার স্বামীর কাছে ভুলচুক্ করিয়া অপ্রস্তুত হইতে জানেন না, তাঁহাকে লইয়া স্বামী সুখী হন না। এরূপ স্ত্রী যে খুব strict হইবেন তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি স্বামীর সামান্য ত্রুটিও উপেক্ষা করিবেন না, পান থেকে চূণ খসিলেই খড়্গহস্ত হইবেন। এহেন স্ত্রী যে গৃহে বিরাজ করিবেন, সে গৃহ যেন একটি বিচারালয়, স্বামী বেচারী যেন আসামী, এবং স্ত্রী যেন জজসাহেব—সর্ব্বদাই বিচারে বসিয়া আছেন। পুরুষ ও রমণীর পক্ষে সংসার হচ্চে পদে পদে পদচ্যুতির ক্ষেত্র। এখানে দুর্ব্বলা রমণী হামেষাই ভুল করিয়া বসিবেন এবং স্বামীর নিকট তজ্জন্য 'সাপরাধী' হইবেন; স্বামী তাঁহাকে চুম্বন দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন। স্বামীরই দণ্ডদাতা হওয়া উচিত; তাহাতে order ঠিক থাকে।

প্রেমরোগগ্রস্ত কোনও পুরুষ যেন রমণীর পদানত হইয়া করজোড়ে না বলে, "আমি তোমায় অত্যন্ত ভালবাসি"। যে আহাম্মক এরূপ করিবে সে কিছুতেই রমণীর ভালবাসা পাইবে না—কৃপা পাইতে পারে। প্রেম নিম্নগামী—ইহার ঊর্দ্ধপাতন অসম্ভব। কর্পূরাদি volatile পদার্থেরই ঊর্দ্ধপাতন হইয়া থাকে। প্রেমকে এইরূপ বস্তু মনে করিয়া ঊর্দ্ধপাতনের চেষ্টা করিলে তাহাও কর্পূরের

মত উবিয়া যাইবে। কৈলাসশিখরে বসিয়া মহাদেব পার্ব্বতীকে অঙ্কে লইয়া সস্নেহে প্রেম সম্ভাষণ করিতেন। আমার মনে হয়, ইহাই প্রেমজ্ঞাপনের সঠিক চিত্র। স্ত্রী উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবে, স্বামী নতমুখে স্ত্রীর পানে তাকাইবে; মধুর রস উর্দ্ধ হইতে নিম্নে পড়িবে—যথা চাতকিনীর মুখে বারিধারা। অতএব স্ত্রীর অপেক্ষা পুরুষের ধনে মানে, গুণে জ্ঞানে, বয়সে ও হাতে-ওসারে কিছু বড় হওয়া আবশ্যক। ম্যাক্স ও-রেল রমণীর পাণিগ্রহণ বিষয়ে এই পরামর্শ দিয়াছেন—"Marry her at an age that will always enable you to play with her all the different characteristic parts of a husband, a chum, a lover, an adviser, a protector, and just a tiny suspicion of a father."

দাম্পত্য প্রেম কলাবিদ্যানুশীলনের সহায় না অন্তরায়?—এই প্রশ্ন লইয়া বহুকাল হইতে অনেক বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। আমি বলি, ইহা ঘোর অন্তরায়। সুদক্ষ চিত্রকর নিভৃতে বসিয়া তন্ময় হইয়া চিত্র আঁকিতেছেন; সেখানে তাঁহার প্রণয়িণী আসিয়া তাঁহার গণ্ডে একটি উৎসাহসূচক চুম্বন দিয়া গেলে নিশ্চয়ই তাঁহার তুলির গতির ব্যতিক্রম হইবে। কথিত আছে, এক প্রসিদ্ধ কবি তাঁহার পাঠাগারে বসিয়া কালিকলম লইয়া একমনে কবিতা লিখিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার স্ত্রী আসিয়া ধোপার হিসাব লিখিবার জন্য তাঁহার হাত হইতে একবার কলমটি চাহিয়া লইয়া গেলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে কলম ফিরিয়া আসিল বটে; কিন্তু সে কলম হইতে আর কয়েক দিনের মধ্যে কবিতার অমৃত-নিস্যন্দিনী ধারা বাহির হইল না। স্ত্রীর অঞ্চলের হাওয়ায় কবিত্বের ব্যাঘাত জন্মে। এজন্য স্ত্রীকে কবি-স্বামীর কা[illegible] থেকে অনেক সময় তফাতে থাকিতে হয়। তাই কবিবর বায়রণ বলিয়াছেন, কবির অর্দ্ধাঙ্গিনী হওয়ার মত স্ত্রীলোকের দুর্ভাগ্য আর নাই। কোন রসিক পাঠক হয় ত জিজ্ঞাসা করিবেন, তবে রজকিনীর অঞ্চল সুঞ্চা[illegible] মহাকবি চণ্ডীদাসের কবিতা ফুটিয়া উঠিত কি করিয়া? উত্ত[illegible]সে যে "পরকীয়া"। পরকীয়া প্রেম আর্টের অন্তরায় নয়। ব[illegible]সমঞ্চ-

গুলি এ কথার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিতেছে। এই সকল রঙ্গমঞ্চে "পরকীয়া" পদাঘাতের নূপুর-নিক্কণে চৌষট্টি কলা ফুটিয়া ওঠে।

পুরুষ রমণী উদ্বাহের উদ্বন্ধন গলায় পরিলে বীণাপাণি তাহাদের প্রতি কিঞ্চিৎ বাম হন। স্বামী-স্ত্রীর সংসারে আর্ট-ফার্ট বেশী দিন টেঁকে না। দাম্পত্য জীবনের উপর লক্ষ্মী ও ষষ্ঠীর দৃষ্টিই ভাল। কেহ কেহ বলেন যে এখানে, বিশেষতঃ স্ত্রীর উপর, সরস্বতীর দৃষ্টি তত বাঞ্ছনীয় নহে। সংস্কারবাদী বলিবেন, খনা গার্গী লীলাবতীর মত রমণী বঙ্গের ঘরে ঘরে শোভা পাওয়া কর্ত্তব্য। তা'হোলেই ত চক্ষুস্থির! মার্কিণদেশে অনেকটা এই ভাব হইয়া আসিতেছে। কিছুদিন হইল একজন মার্কিণ সাহেব অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের দেশে মেয়ে ডাক্তার, মেয়ে উকিল-ব্যারিষ্টার, মেয়ে সম্পাদক, মেয়ে লেখক ও মেয়ে বক্তার সংখ্যা খুব বাড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু "মেয়ে স্ত্রীলোক" বা female women এর সংখ্যা বিলক্ষণ কমিয়া আসিতেছে। ম্যাক্স-ও-রেল বলিয়াছিলেন—"I would rather be the husband of a simple little dairymaid than that of a George Sand or a Madame de Stael!" বিদ্যারও মাদকতা আছে। এই মাদক সেবন করিলে স্ত্রীলোক সহজেই উন্মত্ত হইয়া পড়ে। পুরুষ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া চেষ্টা করিলে নেশা একেবারে ত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু স্ত্রীলোক নেশাকরা একবার অভ্যাস করিলে আর জীবনে সে অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারে না। অতএব অবলাকে বিদ্যা উদরস্থ করিতে হইবে সাবধানে টনিক ডোজে—যেন তাহাতে নেশা না হয়।

স্ত্রীপুরুষের যৌবনে দাম্পত্যপ্রেমের যেরূপ হেউঢেউ চলিতে থাকে, বয়স গড়াইয়া আসিলে তাহা মন্দীভূত হয়। অধিক বয়সে [illegible]রের সকল রসের সঙ্গে মধুর রসও শুকাইতে সুরু করে। ডবকা বয়সে যে পুরুষ তাহার স্ত্রীকে পলকে হারায়,

হয় ত পঞ্চাশের পরপারে গিয়া তাহার সেই স্ত্রীর জন্য আর ততটা থাকিবে না। প্রেমের নদীতে মাত্র একবার জুয়ার আসিয়া তাহাকে কাণায় কাণায় ভরিয়া তোলে; তারপর ভাঁটা পড়িতে আরম্ভ হয়। এই ভাঁটাই শেষজীবন পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। বার্দ্ধক্যের মরা গাঙ্গে আর ফিরে বান ডাকে না। যখন প্রথম ভাঁটার টান দেখা দেয়, তখন স্ত্রী হয় ত তাঁহার স্বামীর ব্যবহারের শৈত্যে কিছু ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন। বয়সদোষে স্বামীর ক্ষুধামান্দ্য হইয়া আসিতেছে, ইহা স্ত্রীর বোঝা উচিত। এ অবস্থায় রমণীর কর্ত্তব্য হচ্চে রকমারী উপাদেয় তেলাল-ঝালাল তরকারী প্রস্তুত করিয়া স্বামীর মুখের কাছে ধরিয়া তাঁহার রুচি-বৃদ্ধির চেষ্টা করা। তাহা না করিয়া তিনি যদি মানময়ী রাধে হইয়া অভিমানে বদন ফিরাইয়া বসেন, তাহা হইলে বেচারী স্বামীর প্রতি তাঁহার অবিচার করা হইবে।

অষ্টাদশ পুরাণের যুগে এদেশে বিবাহে পণপ্রথা প্রচলিত ছিল। তখন কন্যা বা কন্যার পিতা পণ না দিয়া পণ করিয়া বসিতেন; তাহা লইয়া সয়ম্বর সভা এবং লাঠালাঠিও হইত। তখন আসুরিক ও গান্ধর্ব্বাদি অনেক বিটকেল বিবাহ চলিত ছিল। তারপর মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দুধর্ম্ম যখন মধ্যাহ্নে মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তীব্র কিরণজাল বিস্তার করিয়া সমাজকে আলোকিত করিয়া তুলিল, তখন আমাদের স্বর্গীয় কর্ত্তারা মনুর মতে অষ্টমে গৌরীদান আরম্ভ করিলেন। এই সুন্দর সভ্য বিবাহ-প্রথা এতাবৎ নির্ব্বিবাদে চলিয়া আসিতেছিল। দুঃখের বিষয়, আজকাল এই বিবাহের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইতেছে। এখন ব্রাহ্মদিগের দেখাদেখি হিন্দুসমাজেও বিধবা বিবাহ, Love Marriage ও Late Marriage আসিয়া পড়িতেছে। যে মধুর রস এতদিন হিন্দু-বিবাহের পরবর্ত্তী ছিল, তাহা এখন তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইতেছে। সুতরাং পরিণয়াভিলাষী পুরুষ ও রমণীকে তাহাদের অর্দ্ধাঙ্গ নির্ব্বাচন বিষয়ে কিঞ্চিৎ পরামর্শ দেওয়া আবশ্যক।

কোন কোন পুরুষ স্ত্রীজাতিকে আদৌ দেখিতে পারে না। আমি ইহাদিগকে রমণীবিদ্বেষী পুরুষ বলি। এরূপ পুরুষকে কোন রমণীরই বিবাহ করা উচিত নয়। কোন কোন নির্ব্বোধ রমণী হয় ত বলিবেন যে, এরূপ নারী-বিদ্বেষী স্বামী পাইলে তাহার স্ত্রীকে আর ভবিষ্যতে কখনও ঈর্ষার আগুনে পুড়িতে হইবে না, যেহেতু এরূপ পুরুষের চোখে সকল স্ত্রীলোকই বিদ্বেষের পাত্রী। এটি নিতান্ত ভুল। সকল দিকে কৃপণ না হইলে পুরুষ রমণীবিদ্বেষী হয় না। এরূপ পুরুষকে স্বামীরূপে লাভ করিয়া স্ত্রী তাহার নিকট হইতে মধুর রস আদায় করিতে পারিবেন না। সুতরাং এ বিবাহ বিড়ম্বনা মাত্র। আমার মতে, ইহা অপেক্ষা নারীভক্ত পুরুষকেই বিবাহ করা কর্ত্তব্য। হয় ত এরূপ পুরুষ প্রেম বিলাইবার উদ্দেশে একাধিক রমণীর পশ্চাতে ধাবমান হইতে পারে। কিন্তু যে ভাগ্যবতী রমণী এহেন পুরুষপুঙ্গবকে স্বামীরূপে পাকড়াও করিয়া প্রেমের পিঞ্জরে পুরিতে পারিবেন, তিনিই জয়-পতাকা উড়াইতে সক্ষম হইবেন।

আবার যে রমণীকে বিবাহ করিতে চেষ্টা করিয়া অনেক পুরুষ ফেল হইয়াছে, তাহাকেও কোন পুরুষের বিবাহ করা কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু প্রেমান্ধ নির্ব্বোধ পুরুষগণ কি আমার এই অমূল্য উপদেশ গ্রাহ্য করিবে? একশ্রেণীর লোক আছে, যাহারা কেবল নিলামের সময়ই মালের কিম্মৎ বুঝিতে পারে; যে মাল তাহারা পূর্ব্বে দশ টাকায় লয় নাই, তাহা নিলামে চড়িলে তখন হয় ত একশ টাকায় ডাকিয়া বসিবে, এবং তাহা তাহার গলায় পড়িবে। এই শ্রেণীর পুরুষ Highest Bid করিয়া স্ত্রীকে ঘরে আনিয়া পরে হায় হায় করে। যখন এই স্ত্রী ভয়ানক ভালবাসিয়া তাহার স্বামীকে বলিবে,—"ওগো, তুমি মরে গেলে আমি আর একদণ্ডও বাঁচব না", তখন স্বামী [illegible]য়া বসিবে—"যদি তাই ভয় হয়ে থাকে, তবে তুমি না হয় [illegible]গেই সরে পড়।" ফারখতের অন্ত উপায় নাই।

শ্রীগোবর গণেশ দেবশর্ম্মা।

ভোগাতীতা

নহে নীরে, বঁধু-রূপে ভাসে আঁখি-তারা ;
নহে শোকে, প্রেম-যোগে যোগিনীর পারা।
নহে হাসি, দিব্য জ্যোতি বদনমণ্ডলে ;
নহে ফুল, তুলসীর মালা দোলে গলে।
শিরে বাঁধা চুলগোছা চূড়ার আকার,
চুপে চুপে বঁধু-নাম জপে অনিবার।
অঙ্গের লাবণি, নহে রূপের নিঝর,
সারা দেহে লুটে যেন প্রেমের লহর!
যে হেরে বালারে, তার নত হয় শির,
বঁধুর খেয়ান যেন ধরেছে শরীর!
বঁধুময়ী সে মূরতি হেরিয়া মদন
ফুল-ধনু ফেলি' লুটে ধরিয়া চরণ!
বাঁশী, হাসি, আলিঙ্গন—মিলনের দান,
ভোগাতীত করে হিয়া বিরহ মহান্!

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

অদৃষ্টের পরিহাস

ভাঙ্গা-গড়া।

১

বিলাসিনী বাপের বাড়ী ফিরিয়া আসিল। ভাদ্রমাস; একবার করিয়া মেঘ আকাশ ঘেরিয়া ফেলিতেছে, আবার, খররৌদ্রের আলোকে আকাশ নীল ও বাতাস তপ্ত হইয়া উঠিতেছে। বিলাসিনীর হৃদয়েও মেঘ ও রৌদ্রের বিলাস। একবার করিয়া নিরাশা, একবার করিয়া কত আশা!

পিতা চক্ষের জলে কন্যাকে বুকে টানিয়া লইলেন। বিলাসিনীর মুখে যে তারই মাতৃমুখচ্ছবি! নীরবে নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, 'কে জানে তোর কপাল এমন পুড়িল কেন?' তাহার দাদা মুখের দিকে তাকাইতে পারিল না; তাহার বৌ'দি 'ঠাকুরঝি কি হ'লো ভাই' বলিয়া গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সবাই কাঁদিল, কেবল বিলাসিনীর চক্ষে জল নাই। পক্ষ্ম দুটি সিক্ত, আঁখি রক্তাভ; দেহ বায়ুতাড়িত শীর্ণ পত্রের মত কাঁপিতেছে।

তাহার পর সকলেই চক্ষু মুছিল, বিলাসিনীও মুছিল। সংসারেও মেঘ ও রৌদ্রের খেলা যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতে লাগিল। কিন্তু মানুষের বুকের ভিতরে যে এক আগুন আছে, যে আগুনে মানুষ পুড়িয়া পুড়িয়া খাঁটী হয়, সে আগুন ধিকি ধিকি তেমনি জ্বলিতেছিল। মানুষ যে আগুন লইয়া ঘর করে!

২

পি[illegible] আগুন নিভিয়া আসিতেছিল। রুগ্ন বৃদ্ধ উন্মুক্ত বাতায়ন দিয়া [illegible]র আকাশের পানে চাহিয়া থাকিতেন; যেখানে সব ভস্ম

ফেলিয়া মানুষ ধোঁয়া হইয়া উড়িয়া যায়, পড়িয়া থাকে এই সংসারের সব।—বৃদ্ধ দেখিতেছিলেন একটি একটি করিয়া পারাবত উড়িয়া চলিয়াছে। বিলাসিনী দেখিতেছিল পার্শ্বের বাড়ীর প্রতিবেশীর দ্বিতল কক্ষে এক চিত্রকর চিত্র অঙ্কিত করিতেছে। রঙ তুলিকা চারিদিকে ছড়ান, চিত্রকর অনন্যমনে তাহার সেই ধ্যানের প্রতিমা গড়িতেছে। বিলাসিনীর বুকের ভিতর টিপ্ টিপ্ করিয়া উঠিল; তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল, একটা চাপা নিশ্বাস পড়িল। বিলাসিনী সেখান হইতে সরিয়া নিজের ঘরে গেল; মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার দাদার ছেলে মনু তাহার মাথার চুল ধরিয়া টানিতে লাগিল—ডাকিল 'পিছিমা!'—

৩

পিতা বলিলেন, 'আমার মৃত্যুর পর তুমি আছ; তুমি দেখ্‌বে, আমি বৃদ্ধ, রুগ্ন, শক্তিহীন, সমাজের সঙ্গে লড়াই করবার মত আয়োজন আমার নাই'। পুত্র বলিল, 'আমি কি বিলীকে বিলিয়ে দিতে বলছি! এ বিয়েতে আপনার অমত কেন, সমাজের ভয় আমার নেই! সমাজ আমার স্বস্তি, শান্তি কতটা দেখ্‌ছে, যে তার অনুশাসন আমায় মান্‌তে হবে? রাজা বিদেশী; সমাজের সঙ্গে তাঁর কোনই সম্পর্ক নেই। তিনি তাঁর তুলাদণ্ডে আমার ন্যায্য প্রাপ্য দিয়েছেন, তিনি ত আমার সমাজে আসেন নি, আমার তবে তুলাদণ্ড কোথায়? এ ক্রীতদাসের সমাজ চায় সকলেই হীন হয়ে থাকুক—হাজার হাজার বছর ধরে বামুনে এই করে এসেছে, তা বলে তাই মানতে হবে!" পিতা বলিলেন, 'মেনে এসেছি চিরকাল। ব্রহ্মচর্য্য ত্যাগে নষ্ট হয় এ কথা কখন বুঝি নি,—বুঝতে পারিনি; ঋষিদের মানি, আর মানি অদৃষ্ট। তাই ভাবি, ভাঙা কপাল কি আর জোড়া লাগে বাবা! মেয়ে সুখে থাক্ বা থাকবে এ কি বাপের ইচ্ছে নয়, তবে হোল কই?' পুত্র বলিল,

'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে-পতৌ'—

পিতা বলিলেন, 'জানি ঋষি উদার, দিব্য চক্ষুষ্মান! তবু কাল ধর্ম্মে স্মৃতিকে ফেল্‌তে পারি কই? আমি ত পা বাড়িয়ে রয়েছি বাবা, ঋষিবাক্যের বোঝা আমার মাথায়, সংসারের বোঝাও আমার মাথায়; তবে এখন অশক্ত বৃদ্ধ, ইচ্ছা হলেও পেরে উঠব কি? পুত্র বলিল, 'তুমি অনুমতি দাও, আমি—' পিতা বলিলেন, 'বিবেচনা করা উচিৎ, একের জন্য দশের না ক্ষতি হয়। সমাজধর্ম্ম দশকে বাঁচাইবার জন্য। সমাজের মুখ ত চাইতেই হবে। আমার কন্যা আমার সমাজ হইতে বড় কি! আর আমার কন্যা কি সমাজের কেউ নয়!' পুত্র নীরবে নিশ্বাস ফেলিল। বিলাসিনী দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইয়া সকলই শুনিল। ফিরিয়া দেখিল, আমড়াগাছের ডালে এক জোড়া ঘুঘু ঠোঁটে ঠোঁট মিলাইতেছে। বিলাসিনী ভাবিল— 'হতেও পারে।' দূরে পূর্ব্বপ্রান্তে অন্ধকার মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছিল; সেখান হইতে সন্ধ্যাতারকা জ্বল্ জ্বল্ করিয়া তাকাইয়া রহিয়াছে। বিলী ভাবিল, 'তারার কথা বলা যায় না, ও ত এখনি নিভ্‌তে পারে।'

পুত্রবধূ স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁগা, ঠাকুর কি বল্‌লেন?' পুত্র বলিল, 'ভাবিবার কথা; সমাজ কি বলবে।' বধূ বলিল, পোড়া সমাজ! সমাজ! এমন সোণার কমল যে ধূলোয় পড়ে শুখিয়ে গেল, পোড়া সমাজের ত চোখ নেই।' পুত্র বলিল, 'সমাজ যে পুরুষ!' বধূ চক্ষু মুছিয়া বিলাসিনীর কক্ষে গেল, বলিল, 'ঠাকুরঝি! শোন্, তোর মত আছে কি না বল?' বিলাসিনীর মুখ লাল হইয়া উঠিল; সে [illegible] চলিয়া গেল। পার্শ্বের বাড়ীর প্রতিবেশী সেই চিত্রকর যুবক তখন ছবি আঁকিতে আঁকিতে ঝিঁঝিট খাম্বাজে সুর ভাঁজিতেছিল

'মন চুরি যে করেছে, তারে কি সই পাব আর'

'কে রমণী? এস, আজ ক'দিন ধরে বুকের ভেতর বড় ধড়্ফড়্ করছে; খাঁচার ভেতর পাখী যেমন ছট্‌ফটিয়ে ওঠে। তুমি ভাল আছ বাবা?'

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার বুকটা একবার ভাল করে কাউকে দেখালে হয় না?'

'আর দেখিয়ে কি হবে, দেখাদেখির ভরসা আর কেন, এদিকে ত সব ফরসা হয়ে আসছে, এখন পূরো আলোয় এলেই বাঁচি। হাঁ, বিলীর আঙুলে কি হয়েছে একবার দেখে যেয়ো, সে ত দেখাতেই চায় না।'

'না কিছু হয় নি' বলিয়া বিলাসী কাপড়ের মধ্যে হাত লুকাইল।

রমণী হাতখানা দেখিয়া, ছুরির মুখ দিয়া সেই অঙুলের কোন্‌টা উস্কাইয়া দিল। বিলী কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রমণী যখন বিলাসিনীর হাত ধরিয়া দেখিতেছিল, বিলাসিনীর সমস্ত দেহটা যেন ঝিম ঝিম করিয়া উঠিতেছিল। তাহার চক্ষু বাতায়নপথে দেখিল, চিত্রকর—শৈলেন্দ্র তেম্‌নি তন্ময় হইয়া ছবি আঁকিতেছে। উন্নত নাশা, কুঞ্চিত কেশদাম, উজ্জ্বল চক্ষু।

৬

পরক্ষণেই শৈলেন্দ্রের চিত্রশালিকায় রমণী উপস্থিত। শারীরিক গঠনের—শৈলেন্দ্রের অঙ্কিত ছবির শারীরিক গঠনের ভাব সম্বন্ধে তর্ক চলিতেছিল। রমণী বলে, 'আচ্ছা তোমাদের একরকমটা কি বল দেখি, সমস্ত শরীরের সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি হতে দাও না কেন?'

'বলি শরীরটাই ত সব নয়—কেবল কতকগুলা মাংসপেশী এঁকে দিলেই কি সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি হল? ও সব তোমাদের ভুল; ভাবই শ্রেষ্ঠ।'

'বটে! ভাবে বুঝি সব অম্‌নি হয়ে যায়? বুদ্ধকে পায়েস দেবার সময় সুজাতা বুঝি হাতে দু'খানা বাঁকারী বেঁধে দিয়েছিল'? না ভাবে অম্‌নি বুঝি ডাইনী হয়ে গিয়েছিল?

'তোমরা ডাক্তার মানুষ, তোমরা কেবল শরীর-চক্রের চাকায় ঘুরে মর। তুমি, রোঁদার জীবনীতে যে সব ছবি বেরিয়েছে, দেখেছ?'

'বিলক্ষণ দেখেছি। তা তার সঙ্গে তোমাদের ত কোন মিল দেখিনে, রোঁদার সঙ্গে পাহারাওলার মত তোমরা শুধু রোঁদ দিয়ে বেড়াও এই টুকু ছাড়া'।

"তুমি সেই 'ভাবনা' ছবিখানাকে কি মনে কর"?

'তুমি কি মনে কর?'

'কেন খুব চমৎকার! রোঁদা যে সত্য নিয়ে বিশ্বের দরজায় মাথা কুটে মরেছে তাই সে এঁকেছে—সে ত হাত পা আঁকতে যায় নি, সে শুধু ভাবটাকে ওই জড় অস্ফুট পাথর থেকেই পাথরকে জীবন দিয়ে নারী মূর্ত্তিতে ফুটিয়ে তুলেছে। বুঝলে?"

'হাঁ ভাবনা বটে, তা ভাবনার পরিণাম জড়তায়—হুঁ'।

'আমরাও তেমনি ভাবটাকে শুধু মুখে ফোটাতে চাই, সে যে রোঁদার দেখে তা নয়, এমনি আমাদের ভাব-সাধনা থেকে, এ যে একটা সাধন।'

'তোমাদের এ সাধন কি প্রসাধন তা আমার দ্বারা বোঝা অসম্ভব। তবে এটুকু বুঝি খোদার ওপর এ খোদকারী তোমাদের পাগলামী মাত্র।'

'থাক তুমিও বুঝবে না হে বুঝবে না?'

'তা ভাল, সেদিন তোমার ওই যে ইয়ের বাড়ী গিয়েছিলুম ছবি দেখতে—অনেক ছবি দেখলাম; সে আমায় সঙ্গে সঙ্গে করে দেখালে—বনবাসে সীতা, অশোকবনে সীতা, সাবিত্রী, নচিকেতা, আর কত কি বিলিতী ছবি। সব আমরা খুব ত সুখ্যাৎ করলুম, তারপর

একখানা ছবির সামনে এসে দাঁড়াতেই তোমার ইয়ে ত কেঁদেই অস্থির, আমি বল্লুম 'ব্যাপার কি !'

সে বল্‌লে 'বুঝতে পারলে না, এইখানিই আমার সব চেয়ে চমৎকার ছবি।' আমি ত তার ভাবই বুঝলাম না। দেখলাম, শুধু যে একখানা কাগজের উপর শুধু একটা লাল বৃত্তাকার রেখা লেখা রয়েছে। সে তখন বললে "এর ভাব কি জান, এ ধ্যানের বস্তু, ও বড় করুণ কাহিনী, যুগ যুগান্তের অতীতের ইতিহাস। এই পথ দিয়ে মারীচের স্বর্ণমৃগরূপে রামকে নিয়ে পলায়ন, এই পথ দিয়ে লক্ষ্মণ সীতার নাক নাড়ায় তাড়া খেয়ে গেলেন। এই পথ দিয়ে এসে রাবণের সীতাকে হরণ। এই পথ দিয়ে সব হয়ে গেছে, কেবল পড়ে আছে ওই সে অতীতের সাক্ষী, সেই লক্ষ্মণের গণ্ডী, সীতার লজ্জাহীনতার শেষ পরিচয়—কি করুণ—বেদনায় রাঙা হয়ে রয়েছে। দেখি তোমার ইয়ের চক্ষু বয়ে ধারা গড়িয়ে পড়ছে। তা ভাই বেশ, এ একটা রকম বটে। শৈলেন্দ্র খুব হাসিয়া উঠিল, তারপর আবার রঙ ও তুলি লইয়া ছবিতে রঙের খেলা খেলিতে লাগিল। রমণী হাসিয়া বলিল, 'দেখ সব জিনিসেই একটা পূর্ণতা আছে। শুধু ওই ভাবটাকে বেশী জাগিয়ে তোলায় ভাবও হয় না, বস্তুও হয় না, মাকে আঁকতে গেলে যেমন মার যে সম্পর্কে মা তা বাদ দিলে চলে না, তেমনি সবটারই একটা সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি দেখানই ভাল; কেননা তাই হয়—'

'এখানা কি রকম হয়েছে'?

'মন্দ নয়, তবে সেই এক কথা, মুখখানার ভাব বিলীয়, আর ধড়টা অজ্ঞাতার জানোয়ারী রকম; তোমার সব ছবিতেই দেখি বিলীয় মুখ, কেবল ধড়টা দেখি আর একজনের।'

শৈলেন্দ্রের মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে সামলাইয়া লইয়া কহিল, 'তোমার সব তাতে ঠাট্টা। কিন্তু কি বলে ফেলে খেয়াল করেছ?—মুখ খানার ভাব।'

'তা মিথ্যে ত বলিনি, তুমি আঁক ছবি, আমি কাটি আঙুল।

শরীর চক্রের চাকায় আমি মরি ঘুরে, আর তুমি কেবল রূপের ঝলক আর রঙ নিয়েই থাক'।

'কি রকম?'

'হ্যাঁ বিলীর নাকি আবার বিয়ে?'

'বিয়ে!' শৈলেন্দ্রের হাত হইতে তুলি পড়িয়া গেল।

'হ্যাঁ! বিয়ে! চম্‌কে উঠ্‌লে যে? পুরুষে দশটা পারে, আর মেয়েতে পারে না?'

'আমি ও সব ত কিছু বুঝি না।'

তা বুঝবে কেন, মানুষের সুখদুঃখু বোঝবার ত কোন দরকার নেই। রঙের রকমারী হলেই হোল। রমণী চলিয়া গেল।

শৈলেন্দ্র ভাবিতে লাগিল বিলাসিনীর কথা; শৈশবে তাহার সঙ্গে এক সঙ্গে ক্রীড়া; কৈশোরে বিবাহের কথা উঠিল, হইল না। জাতের মিল নাই, তাহার পর তার বিবাহ; তারপর সে বিধবা, তারপর সবই তার কাছে এক একখানা ছোট ছোট ছবির মত মনে হইতে লাগিল।

হঠাৎ একটা চঞ্চল আলোক সেই ঘরের মধ্যে খেলা করিয়া উঠিল,—অঙ্কিত চিত্রের মুখে, একবার শৈলেন্দ্রের মুখে, একবার কক্ষ-গাত্রে। শৈলেন্দ্র ফিরিয়া দেখিল, পার্শ্বের বাড়ীর কক্ষ হইতে কে একখানা আর্শি রৌদ্রে ধরিয়া তার প্রতিবিম্বটা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া তাহারি ঘরে ফেলিতেছে। ফিরিয়া, মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল বিলাসীর অধরে হাসির রেখা; অপাঙ্গে বিদ্যুৎ; উরস-সরের স্তোকনম্র কনক মুকুল যেন প্রশ্বাসের ভরে দুলিতেছে। চক্ষে চক্ষে মিলিল; বিলীর হাত হইতে সে দর্পণ পড়িয়া গেল; টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া ভূমিতে ঠিকরাইয়া পড়িল; বিলাসিনী তাকাইয়া দেখিল, তাহার রূপ খণ্ডিত হইয়া ভূমিতে বিক্ষিপ্ত হইয়া জ্বলিতেছে। রাগে জ্বলিয়া সেই ভাঙা আর্শি তুলিয়া সে ঘরের কোণে ফেলিয়া দিল। আরো অসংখ্য খণ্ডে সেই দর্পণ ছড়াইয়া পড়িল, প্রতি কাচখণ্ডেই তাহার রূপের অগ্নিশিখা!

বিলাসীর বৌদিদি সেই ঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'ঠাকুরঝি!—একি!'

৭

'পিতা বলিলেন, 'হতে পারে না, আমি ভেবে দেখেছি, আমায় তা হ'লে একঘরে হতে হবে।' পুত্র হাসিয়া বলিল, 'তাতে আপনার ভয় কিসের। একঘরে হবার ভয় এত বেশী।'

'নয়ই বা কেন?' দিন ফুরিয়ে এসেছে, শাস্ত্রকারদের অনুশাসন না মানবার মত শক্তি আমার নেই। তারপর আবার যদি সে স্বামীরও মৃত্যু হয়!

'আপনার কাজ আপনি করুন।'

'আমার কাজ আর হোল কই, যদি শান্তি-স্বস্তিই না হোল—'

'শাস্ত্রকার কি চিরসত্যের উপর দাঁড়িয়ে; কালধর্ম্মের গতিকে কি সে রোধ করতে পারে?'

'সত্য কালধর্ম্মে বিকৃত হয় না। তাঁরা ঋষি, মন্ত্রদ্রষ্টা, স্রষ্টা, শাস্ত্রবেত্তা—'

'সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি ত ফুরোয়নি, তবে স্রষ্টার সৃষ্টি ফুরবে কেন; শাস্ত্রকি অভ্রান্ত?'

'তর্কে মীমাংসা অসম্ভব; তবে আমার বিশ্বাস, পরলোক, পরলোকের সঙ্গে স্বামীর একটা সম্পর্ক; হিন্দুর বিয়ে কুকুর বেরাল পোষার চুক্তি নয়? দেশ কাল পাত্রে শাস্ত্র অনুশাসন করে'—

"তার চেয়েও হীন, কেননা মুখে ধর্ম্মের, শাস্ত্রের, অগ্নির, নারায়ণের ধমক্। ভেতরে, সেই যে খড় বাঁখারী সেই খড় বাঁখারী?

"দেশ কাল পাত্রে আমিও সেই নতুন অনুশাসন করতেছিলাম। নতুন শাস্ত্র পুরোণকে কেটে ছেঁটে পার গড়, কিন্তু তোমরা আজকাল সমস্ত জগৎটাকে এমন লালসার চোখ দিয়ে দেখ

কেন ? না, হয় একটু মাতৃত্বের—ত্যাগের চোখ দিয়েই—দেখলে ? ব্রহ্মচর্য্য যার ধাতে সয়, যে চায় তাকে দাও না কেন, তাকেও তোমরা টানতে চাও কেন ? যাট বছর ধরে সংসার করে দেখলুম, সুখ কতটুকু বাবা ! ওসব কথা এখন থাক, তবে বিলী এখন বড় হয়েছে, সে যদি তা চায়, তবে একটা ভাববার কথা বটে !'

'আর তা না হলে ? 'বিলী কি তার নিজের ভালমন্দ বুঝতে পারে ?'

'কেউ কার ভালমন্দ গড়ে দিতে পারে না" ! অদৃষ্ট ! অদৃষ্ট !

'অদৃষ্ট, আর শাস্ত্র, এইতেই দেশের এত দুর্দ্দশা !"

'বাবা, যখন ছেলেবেলার স্বপ্ন, যৌবনে ধোঁয়ার মত উড়ে যায়, যখন যৌবনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা বার্দ্ধক্যে অপূর্ণ রয়, যখন দেখবে শিয়রে অন্ধকারে কি ভীষণ কঠোর হাত তোমায় ধরবার জন্য বেড়াচ্ছে, যখন দেখবে শিশু হাসতে হাসতে ঘুমিয়ে পড়ে, আর সে ঘুম ভাঙে না, তখন,—অদৃষ্ট ! কত ত ভেবেছি, কত ত ভেঙেছি, কত ত গড়েছি,—এই যে আজ তের বছর হোল তোমার মা চলে গেছে,—এই যে তার সংসার থেকে সে ধোঁয়ার হেঁয়ালি হয়ে রইল, কি এমন আছে, যে আমাদের এমন দূরে দূরে রাখলে, এক বিশাল সমুদ্রের মত রহস্য, তার তলও নেই অতলও নেই, কিছু বোঝবার নেই বাবা। অদৃষ্ট ! অদৃষ্ট !—তবুও ত সেই পারের দিকেই চেয়ে আছি ; তার দরজায় মাথা কুটে কুটে মরেছি, সে একটা রা-ও করেনি—'

পুত্র চলিয়া গেল। পিতা বুকে হাত দিয়া শুইয়া পড়িলেন ; ডাকিলেন 'বিলী'। বিলাসিনী তখন তার আপনার ঘরে দাঁড়াইয়া একখানা চিঠি পড়িতেছিল ; দুয়ারের নিকট দাঁড়াইয়াছিল তাহাদের বাড়ীর ঝী মঙ্গলা।

'তোকে কি বললে ?'

'বলবে আবার কি ? চিঠিখানা দিলে, বললে দিদিমণিকে দিস্।

'যা এ চিঠী ফিরিয়ে দিগে যা, কে তোকে আনতে বল্লে,—না থাক!'

'আঃ পোড়া আমারই যত দোষ।' খর্ খর্ করিয়া মঙ্গলা চলিয়া গেল।

বিলাসিনী মুখ ফিরাইয়া দেখিল, ছাদের আলিসায় কপোত কপোতী; গাছের আমড়ায় সোণার রঙ। দূরে চাহিয়া দেখিল, অন্ধকার;—মেঘের খানিকটায় লাল আভা; আঁধার তাহাকে ঢাকিতে চায়—সেও আঁধার ঠেলিয়া ফুটিতে চায়।

৮

বধূ কহিল, তুমি ত বিয়ের সব ঠিক করলে, তা ঠাকুরঝির মত জিজ্ঞেসা করেছ? স্বামী কহিলেন, 'তার আবার মতামত কি, যা তার ভাল তাই আমরা করছি, আমরা কি তার পর?'

'পর ত নও, কিন্তু তবু সে ত বড় হয়েছে?'

'ছেলে বিলেত ফেরত, আমেরিকা বেড়িয়ে এসেছে, দুনিয়া দেখেছে, পয়সা আছে, দেখতে শুনতে বেশ, জমিদার এর চেয়ে কে সুপাত্র?'

'সে বিচার ত আমার নয়। সে রূপ ত আর আমার এই অন্ধকারে দেখবার জন্যে নয়। তোমার বোনের যদি পছন্দ না হয়? তোমারি ত বোন!'

কেন আমার পছন্দটা কি মন্দ দেখলে?

তোমার যে পছন্দ নেই, তা ওই মনু পর্য্যন্ত বোঝে, ওই ওকে জিজ্ঞাসা করে দেখনা কে সোন্দর?

'হ্যাঁরে, কে সোন্দর রে, তোর মা না?—'

মনু তাহার মার গলা জড়াইয়া বলিল—'বাবা'!

'দেখলে ত তোমার পছন্দ নেই!'

স্বামী বধূর কপোলদেশে তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলীর সাহায্যে মৃদু আঘাত করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

৯

রাত্রি ঘন; নির্জ্জন; নীরব। মেঘে মেঘে ঘন-ঘোর। মাঝে মাঝে

এক একবার করিয়া একটা একটা তারা দেখা যাইতেছে, মাঝে মাঝে একফালি চাঁদ আঁধার সাগরে একবার করিয়া ভাসিয়া উঠে, আবার আঁধার মেঘ-সমুদ্রের অন্ধ তরঙ্গে ডুবিয়া যায়। গৃহমধ্যে তৈলহীন দীপশিখা উজ্জ্বল। পার্শ্বের দালানে খোপের ভিতর পায়রা বকুম্-কুম্ বক্‌বক্‌কুম্ করিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে; কপোতকপোতীর পরস্পরের পক্ষ ঝাপটের শব্দ শোনা যাইতেছে; মাঝে মাঝে তাহার সঙ্গে বর্ষারাতের মেঘের গুরু গুরু শব্দ গড়াইয়া চলিয়া বেড়াইতেছে। অন্ধকারা ত্রিযামা রজনী, ঝিম ঝিম্—ঝিল্লী দেয় তান; দূরে দূরে পেচক ফুৎকারে।

বিলাসিনী চিঠী পড়িতে লাগিল। সে-ই চিঠী।

"...ছেলেবেলার কথা ভোলা যায় না জানি, কিন্তু ছেলেবেলা ফিরিয়া আসে না, যৌবনের মাদকতায় মত্ত হইয়া মাতাল, কিন্তু নেশা ভাল করিয়া ধরে না, কি যেন বলিতে চাই, কি যেন পাই অথচ পাই না! রঙে, সুরে, মনে তোমাকে মিলাইতে চাই—চাই কিন্তু পারি না"—

"রঙে, সুরে, মনে, আর কিছুতে নয়! বটে"!

অকস্মাৎ পদশব্দে বিলী চমকিয়া উঠিল, কহিল 'কে'? ফিরিয়া দেখিল, রুগ্ন পিতা দালান দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। বিলাসী চিঠী-খানা লুকাইল।

পিতা বলিলেন, 'এতরাত্রে আলো জ্বেলে কেন মা, ঘুমুস্‌নি।'

'না এই—পড়্‌ছিলাম, ঘুম আস্‌ছে না।'

ঠিক সেই স্নেহময়ী মাতার সজাগ স্বরূপ দৃষ্টি! পিতা যে স্রষ্টা, সে কি না দেখিয়া থাকিতে পারে। পিতা বলিলেন,—'ঘুমো মা ঘুমো, অসুখ করবে'। পিতা চলিয়া গেলেন।

দূরে উপরে অন্ধ আকাশ পানে চাহিয়া কহিলেন, হে অনন্ত! যে পৃষ্ঠা কখন পড়া যায় না, সেই পাতাখানা একবার খোল, এক-বার খোল! একটি বার!

বিলাসিনী আবার সেই পত্র বাহির করিয়া পড়িল,

"—বর্ণে বর্ণে রূপে রূপে তোমায় মিলাইয়া দেখিতে চাই,"

"চাই, চাই, চাই,—চাই না কেবল আমাকে! জাগবার আগে তাকিয়েছিলুম সে এক রকম, ফোটবার সময় তাকিয়ে আছি, সে একরকম, তুমি কেবল দেখলে ফোটার আগে, তুমি কেবল শুনলে হাওয়া কি বলে—ভাল!"

বিলাসিনী চিঠী রাখিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'পোড়া পায়রা-গুলোও ঘুমোয় না গা।'

১০

সে দিনও চিত্রশালিকায় খণ্ড অখণ্ড লইয়া দুই বন্ধুতে দারুণ তর্ক চলিতেছিল। শৈলেন্দ্র বলে, "খণ্ডের মধ্যেই তিনি আছেন"।

রমণী বলে। 'অখণ্ড খণ্ডের মধ্যে আছেন কি রকম; একি সোণার পাথর বাটী নাকি'? তুমি আঁক ছবি, তর্ক কর দর্শনের।"

'সত্যের অনুভূতি দুই যায়গায়ই এক, সেখানেও পূর্ণ হওয়া, এখানেও পূর্ণ হওয়া'।

'যদি পূর্ণ হওয়াই চরম, তবে—তার মানে কি অঙ্গ বাদ দিয়ে পরিণতি না কি! না ভাবে'।

"তোমাদের ওই ভাবের ভাব ভাই কিছু পাইনে, গোলাপ যখন ফোটে, পূর্ণ হয়ে ওঠে। সেই ভাবে যখন সে ভরে ওঠে, তখন কি সে তার ডাঁটা থেকে কাঁটা বাদ দেয়? গোলাপ আঁকলে কি শুধু ওই ফোটবার ভাব আঁকলেই, খণ্ড রস অখণ্ড হয়ে ওঠে। এ কেমন কথা, এই যে তুমি বিলীর ছবি, বিলীর মুখখানা, যার তার কাঁধে বসিয়ে দিচ্ছ, এটা কি সেই অখণ্ড খণ্ডে দেখা দিচ্ছে? না তারই ভাবের পূর্ণতা হচ্ছে!"

"এ ত বিচার বুদ্ধির কথা নয়! ও সবই কি জ্ঞান ভাবের—'

"তা তোমরা যত পার ভাব জড়ো কর, আর ভাবনায় জড় কর,

স্থষ্টিকর্ত্তা কিন্তু মানুষকে পরিপূর্ণ করেই গড়েছেন, আর তার ভাবও সেই পূর্ণতার ভিতর দিয়েই ফুটে ওঠে, সে কেবল চোখে কাণে নাকে চুলের ডগায় ভাবের খেলায় লুকোচুরি করে না, গায়ের রোমাঞ্চ পর্য্যন্ত ভাবে হয়। যা কিছু ভিতরে হয় তার সকল দিক শরীরকে পূর্ণভাবে আশ্রয় করে, প্রকাশ হয়ে ওঠে, কলাকলার শ্রেষ্ঠত্ব সেইখানে, যেখানে ভাব বলবে আমি আকার, আকার বলবে আমি ভাব, দ্রষ্টা দেখবে সত্য, জীবন শুধু রঙের খেলা নয়, শুধু রেখার টান নয়, আধখানা মানুষ, আধখানা পাথর নয়।

এমন সময় বিলাসিনীদের বাড়ীর ঝী মঙ্গলা তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিল, "রমণ্ দাদা, রমণ-দাদা, দিদিমণি হঠাৎ কেমন মুচ্ছ গেছে, তাই বাবা বল্‌লেন, আপনাকে ডাক্‌তে।"

রমণী তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

"মঙ্গলা কি হয়েছে ?"

'কি জানি বাপু, ডবকা মেয়ে, কার উপদৃষ্টি হোল না কি ? মঙ্গলা দৌড়িয়া চলিয়া গেল। শৈলেন্দ্র অন্যমনস্ক হইল! বিলীর যে ছবি অঙ্কিত করিতেছিল, তাহার সেই কাঁচা তৈল-রঙের উপর একটা মাছি উড়িয়া পড়িল; শৈলেন্দ্র সেই মাছিটাকে উঠাইতে গিয়া চিত্রের কপালে হাত লাগাইয়া, কাঁচা রঙ ধেব্‌ড়াইয়া ফেলিল; ভিতরের সিন্দুরের রঙ বিকৃত হইয়া ফুটিয়া উঠিতে দেখাইল যেন বিলীর কপালটা কিসের আঘাতে ছেঁচিয়া গেছে, তাহা হইতে রক্ত বাহির হইতেছে।

১১

স্নেহময় পিতা কন্যার শিয়রে বসিয়া সজল নয়নে কহিলেন, "মা, মা, বিলী, কেন মা অমন কচ্ছ, মা ?"

কন্যার সর্ব্বশরীর তখন প্রস্তরবৎ কঠিন—স্পন্দহীন। মুখ দিয়া ফেনা উঠিতেছে। বৌদিদি জলের ঝাপটা দিয়া মাথার উপর

পাথার বাতাস করিতেছে, আর মনু মার আঁচোল ধরিয়া মুখের মধ্যে পুরিয়া. ভয়চকিত দৃষ্টিতে মার পৃষ্ঠদেশে মাকে জড়াইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

রমণী আসিয়া দেখা দিল।

'এই যে বাবা রমণ, দেখ এই এক কি কাণ্ড, আমি আর পারিনে, আমার বুকের ভেতর ধড়ফড় করছে।'

রমণী বিলাসিনীর ঘাড়ের শির দুই হাত দিয়া চাপিয়া দুই চারিবার টানিতেই সে চক্ষু উন্মীলন করিল।

সন্তান-স্নেহ-বিহ্বল বৃদ্ধ সজল নয়নে কহিল, 'বাবা, তুমি না থাকলে কি বিপদই হোত। মা বিলী কিছু খাবি ?—'

রমণী বলিল, 'একটু দুধ গরম করে খেতে দিন। ও কিছু না, মানসিক চিন্তায় হয়েছে। আপনি বিশ্রাম করুন গে, আপনার আবার অসুখ বাড়বে।'

পিতা বলিল, 'হাঁ এই যাই বাবা! কি এত তোর ভাবনা মা, আমি যতক্ষণ আছি। তারপর ? তারপর তোর দাদা আছে, এই মনুয়া আছে, কি বলিস মনুয়া কেমন ?'

মঙ্গলা বলিল, 'ওমা আজ যে একাদশী! 'ও আজ একা—' বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রামকৃষ্ণ নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেলেন।

মনু তখন আস্তে আস্তে তাহার পিসীমার কাছে আসিয়া নিমীলিত আঁখির পাতা হাত দিয়া ধীরে ধীরে খুলিয়া দেখিল; বিলাসিনী কষ্টে একটু হাসিল। মনু হাসিয়া উঠিল, কহিল 'পিসীমা'।

বধূ পুত্রকে লইয়া চলিয়া গেলেন! পরক্ষণেই একবাটী গরম দুধ ও দুটি সন্দেশ আনিয়া দরজা ভেজাইয়া দিয়া বিলীকে খাওয়াইলেন। বলিলেন, "তুই খা, খা, প্রাণটা গেল খাবি খেয়ে—আবার ধর্ম্ম।"

১২

পিতাপুত্রে এক বিষম কলহ হইয়া গেল। পুত্র বলিল, 'তার পর আপনার মেয়ে যদি ব্যভিচার করে",

'সে জন্য তুমি দায়ী হবে কতকাংশে, আর কন্যা তার জন্য পূরা দায়ী।'

"তবে কি আপনি বলেন যে এই আইনের গণ্ডী দিয়ে, বিবাহ দিয়ে তাকে একটা গোড়া থেকেই রক্ষা করা সঙ্গত নয়?"

"আমার বিবেকের চেয়ে তোমার আইন বড় নয়। তুমি কি বল যে এই আইনের রশারশি দিয়ে বেঁধে এই তোমাদের আইনসঙ্গত ব্যভিচার করবার জন্যে, আমি—আমি—আমার কন্যার জন্য পথ সুগম করে দেব। কখন নয়। আমার পুত্র, আমার কন্যা যদি তারা ব্যভিচার করে, আমি আমাকে দোষ দেব, আমার রক্ত মাংসকে দোষ দেব। আমার কন্যা যদি ব্যভিচার করে করুক্। সু-কু উভয় জ্ঞান তার হয়েছে। আমি তাকে তার স্বামীর হাতে দান করেছি, কন্যার উপর আমার দ্বিতীয় বার দানের অধিকার নেই। আমার দ্বারা এ কার্য্য হবে না। বিশেষতঃ তোমার ওই আইনের ধারায়, আমি নেই।

"কন্যা আইনসঙ্গত স্বাধীন। তবে যদি আপনি বলেন যে ব্যভিচার করে করুক্, তার ওপর ত কথা নেই—তা হলে আমাকে তফাৎ হতে হয়।"

"দেখ বাবা! আমি বামুনের ছেলে, শাস্ত্রও কিছু বোধ হয় ঘেঁটেছি, বহু অর্থ উপার্জ্জন করেছি, সমাজে প্রতিষ্ঠা আছে, মনু, যাজ্ঞবল্ক, পরাশরের উত্তরাধিকারী, সেই পথেরই পথিক, মহা-ঋষিরা যে পথে গেছেন, সেই মহাজনের পথেই চল্‌তে চেষ্টা করেছি। তবে আমার আত্মা বলেও একটা জিনিষ আছে। সত্য কতদূর জেনেছি তা বলতে পারিনে; আমার আত্মা কখন ব্যভিচার করেনি, আমার পুত্র, আমার কন্যা'—বৃদ্ধ কথা কহিতে পারিলেন না, তাঁহার কণ্ঠ-রোধ হইল, চক্ষু দিয়া জল দুই গণ্ড বহিয়া ঝরিয়া পড়িল। কহিলেন, 'বিলিকে জিজ্ঞাসা করিয়ো—সে যদি বিবাহ চায়, দাও; আমার কোন অমত নাই, তবে তার মত জিজ্ঞাসা করিয়ো। মনে রেখ তোমরা তোমার মায়েরও ছেলে—'

বৃদ্ধ ভাবিলেন, 'আমার ব্রাহ্মণী আমার কোলে গেছে, কন্যা আমার কোলে তেমনি যাক্ না কেন! আত্মা স্বাধীন, কন্যার আত্মা যদি ভোগ চায়, সে কি কেউ তার গতি ফিরিয়ে দিতে পারবে?' বৃদ্ধ মাথা নীচু করিয়া চুপ্ করিয়া রহিলেন, প্রশস্ত ললাটে চিন্তার দাগ নাই, শ্বেতশ্মশ্রু বক্ষ ছাইয়া আছে। মুখ ফিরাইতে দেখিলেন, তাহার মনুয়া তাঁহার ছোট থেলো হুঁকাটী সংগ্রহ করিয়া, কলি-কাটি উল্টাইয়া, তাহার উপর বসাইয়া, হাসিতে হাসিতে আসিতেছে —'দাদা-'দাদা—আমি তামুক—?'

পুত্র ধমক্ দিয়া উঠিল। বৃদ্ধ তাহার মনুয়াকে বুকে জড়াইয়া কহিল, "এই ত ভগবানের অন্তঃপুর। এই ত সেই অন্তঃপুরের প্রবেশ পথ—পুত্র! তুমি তফাতেই যাও আর কাছেই থাক, কিন্তু ভুলনা, ভগবান তোমার দুয়ারে দ্বারী হয়ে রয়েছেন।—

১৩

বিলাসিনী সকলই শুনিল। পিতা, ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ সকলেরই মত সে বুঝিল। বিলাসিনী ভাবিল, 'সবাই ত বিয়ে দেয়, কিন্তু বিয়ে করে কে!—তাহার মনে পড়িল ছেলেবেলার কথা, মাতৃহীনা বালিকা কেমন করিয়া পিতার কাছে মাতৃস্নেহ পাইয়াছে, মনে পড়িল, তাহার বিবাহ,—আলোক-উজ্জ্বল সচন্দ্র নিশা। তারপর কেমন করিয়া শুধু হাত হইল। মাঝখানটায় যেন একটা ঝড় বহিয়া গেছে—তখন আবার মনে পড়িল, শৈলেন্দ্র। মুখ শক্ত হইল, অধর দন্তে চাপিল, ভাবিল, তবু ছেলেবেলায় ত বুঝি নাই শৈলেন্দ্র কি, এখন আবার—তা একবারি বুঝিনা কেন—'

শৈলেন্দ্রের চিত্রগৃহে বিলাসিনী প্রবেশ করিল। আলুলায়িত কেশ-দাম লুটাইয়া পড়িতেছে। শৈলেন্দ্র চমকিয়া উঠিল; বলিল..."এস, এস, বিলী! বিলী!...না তুমি মরতে পাবে না, না মর না—

মরা ছাড়া আর আমার পথ কি? রঙে সুরে, মনে চাই রঙে সুরে মনে কি পাও নাই!'

"না-না, আমি তোমার, আমি তোমার, তুমি আমার"

"এ কথা ছেলেবেলায় শোনায় ভাল, এখন ত জীবন স্বপ্ন নয়"—

না-না তুমি আমার, এখন আমার, যাই কেন অদৃষ্টে থাকুক না তুমি আমার,—যদি তুমি না মর, না-না তুমি মর না—বস এই-খানে বস"—

"রঙের মানুষ রঙ্ রাখ।"

"ওঃ তোমার এই কেশের রাশি, এই মুখ, এই উজ্জ্বল ললাট, এই তিলফুল মত নাক, এই বান্ধুলী ফুলের মত অধর, এই চকিত-হরিণ নয়ন, ওঃ তোমার দেহের ওই সৌরভ, তুমি আমার পাশে, আমি তোমার পাশে, ও ঠিক যেন গোলাপ, পথে ঢল ঢল করে মুখ তুলে ফুটেছে। ঠিক, একটু এমনি করে বস, এই, এই, আমি মুখখানা রঙে তুলে অমর হয়ে যাই! তোমায় অমর করে রাখি।

"তোমার কাছে শুধু রূপের আর রঙের বর্ণিমে শুনতে ত' আসিনি"—

"না-না প্রতি রেখায় রেখায় নূতন ভাব ফুটিয়ে তুলব! এ কল্পনা নয়, এ সত্য! এই দেখ তোমার সমস্ত চিঠী, এই দেখ কোথায় তারা আছে জান, তাদের কত ভাল করে রেখেছি—কোথায় তোমায় বসাই—ইচ্ছে হয় প্রতি চিত্রের বর্ণফলকের ভঙ্গি-মায়, তোমার ওই রঙ ফলিয়ে তুলি—চাঁদের আলোর মত কেমন ঝর-ঝর করে রূপ যেন ঝরে জ্যোৎস্না হয়ে নামছে—"

"তুমি সব শুনেছ? আমার আবার বিয়ে শুনেছ—"

শৈলেন্দ্রের মুখ লাল হইয়া উঠিল; কহিল 'হাঁ।'

"তাই তোমার কাছে এসেছি তখন জাতের কথা ছিল, এখন ত আর—তুমি ত জান, তোমার—কি করা উচিৎ—"

"আমি বিয়ে, বিয়ে, আমি"—শৈলেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। তাঁহার মুখখানা পাংশু হইয়া গেল।

"চুপ করে রইলে যে? সব পাপ, সব অন্যায় থেকে, আমাকে

জগতের ওপর তুলে ধর। আমার সব লজ্জা, ভয়, ঘৃণা, দৈন্য সব—ওকি! পেচুচ্ছ ?... এখন তোমার চোখের চাহনি বদ্‌লাচ্ছে—কেন ?—তুমি যে বলতে আমায় ভালবাস ? হুঁ! তার মানে, সুবিধেমত ভালবাস—”

“না-না শোন—শোন···

“চুপ করলে কেন, মঙ্গলা আমায় বুঝিয়েছিল, এতে খারাপ হবে; তাদের মত হবে, তা আমার পক্ষে তাতেই বা আর বেশী ক্ষতি কি—তবু চুপ করে রইলে—ভগবান কোন কথা কয় না—চুপ করলে কেন, মানুষের মত কথা কও—

“এই যে চিত্র! এই, এই, এ নূতন আত্মা, এই আমার দ্বিতীয় —এই এই জাগবে, এই ভাব, এই সাধনা—কিন্তু এখন—আমি স্রষ্টা, জীবনে আমার কোন বন্ধন নেই—বিবাহ—ওঃ বন্ধন—আমি যে মুক্ত—তোমার কাছ থেকে সব আহরণ—চিত্র, চিত্রে যা খুসী তা করা যায়, কিন্তু মানুষের জীবনে—”

তুমি তোমার ছবি নিয়ে খেল, আমি—তবে শুধু তোমার খেলার পুতুল—

“কিন্তু আমি চিত্রকর, আমার আত্মা, ওই রঙে, রঙে, ওই বায়ুচালিত মেঘের হিল্লোলে—ওই নানা ঘোরা—কোনখানে তোমার মুখখানি রেখে আলো ধরলে সুন্দর দেখায়, তাই আমি জ্বালি, নিবাই।”

আর আমি শুধু তোমার সেই সুন্দরী গড়বার পুতুল হয়ে ছায়ার মতন, শুধু তোমার ছবির গায়ে রঙের মত লেগে থাকব”—বিলাসিনী চমকিয়া উঠিল। একটু সরিয়া পিছনে হটিল। শৈলেন্দ্র কহিল, “একবার দাঁড়াও, ওই কপালের রঙের আভাটা—”

“কপাল ত ছেঁচে গেছে” আর রঙের আভায় কাজ কি!—বিলী হাসিয়া উঠিল। ফিরিয়া দেখিল, রৌদ্র নাই, দিনের আলো গাঢ় মেঘে মসীলিপ্ত আঁধার হইয়া আসিয়াছে। বিলী চক্ষে

অন্ধকার দেখিল, তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল, চক্ষে যেন কতকগুলা পীতাভ অগ্নির সূক্ষ্ম রেখা ঝলকিয়া গেল। শৈলেন্দ্র তুলিকা হাতে লইয়া সেই পথের পানে চাহিয়া কহিল—রঙ মাটি সবই আছে, আমি চাই—আমি চাই—চিত্রের জন্য—এ খেয়ালের রঙমহাল এ জীবন কিছু নয়, পাগলের মত্ততা। রঙমহালে রঙের খেলা চাই। আমি যে স্রষ্টা!

বিলী চাপা ভাঙা গলায় চীৎকার করিল, 'তুমি পার না?' তুমি স্রষ্টা! বটে! আচ্ছা!...

(১৪)

পুত্র বলিল, ওগো, বিলীকে একেবার ডেকে জিজ্ঞাসা কর, তার মত কি।

"বধূ বলিল, "এ বিয়েতে তার মত বোধ হয় নেই"।

বিলী আসিল। বিলাসিনীর দাদা তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

বিলী বলিল, 'আমার ভালর জন্যেই ত তোমরা এ কাজ করতে চাও—এতে আমার কি ভাল হবে? একদিন তোমরা বিয়ে দিয়েছিলে, আবার তোমরা বিয়ে দিতে চাইছ! আমি সে বিয়েও করি নি, এ বিয়েও করব না। বিয়ে দেওয়া হতে পারে, বিয়ে করা হতে পারে না"। বিলী এতদিন তাহার দাদার মুখের পানে চাহিয়া কখন কথা কহিতে পারিত না—আজ যেন এক নিশ্বাসে হঠাৎ এত কথা জোর করিয়া বলিয়া ফেলিল।

ভাই বলিল, 'কি রকম, মেয়ে মানুষের এত পাকাম!

"তোমরাই ত এতটা পাকিয়ে তুলেছ।"

'তোর ভালমন্দ আমরা বুঝি নি?'

'ভালমন্দ বোঝা যেতে পারে, ভালমন্দ করে দেওয়া যায় না'।

'তবে তোর ইচ্ছে নেই'।

'না'।

'তোকে—বিয়ে করতেই হবে।'

বিলী তখন মরিয়া—বলিল—"একবার অন্যের ইচ্ছেয় যা হয়ে গেছে, আবার তা হয় না",

'তোকে বিয়ে করতেই হবে।'

'কেন দাদা, আমাকে—না। না। আমি করব না।'

বৃদ্ধ পিতা থাকিতে না পারিয়া কহিলেন, 'আয় মা আয়। বাবা! শান্ত হও। হাসিয়া কহিলেন, সংসার ভেঙেছে বুঝতে পারছি।

"ওর মতই সব।—আপনিই ওর মাথা খেয়েছেন।"

পিতা কন্যার হাত ধরিয়া বক্ষে টানিয়া লইলেন, কহিলেন, 'বাবা! এ পুত্র নয়—কন্যা—তায় বিধবা'।

পুত্র গর্জ্জিয়া জোরে নিশ্বাস ফেলিল। বধূ কহিল, 'তুমি পাগল'— "ছেলেবেলা থেকে আদর দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছেন, এখন ভুগুন। আমি এরপর যে—

"এর পর কি?"

"এর পর আপনার কন্যা যদি ব্যভিচার করে, সেজন্য আমি দায়ী নয়—আর এরূপস্থলে আমার তা হলে থাকা হয় না।"

বধূ ভয়ে ত্রস্তে 'কি কর' 'কি কর' করিয়া উঠিল।

"তুমি উন্মাদ! এ ব্যভিচার তার নয়—এ ব্যভিচারের স্রষ্টা তুমি। বেরোও আমার বাড়ী থেকে!" বৃদ্ধের ষষ্ঠি বৎসরের বিরাট সংযম ভাঙিয়া গেল—

ক্রোধে কম্পিত স্বরে কহিলেন—বেরোও—দূর হও! এক্ষুণি—'

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

রঙ্গলালের "বিরহ-বিলাপ"*

[মুখবন্ধ]

বাঙ্গালাদেশের সাহিত্য-কাননে অনেকদিন হইতে এক নূতন বাতাস বহিতেছে। নূতন ও পুরাতনের সন্ধিস্থল ছাড়াইয়া বাঙ্গলা সাহিত্য অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। বাঙ্গলাসাহিত্যের শৈশব-শ্রী যৌবনে পুষ্ট হইয়া অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, আমরা নূতনকে পাইয়া পুরাতনকে ভুলিয়া যাইতেছি। অতীতের সব কথাই যে মনে রাখিতে হইবে তাহা নহে—সকল কবির সকল কথা আমাদের মনে নাই, অনেকেরই অনেক কথা আমরা ভুলিয়াছি এবং ভুলিয়া যাইব। কিন্তু কাহারও কাহারও কথা স্মৃতিফলকে অঙ্কিত করিয়া রাখা জাতীয় জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক। মধু-হেম-নবীনের কাব্য বিস্মৃত হইবার মত নহে—তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী রঙ্গলালের কাব্যও ভুলিয়া যাইবার মত নহে। কিন্তু রঙ্গলালের কাব্য আধুনিক সময়ের পাঠকমহলে পঠিত, আলোচিত বা তাদৃশ সমাদৃত হয় না। এ দুর্ভাগ্য কবির নহে, আমাদের। "পদ্মিনী"র লেখক, "কর্ম্মদেবী"র লেখক, "শূরসুন্দরী"র লেখক রঙ্গলাল—আধুনিক কাব্যসাহিত্যের আবর্জ্জনার স্তূপে চাপা পড়িয়া গিয়াছেন! আজ ঊনত্রিশ বৎসর অতীত হইল, রঙ্গলালের মৃত্যু হইয়াছে। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে তাঁহার রচনাসকল একত্র প্রকাশিত হইল না, বা তাঁহার জীবনীসংগ্রহের চেষ্টামাত্রও হইল না। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা কলঙ্কের কথা।

রঙ্গলালের সকল কবিতা প্রকাশিত হয় নাই—অপ্রকাশিত রচনা-সকল চেষ্টা করিলে এখনও সংগ্রহ করা যায়। তাঁহার "বিরহ-বিলাপ" নামক একখানি খণ্ডকাব্য আমরা সম্প্রতি সংগ্রহ

---

* ভবানীপুর সাহিত্যসমিতির সাধারণ অধিবেশনে পঠিত।

করিয়াছি। বহুবাজারের দত্তকুলোদ্ভব, স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নিকট কিছুদিন পূর্ব্বে উহা দেখিতে পাই। উক্ত অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব রচনা "নারায়ণে" প্রকাশ করিবার অনুমতি চাহিলে সহৃদয় দত্তমহাশয় সানন্দে অনুমতি দেন। বিরহ-বিলাপ ইংরাজী Willow Drops নামক একখানি কাব্যের অনুবাদ। সুবিখ্যাত কবি রামশর্ম্মা উক্ত ইংরাজী কাব্যের রচয়িতা। স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত Mookerjee's Magazine নামক পত্রে Willow Drops প্রকাশিত হয়। শম্ভুবাবুর সহিত রঙ্গলালের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহার অনুরোধেই রঙ্গলাল উক্ত কাব্যের অনুবাদে হস্তক্ষেপ করেন। ইহার ফলে বিরহ-বিলাপ রচিত হয়। Mookerjee's Magazine যোগেশবাবুর বাটী হইতেই বাহির হইত। শম্ভুবাবু তাঁহার বাটীতে থাকিতেন। শম্ভুবাবুর মৃত্যুর পর বিরহ-বিলাপ কাব্যখানি যোগেশবাবুর কাছেই বরাবর ছিল।

রামশর্ম্মা কিরূপ উচ্চ-অঙ্গের কবি তাহা অনেকেই অবগত আছেন। তাঁহার লেখনী হইতে এত সুন্দর ইংরাজী কবিতা বাহির হইয়াছে যে তাহার তুলনা এদেশে আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইংরাজী যদি তাঁহার মাতৃভাষা হইত, তাহা হইলেও বোধ হয় তাঁহার কবিতার আদর হইত। শম্ভুবাবু একসময় রামশর্ম্মাকে এক পত্রে লিখেন, —"The hour is critical, when the country needs the zealous services of all her true sons. At such a time what a pity that such a genius as yours should be suppressed by Fate and forced to inactivity and silence! I see that you have risen in revolt against circumstances and resolutely struck your Vina—the Harp of Hind—with the very best result." * রামশর্ম্মা

* An Indian Journalist, By F. H. Skrine, I. C. S. pp. 406-7.

কত বড় কবি তাহা এই কয় ছত্র হইতেই অনুমান করা যাইতে পারে।

লেখক যেরূপ প্রতিভাশালী, তাঁহার অনুবাদকও জুটিলেন সেইরূপ। রঙ্গলাল অনুবাদকার্য্যে কিরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন তাহা তাঁহার কুমারসম্ভবের অনুবাদ হইতে বেশ বুঝা যায়। তিনি "পদ্মিনী", "কর্ম্মদেবী" প্রভৃতি উৎকৃষ্ট মৌলিক কাব্য রচনা করিয়া যেমন এককালে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, কুমারসম্ভবের বঙ্গানুবাদেও তাঁহার নাম তেমনি প্রসার লাভ করিয়াছিল। তাঁহার অনুবাদের বিশেষত্ব এই যে, প্রথমতঃ উহার অধিকাংশ স্থলেই মূলের সৌন্দর্য্য অব্যাহত ও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার কৃত অনুবাদ সর্ব্বত্রই মূলানুগত, অথচ কষ্টকল্পিত নহে। কুমারসম্ভবের অনুবাদে এই দুইটি বিশেষত্ব বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিছুদিন পূর্ব্বে রঙ্গলালের সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া একজন লেখক মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, রঙ্গলালই সর্ব্বপ্রথম সংস্কৃত কাব্য যথাযথভাবে বাঙ্গলায় অনুবাদ করেন। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, ইংরাজী কবিতার যথাযথ বাঙ্গলা অনুবাদও সম্ভবতঃ তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহও করিতে পারেন নাই। ইহার কতকগুলি প্রমাণ আমরা সংগ্রহ করিয়াছি—তাহার একটি, বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য, "বিরহ-বিলাপ" নামক তাঁহার অপ্রকাশিতপূর্ব্ব কাব্য। রঙ্গলাল রামশর্ম্মার Hymn to Durga নামে একটি ইংরাজী কবিতারও অনুবাদ করেন। উহা 'দুর্গাস্তোত্র' নামে 'নারায়ণে' প্রকাশিত হইয়াছে।* এই অনুবাদটিও রঙ্গলালবাবু শম্ভুবাবুকে পাঠান। শম্ভুবাবুকে এই সূত্রে তিনি যে পত্র লিখেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

CUTTACK.
20-10-'73.

MY DEAR MIRZA,

After writing my letter to you this morning, I could not avoid the temptation—so took up my grey

* নারায়ণ—আশ্বিন ১৩২৩।

goose-quill and finished the translation in 5 or 6 minutes. I don't keep copy—and never mind afterwards whatever the said grey goose-quill brings forth. See if this will do.

Yours sincerely,

RANGALAL BANERJEE.

রঙ্গলাল অবসরমত মৌলিক কাব্য রচনা করিতেন। যখন অবসর থাকিত অল্প, সংস্কৃত বা ইংরাজী কাব্যের অনুবাদ করিতেন। কটকে বদলি হইয়া কবিবর কুমারসম্ভবের অনুবাদে হস্তক্ষেপ করেন। রামশর্ম্মার Willow Dropsএর অনুবাদও কটকে বসিয়াই লেখা হয়। কুমারসম্ভবের 'বিজ্ঞাপনে' রঙ্গলাল লিখিতেছেন, "পূর্ব্বের ন্যায় আমার অবকাশ নাই,—বিষয়কর্ম্মে সমস্তদিবস ব্যাপৃত থাকিয়া প্রাতে এবং প্রদোষে দুই এক দণ্ড নিশ্বাস পরিত্যাগের সময় আছে, তাহাতে নূতন কোন বিষয় চিন্তা করিয়া লেখা দুরূহ", সেইজন্যই তিনি কাব্যানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার স্বল্প অবসরকাল যাপন করিতেন। কিন্তু তাঁহার সাহিত্যজীবনে অনুবাদের চেষ্টা এই প্রথম নহে। ১২৬৫ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ তারিখের "সংবাদপ্রভাকরে" দেখা যায়, তিনি গোল্‌ডস্মিথের ও পার্নেলের Hermit নামক কবিতাদ্বয়ের অনুবাদ লিখিয়া বাবু জয়নারায়ণ সর্ব্বাধিকারী ও বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়দ্বয়ের প্রদত্ত পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। উক্ত দুইটি কবিতার অনুবাদ প্রভাকরসম্পাদক, সাহিত্যরথী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়, স্বপত্রে মুদ্রিত করেন। তাঁহার মতে, "সেই দুইটি অনুবাদ সর্ব্বতোভাবেই উত্তম হইয়াছে।"

পরলোকগত বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কিজন্য রঙ্গলালকে Willow Drops কাব্যের অনুবাদ করিতে অনুরোধ করেন, তাহা আমরা অবগত নহি। সম্ভবতঃ কোনও বাঙ্গলা পত্রিকায় উহা প্রকাশ করা তাঁহার ইচ্ছা ছিল। শম্ভুবাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু রামশর্ম্মা কেবল ইংরাজীতেই লিখিতেন। যাহাতে তাঁহার প্রতিভা ও কবিত্ব-খ্যাতি

বাঙ্গালী পাঠক সমাজে পরিচিত ও প্রচারিত হয় এ অভিলাষ শম্ভুচন্দ্রের অবশ্যই ছিল। রামশর্ম্মার কবিতার রঙ্গলাল নিজেও একজন ভক্ত ছিলেন। একখানি পত্র হইতে তাহা জানা যায়। যোগেশবাবুর ভ্রাতা স্বর্গীয় নরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে তাঁহাদেরি ভ্রাতুষ্পুত্র বাবু শ্রীশচন্দ্র দত্ত কটক হইতে লিখিয়াছিলেন, "Myself and Deb Baboo called over to Baboo Rungolall's place yesterday * * * * He says he likes Ramsarma's writings and therefore takes the trouble to translate them" [14-1-75]. ১৮৭৩ ও ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের দুই ডিসেম্বর মাসে Willow Drops প্রকাশিত হয়। তাহার পূর্ব্বেই উহার নকল কটকে রঙ্গলালের নিকট প্রেরিত হয়। রঙ্গলালবাবু উহার অনুবাদ একটু একটু করিয়া তিনবারে পাঠাইয়াছিলেন। এই তিনবারে তিনি শম্ভুবাবুকে তিনখানি পত্র লিখেন। এই তিনখানি পত্রের নকলও যোগেশবাবুর নিকট ছিল। তিনি এগুলিও বর্ত্তমান লেখককে ছাপাইতে অনুমতি দিয়াছেন। Willow Drops এর প্রথম কয়েক Stanza অনুবাদ করিয়া পাঠাইবার সময় রঙ্গলাল শম্ভুবাবুকে লিখিতেছেন :—

CUTTACK.
7-11-'73.

MY DEAR BHAT OF BHATS,

Here goes the feat achieved in 15 or 20 minutes, amid 16,000 Uriyas assembled to pay Road-Cess. I received your letter and at once commenced translating—the rest tomorrow with the original.—Send me the remaining stanzas. Crack—you will rue hereafter if my frenzy is lost.

Yours ever sincerely,
RANG ALAL BANERJEE.

ষোড়শ সহস্র উড়িয়ানন্দনের বিজাতীয় অস্ফুট কোলাহলের মধ্যে

প্রহসনের অঙ্কুরোদগম হইতে পারে, কিন্তু কবি যে সেখানে কিরূপে আপনার একাগ্রতা রক্ষা করিয়া কবিতারচনায় মনঃসংযোগ করিতে পারেন, ইহা বিস্ময়ের বিষয়। রঙ্গলালের এই পত্র পড়িলে এবং কবির আদর্শ কাব্য সুহৃদ্‌গণের কথা স্মরণ করিলে, হাস্য সম্বরণ করা যায় না! Willow Dropsএর লেখক 'বামশর্ম্মা'টি কে রঙ্গলাল তাহা জানিতেন না। দ্বিতীয় পত্রে শম্ভুবাবুর নিকট তিনি ইঁহার প্রকৃত নাম জানিতে চাহিয়াছেন:—

CUTTACK.
20-10-'73.

MY DEAR SRIHARSHA,

You didn't say anything about the progress of my present translation. Well, here goes the conclusion of it. Do you mean to give the translation along with the original or what? Will you tell me who is the father of the child, a god father ought to know this or he cannot stand sponsor.

Yours ever sincerely,
RANGALAL BANERJEE.

এক পত্রে রঙ্গলালবাবু শম্ভুবাবুকে অনুরোধ করিয়া পাঠান, যেন তাঁহার "বিরহ-বিলাপ" ক্রমশঃ বাহির না হইয়া একবারেই ছাপা হইয়া যায়। সে পত্রখানি এই:—

CUTTACK.
8-12-'73.

MY DEAR SIVA SAMBHU,

If you give the "lament" at all, don't give it piecemeal.

Yours sincerely,
RANGALAL BANERJEE.

ইহার উত্তরে শম্ভুবাবু কি লিখেন তাহা জানি না, তবে তাঁহার

একখানি পত্রের সারমর্ম্ম তাঁহার নিজের খাতায় এইভাবে টোকা আছে—

"To Baboo Rangalal Banerjee.
Cuttack.

24th. August, 1874 * * * * *—Informed—acquaintance with the contributors to 'Magagine', Ramsarma in the bargain—by and bye.

"শ্রীশ বাবুর যে পত্র খানির উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার এক জায়গায় আছে—"Moreover, he (Rangalal) was anxious to know who the individual is. He pressed both of us, and at last I gave him an evasive answer, saying, that individual is but * * * a native of Bengal. He was not satisfied * * * * and pressed me * * * to give out the name."

কিন্তু অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে, এই "Lament" শম্ভুবাবু প্রকাশিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর জিনিসটি দত্তবাবুদিগের বাটীতেই পুরাতন কাগজপত্রের মধ্যে রক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। শেষে যখন উহা নষ্ট হইবার উপক্রম হইল, তখন যোগেশবাবু একটা খাতায় উহার নকল করিয়া রাখিলেন। রঙ্গলালের স্বহস্তলিখিত কাগজখানি হারাইয়া গিয়াছে, সুতরাং সেই নকলটিই এখন আমাদের একমাত্র সম্বল। Willow Dropsএর লেখক 'রামশর্ম্মা'। কিন্তু রামশর্ম্মা কে সাধারণে অবগত নহেন। রামশর্ম্মার প্রকৃত নাম শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষ। নবকৃষ্ণবাবু এখনও জীবিত আছেন। তিনি সপরিবারে বরাহনগরে বাস করিতেছেন। এরূপ অসাধারণ প্রতিভাশালী ইংরাজী লেখক—গদ্যে এবং পদ্যে, এরূপ সাহিত্যিক সব্যসাচী এখন এদেশে দুর্ল্লভ। জ্যোতিষ শাস্ত্রেও ইনি সুপণ্ডিত। শম্ভুচন্দ্র নববাবুকে বলিতেন, "আপনার হাত সোণা দিয়া বাঁধাইয়া দেওয়া উচিত।" এই প্রসঙ্গে, একটি গল্পের অবতারণা করা যাইতে পারে।

একসময় শম্ভুচন্দ্র Pioneerএ প্রকাশিত কোনও প্রবন্ধের জবাব দিতেছিলেন। তথায় উপস্থিত তাঁহার এক বন্ধু বলেন, "Pioneer কি আপনাকে ছাড়িয়া কথা কহিবে ?" উত্তরে শম্ভুবাবু বলেন, "এলেখার জবাব দিবার উপযুক্ত লোক বাঙ্গালীর মধ্যে একজনমাত্র আছেন—তিনি নবকৃষ্ণ ঘোষ। এদেশে ইংরাজলেখকদিগের মধ্যে চেষ্টা করিলে দুইজনে ইহার জবাব দিতে পারেন, একজন Field Robinson, আর একজন Mc.Guire"। মাইকেল, রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা নবকৃষ্ণের সম্বন্ধেও খাটে।—'বাঙ্গলাভাষার দুর্ভাগ্য যে এমন সব লেখক বাঙ্গলায় লিখেন না।'

রঙ্গলালের অনুবাদ কিরূপ মূলের অনুগত তাহা "বিরহ-বিলাপ" ও Willow Drops কাব্যের কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। রামশর্ম্মার Willow Drops এর গোড়া :—

"Distracted,—heart-sore,—all wild with unrest,
I take my harp,—my joy of early years,
Hoping perchance its notes may soothe the breast,
Which weeps and weeps, nor finds relief in tears"

রঙ্গলালের অনুবাদ—

বিরহবিষাদে মম, অন্তর কাতরতম,
নিদ্রা বিনা ক্ষিপ্তের লক্ষণ,
শৈশবের সহচরী, বীণায় আদর করি ;
করিলাম করেতে গ্রহণ।
ভাবিলাম যদি তার, ঝঙ্কার সুধার ধার
জুড়ায় এ তাপিত হৃদয়,
বিলাপেতে অনিবার, শান্তি না হইল তার,
বৃথা বিগলিত অশ্রুচয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রঙ্গলালের অনুবাদে সাধারণতঃ মূলের

সৌন্দর্য্য ক্ষুণ্ণ হয় না; যে অংশ উদ্ধৃত হইল তাহাতেও তাঁহার এই বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বিরহ-বিলাপের ভাষাসম্বন্ধে বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন, সে বিচার পাঠকগণই করিবেন। তবে বেশী literal করিতে গিয়া কোনও কোনও স্থলে কবি ভাষা যে একটু আধটু অস্বাভাবিক করিয়া ফেলিয়াছেন, একথা না বলিলে হয় ত কবির প্রতি অবিচার করা হয়। নিম্নে বিরহ-বিলাপ কাব্যখানি আমূল উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

এই প্রবন্ধ লিখিত হইবার পর ঘটনাক্রমে জানিতে পারি, পরম-শ্রদ্ধেয়া, স্বনাম-ধন্যা শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর নিকট রঙ্গলালের "বিরহ বিলাপের" একটি নকল আছে। এই সংবাদ ও নকলটি তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আমাকে দেন। গিরীন্দ্রমোহিনী অন্যূন পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত কবিতার নকল লিখিয়া রাখেন। বহুবাজারের দত্তদিগের বাটীতেই তাঁহার শ্বশুরালয়, সেই জন্য উহা দেখিবার এবং উহার নকল রাখিবার তাঁহার সুযোগ হয়। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তিনি উহা যেমন দেখিয়াছিলেন, অবিকল তেমনি নকল করিয়াছিলেন। কিন্তু যোগেশবাবুর নিকটে বিরহ-বিলাপের যে অনুলিপি আছে, তাহার সহিত এই অনুলিপির স্থানে স্থানে অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। সেইজন্য মনে হয়, রঙ্গলাল প্রথমে যাহা শম্ভুবাবুকে পাঠান, পরে স্থানে স্থানে তাহার পরিবর্ত্তন করেন এবং এই পরিবর্ত্তিত রচনা পুনরায় পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনীর রক্ষিত নকল সম্ভবতঃ দ্বিতীয়বার প্রেরিত আসলেরি কপি। বিরহ-বিলা-পের উল্লিখিত দুইটি নকলের মধ্যে যে যে স্থানে বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হইয়াছে, সেই সেই স্থলের পাদটীকায় তাহার উল্লেখ করা হইল।

বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিলা কবি যখন কীটের কবল হইতে "বিরহ-বিলাপ" উদ্ধার করিয়াছিলেন, তখন তিনি জানিতেন না যে, উহা তাঁহার সমসাময়িক যুগের আর একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ কবির রচনা। ছাপাইবার মানসে এই অজ্ঞাতকুলশীলের লেখা তিনি

এযাবৎ অতি যত্নে "কুড়ান" নাম দিয়া তাঁহার নিজের এক কবিতার খাতায় তুলিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং এই রচনার দুটি ছত্র,

"যথা অগ্নিহোত্র দ্বিজ দীপ্ত রাখে অগ্নি নিজ,
চিরদীপ্ত রবে হুতাশন"—

সমধিক উপযোগী বোধে স্বীয় গ্রন্থের 'মটো' স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। জানিতেন না বলিয়া উদ্ধৃত ছত্রের শেষে লেখকের নাম দিতে পারেন নাই। ঘটনাচক্রে, আজ প্রায় চারিযুগ পরে, "নারায়ণের" কৃপায় রঙ্গলালের কবি-ভগ্নীর ইচ্ছা সফল হইল এবং বঙ্গসাহিত্য একটি নূতন অলঙ্কার লাভ করিল।

শ্রীননীগোপাল মজুমদার।

বিরহ-বিলাপ

১

বিরহ-বিষাদে মম, অন্তর কাতরতম,
নিদ্রা বিনা ক্ষিপ্তের লক্ষণ।
শৈশবের সহচরী বীণায় আদর করি,
করিলাম করেতে গ্রহণ।—
ভাবিলাম যদি তার, ঝঙ্কার সুধার ধার,
জুড়ায় এ তাপিত হৃদয়।
বিলাপেতে অনিবার, শান্তি না হইল তার,
বৃথা বিগলিত অশ্রুচয়।

২

যতক্ষণ বিভাকর, বরিষে প্রখর কর,
ততক্ষণ অশ্রু বরিষয়।
যতক্ষণ শশিকরে, নিশির (১) তিমির হরে,
ততক্ষণ অশ্রু বন্ধ (২) নয়।

---

(১) পাঠান্তর—"নিশায়" (২) পাঠান্তর—"আঁখি শুষ্ক নয়।"

হায়! ভবচক্রে ঘোর, যে সময় যায় মোর,
তখনো ত অশ্রুপাত হয়,
স্তব্ধভাবে যেই কালে বদ্ধ থাকি চিন্তাজালে,
সেকালেও অশ্রু বরিষয় (৩)।

৩

এই কথা লোকে ভাষে, যাতনার ধার নাশে,
কালের দূরতা সুনিশ্চয়।
আরো লোকে এই বলে, অতি তীব্র শোকানলে,
নিবাতেই কাল যোগ্য হয়।
একথাটা সত্য নাকি? হয় হোক তা'তে বা কি?
আমি কিন্তু জানি নাই তাহা;
আমি মাত্র জানি এই, যত গত হয় সেই,
তত বুক ফেটে যায় আহা!

৪

শোকের তুফানে মগ্ন—, দুঃখ-ভরা-হেতু ভগ্ন,—
আমার হৃদয়-জলযান,
অনুভূত পরিগত, আমোদ আহ্লাদ যত,
তাহাদের সমাধি সমান।
যেন পরিশুষ্ক দাম, নয়নের অভিরাম,
পল্লবে না পরিণত হবে,
না জানিবে সুপ্রকাশ, নিদাঘকালের হাস,
বসন্তের লাবণ্য-বিভবে।

৫

কেন আমি করি খেদ, কেন হৃদি করে ভেদ,
ক্ষয়করী চিন্তা নিশাচরী?
ওরে মন বাক্য ধর, তমাল * বসন পর,
হায়! কথা না শুনে কি করি?
হায়! মনে যে সময় একথা উদয় হয়—
সে আমায় না করে গণন,

(৩) পাঠান্তর—"অশ্রুধারা বয়।" * তামস (?) মূলে আছে wrap thee in pride.

সে কথা কঠিন অতি, মেতে উঠে মন মতি,
জ্ঞাননেত্র রোধে, অসহন। (৪)

৬

দিবা-অবসান-পরে, নিশা আগমন করে,
তিমিরের পশ্চাতে মিহির,
ঘোরতর ঝঞ্ঝাবাত, পরিগতে অচিরাৎ,
স্থিরতার আবির্ভাব স্থির।
কিন্তু হায়! মম মনে, কেন তবে অনুক্ষণে,
অনন্ত তিমির বেড়ি রহে?
অবিরত তাহা থেকে বেগে (৫) উঠি ঝেঁকে ঝেঁকে,
দুঃখের নিশ্বাস-ঝড় বহে।

৭

ভালবাসিতাম আগে, আজো বাসি অনুরাগে,
বাসিব রে যাবৎ জীবন,
যথা অগ্নিহোত্র দ্বিজ দীপ্ত রাখে অগ্নি নিজ,
চিরদীপ্ত রবে হুতাশন।
সে অনলে নিরন্তর, মম শ্বাস উষ্ণতর,
তাপিবেক চরম নিশ্বাস,
পরেতে অনন্ত দীপ্তি, প্রবেশি পরম তৃপ্তি
প্রাপ্ত হয়ে রহিবে প্রকাশ।

৮

তব (৬) চন্দ্রনিভানন, তড়িৎ-কেলি সদন—
অসিত নয়ন মনোহর;
তব (৭) সুরভিত শ্বাস, মাধুর্য্যের অধিবাস,
বিনোদ বঙ্কিম বিম্বাধর।
পদ্মাকার তবাকার, যাহে কত শোভাধার,
বসন্তের প্রসূননিকর।

(৪) এই কয় পঙ্‌ক্তি গিরীন্দ্রমোহিনীর অনুলিপিতে নাই। (৫) "কেঁপে"—পাঠান্তর
(৬) "পূর্ণ"—পাঠান্তর। (৭) "মন্দ"—পাঠান্তর।

সুনীল নিবিড় কেশ, ধরি এক এক বেশ, (৮)
ঝুলিতেছে কত ফুলশর।

৯

কপোলযুগল মাঝে, কিবা চারু রেখা সাজে,
রত্নশিলা ললাটফলক,
বীণার ঝঙ্কার প্রায়, তব স্বরে মোহ যায়,
শ্রুতিযুগ পাইয়ে পুলক।
প্রথমেতে যেই ক্ষণে, দেখিলাম চন্দ্রাননে,
শুনিলাম মধুর বচন,
সেই ক্ষণে জানিলাম, মনে মনে মানিলাম,
বচনীয় নহ তুমি ধন। (৯)

১০

বিমল মুকুর যথা, সেরূপ যদ্যপি কথা
প্রতিবিম্ব করিত রুচির,
কিম্বা জ্যোতিশ্চিত্র † প্রায়, তোমার সুচারু কায়,
বুক থেকে করিত বাহির,
তবে তোমা নিরীক্ষণে, ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগিজনে,
তব পদে লুটায়ে পড়িত,
দগ্ধ হ'য়ে প্রেমানলে, হৃদয়-সহস্রদলে,
প্রতিমার অর্চ্চনা করিত!

১১

তোমার রূপের জোর, প্রথমে হৃদয়ে মোর,
যখন হইল অনুভূত,
যেন লয়ে প্রহরণ, লক্ষ্য করি মম মন,
মারিলেক কোন দেবদূত।
সৌদামিনী পরিকর, তোমার কটাক্ষশর,
প্রভাসহ মৃত্যুর মিলন,

(৮) "শেষ"—পাঠান্তর। † ফটোগ্রাফের প্রথম বাঙ্গলা।
(৯) পাঠান্তর—"বচনের অতীত রতন"।

বিষম আঘাত তার সহ্য বল হয় কার?
মম সহ্য নহে কদাচন।

১২

তদবধি বর্ষ কত, হইল আগত গত,
তোর সহ না ছিল দর্শন,
কিন্তু হায় নিরন্তর, ক্ষুধা এক ঘোরতর,
চিত্ত মোর করিল চর্ব্বণ।
তারপর বর্ষ কত, সমাগত পরিগত,
জুড়াতে নারিল ক্ষুধানল,
নিরবধি (১০) সেই ভুক্, দাহন করিল বুক,
শান্তি বিনা সতত বিকল।

১৩

সে চারু মধুর্য্যাবলী, ভুলিতে নারিনু বলি,
অনুযোগ ক'রনা আমায়,
সেই সব রূপরাশি জানি, মন নিজ ফাঁসি,
ইচ্ছা করি পরিল গলায়।
হরিধ্যান পরায়ণ, উর্দ্ধরেতা যোগিগণ,
সে সব করিলে দরশন,
না পারিবে বহুকাল, তাহাদের শরজাল,
কখনই করিতে লঙ্ঘন।

১৪

শেষে মোর ভাগ্যে লেখা, পুনঃ তোর সহ দেখা,
দয়া প্রকাশিলে তবে তুমি;
আনন্দ না যায় ধরা, যেন এই বসুন্ধরা,
সেইক্ষণে হ'ল স্বর্গভূমি।
আহা! আহা! কি মধুর! মাদকে মানসপুর,
পূর্ণ মম হল সে সময়,
সুখের নাহিক ওর, ভাবেতে হইল ভোর,
কিবা সেই দিন রসময়!

(১০) "সে অবধি"—পাঠান্তর।

১৫

তোমার কি পড়ে মনে, মুগ্ধ কর সেই ক্ষণে
শান্তিসুখময় যেইক্ষণে—
মম যুগবাহু-পাশে, শিহরিত তনু ত্রাসে,
বাঁধা তুমি পড়িলে বন্ধনে ?
অর্দ্ধ-বিকসিত ফুল, তুমি তার সমতুল,
লয়ে গেনু বিবাহ বাসরে ;
প্রজাপতি-করতলে প্রণয়-প্রদীপ জ্বলে,
ব্রতোচিত পণ পরস্পরে।

১৬

এখন কি পড়ে মনে, সেই সমুদয় পণে—
মুদ্রাঙ্কিত নিকর চুম্বনে ?
তব দৃঢ় অঙ্গীকার, আমার লো প্রাণামার,
ভুলিবে না যাবৎ জীবনে ?
প্রাণে প্রাণে পরিণয় হয়েছিল যে সময়,
প্রেমোন্মদে মত্ত দুই মন, (১১)
একতানে শুভদৃষ্টি, পরস্পরে সুখবৃষ্টি,
সেই ক্ষণ হয়কি স্মরণ (১২) ?

১৭

এখন কি পড়ে মনে, মম করে যেই ক্ষণে,
তোর কর পড়িল বন্ধনে,
অপ্সরার মধুধ্বনি- সহকারে সুবদনি !
মোরে ধন্য কর এ বচনে—
"এই কর, এই মন, অধীনীর এ জীবন,
তোমারিই হইল এখন"—
মুগ্ধ হয়ে সে কথায়, প'ড়ে আমি বসুধায়,
তব পদ করিনু বন্দন।

১৮

হা ! সুখের দিনচয় ! আর কি তুলনা হয়—
অনুপম সে সুখ নিকর,

(১১) পাঠান্তর—"প্রেমোল্লাসে পূর্ণ বসুন্ধরা"। (১২)পা স্তর—"সে আনন্দ নাহি যায় ধরা।"

যখন আনন্দস্রোত, করিলেক ওতঃপ্রোত,
দ্রবীভূত উভয় অন্তর ?
সুরভিভারেতে নত, মলয় মারুত মত,
সে সময়ে আমরা দু'জন
মধুর ভাবেতে মাতি, পূর্ণ বসন্তের ভাতি,
যুক্ত হয়ে করিনু চুম্বন। (১৩)

১৯

হা! সুখের দিনচয়! দরশন সে সময়,
যদি না হইত পরস্পরে,
যদি আমাদের মন, না করিত আলিঙ্গন,
প্রেমপূর্ণ লিপিপরিকরে,
কিম্বা পরিহাসনলে, জ্বালিয়া হৃদয়স্থলে,
না গড়িতাম স্বর্ণ শিকল,
না গড়িতাম এই বেড়ী, এখন যা আছে বেড়ি,
হায়! মম চরণযুগল!

২০

দু'জনায় প্রেমাবেশ, কত স্নেহ নাহি শেষ,
এক এক কটাক্ষ তোমার,—
আর এক এক দৃষ্টি, করিত তড়িৎ সৃষ্টি,
অবসান না ছিল তাহার।
খঞ্জন-নর্ত্তন সম তব গতি অনুপম,
কি আর তুলনা দিব তার ?—
তোমার মধুর কথা, বাণীর বীণায় যথা,
বিনির্গত বিনোদ ঝঙ্কার।

—

২২

পান করি' প্রেমাসব, যেন এক অভিনব,
অবনীতে উভয়ের বাস,

(১৩) "হইনু শোভন"—পাঠান্তর।

কি বিচিত্র! সেইকালে, তোমার প্রতিভা-জালে,
আমার প্রতিভা পায় নাশ—
যেরূপ যামিনীকর— করে হরে অন্য কর,
উপগ্রহ গ্রহণ সময়;—
অন্তর্হিত সেই তারা, একেবারে দীপ্তিহারা,
বিভান্বিত শুধু সুধাময়।

২৩

হেন প্রেম মূর্ত্তিমান্, দুই প্রাণে এক প্রাণ,
সে যে ঘোর তন্ত্রের প্রয়োগ,
সেরূপ তন্ময় আর, এ জগতে হওয়া ভার,
আত্মায় আত্মায় সুসংযোগ।
নন্দনকানন-জাত, অতি সুখময় বাত,
সম্ভোগ করিনু দু'জনায়,
যে প্রণয় স্বর্গপুরে, ভোগ করে যত সুরে,
আনিলাম সে প্রেম ধরায়।

২৪

যথা সুবিমল তর, (১৪) শরদ্ শশীর কর,
সমুজ্জ্বল করে সমুদয়,
সে রজত প্রতিভায়, (১৫) নিমজ্জিত করি কায়,
অসিত পদার্থ সিত হয়,
সেইরূপ মহাবল, মন্ত্রৌষধে সুকুশল,
ওরে প্রেম, অন্তরীক্ষচয়!
তোর মহামন্ত্রবলে, যে কিছু এ ধরাতলে,
সকলই সমুজ্জ্বল হয়। (১৬)

২৫

তোর ভাস্কর-ছেদী, কাচের কলকভেদী,
দৃষ্ট কি উজ্জ্বল বর্ণচয়,

(১৪) "মনোহরতর"—পাঠান্তর। (১৫) "শুক্লতর সে শোভায়"—পাঠান্তর।
(১৬) শেষের চারি ছত্র গিরীন্দ্রমোহিনীর অনুলিপিতে নাই।

অতিশয় তুচ্ছতর, পদার্থ নিকরোপর,
রঙ্গ দান করে দীপ্তিময়।
কিবা হেম, কি লোহিত, সুনীল লোহিত (১৭) পীত,
হরিতাদি রঙ্গ শোভাময়,
যেন কোন দিব্যাঙ্গনা, স্বর্গ হতে সুশোভনা,
লোকালোকে রঙ্গ বরিষয়।

২৬

যে দিকের প্রতি চাই, সে দিকে দেখিতে পাই,
প্রভার না হয় রে অভাব,
প্রভান্বিত ভূমিতল, প্রভান্বিত বনস্থল,
প্রভান্বিতা হাস্যময়ী জল,
প্রভায় পবন বহে, প্রভায় গগন দহে,
হীরকের প্রভাপরিকর—
নব কপোতিনী! (১৮) মোর, প্রোজ্জ্বল নয়নে তোর
প্রজ্বলিত ছিল নিরন্তর।

২৭

তোর মুখ সুমধুর, জিনিয়ে অমরপুর,
তথা ছিল উজ্জ্বল আধারা,
পাশাপাশি পরস্পর, সন্ধ্যাতারা মনোহর,
সহ প্রভাতের শুকতারা।
যে হেরেছে একবার ভুলিবার সাধ্য কার,
সেই চারু নক্ষত্রযুগল,
কিবা সে চমক তার, চিক্‌মিক্ অনিবার,
মদভরে করে টলটল।

২৮

উড্ডীন বিহঙ্গ কাল, আনন্দের মুক্তামালি,
ছড়াইত তুই পক্ষ থেকে,
বিভাবনা সেইকালে, মহামূল্য মণিমালে,
আমাদের পথ দিতে ঢেকে।

(১৭) পাঠান্তর—"কপিশ"। (১৮) পাঠান্তর—"প্রভান্বিত প্রিয়া মোর!"

স্বর্ণময়ী যত হোরা, আমাদের কাছে তোরা,
ছিলি সবে অনুরক্তা দাসী,—
যখন যা হ'ত সাধ, যোগাতিস বিনাবাধ,
নিত্য নব রস রাশি রাশি।

২৯

মর্ত্ত্য প্রেম যে সময়ে, অতীব উন্নত হয়ে,
স্বর্গপথে করয়ে গমন, (১৯)
সেই পথে স্থির বায়ু, হরয়ে তাহার আয়ু,
শ্বাসরোধ হয় ক্ষণে ক্ষণ। (২০)
যথা পেয়ে পক্ষ নব, প্রাবৃট্ পতঙ্গ সব,
মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়।
যাহাতে প্রভূত হয়, সেই আসি সঞ্চারয়,
অচিরাৎ তাহাদের লয়।

৩০

হায়, স্বপনের মায়া! আসন্ন বিপদ-ছায়া,
আগে আসি হয়রে উদয়;
স্বপ্ন দেখিলাম আমি— হয়েছি তটগামী,
নিম্নে নদী অতিবেগে বয়,
রজতের রাশি প্রায়, কত ঊর্ম্মি বহে তায়,
চক্রাকার আবর্ত্ত নিকর,
আমার হৃদয়'পর, সেই ক্ষণে শোভাকর,
ছিল এক কুসুম সুন্দর।

৩১

অতিশয় খরতর, অনিবার্য্য বেগধর,
প্রবাহিত সলিল নিচয়,
যেন তারা বেগভরে, গমনে সন্ধান করে,
বাঞ্ছনীয় শান্তির উদয়।
সেই ক্ষণে, আহা মরি! মোরে পরিহার করি,
স্রোতে গিয়ে পড়িল সে ফুল,

(১৯) "করিল আশ্রয়"—পাঠান্তর। (২০) "হয় হয় হয়"—পাঠান্তর।

মনোজ্ঞ প্রসূন সেই, আমার হৃদয়ে যেই,
শোভা দান করিল অতুল।

৩২

অচিরাৎ তার পরে, প্রিয়ে! তব কলেবরে,
হইল রে পীড়ার সঞ্চার,
দিবাবিভাবরী যায়, হইল নির্ব্বাণ প্রায়,
প্রাণরূপ প্রদীপ তোমার,
অবশেষে ওরে প্রাণ! সে বিপদে পেলে ত্রাণ,
রক্ষা পেলে ঈশ্বর-ইচ্ছায়,
কিন্তু হায়! সুকুমার, প্রেমপুষ্প-সুধাধার,
শুকাইয়া গেল কুয়াসায়।

৩৩

পুন যবে হ'ল দেখা, বিরাগের ভাব লেখা,
দেখিলাম তোমার নয়নে,
সুধাধার তবাধরে, এক চুম্বনের তরে,
কতই লালসা করি মনে,
কত আকিঞ্চন-[illegible], সাধিলাম অহরহ,
ব্যর্থ হ'ল সাধনা সকল,
ঘৃণাতে ভরিয়ে আঁখি, বিরাগতুষারে মাখি,
ফিরাইলে মুখশতদল।

৩৪

জ্ঞানহীন একেবারে, নিরাশায় ক্ষিপ্তাকারে, (২১)
তোরে ত্যজি' আইলাম চলি',
দয়াবশে সে সময়, বরষিল দেবচয়,
মম'পর হিমাশ্রু-আবলি।
পূর্ব্বকার ব্যবহার, করিলে লো পরিহার,
না দিলে বসিতে একবার,
ক্ষেপে উঠি সেইক্ষণে, যখন পড়য়ে মনে,
'এসো' বাক্য না বলিলে আর।

---

(২১) "ক্রোধে ক্ষোভে নিরাশায়, একেবারে ক্ষিপ্ত প্রায়"—পাঠান্তর।

৩৫

ভাবিলাম ওরে প্রাণ! করিয়াছ অভিমান,
পীরিতিতে হেন রীতি আছে,
এত যবে তব রোষ, অজ্ঞানত কোন দোষ,
করিয়া থাকিব তোর কাছে!
কিন্তু পরে হ'ল বোধ, দোষজন্য নহে ক্রোধ,
কালক্রমে গত সেই ভ্রম,
শেষে জানিলাম স্থির, মম প্রতি বিরক্তির,
ছিল কোন হেতু গূঢ়তম।

৩৬

অতিশয় ব্যগ্র হয়ে, চাহিলাম সবিনয়ে
দরশন ক্ষণেকের তরে,
না করিয়ে দৃক্‌পাত, করিলে লো পদাঘাত,
সে সকল বিনয় উপরে।
বিরাগেতে গর গর, দিয়াছিলে যে উত্তর—
অল্পাক্ষর বটে সে উত্তর,
কিন্তু খর-তরবার সম তার তীক্ষ্ণধার,
হৃদয়ছেদনে পটুতর।

৩৭

হেন চারু দেহে তোর, হেন হৃদি সুকঠোর,
নিবসতি পাইল কেমনে?
অসম্ভব অতিশয়, প্রকৃতির বিপর্য্যয়,
অবশ্যই মানিব লো মনে!
যেন ধ্রুব হেমময়ি, কোষের ভিতরে রয়,
লৌহখণ্ড সুকঠিনতর,
হীরা বটে দীপ্তিময়, কিন্তু আর কিছু নয়,
লোকে তারে কহে লো প্রস্তর।

৩৮

প্রেমপুষ্প যে সময়, নব বিকসিত হয়,
সেকালের তব লিপিচয়,

অতিশয় করি যত্ন, পূর্ব্ব অভিজ্ঞানরত্ন,
রাখিয়াছি সেই সমুদয়।
এবে আমি যেইক্ষণ, করি তাহা অধ্যয়ন,
প্রতিবাক্যে আজো এত জোর, (২২)
নিবারিতে নাহি পারি, অতিবেগে অশ্রুবারি-
প্রবাহ নয়নে বহে মোর। (২৩)

৩৯

তোর ক্রূর করাঙ্গুলি, লিখিল কি কথাগুলি,
আদরের ধন যারা (২৪) মোর!
কহ, এই কথা সব, হয়েছিল কি প্রসব,
নিদয় হৃদয় থেকে তোর?
মোহনীয় মন্ত্র প্রায়, প্রতিবাক্যে হায়, হায়,—
এখনো অনঙ্গ (২৫) দীপ্তি পায়,—
যেন কোন সুসেবিত, অতিথি হইয়ে প্রীত,
অনিচ্ছুক লইতে বিদায়।

৪০

তারপর পরিগত, দিবস সপ্তাহ কত,
আইল যাইল কত মাস,
কিন্তু আজো সবাকারে, রাখিয়াছ আপনারে—
ঢেকে রেখে দিয়ে মানবাস
বিলাপেতে অনিবার শুকাইল প্রাণাধার,
মৃত্যুমাত্র রহিয়াছে বাকি,
জীবিত থাকিতে দারা, আমি যেন পত্নীহারা
সম হয়ে রয়েছি একাকী!

৪১

যথা উচ্চ তরুবর- অভ্যন্তরে নিরন্তর,
সুপ্তভাবে থাকি হুতাশন,

---

(২২) "মনে হয়"—পাঠান্তর। (২৩) "সদা রয়"—পাঠান্তর।
(২৪) "অতি"—পাঠান্তর। (২৫) "প্রণয়"—পাঠান্তর।

অকস্মাৎ বহির্গত, হয়ে কালানল যত,
কাননেরে কয়ায় দাহন,
সেইরূপ অবিকল, অলক্ষ্যে বিরহানল,
ভস্মসাৎ করিয়ে আমায়,
এখন হইয়ে ঘোর, হৃদয়-কাননে মোর,
দাহন করিছে উভরায়।

৪২

এই কথা লোকে কয়, কারণ পাইলে লয়,
সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যলোপ পায়,
কিন্তু এটি চমৎকার, কেন এই কথা সার,
প্রেম পরিচ্ছেদে না জুয়ায়।
দেখলো প্রমাণ তার, তব বিরহে আমার,
ক্রমে আরো বাড়িছে বেদনা,
আমার আত্মায় পশি, জড়াইয়ে কসি' কসি'
চূর্ণ করে, ভুজঙ্গী শোচনা।

৪৩

মানুষের আন্তরিক, (২৬) ভাবচয় হয় ঠিক,
কাচে ভুগ্ন ভানুকর সম,
যথায় পতিত (২৭) যবে, তথায় বিতরে তবে,
নিজ নানারঙ্গ নিরুপম;
এই ক্ষণে (২৮) নিরাশ্বাস, হৃদে হায় পরকাশ,
যেন মায়াবীর মায়া ধরি,
দীপ্ত দিবা দ্বিপ্রহরে, সমুদয় দীপ্তি হরে,
করে দেয় ঘোর বিভাবরী।

৪৪

তমোপূর্ণ ধরাতল, তমোময় নভস্থল,
তিমিরেতে পূর্ণ সমীরণ,
তমোপূর্ণ মাঠঘাট, তিমিরেতে পূর্ণ বাট,

---

(২৬) পাঠান্তর—"বুঝি তব আন্তরিক"। (২৭) "কাছে উপস্থিত"—পাঠান্তর।
(২৮) "একি ঘোর"—পাঠান্তর।

তমোপূর্ণ মম নিকেতন,
তমোপূর্ণ দিনকর, তমোপূর্ণ সুধাকর,
তমোপূর্ণ চারু তারাদলে,
সমাধির অভ্যন্তরে, যেই তমঃ বাস করে,
তাহা মোর হৃদয়-কমলে।

৪৫

যদিও আপন পণ করিয়াছ উল্লঙ্ঘন,
ভাঙ্গিয়াছ নিজ সত্যব্রত,
যদিও আমার প্রতি, এতেক বিরাগবতী,
নিদয়া কঠিনা অবিরত,
যদিও শশীর মত, নিত্য তব ভিন্ন মত,
এক ভাবান্বিতা তুমি নহ,
কিন্তু আমি লো তোমার, সন্ধ্যাপ্রতি দিবাকর, (২৯)
এক ভাবে আছি অহরহ।

৪৬

হায়! কোথা এবে আর, সেই সব অঙ্গীকার,
সুসময়ে কৃত দুজনার?
হায়! কোথা সেই সব, অটল প্রতিজ্ঞা তব,
করেছিলে ব্যক্ত কতবার?
হায়! কোথা সে সকল, তব পণ অবিচল,
লঙ্ঘিলে যা এবে অনায়াসে?
হায়! কোথা সে প্রণয়, সর্ব্বজয়ী যেই হয়,
পরাজিত হ'ল তব পাশে?

৪৭

হায়! তোরা কোথা গেলি? হায় রে কে দিল ফেলি,
তোদিগে উপেক্ষি' সমীরণে,
তবু নাহি মানে মন, এখনো রে প্রাণধন,
কেন তোরে ধ্যায় অনুক্ষণে?
যথা সেই শূন্য থেকে, কুলিশ পড়িয়া ঝেঁকে,
মহীরুহে করিলে দারুণ,

(২৯) "হিমাকর"—পাঠান্তর।

তবু সেই শূন্যপানে, রহে স্থাণু একধ্যানে,
নিজ শির করি উত্তোলন।

৪৮

আমারে লো প্রিয়ে হায়! নিজ প্রাণবায়ু প্রায়,
এককালে ভাল বেসেছিলে, (৩০)
আমার বামেতে বসি, সোহাগ রসেতে রসি,
'প্রাণ' 'প্রাণ' বলি ডেকেছিলে। (৩১)
এখন বুঝিনু ফন্দী, সে সকল অভিসন্ধি,
নিমন্ত্রিতে আমার মরণ,
হায়! মম মৃত্যু নয়, করিতেছ সুনিশ্চয়,
আপনারি আত্মার ঘাতন!

৪৯

হর হর অভিমান, ওলো ও পাষাণি প্রাণ!
হও হও দ্রব লো প্রেয়সি!
প্রণয়ের স্রোতজলে, আবার যাহ লো গ'লে,
মম শুষ্ক হৃদি দেহ রসি;
কর পুনঃ সুকোমল, আপন হৃদয়স্থল,
মম শির বিশ্রামের স্থান,
হও দেবি! অধিষ্ঠাত্রী, হও পুনঃ দয়াদাত্রী,
হও পুনঃ পূর্ব্বের সমান।

৫০

আর মোর নাহি সয় এ ঘোর যাতনাচয়,
এ অধৈর্য্য বাতুলের প্রায়,
হইল অনেক কাল, ঘেরিয়াছে মৃত্যুকাল,
তবু প্রাণ নাহি বাহিরায়!
এসলো প্রেয়সি মোর! এখনো যদ্যপি তোর,
হৃদে থাকে দয়ার সঞ্চার,

---

(৩০) "ভাবিতে বলিতে শতবার"—পাঠান্তর।
(৩১) "প্রাণাধিক বলিতে তোমার."—পাঠান্তর।

জীবন নিধন কর, মারি' এক দৃষ্টিশর,
প্রাণবায়ু হরলো আমার।

৫১

যদিও তোমার মূর্ত্তি, নয়নে না পায় স্ফূর্ত্তি,
কিন্তু সদা মনে বিদ্যমান্,
চারিদিকে যেন হেরি, আকাশে রয়েছে ঘেরি,
মন্ত্রে বিমোহিত একপ্রাণ।
প্রকৃতি আপন মুখে, তোমার প্রতিমা সুখে,
ধারণ করিছে প্রাণপ্রিয়ে!
অতি প্রিয়তম, মম, এহেন বিষম ভ্রম
অনিবার দেয় বাড়াইয়ে।

৫২

যামিনীর অধিপতি, কিম্বা তারা জ্যোতিম্মতী,
আমি ত না করি দরশন,
কি ধরায়, কি আকাশে, যত শোভা পরকাশে,
কিছুই না হেরে লো নয়ন।
ফলতঃ নিরখি হেন, ক্ষুদ্র এক চক্রে যেন,
[illegible]মাবেশ হইয়া সকল,
তব অনির্ব্বচনীয়, রূপরাশি কমনীয়,
পাইতেছে শোভা সমুজ্জ্বল!

৫৩

সুরভির নিকেতন, মলয়জ সমীরণ,
তোরে লয়ে তাহার বড়াই,
প্রত্যেক হিল্লোলে তার, চারুগন্ধ সুধাধার,
তোর নিশ্বাসের ঘ্রাণ [illegible]ই।
মধুকর গুঞ্জরণ- পূর্ণ প্রতি কুঞ্জবন,
কিবা তরুপুঞ্জ গীতিময়,
প্রতি (৩২) বিহঙ্গের স্বর তরঙ্গ-মধুরতর,
তোমারি সুস্বর বিতরয়।

(৩২) "যেন"—পাঠান্তর।

৫৪

ওলো কপোতিনি মোর ! মোহন মূরতি তোর,
মনোনেত্রে হেরি নিরন্তর,
আজো করি অনুভব, তব মৃদুমন্দ রব,
ধ্বনিত আমার বক্ষোপর,
যেই রব সুধাময়, প্রকটিতে সে সময়,
কৃতার্থ যখন প্রেমসুখে,
সোহাগেতে দ্রব হ'য়ে, সময় যাইত ব'য়ে,
দোঁহে থাকিতাম সুখে সুখে।

৫৫

অদ্যাপিরে প্রাণধন ! তোরে করি দরশন,
যেন সন্ধ্যা তারা মনোহর,
এক একবার প্রিয়ে ! বাতায়নে দেখা দিয়ে
প্রকাশিছ শ্রীমুখ সুন্দর।
যেইরূপ ভাব ধরি,' পূর্ব্বে তুমি প্রাণেশ্বরি !
থাকিতে লো নাথপ্রতীক্ষায়,
যে নাথের পদ আর, সঞ্চারিত পুনর্ব্বার,
না হইতে পারে বা ত[illegible]।

৫৬

দেখিতেছি এইক্ষণে, বসিয়াছ চন্দ্রাননে !
শ্রান্তিকর এই দ্বিপ্রহরে,
এ[illegible]াকিনী মৌনাকারে, অপঠিত চারি ধারে,
পড়ি' আছে পুস্তকনিকরে ;
[illegible]থা সীতা সুরূপসী, শোকেতে ছিলেন বসি,
[illegible]রাগারে অশোকের বনে,
কিম্বা অবিক[illegible] স্থির, শ্বেতোপল মূরতির,
পলক স্থগিত দুনয়নে।

৫৬

আয়ো যেন প্রাণ তুমি, লুটিয়ে পড়েছ ভূমি,
শীর্ণ হয়ে যেতেছ শুকিয়ে,

যথা প্রস্ফুটন কালে, কবলিত কীটজালে,
শোভাশূন্য পুষ্প, প্রাণপ্রিয়ে!
এত দুঃখ তবান্তরে, তথাপি লো নাহি সরে.
সেই কথা তোমার বদনে,
যে কথাটি তব দাসে, অবিলম্বে তব পাশে,
আনিবেক সংশয় বিহনে!

৫৮

আর করি দরশন, শিহরিছ প্রাণধন!
যেন দেখি আপনার ছায়া,
আবার ঈক্ষণ করি, অনিদ্রায় শয্যোপরি,
ছট্‌ফট্‌ করে তব কায়া।
অই কি নিশ্বাস ঘোর, হৃদয় হইতে তোর,
বিনির্গত হইলরে প্রাণ,
অই কি লো সুলোচনা! অশ্রু সলিলের কণা,
তোমার নয়নে বিদ্যমান।

৫৯

এই যাই, যাই আমি, হ'য়ে অতি দ্রুতগামী,
অনুরক্ত প্রেমিক বিহিত,
শীতল করিতে তব, দুঃখের তরঙ্গ সব,
যাহা তোর হৃদে সমুত্থিত।
যাই চুম্বনেতে কান্তে! তোমার নয়নোপান্তে,
অশ্রুবিন্দু করিবারে পান, (৩৩)
কিন্তু মরি হায় হায়! ভেবে বুক ফেটে যায়,
তুমি কোথা, আমি কোথা প্রাণ! (৩৪)

৬০

দূর দূর! রে সকল, বিফল স্বপ্নের দল,
সারহীন মিথ্যা দৃষ্টি ছায়া,

---

(৩৩) "দূর"—পাঠান্তর।

(৩৪) "কোথায় বিধুর"—পাঠান্তর।

হও হও দূরীভূত, কল্পনায় আবির্ভূত,
ওরে মরীচিকা মিথ্যা মায়া ;
একে ভ্রান্তিভরে ঘোর, মাতায়েছ মতি মোর,
তুমি ফের বঞ্চহ আমায়,
দেখাইয়ে প্রীতিকর, নানা দৃশ্য মনোহর,
হায় তারা কোথা শেষে যায় !

৬১

হায় স্মৃতি ভয়ঙ্করী, ডাকিনীর ভাব (৩৫) ধরি',
হৃদয়েতে হইয়ে উদয়,
ভোজবাজী ছায়ামত, মনের কল্পনা যত,
একেবারে (৩৬) করিল বিলয়।
অপসৃত করি ভ্রম, সরাইল সে বিষম,
ক্ষিপ্তবৎ বিহ্বল স্বপন,
পরে দিল পরিচয়, আমি আর কেহ নয়,
সেই পরিত্যক্ত অভাজন।

৬২

ছাড়িয়ে রঙ্গিল তন্ত্র, সেই স্থানে রাথ যন্ত্র,
মিলে যথা প্রতিভাসরাশি,
পরিপূর্ণ নিষ্ফলতা, স্বীয় শিল্পকুশলতা,
সত্য আসি করুন প্রকাশ।
আহা অপরূপ একি ! তোরে সুখময়ী দেখি,
মাতিয়াছ আমোদে আহ্লাদে,
নাহি আন দোষ লেশ, যেন নির্দ্দোষীর শেষ,
কারো মন ভাঙ্গনি বিষাদে !

৬৩

নিকুঞ্জের প্রীতিকর, প্রমোদিত পক্ষীবর-
সম তুমি মেতেছ প্রমোদে,
হাব ভাব লীলা হেলা- সহ মনোমত খেলা,
খেলিতেছ বিবিধ বিনোদে।

(৩৫) "বেশ"—পাঠান্তর।
(৩৬) "একে একে"—পাঠান্তর।

যথা ভস্মীভূত হ'য়ে, অভিনব তনু লয়ে
সমুত্থিত বিহঙ্গবিশেষ,
পূর্ব্ব-প্রেম-ভস্ম থেকে, নব অনুরাগ একে,
উঠাইছ সুখী হতে শেষ।

৬৪

হওলো হওলো সুখী, তার সহ বিধুমুখি!
যাঁরে মন সঁপেছ এখন,
নবপ্রেম শস্যরাশি, আনন্দরসেতে ভাসি,
সংগ্রহ করহ প্রাণধন।
কখনো কিরূপ রঙ্গে, ভালবাসা মম সঙ্গে,
ছিল ইহা হওলো বিস্মৃত,
পূর্ব্বকথা পূর্ব্বরতি, কর ওগো রসবতি!
ভোগবতী জলে নিমজ্জিত।

৬৫

তথাপি সমুদ্র সম, সীমাহীন প্রেম মম,
তব প্রতি জান ইহা স্থির;
ছাড়ল (৩৭) ওলো সুত্র, তল নাহি পাবে কুত্র,
অতল, অস্পর্শ, সুগভীর।
হোক্ হোক্ (৩৮) সুবিচ্ছেদ, হাজার হউক ভেদ,
তবু আমি তোমারি নিশ্চয়;
অলক্ষ্য (৩৯) গগনে বসি', সমুদিত বটে শশী
কিন্তু সিন্ধু হেরি ফুল্ল হয়।

(৬৬)

উত্তর কেন্দ্রের প্রতি, (৪০) চুম্বকের যথাগতি,
একভাবে সেই দিকে ধায়,

(৩৭) "ফেলহ" পাঠান্তর।

(৩৮) "তব সনে"—পাঠান্তর।

(৩৯) "সুদূর"—পাঠান্তর।

(৪০) "অয়স্কান্তের প্রতি"—পাঠান্তর।

অথবা যখন রবি, যেখানে প্রকাশে ছবি,
রাধাপদ্ম সেই দিকে চায়।
তারো চেয়ে রসবতি! একভাবে তব প্রতি,
অবিরত আছে মম মন,
হায়! সেই একভাব, না হইবে তিরোভাব,
যদবধি রহিবে জীবন।

৬৭

যদ্যপি একের প্রতি, সমর্পিলে রতিমতি,
তাঁরে কর অচলা ভকতি,
তবে প্রিয়ে সুনিশ্চয়, আমারি সে ভক্তি হয়
অবশ্যই আমারই সে রতি।
যেহেতু লো চন্দ্রাননে, নিরবধি মম মনে,
জাগরূক একমাত্র দেবী,
তাঁহাকেই যথাশক্তি, আরাধি সহিত ভক্তি,
তুমি সেই, তোমারেই সেবি।

৬৮

সে ভক্তির অর্দ্ধভাগে, [illegible] পূজিতাম আগে,
আপনার ইষ্ট দেবতায়,
যেই নিষ্ঠাসহকারে, সাধিয়াছি লো তোমারে,
সাধিতাম অর্দ্ধভাগে তাঁয়,
[illegible]ব এতদিনে মম, মুনিত্ব পবিত্রতম,
সংগ্রহ হইত অসংশয়,
কিরীট (৪১) কণ্টকময়, মোর ভাগ্যে কভু হয়?
পা[illegible]তাম তাহা প্রভাময় (৪২)।

৬৯

আছে [illegible] সমুজ্জ্বল, কত কত নেত্রদল,
স্নেহ প্রেম হাস্যের সে ভোর,
আছে বটে মধুময়, অধর অমৃতাশয়,
সে অমৃত করায়ত্ত মোর;

---

(৪১) "বেপথ"—পাঠান্তর। (৪২) "অসংশয়"—পাঠান্তর।

কিন্তু সে সকলে প্রাণ! প্রেমহারা মম প্রাণ
কোনরূপে সুখ নাহি পায়,
পেয়ে এত তিরস্কার, ভাবান্তর নাহি তার,
আকর্ষিয়ে আছেলো তোমায়।

৭০

হায় হায় কি অদ্ভুত, নিকরনয়ন-যুত,
হন সেই প্রণয় দেবতা;
পদ সঞ্চরণে আমি, হই যেই পথগামী,
যেই দিকে ফিরাই আঁখিলতা;
কিবা লোকারণ্যময়, নগরীর রথ্যাচয়,
কিবা হর্ম্ম, কিবা কুঞ্জবনে,
নক্ষত্রের নিভ সাজে, সাজ্জিত কুহেলীমাঝে,
দেখি যেন তব চন্দ্রাননে।

৭১

সেই মুখ পূর্ণশশী, থেকে থেকে হে রূপসি!
নিশিতে বিশোধ দেয় দেখা, (৪৩)
আর যেন (৪৪) সেইক্ষণ, করি আমি নিরীক্ষণ (৪৫)
সমুদিত [illegible] শশি-লেখা। (৪৬)
শূন্যে এক সুধাকর, অন্য মম বক্ষোপর,
এক ভ্রান্তিদৃষ্টি হে সুদতি! (৪৭)
যেন সেই ব্যঙ্গরত, মুখভঙ্গি কত মত
করে মানসিক নেত্র প্রতি। (৪৮)

৭২

তব আত্মা রাজা প্রায়, অনুগত প্রজা তায়,
মম মনোগত ভাবগণ,
যেন তারা অনুদিন, তুচ্ছের কারণাধীন,
তোরে ঘেরি ঘোরে ঘন ঘন।

---

(৪৩) পাঠান্তর—"বিহরে নেত্রপর"। (৪৪) পাঠান্তর—"সখি"
(৪৫) পাঠান্তর—"দরশন"। (৪৬) "শশধর"—পাঠান্তর।
(৪৭) পাঠান্তর—"কহরে আমারে"। (৪৮) "চিন্তাগারে"—[illegible]

ঘুরিতেছে অবিশ্রান্ত, শ্রান্তিভারে ভারাক্রান্ত,
ঘূর্ণমান প্রতিক্ষণ সহ,
যথা সব গ্রহগণ, বেড়ি বেড়ি বিবর্ত্তন,
ভ্রমণ করিছে অহরহ।

৭৩

প্রেয়সি! স্মরণ কর, যে মনমুকুরোপর,
তব মোহনীয় মূর্ত্তিছায়া,
পতিত হয়েছে প্রাণ! সেই স্থানে বিদ্যমান,
রহিবেক নিত্যচিত্র প্রায়া।
সেত আর কিছু নয়, কাচের স্বরূপ হয়,
ভঙ্গুর ভাঙ্গিতে পারে শেষে,
গুরুতর চিন্তাভার, রক্ষিত উপরে তার,
চুরমার হবে লো বিশেষে।

৭৪

হৃদয়েতে সমুদ্গত, হয়ে থাকে ভাব যত,
প্রেম তাহে কি বিচিত্রতম!
অনুরাগচন্দ্রমার, ইহা পূর্ণ কলাসার,
দেখ দেখি এর পর[illegible]।
যে নরক তলাতলে, [illegible] স্বর্গ সর্ব্বোচ্চস্থলে,
সে দুয়ে মিলায় একস্থলে,
ছুঁয়াইয়ে নিজানল, করে দেয় সমুজ্জ্বল,
যে জনের হৃদয়-মণ্ডলে।

৭৫

সেই স্বর্গে অবস্থান, ছিল মম যবে প্রাণ,
সদয়া ছিলে লো মম প্রতি,
নরক যাতনা ঘোর, দেখ হায় হায় মোর,
ভোগসার হয়েছে সম্প্রতি।
আহা আমি এইক্ষণ, করিতেছি নিরীক্ষণ,
আপনার জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ,
আমা[illegible]নহেক আর, দাসবৎ ব্যবহার,
করে মম শত্রুর সদন।